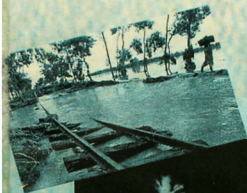
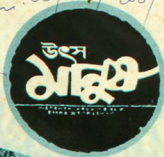


ISSN 0971-5800

জানুয়ারি ২০০১

Cul. Am. 02/02/2001

আগামী বন্যা প্রতিরোধ সংখ্যা



বন্ধ হোক
বার্ষিক
বন্যা
উদযাপন

৮
০৫০.
১ ৭ ৮

প্রজ্ঞদ চিত্র পরিচিতি

১. ২৬ সেপ্টেম্বর '০০। কলকাতা থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে বর্ধমানের কাটোয়া।
২. ২০ সেপ্টেম্বর '০০। কলকাতা থেকে ১০০ কি.মি. দূরে নদীয়ার শান্তিপুর। জলে ডুবে যাওয়া গ্রাম থেকে নিজেদের একটি গরুকে নিয়ে এগোচ্ছে এক বন্যা-বিষমস্ত পরিবার, কোনো উঁচু জায়গার খোঁজে।
৩. ২২ সেপ্টেম্বর '০০। কলকাতা থেকে ১৫০ কিমি দূরে কৃষ্ণনগরে। অসহায় দর্শক গ্রামবাসী।
৪. ১ অক্টোবর '০০। বাংলাদেশের যশোরের গাটিপাড়া গ্রাম থেকে ছিন্নমূল বানভাসি এক পরিবার তাঁদের সর্বস্ব নিয়ে ভেসে পড়েছেন অশ্রুয়ের খোঁজে — সীমান্ত বিভেদ জলে একাকার।

সৌজন্য ॥ এ.এ.সি. ফটো

০৫৭.৭।১৫
১৭ ৭



দ্বিবিংশ বর্ষ • প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা • জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০১
(আগুন বন্যা প্রতিরোধ)

সূচিপত্র

বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ভাবনা	সিতাংক গঙ্গোপাধ্যায়	৩
যা আশ্রয় করণীয়	কল্যাণ রায়	৮
এখানের বন্যা-কিছু পরামর্শ	তপোব্রত সামাল	১৩
উঃ ২৪ পরগনা	রণতোষ চক্রবর্তী	১৭
মানুষ কী না পারে	ভোলানাথ আইচ	১৮
ফারাফার দায় কোথায়	সেকেন মুখার্জি	২১
মালদা ও ফারাফা রক্ষা	তরুণ কুমার চৌধুরী	২৪
আঁকাবাঁকা পথে নদী	সমীরকুমার ঘোষ	২৮
জীবিকাবিহীন জীবন	জহা মিত্র	৩১
চিঠিপত্র	মনোজ্যোত সাহা	৩৫
সংগঠন সংবাদ		৩৬

সম্পাদনা : অশোক বসুগোপাধ্যায়

সাহায্য সহযোগী : করুণ ভট্টাচার্য, শ্যামল ভদ্র, চিত্ত সামন্ত,
পূর্ববী ঘোষ এবং সমীরকুমার ঘোষ

উৎস মানুষ

ISSN 0971 - 5800

বি ডি ৪৯৪, স-টলেক, কলকাতা ৬৪

BD 494, Salt Lake, Calcutta 64

অস্থায়ী কার্যালয় — প্রাক্কী, এস ৬/২, স-টলেক,

কলকাতা ৯১

সম্পাদকীয়

'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে'

দু হাজার সাল চলে গেল, বন্যার নারকীয় দশা এখনো চোখ থেকে যায় না। প্রাকৃতিক বন্যাপ্রবণ জলপাইগুড়ি কুচবিহারকে বাদ দিলে এবারে নটি জেলা বন্যার কবলে পড়েছে। দু'কোটির ওপর মানুষ বন্যা-বিপন্ন, গৃহহীন, নিরাজ্ঞ। কয়েক সহস্র মৃত। সঠিক সরকারি হিসেব নেই। অন্তর্নতি গবনি পত্র পচাগুলো দেহ যত্রতত্র। বিপুল পরিমাণ চাষের ক্ষতি চিরতরে বরবাদ। সোনার বাংলার দরিদ্র ঘরে দরিদ্র এখন দাগটানা দরিদ্র-সীমার অনেক নীচে তলিয়েছে। কিশোরী-যুবতী-গৃহবধূরা গনিকাবৃত্তি ছাড়া ঝিদে মেটানোর পথ খুঁজে পায় না। কিশোর-যুবক-প্রবীণেরা ম্যাগলিং আর চুরি-ডাকাতির লাইন ধরছে নিরুপায় হয়ে। বন্যা আসছে প্রতিবার। আরো ভাঙন, আরো প্লাবন, আরো সর্বনাশ নিয়ে। পরিস্থিতি এতই কঠিন, এতই ভয়াবহ যে, প্রশাসন থেকে বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী থেকে গণকর্মী, কেউই আর বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। আর সামনে নির্বাচন বলে ভোট-শিকারি (বা ভিয়ারি) রাজনীতির কর্তারাও বেশ বিভ্রান্ত।

অতএব বিস্তার লেখালেখি, সভা সেমিনার, তর্ক-বিতর্ক চলছে। অতিবৃষ্টির অজুহাত সত্যি, না পরিকল্পনার গোড়ায় গলদ, তা নিয়ে তথ্যের তত্ত্বের কৌদল চলছে। বেমজা বীধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ নৈরাজ্য, সরকারি অর্থের নির্লক্ষ আত্মসাৎ, মিথো প্রতিশ্রুতি — এ সবই মানুষ দেখে আসছে অসহায়ভাবে। কিন্তু কতদিন? আর কতকাল এই অমানবিক কর্মসূচি চলবে? কোনো সমাধান কি নেই?

বিশেষজ্ঞ কমিটি কত যে বসল! আমাদের বিস্তৃতির স্বভাবই কমিটি-রিপোর্টগুলির নীরবে সমাধি হওয়ার ভরসা। ১৯৫৪ থেকে বহু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিটি বসেছে বন্যার ধ্বংসকণ্ড সামলানোর উদ্দেশ্যে। সুপারিশ হয়েছে

সুচিভিত্তি পরামর্শে। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটিও সুপারিশ সরকারের কাছে গ্রাহ্য হয়নি দীর্ঘমেয়াদ বা কার্যবাহ্য্য কিংবা অন্য কোনো রহস্যময় কারণে। একের পর এক সুপারিশ এসেছে আর গেছে। ১৯৮৫তে পূনের 'কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি গবেষণা পরিসংখ্যান' (CWPRS)-এর সুপারিশ, ১৯৮৯-এ মালদা-মুর্শিদাবাদ বাঁচাতে সড়কশ চক্রবর্তীর 'গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন'এর সুপারিশ, ১৯৮০ সালে প্রীতম সিং কমিটির সুপারিশ (সামান্য অংশ রূপায়িত, পরে অর্থাভাবেই দেখাইতে শুরু), সাম্প্রতিক ১৯৯৬-তে কেশবকর কমিটির সুপারিশ — এরকম সব কটি সমাধান-সুপারিশই পুরন্বত হয়েছে সরকারি অবহেলা আর সদিচ্ছার অভাব দিয়ে।

আসলে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া ক্ষয়ভ্যাসীন শক্তি করবেই বা কী! মসীমাতৃক বসন্তেশবাসীর সলিল-সমাদি-ক্ষেত্র তিল তিল করে রচিত হয়েছে গত দু'শতকে। চরম দুর্নীতি আর গণবিদ্বেষ পরিকল্পনায় অপদারভতা আর অপভীতির কর্মফল পথ রচিত হয়ে গেছে, সেটা কর্তৃপক্ষ খুব ভালো করেই জানেন। এখন সেখানে হাঁটু ভুবে যায় পাকে, এগোতে চেষ্টা করলেও এগোনো যায় না। অতএব অর্থাভাবেই জনমনবান্য রাজ্যন্যের এটাই প্রকৃষ্ট সময়। রাজ্যের হাতে কোনেই টাকা নেই সে তো সত্যি নয়। গত বন্যায় বরাদ্দ বন্যাগ্রাসের ৬০০ কোটি সরকারি টাকা কোথায় গেল? আজও, তিন মাস পরেও, হ্রেপল বা কথলের একটা ছেঁড়া টুকরো পারনি বহু বহু বানভাসি 'হতভাগ্য' গ্রাম। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের আশু অডিটার জেনারেল (সি এ জি) পশ্চিমবঙ্গে বন্যাগ্রাসের টাকা ব্যবহারের যে হিসেব দিয়েছেন তাঁদের সর্বশেষ রিপোর্টে, যে-চিত্র উদ্ভোচিত করা হয়েছে তাতে লজ্জায় (যদি অবশিষ্ট কিছু থেকে থাকে) মুখ মুকোনো দায় হয়। রিপোর্ট অনুসারে গত দু'দশকে মালদা-মুর্শিদাবাদে ১১৪ কোটি টাকার বেশির ভাগই জলে গেছে। তাঁরা বলেছেন বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে ঠিকাদারদের 'পাইয়ে' পেওয়ার জন্য মাস্টার প্রান হারিয়ে, মাটি পরীক্ষা না করে, ভরা বর্ষায় পদ্মা পাড়ে বোম্বার ফেলে কোটি কোটি টাকা নষ্ট করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ। মাপজোকের ভুলো হিসেব দেখিয়ে বহু টাকা গায়েব করা হয়েছে। শারাক ডাউন স্ট্রীমে জরুরিকায়ী

কাজের নাম করে সরকারের গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন প্রতিরোধ বিভাগ ৬ বছরে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা নষ্ট করে দিয়েছে সেচ বিভাগের সহযোগে। এছাড়া ১৯৯১ থেকে '৯৭ আধেয়গঞ্জ, আলহাইপুর ও নলবোনায় পাড় বাঁধানোর কাজে সেচ দফতরের নষ্টের পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এ হল কেবল মুর্শিদাবাদের টুকরো চিত্র। তাহলে হিমবাহের মূল অংশটা, অন্যান্য জেলা মিলিয়ে, কত পরিমাণ টাকার খেলা হতে পারে অনুমান করতে খুব কষ্ট হয় না। তাই এবার জ্যোতিবাবুকে সামনে রেখে রাজ্য সরকার যখন কেন্দ্রের কাছে ১৪৮৭ কোটি টাকা বন্যাগ্রাসের জন্য উচ্চকণ্ঠে দাবি করেন, জোর জুলুমী আকবর রাখেন, তখন কেন্দ্র যদি ঘুরে ফিরে আগের পেওয়া টাকার হিসেব চাইতে থাকে বারবার, তাহলে খুব কি অন্যায় তারা করে? অথচ লোক খেপানোর চেষ্টা হচ্ছে 'কেন্দ্রীয় বক্তব্য'র সেই বক্তাপটা ঘোষণা দিয়ে।

এখন পরিস্থিতি এই। ওদিকে দিমি-কলকাতার রাজনৈতিক পাশা খেলা আর এদিকে আমাদের, উলুখাগড়ার, প্রাণ যায়। নতুন বছর এলো, আবার আসবে বর্ষা, আর বর্ষা মানেই বন্যা। হয়তো আরো ভয়াবহ, আরো বিধ্বংসী, আরো ব্যাপক বন্যা অপেক্ষা করছে এ বছর। আমরা জানি বন্যা-ভাঙন সমস্যা এক দু'বছরে সমাধান হবে না। সদিচ্ছার জাগরণ যদি বা ঘটে প্রাণন বন্ধ করা দীর্ঘমেয়াদী দুর্কর কাজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কও চলে আসবে। আমাদের শুধু একটিই অসহায় আর্তি — আশু কর্তব্য কি কিছুই নেই? আসছে বন্যায় প্রাণন কিছু কমুক, নদীর বুকে কিছু কম মৃতদেহ ভাসুক, গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন না হয়ে থাক, কোনো শিশু আর মায়ের কোল থেকে না ছিটকে পড়ুক।

কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার প্রখ্যাত অভিজ্ঞ সামাজিকভাবে লায়বক বিশেষজ্ঞদের দুরূহে দুরূহে ঘুরেছি আমরা। স্বল্পমেয়াদী আশু সমাধানের কিছু বাস্তব পরামর্শ দিন (দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ তো আগে থেকেই আছে), এখনুনি কী করা সম্ভব বলুন, মানুষের নিরাশ্রীন আতঙ্কের দিনগুলিতে কিছু সমাধান সূত্রে হৃদিশ দিন — যাতে সহায় সবলহীন বাংলার গরিব মানুষ অস্তত গলা তুলে কিছু অধিকারের দাবি জানাতে পারেন।

এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ভাবনা

সিতাংশুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে বার্ষিকিক বন্যার দাপট সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা আর সম্ভব না হলেও, এর ক্ষয়ক্ষতি কমানবস্থা সীমিত ভাৱে অসম্ভব নয়। নিয়ন্ত্রণের দু'ধরনের ব্যবস্থা আছে — মূল পরিকাঠামো বা নির্মিতমূলক, এবং কঠোর বহিষ্ঠিত বা অনিনির্মিতমূলক — যেমন ধনাও পূর্ণাচাষ, সতর্কীকরণ, গ্রামভূমি নিয়ন্ত্রণ, বন্যা ইন্স/ বর্ষমান আর্থিকমজিক পরিবেশে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জনশেখা প্রবর্তিত ও পরিচালকের সঙ্গে তত্ত্বোপী জনসাধারণের সারসঙ্গা বর্ততে শাংলৈ আকর্ষী তিনে কিছু আশার ভাংসা থাকবে।

সূচনা

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতি বছরই অল্পবিস্তর বন্যা হয়। বসন্ত এমনিও অনেক বন্যা উপক্রান্ত অঞ্চল আছে যেখানকার অধিবাসীরা আবার মাসে আকাশে মেঘ দেখলেই বন্যার আশঙ্কায় বিন শুনতে শুরু করেন, কবে বর্ষাকাল শেষ হবে। তবে এবারের বন্যা নানা দিক থেকেই অসাধারণ। যদিও ১৯৭৮ সালের বন্যা এখনো মানুষের মনে ভয়ঙ্কর স্মৃতি হয়ে জেগে আছে। তবুও এবারে তুলনামূলকভাবে কম অঞ্চলের মধ্যে উত্তর বন্যায় কম ক্ষতি ঘটেই হয়েছে। বিশেষ করে বন্যায় অস্বাভাবিক দীর্ঘ স্থায়ীত্বের জন্য মানুষের দুঃখ দুর্দশা এবং বিপর্যয় অধিক হয়েছে।

বন্যা কেন হয়? অল্পকাল্য এর উত্তর, অধিক বৃষ্টিপাতের

ফলে উদ্ভূত জলরাশি যখন আঞ্চলিক নিকাশী ব্যবস্থার মাধ্যমে, তা সে নদীই হোক বা বাল কিল হোক, স্বল্প সময়ে নিষ্কাশিত হতে পারেনা তখনই বন্যা হয়। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধ্যে কলকাতা শহরও প্রায় তিনদিন পুরো বন্যা কবলিত অবস্থায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে আলিপুরে পাঁচ দিনে (২৭/৯ থেকে ১/১০) নথিভুক্ত মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৭৩৫.৩০ মিমি, যার মধ্যে একমাত্র ২৮/৯ তারিখেই ছিল ৩৬৯.৭০ মিমি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে আলিপুরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৬২৪.৮ মিমি। বার্ষিক গড়ের শতকরা হিসাবে উল্লিখিত পাঁচদিনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৫ শতাংশ এবং ২৮/৯ তারিখের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩ শতাংশ। এই প্রসঙ্গে ২০০০ সালের কিছু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল :

বৃষ্টির পরিমাণ (মিলিমিটার)

বৃষ্টিমাপক কেন্দ্র	১৮/৯ থেকে ২১/৯ ৪ দিনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ		২৪ ঘণ্টায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের		বার্ষিক গড়	মন্তব্য
	বার্ষিক গড়ের শতাংশ	বার্ষিক	পরিমাণ	বার্ষিক গড়ের শতাংশ		
কুলিয়ারী (দুমকা)	১০৭৩.২০	৮৩.৩৫	৪৫০.৬০ (২১.৯)	৩৫.০৭	১২৮৫.০	ময়ূরাকী বাঁধের অববাহিকা
সিউড়ি (বীরভূম)	১০৬৬.২০	৭৬.১৬	৬১৮.০০ (১৯.৯)	৪৪.১৫	১০৯৯.৯*	ময়ূরাকী প্রকল্প সেচসেবিত অঞ্চল
রামপুর হাট (বীরভূম)	১৩৭৭.১০	৯৫.৮৫	৪৮৮.৬০ (১৯.৯)	৩৪.০১	১৪৩৬.৭*	
সিকাটিয়া	৯৮৯.৬০	৭৩.২৫	৫৬৯.২০ (২১.৯)	৪২.১৩	১৩৫১.০০	" অজয় নদের অববাহিকা
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)	১২০৭.৫০	৮৫.২৪	৫৫৮.০০ (১৯.৯)	৩০১.৩৯	১৪১৬.৬*	

* চিহ্নিত ওয়া ছেদা গোষ্ঠীভার : খেচ সঞ্চরিত। বাকি তথ্যগুলি পশ্চিমবঙ্গ সেচ ও জলপথ বিভাগ সূত্রে প্রাপ্ত।

* সোমক পশ্চিমবঙ্গ সেচ ও জলপথ বিভাগের প্রাক্তন চিক ইঞ্জিনিয়ার : এবং শেবে রাসা সেচ সত্ত্বের সচিব হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত।

এবারের বন্যা

এ বছরেও (২০০০) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে, মালদা এবং নিম্ন দামোদর অঞ্চলে বিশেষ করে হুগলী জেলায় বন্যার খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু এবারকার বিধ্বংসী বন্যা প্রধানত মধ্য বঙ্গে দ্বীপভূমি, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় এবং সবশেষে ২৪ পরগনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে ডাঙ্গীরখীর পশ্চিম তীরে যে সমস্ত নদী এসে মিলেছে তাদের মধ্যে প্রধান হল পাগলা, বাঁশলৌহ, ব্রাহ্মণী, ধারকা, ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, কোপাই এবং অজয়। এই সমস্ত নদীর অববাহিকায় ১৮ থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর এই ৮দিন বিশেষ করে প্রথম ৪ দিন প্রবল বর্ষণ নথিভুক্ত হয়। ফলে এক বিশাল মিলিত অববাহিকার জলপ্রবাহ একযোগে

থেকে যে সুবিখ্যাত জলপ্রবাহ ডাঙ্গীরখীতে এসে পড়েছে — তা ডাঙ্গীরখী পেরিয়ে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ ভেঙে অগ্রসর হয়। ফলে পূর্ব তীরের নদীগুলোর জল 'ডাঙ্গীরখীতে' নিকালী হতেই পারল না বরং পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসা জলপ্রবাহ এই সব নদীতে বিপরীতমুখী প্রবাহ সৃষ্টি করলো। তাই এই অঞ্চলে এবারের বন্যা নাছোড়বান্দার মত বহুদিন স্থায়ী হল। মাথাভাঙা নদী বাঙলাদেশ থেকে বন্যাপ্রবাহ নিয়ে এসে আঞ্চলিক বর্ষণপুষ্ট হয়ে চূর্ণীর বন্যাকে বাড়িয়ে তুলল। পরবর্তীকালে জলসী, চূর্ণী এবং ডাঙ্গীরখীর বন্যার জল ইছামতীতে প্রবেশ করলো। ইছামতী নদীর বহন ক্ষমতা প্রাকৃতিক কারণেই ত্রাসগ্রাস্ত। তার উপরে ইদানীং নানা ধরনের মাছের ভেড়ি এবং ইট ভাটার আক্রমণে এই নদীর বহনক্ষমতাও ভীষণ কমে গেছে। ফলে



ছবি : বাবন গাঙ্গুলি

ডাঙ্গীরখীতে প্রবেশ করে। কাটোয়ার সম্মুখে অজয়ের মোহনায় ডাঙ্গীরখীর বহন ক্ষমতা যেখানে ১লক্ষ কিউসেকের কিছু বেশি সেখানে এই মিলিত প্রবাহের মাত্রা প্রায় ৫ লক্ষ কিউসেকে পৌঁড়িয়েছিল। ফলে সর্বত্র এক সুবিখ্যাত এবং সুগভীর জলপ্রবাহ পশ্চিম থেকে পূবে ধেয়ে আসে। এর ফলে ঘর বাড়ি, রাস্তা ঘাট, নদী বাঁধ, রেলপথ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভেঙে গেল। মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরমে উঠল, রাস্তা এবং রেলপথে চলাচল বিঘ্নিত হল। এই একই সময়ে ডাঙ্গীরখীর পূর্ব তীরে যে সমস্ত নদী এসে মিলেছে যেমন জলসী, চূর্ণী এসমস্ত নদীর অববাহিকায়ও প্রচুর বর্ষণ হয় এবং প্রায় একই সঙ্গে এই সব নদীর প্রবাহও ডাঙ্গীরখীতে এসে মিলতে চায়। কিন্তু পশ্চিম দিক

ইছামতী নদী এই জলপ্রবাহ বইতে অক্ষম হল। জল ক্রমশঃ ফুলে উঠে বিস্তীর্ণ অঞ্চল গ্রাস করে নিল। এইসব অঞ্চলে বহু নিম্নভূমি আছে যেখানে জল ঢুকলে সহজে নিকাল হতে পারেনা। তাই বহু ফলে মাসাধিক কাল জল দাঁড়িয়ে রইল।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ

এবারের বন্যার পর নানারকম সমালোচনা হয়েছে। কোনো কোনো মহলে বলা হয়েছে মসানজোড়ে ময়ূরাক্ষী বাঁধের জলাধার থেকে বেহিসাবি ভাবে জল ছেড়ে বন্যা ঘটানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ধারকা, ব্রাহ্মণী, কোপাই এবং বক্রেশ্বর নিয়ে ময়ূরাক্ষী অববাহিকার পরিমাপ

যেখানে প্রায় ১১৬৬৪ বর্গকিমি সেখানে মশানজোড় বীধের উচ্চানে নিয়ন্ত্রিত অববাহিকার পরিমাপ মাত্র ১৮৬০ বর্গকিমি অর্থাৎ প্রায় ১৬ শতাংশ। সুতরাং এই অববাহিকার ৮৪ শতাংশের উপর বীধের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তা ছাড়া ময়ূরাক্ষী জলাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কোনো জায়গা চিহ্নিত নেই। সুতরাং জলাধার নিয়ন্ত্রণে বন্যার জল ধরে রাখার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবুও বন্যার কথা মনে রেখে এই জলাধারের নিয়ন্ত্রণ নীতি কিছুটা নির্ধারিত হয়। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য সেচ এবং জলবিশুদ্ধ উৎপাদন। অবকা জলবিশুদ্ধ উৎপাদনের পরিমাণ খুবই সামান্য এবং তার জন্য সাধারণত আলাদাভাবে জল ছাড়া হয়না। সেচের ব্যবহার প্রকল্প অনুযায়ী খরিফ (পরিপূরক - supplementary) এবং রবি। প্রকল্প প্রায়ের সময় বোরো চাষের প্রচলন ছিলনা। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের পর বোরো চাষ আঙ্গ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবি চাষের তুলনায় বোরো চাষে অত্যন্ত ৪ ওণ জল লাগে। তাই জলাধারের নিয়ন্ত্রণ নীতি নির্ধারণ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা বোরো চাষের গুরুত্বকে অবহেলা করতে পারেননি। সেজন্য রবিখ চাষের প্রয়োজন মেটা এবং বিশেষ করে বর্ষা শেষে বোরো চাষের জন্য জলাধার যত দূর সম্ভব পূর্ণ রাখা এই দুই প্রয়োজন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা মাথায় রেখে — জলাধারের জলতল কখন কোন স্তরে রাখা হবে এবং বন্যা এসে কি ভাবে জল ছাড়া হবে তার নীতি নির্ধারণ হয়। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে খরিফ চাষে ধানের ফুল (flowering) হবার সময় গ্রীষ্মকাল জল দিলে না পারলে চাষ ভীষণভাবে মার যায়। সুতরাং এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে সেপ্টেম্বরে জলাধারে পরিমাণমত জল সঞ্চয় করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য ময়ূরাক্ষী প্রকল্প রূপায়ণের আগে বৎ বছর এই বিশেষ প্রয়োজনীয় (critical) জলের অভাবে চাষ ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সুতরাং জলাধারের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই বিশিষ্টতামুখী টানাপোড়েনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য আনা প্রয়োজন।

এ বছরে বন্যার প্রাকালে জলাধারের জলস্তর, নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুযায়ী যেখানে থাকা উচিত তার থেকে ৫.২৮ মি. বা ১৭ ফিট নীচে ছিল। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুযায়ী আর জল ছেড়ে দেবার কোনো সুযোগ ছিল না। ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় জল আয়োগ (Central Water Commission বা সংক্ষেপে CWC) জলাধারে জল আগমনের (inflow) ডিবাখবার্তা পৌঁছে দেয়। ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টার জলাধার থেকে জল ছাড়া শুরু হয় এবং অববাহিকার জলতে থাকে। ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা নাগাদ সর্বোচ্চ মাত্রা — ২,৮৬,৯১৫ কিউসেক জল জলাধারে আসে। তারপরই জলের আগমন কমে আসে। ৩ দিনই বেলা ৪টা নাগাদ জলাধার

থেকে জলের আগমন ও নির্গমন ২,০০,৫০০ কিউসেক এসে দাঁড়ায়। পরপর আগমন ও নির্গমন দুইই সাধারণভাবে কমতে থাকে যদিও ২২শে সেপ্টেম্বর রাত দুটো নাগাদ জলপ্রবাহের আগমন কিছু বেড়েছিল।

ময়ূরাক্ষী জলাধারে পলিপতনের ফলে জলাধারের আয়তন ক্রমশ কমে আসছে এরকম একটা অনুযোগও শোনা যাচ্ছে। এ সমস্যাটা চিন্তার বিষয়। ময়ূরাক্ষী প্রকল্প নষ্টা করবার সময় প্রকল্পকারগণ এই সমস্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তখনকার প্রচলিত ধ্যান ধারণা অনুযায়ী তীরা প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার অনুগ্রহ নারায়ণ খোন্দকার মতামতাম্বয়ে পলিপতনের একটা বাৎসরিক গড় হার ধরে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সে সময়ে ভারতের অন্যান্য অনেক প্রকল্পেও এই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সেবা গেল বাস্তবে পলিপতনের হার অনেক বেশি এবং পলিপতন স্থানিক ভাবে শুধু জলাধারের গভীরতম প্রদেশ বিশেষ ভাবে চিহ্নিত মৃত সঞ্চয় (dead storage) অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ না থেকে প্রথম থেকেই মৃত এবং জীবিত (live storage) উভয় স্থানকেই ভরতি করছে। এর কারণ হিসাবে সাম্প্রতিক কালে প্রায় সব নদী অববাহিকায় দ্রুত এবং অব্যবহার্য অপসারণকেই দাবী করা হয়।

বর্ধিত অরণ্য আচ্ছাদন শুধু যে বর্ষপের সোজাসৃজি আঘাত থেকে বাঁচিয়ে মাটি সংরক্ষণে সহায়তা করে তাই নয়। গাছপালা এবং তলার পড়ে থাকা কাঠকুটো, পচাপাতা এবং খোপ জাতীয় গাছপালা (undergrowth) জলপ্রবাহকে বিলম্বিত করে, মাটিতে চুষে যাওয়ার সহায়তা করে এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরের উন্নতি ঘটায়। এর ফলে একমিকে যেমন বর্ষপের পর পর তাৎক্ষণিক প্রবাহ অনেক হ্রাস পায় এবং বন্যার তীব্রতা কমে এবং অন্যদিকে শুবার সময় ভূগর্ভস্থ জমা জল ধীরে ধীরে স্তরার মাধ্যমে বেরিয়ে এসে নদী প্রবাহকে একেবারে শুকিয়ে যেতে দেয়না। এক কথায় প্রকৃতি অরণ্য আচ্ছাদনের মাধ্যমে বর্ষাকালে ভূগর্ভে এক অসংখ্য জলাধার বাড়তি জল সঞ্চয় করে এবং বরা বা শুবার সময় সেই জল ধীরে ধীরে ছেড়ে দেয়। সুতরাং এই ভাবে সংবহনের নদীর প্রবাহে একটা সমতা আসে এবং নদীর প্রবাহ মানুষের কল্যাণমায়িনী হয়। মাটি সংরক্ষণের অন্যান্য পদ্ধতি যেমন (ছোট ছোট নালায় মুখে) চেক ডাম (check dam), কটুর বাঁধ (contour bund) বা সিঁড়ি চাষ (stepped cropping) জল ও মাটি সংরক্ষণের সহায়ক হয়।

আরো একটা সমাধাচিন্তা করা হয়েছে নিকানী ব্যবস্থার অপ্রভুলতাকে। বলা হয়েছে নদী নালায় সময়মত সংস্কার করলে বন্যার জল দ্রুত অপসারিত হত — বন্যা ক্রান্তি ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পেত। কথাটার সত্যতা অবহেলা করবার মত নয়। সত্যিই পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন নদী, নালা, খাল, বিল নানা

ভাবে আজ শীর্ণ অক্ষয়। প্রাকৃতিক কারণেই গঙ্গার মূল ধারা ভাগীরথী থেকে পদ্মায় সরে যাবার পর বাতাবিক ভাবেই ভাগীরথী এবং তার শাখানদীগুলি দ্রুত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি ওকনো মরসুমে গঙ্গার উচ্চতার অববাহিকায় ভূপৃষ্ঠই এবং ভূগর্ভস্থ (surface & ground water) জলের আহরণ ও ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় সে সময়ে গঙ্গার প্রবাহে বিশেষ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তৃতীয়ত, নানাবিধ মানবিক কার্যকলাপে নিকশী ব্যবহার দ্রুত অবনমন ঘটছে। এই সূত্রে নদী তীর বরাবর কন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের (embankment) আলোচনা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাঁধ দিয়ে কন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সম্ভবত ইতিহাসের চেয়েও পুরনো। এর কারণ বাঁধ তৈরির মাটি প্রয়োজনীয় অঞ্চলেই সহজলভ্য, বাঁধ তৈরির কলাকৌশল খুবই সহজ এবং সহজবোধ্য এবং তৈরির করবার যন্ত্রপাতি এবং শ্রমিকও সহজলভ্য। তা ছাড়া নদীতীরের বাঁধ বন্যার কিছুতে একটি দৃশ্যমান প্রতিরোধ গড়ে তোলে — যাব ফলে তা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবস্থায় কতগুলি কুফল অবশ্যস্বায়ী। বাঁধের কুফলগুলি নিম্নরূপ :

(১) প্রাধানভূমি (spill area) বেড়ে নেওয়ার ফলে সংবন্ধিত জমিতে পলি জমায়ে যেতে পারেনা, ফলে নদী গর্ভে পলি জমে ভরাট করে নদীর বহনক্ষমতা গ্রাস করে এবং বন্যার জলস্তর ক্রমশ উন্নয়ন করে।

(২) সংরক্ষিত জমি উর্বরতা বৃদ্ধিকারী পলি থেকে এবং মশা ধ্বংসকারী মাছের পোনা থেকে বঞ্চিত হয়। সংরক্ষিত অঞ্চলের ভূমিতল ক্রমাগত ভূমিকমে অবনীত হয় এবং বন্যার জলের সাধারণ সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়।

(৩) নদী গর্ভ এবং সংরক্ষিত জমির ভূমিতলের তফাত ক্রমশ কম আসে এবং বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়ে।

(৪) বন্যার জলস্তর উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মাটির বাঁধ আরও উন্নত করতে হয়। কিন্তু মাটির বাঁধ ১০-১৫ ফিটের বেশি উঁচু হলে রক্ষণাবেক্ষণ কঠিন হয়ে পড়ে এবং হানা (breach) পড়বার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

এই সূত্রে দামোদরের তীরবর্তী বাঁধ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। এই নদীর দু পায়েই দীর্ঘ বাঁধ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ সেবা গেল দু ধারের বাঁধ যুগপৎ রক্ষা করা প্রচুর ব্যয়সাধ্য এবং কঠিন। ১৮৪৬ সালে এই সমস্যার অনুসন্ধানে ভারপ্রাপ্ত একটি কমিটি দামোদরের সমস্ত বাঁধ ভুলে সেবার প্রস্তাব করে। কিন্তু মোহেতু দামোদরের বামতীর অশেখাকৃত সমুদ্রশালী ছিল তাই ১৮৫৫ সাল থেকে ডানতীরের বাঁধ ক্রমশ পরিভ্যক্ত হয়। কিন্তু

বামতীরে দামোদর বাঁধ ছাড়া রেললাইন, জি. টি. রোড এবং ইডেন কানালের দু পাশের বাঁধ নিয়ে ভূপৃষ্ঠে জলপ্রবাহের পথে মোট পাঁচটি বাধা বা শৃঙ্খলিত শৃঙ্খল (satanic chains) নামে অভিহিত করেছিলেন সার উইলিয়াম উইলকিন্স তাঁর Ancient System in Irrigation-এ। ১৯৪৩-র বন্যার পরে রেল লাইনের যে ক্ষতি হয়েছিল তার সুস্বাভাবিক পদ্ধতিগতভাবে কাছের দীর্ঘ কালভার্ট তৈরি করা হয়েছিল তা আভও সেই ধ্বংসের সাক্ষী হয়ে আছে।

প্রসঙ্গত মেদিনীপুর জেলার খাটাল, সব, শিলো এসব অঞ্চলের এবং অন্যান্য চলাধার বাঁধের কথাও এসে পড়ে। এই সব বাঁধের অধিকাংশই পুরনো ভূমিদারী বাঁধ বা — Test relief বাঁধ এদের গঠন প্রাচীন বৈজ্ঞানিক নয়, স্থানীয় সমস্যা মোটোমোটো তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ আসলী সন্তোষ জনক নয়। ১৯৮০ সালের জাতীয় বন্যা আয়োগের (National Flood Commission) প্রতিবেদনে এই সব বাঁধ সম্পর্কে যে সুপারিশ ছিল তা সংক্ষেপে এইরূপ : এই সব বাঁধগুলির ওস্তাদ বিবেচনা করে যেগুলি রাখবার সেগুলি ইতিসম্মত (properly) রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং বাকিগুলি হয় ধ্বংস (demolish) ফেলাতে হবে না হয় ধীরে ধীরে নিজে থেকেই যাতে ধ্বংস হয়ে যায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

সুতরাং এই সব বাঁধগুলির পুনর্মূল্যায়ন ও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থান ও উপযোগিতার বিচার প্রয়োজন। বর্তমানে জনসংখ্যার প্রাবল্যের চাপে এই সব বাঁধ শুধু বন্যার সম্মুখেই নয়, সাধারণ সময়েও বাসস্থান, চাষাবাস, হাঁস খুবী পালন ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে পুনর্মূল্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে যথেষ্ট বাধা আসছে।

নদীযাত জনন করে (dredging) নদীর নাব্যতা বাড়ানোর প্রস্তাবও আজ প্রবল। বাস্তবিক এই প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবত ছোট ছোট নিকশী খাল মাঝে মাঝে সংস্কারের কাজ সরকারি উদ্যোগে স্থানীয় শ্রমিকদের দ্বারাই সম্পন্ন হোত। পরবর্তীকালে এই সব বাঁধে বসবাস এবং অন্যান্য নানা উপরীচিকায় ব্যবহারার্থে নিয়োজিত হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে সে কাজ বাহ্যত হয়েছিল। তাছাড়া এই সংস্কারের কাজও ক্রমশ ব্যয়বহল হয়ে পড়ছে। বড় নদী বাত জনন করার কাজ প্রচুর ব্যয়সাধ্য এবং বহু মাটি কোথায় ফেলা হবে তার স্থান নির্ধারণ করা মুশকিল। তা ছাড়া মোহনাবী নদ থেকে বনন না করলে সে বনন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। পক্ষিণবৎসের অধিকাংশ নিকশী ব্যবস্থাই ভাগীরথীর নাব্যতার উপর নির্ভরশীল; তাই ভাগীরথী বা ধলেশ্বরী নদীর নাব্যতা বাড়াতে না পারলে আংশিক বননকার্য ফলপ্রসূ হবে না। সুতরাং নদী বা খাল বননের কাজে

বিশেষ চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে ৭০-এর দশকে শুরু করা নিম্ন নামোদর প্রকল্পের কথা এসে পড়ে। এই প্রকল্পের কর্মসূচি অনুযায়ী আমতা থেকে মিল্লালে নামোদর নদীর সংকার করিক শ্রম দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু এই প্রকল্পের অন্য অংশ মুচুন্দবীর High level chanalisation — মুখ্যতঃ জনগণের চাপে জমি না পাওয়ায় সম্পন্ন করা যায়নি। বর্তমানে কিছু নিকানী প্রকল্পের কাজ চলছে — কিন্তু সেখানেও জমি পাওয়া বেশ সমস্যাসম্মুল। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র, তাই এখানে জমির সমস্যা অব্যাহত। সুতরাং বিচার বিবেচনা করে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে নিকানী বাস সংকারের কাজ অন্তত সাময়িক সূত্রে দিতে পারে।

উপসংহার

উপসংহারে প্রশ্ন থেকে যায়, বন্যা নিয়ন্ত্রণে কী করবার আছে? বছর বছর এই ধরনের বর্ধমান দুঃখ, দুর্দশা, ক্ষয়, ক্ষতি যেমন নেওয়া তো যায় না। নিয়ন্ত্রণের দু ধরনের ব্যবস্থা আছে:

(১) নির্মিতমূলক (Structural)

অববাহিকার মাটি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদি বীধ (Dam), নদীবীধ (Embankment), নিকানী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার।

(২) অ-নির্মিতমূলক (Non structural)

বন্যার পূর্বসূচক ও সতর্কীকরণ, প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ, বন্যা বীমা।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা পুরোপুরি নিরোধ করা বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব নয়। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত, ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন, নিকানী ব্যবস্থার অবনমন এবং জনসংখ্যার প্রবল চাপে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত — এ সব কারণেই বন্যার ক্ষয়ক্ষতির বৃদ্ধি ঘটছে। নির্মিতমূলক ব্যবস্থাদির মধ্যে নতুন বীধ বা নদীবীধ (embankment) প্রকল্পের সন্ধান নেই। পশ্চিমবঙ্গে নতুন বীধ (dam) তৈরি করবার উপযুক্ত স্থানও বিশেষ নেই। অজয়ের বীধ বা ময়ূরাক্ষীর উপনদী সিংহেশ্বরী-মুনবিলের বীধ তৈরি করতে গেলে বিহার বা নতুন ঝাড়খণ্ড সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সে সহযোগিতা সহজলভ্য নয়। দ্বিতীয়ত, এ ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের ব্যয় প্রচুর; তাছাড়া বর্তমানে সামাজিক সচেতনতার প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নদীবীধ তৈরির ক্ষেত্রে পরিবেশ প্রদূষণ আপত্তি ওঠা সম্ভব। তা ছাড়া নদীবীধ তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং এই সব প্রকল্প নতুন করে আরম্ভ করা যায় অসম্ভব এবং তাই

বর্তমান প্রকল্পগুলির সূচ্য রক্ষাব্যবস্থা এবং পরিচালনা ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য অববাহিকায় ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থাদির ব্যাপক ও কবরুখী রূপায়ণ বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

যেহেতু অনির্মিতমূলক ব্যবস্থাদি স্বল্পব্যয় সাধ্য এবং এগুলির সঙ্গে পরিবেশের কোনো দ্বন্দ্ব নেই তাই এই ব্যবস্থাদি বর্তমান কালে বিশেষভাবে কার্যকরী হবার দাবি রাখে। বর্তমানে উদ্ভাদি সংগ্রহ ও আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া কম্পিউটারের মাধ্যমে কাঁচা তথ্যকে (raw data) প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিণত করা এবং পরিশেষে সেই তথ্য ব্যবহার করে বন্যা সংক্রান্ত পূর্বসূচক তৈরি করা আজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। তাই বর্তমান প্রযুক্তিগত উন্নতির সহায়তায় পূর্বসূচক প্রদান ও সতর্কীকরণ ব্যাতি ছড়িয়ে দেওয়া আজ অনেক নির্ভুলভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে অবশ্য বন্যাপ্রবণ (flood prone) অঞ্চলের জনগণের সচেতনতা ও তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা একান্তই কাম্য।

প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোনো তেমন জনসমর্থন পায়নি। নদীবীধের এবং দুই তীরের জমির বন্যার তীব্রতা ও সাময়িকতা বিচার করে ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ ও তার সূচ্য রূপায়ণ — বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিতভাবে হ্রাস করবে। কিন্তু এ ব্যাপারেও অকৃত জন সমর্থন তথা রাজনৈতিক সহিষ্ণু একান্ত প্রয়োজন।

বন্যাবীমা প্রকল্প এখন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রচলন অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই কাম্য। তবে তার পূর্বে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক (pilot) প্রকল্প রূপায়ণ আবশ্যিক।

বন্যা এক প্রাকৃতিক ঘটনা। যে স্থান জনমানবহীন অরণ্য বা প্রান্তর সেখানে বন্যা হলে প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে কিন্তু তা মানব সমাজকে বিশেষ আঘাত হানে না। তাই বন্যার মানবিক দিকটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বন্যার রীতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আর্থসামাজিক পরিবেশের সীমার মধ্যে থাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণের রূপরেখা প্রণয়ন করবেন রূপ সেবেন পরিচালনা ও রক্ষাব্যবস্থা করবেন, এবং বাঁসের জন্য সেই প্রকল্প — তাঁদের সকলকে যুক্ত করে সুসমঞ্জস্যভাবে প্রকৃতি নিলে আগামী দিনে বন্যার ভয়াবহতা সীমিত করা অসম্ভব হবে না।

তথ্যসূত্র

এই নিবন্ধে ব্যবহৃত তথ্যাদি প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ভবিষ্যতের জন্য যা আশু করণীয়

কল্যাণ রত্ন

এবারের বন্যার জরন, সরকারি তথা-বিকৃতি, ক্ষয় নিরস্ত্রদের উপাশ এবং বিপর্যয়ের পর পুনর্গঠন—সামগ্রিকভাবে বিবর্তিত হলে হয়েছে। কী অবস্থা নিয়ে হবে? কী-জলপানের অভাবের বৃষ্টির প্রভাব মানবিক নয়? হেঁচি হেঁচি সমাধান? জলপানের ফিরে যেতে হবে ইচ্ছামতীতে কিছুটা ত্রুটি: তবে বাক্য সন্দেহে দরকার দুইভাষীতে তৎপরতার। মার্জিতা বা কল্যাণের 'মেড বেগলেটোর' ফলাফল ইচ্ছামতীর প্রভাব নিশ্চিত হবে। বাক্য সেচনপত্র আর কবরওচা পল্লুর সমন্বয় না থাকার মানুষের সর্বজন্য হয়েছে। অতিবৃষ্টি আসল জরন নয়। সেচ-কর্তাদের (সেওরা কৃষিশক্তির অঙ্গ ভাষা হুল। জল ছাড়ার আগে সত্যকীরণ ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটানো অতিমাত্রা লাভ জটিল নয়। প্রতি গ্রামে পলিমি মট্রি দিয়ে উঁচু করে একটি টিউবওয়েল করা যায় — আরম্ভস্থল হিসেবে। গ্রামে জলমানেব বণাধা অস্ত্রাবশ্যক: পৌত্রে বা ভ্রমজামে পলিভার্নে ইচ্ছতলা করা থাকলে জল নামলেই রোপণ করা যাবে।

প্রায় ২৩,৭৫৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্রাবিত করে, ২.২১ কোটি মানুষের জীবন ভীতিকা বিপন্ন করে, এবারের মতো বন্যা বিদায় নিয়েছে। ভেঙে দিয়ে গেছে প্রায় ১৯ লক্ষ বসত বাড়ি, কেড়ে নিয়েছে ১৩২০টি ডাঙা গ্রাম, প্রায় ১৫ লক্ষাধিক বর্গকিলোমিটার কৃষিক্ষেত্র ফসল নষ্ট হয়েছে, সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ ৫৬৬০ কোটি টাকা — এসব তথ্য রাজ্য সেচ-দপ্তর ও অন্যান্য সরকারি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় টাকার জন্য এখন চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্যের কক্ষিয়া। 'কেন্দ্র টাকা দেয় না' বা 'রাজ্য হিসাব দেয়না' ইত্যাদি চাপান উত্তোর এখন অস্বাভাবিক। এবারের বন্যায় 'বিধির অধিবেশন' অমৃতের টীকা পড়ে' যারা বেঁচে গেছেন তাঁরা অনেকই আচ্ছন্ন ও প্রায় খোলা আকাশের নীচে জীবন কাটাচ্ছেন। অভিযোগ উঠেছে প্রাণ নিয়ে দলবান্ধির। যেসব যেক্সমাসেবী সংস্থা গ্রামের কাছে এগিয়ে এসেছিল, তারা আবার নিজেদের কাছে ফিরে গেছে। একথা সত্য যে রাজ্য সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে এত বড় বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তবে প্রাণ বঁচানো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নানা প্রস্তাবের মাঝে যে আতঙ্ক মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হল — আগামী বছর কী হবে? সেপ্টেম্বর ২০০১ কি আরও এক বিপর্যয় নিয়ে আসবে? বৃষ্টির পরিমাণ আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমরা বলতে পারি না আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান। হেটনাগপূরের মালভূমিতে প্রবল বর্ষণ শুরু হলে আমাদের প্রাণিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আর চারদিনের বৃষ্টি আমাদের নদী পরিকল্পনা আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করে দিয়েছে। এখন বৃষ্টি হলে 'আমাদের কিছু করার নেই' গোছের সরকারি মানসিকতা সামারণ মানুষের আস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে। এমন এক

অবস্থার মধ্যে পারম্পরিক মোহাংরোপ না করে একটি ভেবে দেখা সরকার এই মুহুর্তে আমাদের কী করণীয়, যাতে আগামী দিনে বন্যার তাণ্ডব হ্রাস পায়।

এই উপমহাদেশে গত দুই দশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে — প্রথমত বন্যাপ্রবণ এলাকার নদীর দুই পাড় মাটি দিয়ে উঁচু করে সেওয়া হয়, যার নাম উটবন্ধন বা embankment। বর্তমানে পশ্চিমবংলায় এই পাড় বীধ বা উটবন্ধনের দৈর্ঘ্য ১৬,৩০০ কিলোমিটার। সুন্দরবন অঞ্চলেই প্রায় ৩,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বীধ রয়েছে। এই সব বীধ প্রাথমিকভাবে কিছুটা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করলেও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিপরীত। যে পলি প্রাবন ভূমিতে সঞ্চিত হয়ে জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দিত, সেই পলি ক্রমাগত নদীপার্শ্ব সঞ্চিত হয়ে নদীকে ঘেরে ফেলেছে। অনেক স্থানেই নদীপার্শ্ব পার্শ্ববর্তী জমির তুলনায় উঁচু হয়ে উঠেছে। সুন্দরবনে জোয়ারের সময় নদীর তল পার্শ্ববর্তী জমি থেকে প্রায় দুই মিটার উঁচুতে উঠে যায়। ফলে নষ্ট হয়ে গেছে স্বাভাবিক নিকালি ব্যবস্থা, বিতীর্ণ অঞ্চল জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মিত বীধ এখন বন্যার অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়ত, বন্যহুদী উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনতা উত্তর কালে ভারতে ৩,০০০টি বড় বীধ নির্মিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই আঙ্গুরিক প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ। এমনই একটি প্রকল্প হল ডি. ডি. সি। পশ্চিমবংলার অন্য দুটি নদী প্রকল্প হল ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী। এছাড়া রয়েছে ফারাক্কা গঙ্গার ওপর ২.৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ অতিকায় ব্যারেজ। সমগ্রতী জলপাইগুড়ি জেলার গাজুলোবাঘা ডিগ্রা নদীর ওপর একটি ব্যারেজ তৈরি হয়েছে। এছাড়া বীরভূমে রয়েছে ময়ূরাক্ষী নদীতে ডিলপাড়া, ধারকা নদীতে সেউচা এবং ব্রাহ্মণী নদীতে বৈকড়া ব্যারেজ। অজ্ঞার অববাহিকার হিলো জলাধারও বিশেষ

* লেখক বিশিষ্ট নদী বিজ্ঞানী, অধ্যাপক ও গবেষক

উল্লেখযোগ্য। ফাযাফা ছাড়া অন্য সবক্ষেত্রেই সেচ ব্যবস্থার প্রসারই ছিল এই নদী প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য। কেবলমাত্র ডি. ভি. সি. প্রকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য যুক্ত হয়েছিল। সবক্ষেত্রেই নদীখাত রুদ্ধ করার দীর্ঘমেয়াদী ফল হয়েও ভয়ঙ্কর। প্রবহমান জলের পতিরুদ্ধ করে যে সব বিশালাকার জলাধার তৈরি হয়েছে, অবিরাম পলিসঞ্চয়ের ফলে সেগুলি আজ বন্ধ জলায় পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই বীধ থেকে ছাড়া জলে ডেমে যাচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাকা। অতিযোগের ভাঙনী উঠেছে এই সব নদী প্রকল্পের দিকে। ডি ভি সি প্রকল্পের আংশিক রূপায়ণের পর নিম্ন ধামোদর অববাহিকায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে — এ অতিযোগ বহু মানুষের। এ অবস্থায় কি আমরা একেবারেই অসহায়? না, এমন হতাপাবাদী হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে আগামী দিনে এমন বিপর্যয় এড়িয়ে যাওয়া যাবে।

জল সংরক্ষণ

রাজ্য সেচ দপ্তরের সেওয়া হিসেব অনুযায়ী সেপ্টেম্বর (২০০০) মাসের ১৮-২১ তারিখের অবিশ্রান্ত বর্ষাশে পশ্চিমবঙ্গলা ও বিহার সংলগ্ন মাগড়মি ও রাঢ় সমভূমি থেকে জল নেমে এসেছিল প্রায় ৩৬ লক্ষ একর ফিট বা ৪৪৪ কোটি ঘনমিটার। ডি ভি সির অধীন মাইখন, তিলাইয়া, পাণ্ডেত, কোনো'র জলাধারের সম্মিলিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মাত্র ১২৭ কোটি ঘনমিটার। মাসাঙ্গোরে বা কংসাকটী জলাধারে বন্যার জলধারণের স্থান নেই। বোরো চাচের জন্য জলের যোগান দিতে এই সব জলাধার জুলাই-অগাস্ট মাসে পূর্ণ করে রাখা হয়। ফলে সেপ্টেম্বর মাসে একটি দুই বা তিন দিনের অতিবৃষ্টি পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। পশ্চিমী দেশে অনুরূপ কয়েকটি বীধ ডেমে নদীকে আবার মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু খনী সৈনের মতো বিলাসিতা আমাদের মানায় না। আমাদের ডাবনা বর্ডমান জলাধারগুলোকে অক্ষুন্ন রেখে কী ধরনের সশোধানী ব্যবস্থা নেওয়া যায়। রাজ্য সেচ দপ্তরের হিসাব মেনে নিলে এবারের অতিবৃষ্টি থেকে স্ট্র ৪৪৪ কোটি ঘন মিটার জলের মাত্র ১২৭ কোটি ঘন মিটার জল সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল। জলাধারের আয়তন আরও বৃদ্ধি করে ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জনবিরোধী প্রত্যাবৃত্ত গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যন্ত অসিবাঙ্গীর গ্রাম প্রাণিত করে অববাহিকার নিম্নাংশের নাগরিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধির অমানবিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আঙ্গ বহু মানুষ সোচ্চার। সর্গার সরোবর বীধের উচ্চতা আরও বৃদ্ধি করার সপক্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ভারতের রাষ্ট্রপতি এক বিবৃতিতে বলেছেন — 'বড় বীধ যেন আর কোনো ভূমিপুত্রকে গৃহহীন না করে।' এবারের বন্যার পর পশ্চিমবঙ্গলার অর্ধেকই জানিয়েছিলেন —

সব জলাধার থেকে এমাবৎ সজিত পলি তুলে ফেলা হবে। কিন্তু রাজ্য সেচ দপ্তরের প্রকাশিত এক সাম্প্রতিক নথিতে জানানো হয়েছে — "Dredging of reservoirs is neither cost effective nor a practical proposal."। এমত অবস্থায় ছোট ছোট জলাধারে জলসংরক্ষণের সনাতন পদ্ধতিতেই আমাদের ঘিরে যেতে হবে। ভাগীরথী হগদী নদীর পশ্চিমের উপনদীগুলির অববাহিকার মোট আয়তন প্রায় ৫৫০০০ বর্গকিলোমিটার; এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মালভূমি। এই অববাহিকা ভূদে প্রতিটি এক লক্ষ ঘনমিটার জলধারণের ক্ষমতা সম্পন্ন ৪০,০০০ জলাধার বনন করলে ৪০০ কোটি ঘন মিটার জল সংরক্ষণ সম্ভব হবে। যেহেতু এই অববাহিকার উচ্চাংশ বিহারের অন্তর্গত, সেই জন্য চল ও পলি নিয়ন্ত্রণের একটি আন্তরাজ্য পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন। বারে বারে বন্যায় ভুতভোদী বলে পশ্চিমবঙ্গলাকেই এ ব্যাপারে উসোদী হতে হবে। মাত্র ৪০০ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ সমগ্র অববাহিকার ০.৭৩ ভাগ জমি ব্যবহার করে এই জল সংরক্ষণ প্রকল্পের সফল রূপায়ণ সম্ভব। দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি জলাধার বনন করতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হলে সমগ্র প্রকল্প বরাদ্দ হবে ৬০০০ (৬ হাজার) কোটি টাকা। এবারের বন্যার কঠোর সামগ্রিক জলসংরক্ষণ প্রকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে নদীতে পলির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করবে, ভূগর্ভের জলস্তরকে সমৃদ্ধ করবে, শুভা মরুভূমে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করবে, সর্বাধিক সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে।

নদীর পলি নিষ্কাশন বা ড্রেজিং

প্রতিবছরই বন্যার সময় নানা মহলে নদী খাত ড্রেজিং-এর কথা আলোচিত হয়। এই নদীমাতৃক রাষ্ট্র মতো যাওয়া নদীগুলিকে ড্রেজিং করে এমাবৎ সজিত পলি তুলে ফেলা প্রায় অসম্ভব। বিপুল পরিমাণ পলি তুলে রাখার স্থান সংকুলান করা সম্ভব নয়। গত তিন দশকে ফারাকা ব্যারেজের উচ্চানে সজিত পলি তুলে ফেলার কথা নানা কমিশনে আলোচিত হয়েছে। ফারাকা থেকে মামিকচক পর্যন্ত প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, দু' কিলোমিটার প্রশস্ত গঙ্গার খাত গড়ে দু'মিটার গভীর করলে নিষ্কাশিত পলির পরিমাণ হবে ১৪ কোটি ঘন মিটার। এ ছাড়া নদী খাত ইতস্তত বিকিপ্ত ভাবে গভীর করলেই জল প্রবাহের পথ সুগম হয় না। ঢাল নির্ভর করে উৎস ও মোহনার উচ্চতার পার্থক্য এবং নদীর দৈর্ঘ্যের ওপর। কঙ্গীপুরের কাছে ভাগীরথীর জলস্তরের উচ্চতা ১২.৮০ মিটার। অর্থাৎ ৫০২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নদীটির ঢাল প্রতি কিলোমিটারে মাত্র ২.৫৫ সেন্টিমিটার। সব নদীই জলের সাথে গ্রুহর পরিমাণ পলি বহন করে আসে। হগদী নদীর মোহনায় প্রতি বছর প্রায় ৪১ কোটি

টন পলি সঞ্চিত হয়। বন্নার সময় প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রচুর পলি ধুয়ে সাগরে চলে যায়। কৃত্রিম উপায়ে নদীর কোনো অংশে ড্রেজিং করলে অচিরেই তা আবার ভরাট হয়ে যায়। এতদসমক্ষেও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ড্রেজিং-এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। ফারাক্কার উজানে কিছু পরিমাণ পলি প্রতিবছর ড্রেজিং করে যান্ত্রিকের অল্পকক গেটগুলিকে আবার খুলে নেওয়া দরকার। নিম্নসামোদর এলাকায় ডাকডিয়া খাল প্রকল্প দীর্ঘদিনে অসম্পূর্ণ রয়েছে।

‘৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইছামতীর সব তেড়িও ইট ভাটা সরিয়ে ফেলা হবে’ — এই সরকারি ঘোষণার পর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে। কবী ইছামতী মুক্তি পায়নি। পলিগণবে ভুল নিদ্রাশনের দুটি মাত্র মূল পথ — একটি ভাগীরথী-বঙ্গালী অন্যটি ইছামতী। ১৯৯৮ সালে রাজ্য সেচ দপ্তর নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে ইছামতীর মধ্যে বাওয়া উৎসমুখ সেটে উদ্ভুক্ত করে দেয়, কিন্তু নিম্নাংশে বাধাগুলি অপসারণের কোনো উদ্যোগ পরবর্তীকালে নেওয়া হয়নি। অতিমাত্রায় চক্রবৃদ্ধি টোকর মতো ঐ পথেই একাবের বন্নার জল ঢুকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ পায় নি। অবশ্যজাবী-ভাবে উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে জল দাঁড়িয়ে ছিল। কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীর জল নিদ্রাশন কমতা মাত্র ১.০৫ লক্ষ কিউসেক। কৃত্রিম বাধাগুলি সরিয়ে দিয়ে কিছুটা ড্রেজিং করলে অন্তত ৫০ হাজার কিউসেক জল ইছামতী দিয়ে নিদ্রাশন করা সম্ভব। এই কাজটি মুক্তকালীন তৎপরতায় আশামী বর্ষার আগে শেষ করা দরকার। এতে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনার নিকালি ব্যবহার উন্নতি ঘটবে।

প্রায় প্রতি সেপ্টেম্বর মাসে ভরা কোটালের সময় কলকাতা শহর বঙ্গালী নদীর জোয়ারের জলে প্রাণিত হয়। ঐ সময় বৃষ্টি হলে শহরের অবস্থা দুর্ভীষ হয়ে ওঠে। ১৯৯৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৩৩০ মিলিমিটার বৃষ্টি সারা কলকাতা প্রাণিত করে দিয়েছিল। কলকাতা শহরে জোয়ারের জল অনুপ্রবেশের দুটি পথ — প্রথমটি সার্কুলার খাল, দ্বিতীয়টি জলিলাঙ্গ। সার্কুলার খাল রাজ্যবাজারের আশেপাশে প্রায় পুরোটাই দখল হয়ে গেছে, প্রাসাদ নির্বিকার। এখন সার্কুলার খালের জল নিউকট খাল, — কেউপুর খাল হয়ে বয়ে যায়। ঐ খালটি দীর্ঘদিন কোনো সংস্কার হয়নি, ফলে অল্প বৃষ্টিতেই সন্টলেক, লেকটাউন, বাজুর, দমনদ পার্ক এলাকা প্রাণিত হয়। সার্কুলার খালকে দখল মুক্ত করে দিলে কিছু পরিমাণ জোয়ারের জল ঐ পথে প্রবাহিত হবে, উত্তর কলকাতার নিকালি ব্যবহার উন্নতি হবে — এসব কথা সবারই জানা।

চলির নালি অতীতে শামুকপোতায় বিধাদরী নদীতে যুক্ত ছিল। কিন্তু গড়িয়ার পূর্বদিকে এই নিকালি খালটি সম্পূর্ণ মতে গেছে, হারিয়ে গেছে বিধাদরী নদী। তাই জোয়ারের জল আশিলা দিয়ে প্রবেশ করে বেরিয়ে যেতে পারে না, প্রাণিত হয়ে যায় দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা। ১৯৯৯ সালে কলকাতার নিকালি ব্যবহার উন্নতির জন্য সরকারি আধাসের প্রাচীন বয়ে গিয়েছিল তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী থেকে মেয়র, সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন — সব খাল ড্রেজিং করে নিকালি ব্যবহার উন্নতি ঘটানো হবে। অতীতের অনেক প্রতিশ্রুতির মতো এসব কথাও ফ্রাসফর নানা ব্যক্ত্যয়ে নির্ভুলভাবে ভুলে গেছেন। নিকালি ব্যবহার পূর্ব কলকাতার জলাভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। গভ্র কয়েকশক ধরেই নগরায়ণের চাপে এই জলাভূমি হারিয়ে যাচ্ছে। সন্টলেক দিয়ে যে সর্বনাশের সূত্রপাত হয়েছিল রাজারহাট উপনগরীতে তার শেষ নয়। ‘জমি সদাগর আবাসের জমি বাচ্ছে সমানে চেটে’ — এই পথে ইটলে কলকাতার নিকালি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে।

জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ

মুর্শিদাবাদে জলসী নদী উৎসমুখে গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ডেরবনামে একটি শাখা নদী মুর্শিদাবাদের আশেবিগাঞ্জে পড়া থেকে বেরিয়ে মুক্তাপুরে জলসী নদীতে মিশেছে। ভরা বর্ষায় সর্বোচ্চ প্রায় ৫৭ হাজার কিউসেক জল ডেরব নদী দিয়ে জলসীর দিকে প্রবাহিত হয়। ১৯৮৯ সালে গঙ্গা কন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রিপোর্টে আশেবিগাঞ্জে একটি হেড রেগুলেটর তৈরি করে পন্ডার জলের অনুপ্রবেশের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই কাজটি অত্যন্ত জরুরি হলেও তা আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পন্ডা যখন দু কূল ছাড়িয়ে ওঠে, তখন মাথাভাটা-চুর্ণী দিয়ে অন্তত ২০ হাজার কিউসেক জল ভাগীরথীর দিকে প্রবাহিত হয়। মাথাভাটা নদী নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা ইছামতী নামে দক্ষিণ দিকে উত্তর ২৪ পরগনায় প্রবেশ করছে, অন্য শাখাটি চুর্ণী নামে ভাগীরথীতে মিশেছে। মাথাভাটার উৎসমুখটি বর্তমানে বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থিত বলেই ওখানে কোনো হেড রেগুলেটর স্থাপন করা সম্ভব নয়। তবে মাজদিয়া বা কৃষ্ণগঞ্জে উৎস মুখে রেগুলেটর বসালে বর্ষায় ইছামতীর প্রবাহ প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

বন্নার সময় আশ্রয়স্থান

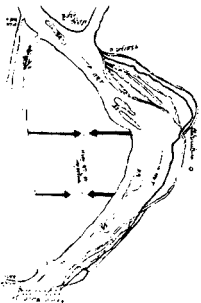
রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছে প্রতিটি অঞ্চলে ফ্লাড পেন্টার বা বন্নার সময়ের জন্য আশ্রয় স্থান নির্মিত হবে। কন্যা অক্রান্ত প্রত্যেকের জন্য ২০ বর্গফুট পরিমাণ স্থান সংকুলানের

জন্য ন্যূনতম ৮০০০ টাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ দু'কোটি মানুষকে আশ্রয় দিতে প্রয়োজন ১৬,০০০ কোটি টাকা। ১৯৯৯-২০০০ সালের রাজ্য সেচ দপ্তরের মোট বাজেট ছিল প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে একটি বাস্তবসম্মত প্রত্যবেহ হল — সরকার প্রতিটি গ্রামে একটি বা দু'টি খেলার মাঠ মাটি ফেলে অনেকটা উঁচু করে রাখুন। এই মাঠে কয়েকটি টিউবওয়েল বসিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা করুন দিন। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মজুত যাওয়া নদীশাভিত্তিক থেকে পলি ভূলে অনেক কম খরচে সহজেই এই কাজ করা যায়। বছরের অন্যান্য সময় এই মাঠ বেলা ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন

এবারের বন্যা প্রমাণ করেছে রাজ্য সেচদপ্তর ও আবহাওয়া দপ্তরের মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। রাজ্য সরকারের অভিযোগ আবহাওয়া দপ্তর বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত আগাম সতর্কতা দেয়নি বলেই এমন বিপর্যয় ঘটেছে। আবহাওয়া দপ্তর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের মতে সেপ্টেম্বর মাসের ১৩, ১৪ ও ১৭ তারিখে আগাম তানানো হয়েছিল যে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বর্ষণ হতে পারে। এই সব অভিযোগ — প্রত্যাভিযোগের সত্যতা নিরূপণের সামর্থ্য আমাদের নেই তবে একথা নিশ্চিত যে দুটি সরকারি দপ্তরের মধ্যে এমন সমন্বয়ের অভাব ঘটলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার অভাব ঘটবেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজ্য সেচদপ্তর দাবি করেছে এবারের বৃষ্টি গড় এক শতাধীর সব রেকর্ড তান করে দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রকাশিত নবি ও পদস্থ আধিকারিকদের স্বত্বাধীন স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। বন্যার কারণ সম্পর্কে রাজ্য সেচ দপ্তরের প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছে সেপ্টেম্বর মাসের ঐ দু'বছরের চারদিনে ময়ূরাক্ষী ও অজয় অববাহিকায় বৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে ১০১৫ ও ৭৯৬ মিলিমিটার। অপরদিকে নভেম্বরে (২০০০) এক বেতার বিবৃতিতে সেচদপ্তরের একজন পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন যে পশ্চিমের মালভূমির প্রায় ১৭,১৪২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রবল বর্ষণের কালে জল নেমে এসেছিল প্রায় ৩৬ লক্ষ একর ফিট বা ৪৪৪ কোটি ঘন মিটার। কিন্তু উল্লেখিত ঐ অঞ্চল থেকে ঐ পরিমাণ জল সৃষ্টি হতে প্রয়োজন হয় মাত্র ২৬০ মিলিমিটার বৃষ্টি। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে ঐ সময় ময়ূরাক্ষী ও অজয় অববাহিকায় বৃষ্টি হয়েছে ২৪৮ মিলিমিটার।

ডি ডি সি নিয়ন্ত্রিত দুর্গাপুর ব্যারেন্স ও রাজ্য সেচদপ্তর নিয়ন্ত্রিত তিসাপাড়া ব্যারেন্স থেকে জল ছাড়ার মধ্যেও সমন্বয় থাকা সরকার, কারণ সব জলই নেমে আসে ভাগীরথী-বঙ্গালী



নদীতে। তিসাপাড়া থেকে ছাড়া জল হিজল বিল হয়ে ভাগীরথীতে নেমে আসে, আর দুর্গাপুর ব্যারেন্সের জল মুন্ডেশ্বরী ও দামোদর হয়ে যথাক্রমে গের্ডখালি ও উলুবেড়িয়ায় বঙ্গালী নদীতে মেশে। লক্ষ্য রাখা সরকার দুটি জলাশয়ে যেন একই সময় উলুবেড়িয়া—গের্ডখালিতে না আসে। একথা নিশ্চিত যে, জলাধারের বর্তমান ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকলে প্রতিবর্ষীয় কম বেশি জল ছেড়ে দিতেই হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে মানুষকে আগাম সতর্কতা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও, এই কাজটি সঠিক ভাবে করা হয় না। তিসাপাড়া ব্যারেন্সের নীচে যে ময়ূরাক্ষী নদী ৩০ হাজার কিউসেক জলও ধারণ করতে পারে না, সেই খাত দিয়ে যদি ২.৫৬ লক্ষ কিউসেক জল বয়ে যায় তবে তাড়াতাড়ি মাত্রা অনুমান করাও কঠিন। হাতাবিক ডাবেই বীরভূমের বৃহৎ, গামারী, ভাবনা ইত্যাদি গ্রামে আজ একটি পাকা বাড়িও পঁড়িয়ে নেই, কাঁচা বাড়ির পরিপন্থী সহজেই অনুমের। কলাধার থেকে জল ছাড়া যদি নিতাতাই অপরিহার্য হয় তবে সতর্কতা জারির বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। সর্বোপরি মূলত সেপ্টেম্বর মাসেই পশ্চিমবঙ্গে বন্যার তাণ্ডব শুরু হয়। পশ্চিমের উপনদীগুলি নেমে এসেছে — বিহারের মালভূমি থেকে। নদীর উৎসমুখে বৃষ্টি শুরু হলে সেই জল নদী খাত ধরে

নেমে আসে ঘণ্টায় ১৮-২০ কিলোমিটার গতিতে। বিহারে নদীগুলির উৎস থেকে নির্মিত দূরত্ব অল্প কয়েকটি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে আগাম খবর সংগ্রহ করলে এবং বার্তা পৌঁছে দিলে জলাধার থেকে জল ছাড়ার ব্যাপারে সড়কজ্ঞা নেওয়া সম্ভব হবে। প্রয়োজনে আগের কিছু জল ছেড়ে দিয়ে উৎস থেকে দাবমান জলপ্রোতের জন্য জলাধারে স্থান সংকুলান করে রাখা যাবে।

ত্রাণব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ

সড়ক ও রেল পথ বিচ্ছিন্ন হলে কলকাতা থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে ত্রাণ নৌচালনা না। বরং বেসরকারি সংস্থা এবারের বন্যায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ত্রাণ পৌঁছে দিতে অনেক সেরি হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় ত্রাণ কটন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত চরুর। প্রত্যেকটি জেলা সমরে একটি করে ত্রাণকেন্দ্র দরকার। বেসরকারি সংস্থাসুলভিক তাসের পদ্ধতি মতো এলাকায় কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। এবারের বন্যার সময় নৌকা ও অন্যান্য জলযানের অভাব নানা অঞ্চলে অনুভূত হয়েছে। প্রতিটি জেলা সমরে ছোট ছোট জলযান মজুত রাখতে হবে। অন্যথায় বিপন্ন মানুষদের উদ্ধার ও ত্রাণ বটনে ওরুতর ব্যাঘাত ঘটবে।

কৃষি কর্মসূচি

এবারের বন্যায় রাস্তা প্রায় ১৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার কৃষি ভূমির ক্ষতি হয়েছে। বন্যার জল নেমে যাওয়ার পরও কৃষকরা চাষের কাজ শুরু করতে পারেনি। তাদের না ছিল প্রয়োজনীয় মূলধন, না অন্যান্য সরঞ্জাম। বন্যার জল নামার পর বীজতলা বা নার্সারি বেড তৈরি করতে অনেক সেরি হয়ে যায় বলে ফসল রোপণের সময় পেরিয়ে যায়। বন্যাপ্রবণ এলাকায় নৌকা বা ভাসমান পাটাতনের ওপর বীজতলা তৈরি করে রাখলে বন্যার জল নেমে যাওয়ার সাথে সাথেই রোপণের কাজটি শুরু করা যায়। এর সাথেই চাই সুবিধাজনক শর্তে ঋণ দানের ব্যবস্থা। আশার কথা, কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ঋণ (micro credit) প্রকল্প চালু করেছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

এবারের বন্যা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। এই ক্ষতিপূরণ হস্তান্তে অসম্ভব। পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আবার বর্ষা এসে যাবে। তাই স্বল্পমেয়াদী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমূহের কাজ এখনই শুরু করা দরকার। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা সম্পর্কেও ভাবনা শুরু হোক। ভবিষ্যতে হাজার মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে আমাদের যেন বলতে না হয় — “কল্প বেশি মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে।”

এবারের ২০০০ সালের বন্যায় রেললাইন বা রেলট্রিক ভেঙেছে ২২৬টা — এই পশ্চিমবঙ্গে। আশঙ্কাজনক বা নদী-উপচানো জল তার আগমন স্বভাবে ঘেরোবার রাস্তা খোঁজে। সহজ নির্গমনের পথ পেয়ে ধরসোতা জল ওই ২২৬টি রেলের বাধা বা অবরোধ ভেঙে বেরিয়েছে। বিক্ষিপ্ত কাণ্ড হলেও এটা প্রকৃতির একটি সংকেতও ছিল বটে। বছরের পর বছর নদীখাত ভরাট হতে গিয়ে, সেখানে সেখানে চর ফেলতে গিয়ে, নদীপথ তরঙ্গ করে অপরিকল্পিতভাবে ট্রেন যাওয়ার লাইন পেতে গিয়ে, নদীকে অন্যায়ভাবে বেঁধে দেওয়া এবং নদীর চলার পথে বাধা তৈরি করার পর বন্যার তরঙ্গ জলে স্বজন আমরা অসহায়ভাবে কপাল চাপড়ামি, তখন নদী নিজেই ওই ওই রেলডাঙা জায়গাতলো সেঝিরে দিয়েছিল নীরব নির্দেশে। আমাদেরই তৈরি করা বাধাতলো যে তার সহজ সরণের পথ, সে কথা এখার কন্ঠ্যর জলই বলে দিয়েছিলো। বলেছিলো—আপাতত এই ২২৬টা জায়গা আমাদের বয়ে যাওয়ার জন্য খোলা রাখতে পারতে হোক।

কিন্তু তিনিই আমরা। গ্রাহ্যই করেনি বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার ও ক্রমাসকপন। তাই বন্যার জল সরতেই আবার নির্মালের কাজ হয়েছে দ্রুত গতিতে, ওই ডাঙা রেলপথের ঝাঁকতলো আবার ভরাট করে দেওয়া হয়েছে আগের মতন। অর্থাৎ জল যে প্রতিবন্ধকতাগুলি সন্নিবে ভেঙে তার প্রবাহপথ বুঁজে নিয়েছিলো, সেখানে আবার বাধাতলো, গতিরোধ করার স্বব্যবস্থাতলো পূর্ণোদ্যমে পুনর্নির্মিত হয়েছে, কেন্দো ভবিষ্যত না স্তেবেই।

উৎস মানুষের নতুন বই

জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বইমেলায় পাওয়া যাবে

স্টল নং — ৭৩০

পশ্চিমবঙ্গে এবারের বন্যা — কিছু পরামর্শ

তপোব্রত সান্যাল

১৯৫৪-র পর থেকে বঙ্গ ভূমিটির বঙ্গ সুপারিশ কার্যকর করা হয় নি। সাময়িক বন্যারোধ সরকারের সাধ্য নয়; সন্নিহিত ও দূরপর্ষিতারও সমুদ্র অভাব। এই নিবন্ধে আশু করণীয় ব্যাঘাতটি বিষয় বলা হয়েছে — বাস্তব পরিস্থিতির কথা মনে রেখে। এছাড়া অপৎকালীন ব্যবস্থাপনার (disaster management) দ্রুতি ও দক্ষতা সেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঠান্ডানীশ বা বিদ্যুতিতে নিশ্চেষ্ট হয়ে না থেকে দ্রুতি বন্ধুর বন্যা প্রবণ অঞ্চলে বর্ষার আগে চেষ্টা-নিবিধ করা যায় স্থানীয় মানুষদের নিয়ে। ফেল্যাসেই সংস্থা ও গণসংগঠনগুলি এগিয়ে আসতে পারেন।

এবার পশ্চিমবঙ্গে বন্যার কারণ নিয়ে বিস্তারিত বিতর্ক চলছে। রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর বলছে যে, অল্প সময়ের মধ্যে বর্ষাঘের ব্যাপকতা ও প্রাবল্য এই অভাবনীয় বন্যার কারণ। নিম্নুকেরা বলছেন এই বন্যা মনুষ্য-সৃষ্ট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এই চাপান-উতোরের সাধারণ জন বিব্রান্ত। একথা অবশ্য ঠিক যে এমন দীর্ঘস্থায়ী প্লাবন এ-রাজ্যে সম্প্রতি দেখা যায় নি।

যে কোনো বন্যায় ব্যুটি অবশ্যই মূল কারণ। বর্ষা যখন ব্যাপক ও প্রবল হয়, তখন সেই অতিরিক্ত জলভার বইবার সামর্থ্য এ-রাজ্যের নদীগুলির থাকে না। এবারের বন্যায় আর একটি বাড়তি ব্যাপার ঘটেছে। সমিহিত কয়েকটি নদীর নির্গম ক্ষেত্রে (catchment) একই সঙ্গে প্রবল ধারাপাত হয়েছে। নির্গম ক্ষেত্রগুলি এর ফলে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই প্রবল জলভার বহনের সামর্থ্য এ রাজ্যের নদীগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলেছে। আসলে নদী ব্যবস্থাপনা বলতে যা বোঝায়, তার উপযোগিতা রাজ্য সরকার কখনোই তেমন করে বোঝেন নি। এপর্যন্ত যা হয়েছে তা হল কতকগুলি কয়মুখী নদী-পরিষ্কলনা। দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, তিস্তা প্রভৃতির মত যে কয়েকটি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে, তাতে বন্যা প্রতিরোধক ব্যবস্থার স্থান বিশেষ নেই। একমাত্র দামোদর - প্রকল্পে বন্যার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে। এখানে বন্যার জন্য জল ধারণের সামর্থ্যের পরিমাণ ১০.৫ লক্ষ একর-ফুট। ময়ূরাক্ষী ও



কংসাবতী প্রকল্পে বন্যা মোড়ের জন্য কোনো বস্ত্র ব্যবস্থা নেই। তিস্তা প্রকল্পও সেচ-ভিত্তিক। আর ফারাকী প্রকল্পের উদ্দেশ্যই তো আগাঙ্গা!

একথা সকলের জানা যে পলি জমে জমে নদী তার ধারণ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যেখানে দুই নদীর সন্নিধান, সেখানে প্রধানতর নদীটির জলস্তর ওপরে থাকলে অন্য নদীর জল নির্গমনের পথ খুঁজে পায় না। উপনদীটির জল তখন তার দুই তীর উপরে সমিহিত জমি প্রাতিব করে। ভূ-তাত্ত্বিক বিচারে হিমালয় অপেক্ষাকৃত নবীন পর্বতশ্রেণী। এর ওপরের ভূ-স্তর ক্ষয়প্রকণ। ফলে হিমালয়-উদ্ভূত সব নদীর প্রবাহেই পলিকণার আতিশয্য। এছাড়া আছে এসব নদীর প্রবাহ পথ পরিবর্তনের প্রবণতাও। নদীর পথ পরিবর্তন মানেই ভূমিক্ষয় এবং পলি-ভারের বৃদ্ধি। নদীর গতিপথ বদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষ

* লেখক বিশিষ্ট জলবিজ্ঞানী। কালকাতা পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন প্রধান হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার

ছবি : বাবন গাঙ্গুলি

ভার কৃষিকর্মের ধরন পালটে ফেলে, নিজের সুবিধার জন্য অথবা নদীর স্বাভাবিকতায় ব্যাধাত ঘটায়। এসবই পলি-ভার বৃদ্ধির কারণ। ভূ-ভৌম কারণে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির চেয়ে উত্তর ভারতের নদীগুলি তেমন সুস্থিত নয়। ভূমি-ব্যবহার ও উন্নয়ন-মূলক কাজকর্মে সৃষ্ট পরিকল্পনা না থাকলে ভূতল জলের প্রবাহে ব্যাধাত ঘটে। ঠিক তাই হয়েছে আমাদের দেশে। জনসংখ্যার অতিরিক্ত চাপে কোনো পরিকল্পনাই সৃষ্টভাবে ঠিক জায়গায় করা যাচ্ছে না। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনই আঁক অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

বন্যার আরেকটি বড় কারণ ভূ-পৃষ্ঠে জল-নির্গমনে বাধা। এই প্রতিবন্ধকতা অনেক জায়গায় রেল-বীথি ও সড়ক-বীথিে অপর্যাপ্ত ও অশরিসর কালভার্টের জন্যও হয়ে থাকে। আসলে আগে জমির স্বাভাবিক ঢালের দিকে তেমন নজর না দিয়েই রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ করা হত। স্বাধীনতার আগে এটাই বন্যার একটা বড় কারণ বলে বিজ্ঞানদার্য মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন। অতিরিক্ত জলাসেচও ভাড়াভাড়ি জল না সরার একটা কারণ। জমি বেশি জল পেয়ে সম্পূর্ণ থাকলে ভূগর্ভে জল ঢুকতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার কারণ নির্ণয় করতে গেলে এলাকা-ভিত্তিক বিশ্লেষণ দরকার। উত্তর বঙ্গের সব নদীই পার্বত্য এবং ব্রহ্মপুত্র-প্রভাবিত। মধ্য বঙ্গের নদীর প্রকৃতি এবং একেবারে দক্ষিণে সমুদ্র সমীপে নদীর আচরণ আবার অন্যরকম। গঙ্গা-ভাগীরথী-বগলিই পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম নদী এবং সেই সঙ্গে মুখ্য জলনির্গমন-প্রায়ীও। হলদিয়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত এই নদীর অংশটি জাতীয় জলপথ নং ১ হিসেবে ঘোষিত হয়েছে অনেকদিন। সুতরাং এটির রক্ষণের সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের হওয়া উচিত, এবং কিছু কাজ নিশ্চই হয়। তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের নদী-উপনদীই অবহেলিত। দক্ষিণে বামোদর, শীলাবতী, ধারকেশ্বর, কংসাবতী, হলদি, ইছামতী এবং মধ্যবঙ্গে অজয়, ময়ূরাক্ষী, ভঙ্গুরী, চুর্ণী, পাগলা, ধারকা প্রভৃতি সব নদীর বহনক্ষমতা প্রকৃত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে নদী-ব্যবস্থাপনার অবাধেলার ফলে। অবশ্য নদী-ব্যবস্থাপনা কথটা বলতে যত সহজ, তা করে তোলা প্রকৃত ব্যয়সাশপেক্ষও বটে। এছাড়া বাঁধের জলাধারগুলির ধারণ-ক্ষমতাও প্রচুর কমেছে। জলাধারগুলির ধারণ-সামর্থ্য গড়ায় ৪০% কমে গিয়েছে। ফলে, জল ধরে রাখতে না পারায়, জল ছাড়ার প্রকণতা গিয়েছে বেড়ে। নদীর নির্গম-ক্ষেত্রের সূচ্য ব্যবস্থাপনা নদীবক্ষে পলি-সঞ্চয় প্রতিহত করে। এ যাপারটার ওপর পরিবেশবিদ্যাও জোরে দিচ্ছেন। বিশেষ করে কংসাবতী, শীলাবতী ও ধারকেশ্বরের নির্গম ক্ষেত্রে 'হরিদায়ন' বা সবুজের সৃষ্টি করা আস্ত দরকার।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার ১৯৫৪-এর পরে বহু কমিটি গঠন করেছেন বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য। সে-সব কমিটির সুপারিশ তেমন গুরুত্ব পায় নি। এ-ব্যাপারে রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময় নানা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। সেগুলি সবই বিপুল ব্যয়সাশপেক্ষ প্রকল্প: ব্যয়-সুবিধার (Cost-benefit) অনুপাতিক হিসাব কষলে সেগুলির ছাড়পত্র পাওয়া কঠিন। কতগুলি স্বল্পমের্যাদি কাজ অবশ্যই হাতে নেওয়া যায়। এবং সেটাই এখন জরুরি। পাশাপাশি প্রণীত বড় বড় পরিকল্পনাগুলির অগ্রাধিকার স্থির করে একে একে হাতে নিতে হবে রাজ্য ও কেন্দ্রের ব্যয় সাধাতা বিচার করে।

হল্পমের্যাদি কাজ যেগুলো অবিলম্বে হাতে নেওয়া যায় সেগুলো হল —

(১) অসংরক্ষিত এলাকার, যেগুলিতে সাধারণত সেপ্টেম্বরে বন্যা হয়, সেখানে সেতের জলে ধানের চাষ করা। বিকল্প শস্য চাষের কথাও ভাবতে হবে বন্যার সম্ভাব্য সময় বিচার করে।

(২) এ-রাজ্যে খাল-বিসের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এসের অধিকাংশই নদীর বিচ্ছিন্ন অংশ। এইসব খাল-বিলগুলি মজ্ঞে এসেছে। জল ধরে রাখার ক্ষমতা এসের কমে এসেছে। এইসব জলা জমি সংস্কার করলে বর্ষা ও বন্যার মল অনেকটা আটকানো যাবে। পক্ষায়েত-গুলির মাধ্যমে একাজ করা যেতে পারে। অন্য সময় এতে মাছের চাষ ও ক্ষুদ্র সেতের কাজ চলতে পারে। সব নদীর যুগলং সংস্কার করা বিপুল ব্যয়সাধ্য। তাছাড়া উল্লেখিত পলি ফেলার জায়গাই বা কোথায়?

(৩) যে সব কাজ সেচদপ্তর ইতিমধ্যে হাতে নিয়েছে, সেগুলির দ্রুত রূপায়ণ জরুরি।

(৪) বাতবসম্মত বন্যারোধক পরিকল্পনা তৈরি করতে গেলে নদী সংক্রান্ত নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য রাখা জরুরি। নদীর গর্ভতলের ভূরূপ, স্রোত-সংক্রান্ত তথ্য, বিভিন্ন ক্ষত্রে প্রবাহ বেগ ও পথের তারতম্য, নদীর পাড়ের ভাঙনের পরিমাণ ইত্যাদি নানা তথ্য প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে একটা তথ্য-ভাণ্ডার (data-bank) তৈরি করতে হবে। বীথ, ব্যারাজ (সরঞ্জ বীথ) ও তাদের জলাধারগুলি সবুজ্ঞেও তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যিক। পলির প্রকৃতি ও পরিমাণ নদী ভেঙ্গে এক এক রকম। এ-সংক্রান্ত তথ্যও সংগ্রহ করতে হবে। উপগ্রহ চিত্র দূর সবেদন প্রকৃতিদায় (remote sensing technique) বিশ্লেষণ করেও নদী সংক্রান্ত অনেক ববর জ্ঞানা সম্ভব। দুর্ভাগ্যের কথা, এ-ব্যাপারে কাজ তেমন হয় নি। জরুরি ভিত্তিতে এ কাজ অবিলম্বে শুরু করা দরকার।

(৫) গুরুত্বপূর্ণ জল-নির্ণয়ন প্রকল্পগুলিকে চিহ্নিত করা দরকার। সুন্দরবনে নদী ও খাড়িগুলির সংস্কার, ময়ূরাক্ষী-বাবসা-দ্বারকার জন্য বন্যারোধক ও জল নির্গমন প্রকল্প, ইছামতী-চুর্ণী-জলস্রীর সংস্কার, প্রভৃতি প্রকল্পগুলিকে হাতে না নিয়ে উপায় নেই।

(৬) সবচেয়ে ভয়ঙ্কর — বন্যাপ্রবণ নদীগুলির নির্গমনক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা, ভূমি-সংরক্ষণ ও লক্ষ্যহীন ক্ষেত্রের হরিদায়ন। একাজ বিভিন্ন পর্বে হাতে নিতে হবে। পলির উৎস নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে নদীর ধাক্কাফড়াতের তেমন অবনতি হবে না, বন্যার সঙ্কটবণ্ড অনেক কমে যাবে।

(৭) নদীর খাতের সংলগ্ন এলাকা দখল মুক্ত করতে হবে — প্রয়োজনে আইন করে।

(৮) প্রতিটি বাধ ও ব্যারাজের সঞ্চালনের (operation) ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। ডি. ডি. সির বাধ ও ব্যারাজগুলির ক্ষেত্রেই কেবল এই ধরনের নির্দেশিকা বর্তমানে আছে।

(৯) সেবা গিয়েছে সেচ দপ্তর কাজ শুরু করে ঠিক বর্ষার শুরুতে। সব কাজ যাতে জানুয়ারি থেকে শুরু করে অক্টোবর জুন মাসের মধ্যে শেষ হয়, তা নিশ্চিত করা দরকার।

(১০) ঘেসব ড্রেনেজ দুইস (drainage sluice) আছে সেগুলি সঞ্চালনের কোনো নির্দেশিকা নেই। এই নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি ড্রেনেজ দুইস যাতে সচল থাকে তার দিকে নজর দিতে হবে।

(১১) সেচ দপ্তরের বিভাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে অবিলম্বে শক্তিশালী বশসিত একটি সংস্থায় পরিণত করতে হবে। মনে হয়, সেচদপ্তরের আওতার বাইরে থাকলেই এটি ভালো কাজ করবে। বিষয়ের কথা, রাজ্যে বন্যার পৌনঃপুনিকতা সত্ত্বেও সেচদপ্তরের এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব নিয়ে কেউই প্রশ্ন তোলে ন। অথচ ভীষণভাবেই তোলা উচিত ছিল।

(১২) প্রথম বর্ষার পলি-সংগৃহীত জল খালি-করা বাঁধের জলাধারে ভরতে না দিয়ে বের করে দিলে জলাধারের ধারণক্ষমতা ভরা বর্ষায় কিছুটা বাড়তে পারে। বাঁধ ও ব্যারাজের সঞ্চালনে এ ধরনের নির্দেশ রাখা যেতে পারে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার — নদীর তীরের বাঁধ দিলে বন্য সাময়িকভাবে রোধ করা গেলেও আবেশের তা কিন্তু নদী-

পার্শ্বে পলি সঞ্চেদে সাহায্য করে। এইসব বাঁধ নির্মাণ করা উচিত নদীর প্রাচীর সীমায়। অথচ বাঁধ সচরাচর দেওয়া হয় উটসীমান ভেতরে। সুন্দরবনের জমিদারি বাঁধগুলি বহুত মতলা প্রকৃতি নদীর বিনাশকেই ত্বরান্বিত করেছে। তাই নদী বাঁধ দেওয়ার আগে যথেষ্ট ভেবে-চিন্তে দেওয়া দরকার। বাঁধ নির্মাণের ক্রটি অনেক ক্ষেত্রেই বন্যারোধে ব্যর্থতার একটা বড় কারণ। নির্মাণ ও মেরামতি ঠিক মত ও ঠিক সময়ে হলে কাজ অনেক ভাল হতে পারে।

বন্যার বিষয়টি এত ব্যাপক যে স্বল্প পরিসরে সমাধান সূত্র নির্দেশ করা কঠিন। এই নিবন্ধে আট করণীয় বিষয়গুলির ব্যাপারে একটা আভাস দেওয়া হয়েছে। আসলে প্রয়োজন সঠিক ও দুরদর্শী ভাবনার, এবং ভাবনা-রূপায়ণের সদিচ্ছার। প্রতি বছর স্বাভাবিক বন্যা সাধারণত অসংরক্ষিত এলাকায় হয়। নদীর সান্নিধ্য মানুষ আদিকাল থেকে কামনা করে এসেছে। মানুষ চায় নদীর ধারে ঘর বাঁধতে। নদীর তীরের জমিতে কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করতে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হন এরাই বেশি। সত্যি বলতে কি, সামগ্রিক বন্যারোধে কোনো সরকারেরই সাধ্য নয়, এবং তা কাম্যও নয়। কারণ বন্যা শুধু অবিমিশ্র অভিযাণ নয়, এর কল্যাণকর দিকটাও কিন্তু একেবারে উপেক্ষা করা যায়না। তবু বন্যার পূর্বভাস খণ্ডসময়ে জানার অধিকার মানুষের আছে। স্থানীয় আবহাওয়া-ক্ষেত্রগুলির সংখ্যা তাই বাড়তে হবে, সেচ-দপ্তরের সঙ্গে এইসব ক্ষেত্রের সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বন্যার সময় বিভিন্ন বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলের বরষা ঘন ঘন প্রচার করাও জরুরি, সেই সঙ্গে বানো-ভাসা মানুষদের করণীয় আচরণবিধিও। প্রচার-মাধ্যমগুলিকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবছর বর্ষার আগে আপৎকালীন ব্যবস্থাপনাকে (disaster management) আড়ও তেমন গুরুত্ব এমেনে দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে বন্যাপ্রবণ অঞ্চলে চেতনা-শিবির করা যেতে পারে। বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি এ-ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। জেলাস্তরের বন্যার জন্য সরকারি প্রকৃতিতে গল্প ও অপর্যাপ্ততার ব্যাপারে সতর্কতা দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে ত্রাণ-কর্মীরা বন্যাগ্রস্ত অঞ্চলে উপযুক্ত জলখাবার অভাবে লৌহোত্তেই পারছেন না। এটা সরকারি কিছুটা। নদীর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আবহাওয়া বিশ্লেষণ, ভূমিসংযোগ এবং আপৎকালীন প্রকৃতিতে মেসোতে হবে। নতুন বন্যায় বছর-বছর ক্ষতির পুরনো ঐতিহ্য চলতেই থাকবে।

অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণে উন্নয়নের দিশারী

তপশিলী জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণে বামফ্রন্ট সরকার গত ২৩ বছর অনলসভাবে কাজ করে চলেছে। যেসব সরকারি উদ্যোগে অনগ্রসর শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : খাস জমি বিলি, সরকারি কৃষি জমি দান, গৃহহীনদের বাস্তু ভিটা দান, ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি, ভরণপোষণ ভাতা প্রদান, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ ও চাকুরিতে আসন সংরক্ষণ। কৃষি, প্রাণীসম্পদ-বিকাশ, ক্ষুদ্রশিল্প ও মাছচাষেও এদের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ভাষাকে যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও তাঁদের সংস্কৃতির বিকাশ, কুসংস্কার দূরীকরণ ও বিজ্ঞানচেতনা বাড়ানোর সমন্বয়যোগী সরকারি উদ্যোগেও এই অনগ্রসর মানুষেরা প্রগতির আলো দেখেছেন।

অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন অব্যাহত
রাখতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং — ৫০৮৭/২০০০/ তথ্য ও সংস্কৃতি

উঃ ২৪ পরগনার বন্যা : সমাধানের কয়েকটি উপায়

রণতোষ চক্রবর্তী

উত্তর ২৪-পরগনার বন্যা আমাদের তথ্য বড়িয়েছে। বহুদিন ধরে জল নামেনি। নিকানী ব্যবস্থা নেই। সমস্যের বছর এই বিপর্যয় আরো বিবৃত হতে পারে। অকিলাবে যমুনা, ইছামতী, পদ্মা বাক্যে জমা পলি কেটে সোকা বাক্য হবে দিতে হবে। টিপি' ব্লক করে ভেঙে সেওয়া সম্ভব না হলেও কোনমতেই একে পিকনিক স্পট করা চলবে না। তেড়ি আর ইট ভাটা জনাননিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করলে আগামীতে ভয়াবহ বিপর্যয়।



ইছামতী সঙ্কোর সম্ভব? কতদিনে?

সৌজন্য : আনন্দবাজার

“মহত্তরে মরিনি আমরা / মারি নিয়ে ঘর করি ...”

মহত্তরে না মরলেও নিশ্চিত ঘর করা হচ্ছে না। প্রতি বছরই বন্যা। বন্যা আর নদী ভাঙন। দুর্দশা, প্রাণহানি, হাহাকার, ক্ষোভ, বিক্ষোভ। সেইসঙ্গে বন্যার কারণ নিয়ে কমিশন, মিটিং, মিছিল, সেমিনার, ওয়ার্কশপ। শহরের বাতানুকূল ঘরে বসে বড় বড় আমলা বা মন্ত্রীসের মাঝে মাঝে। তারপর যে-কে সে-ই। পরের বছর আবার বন্যা। বতাবতই প্রশ্ন জাগে, এর কি কোনো সমাধান নেই?

গত সেপ্টেম্বর (২০০০) মাসেও পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল। রাজ্যের নটি জেলা বন্যার প্রকাণ্ডে পড়লেও এবারে উত্তর চব্বিশ পরগনার বন্যাই অধিক আলোচিত। এর কারণ আছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনার এবারের বন্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বন্যার সময় এখানে বৃষ্টি তেমন কিছু হয়নি, তবু বন্যা। বন্যার জল এসেছে হঠাৎ করে। রাতের অন্ধকারে বা মাত্র কয়েকঘণ্টায় ঘর বাড়ি বন্যার জলে ডোবাতেও জল সরতে সময় নিয়েছে মাসাধিককাল। উত্তর চব্বিশ পরগনার বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও তাঁদের জীবদ্দশায় এমন বন্যার কথা শোনেননি বা দেখেননি।

অতিবৃষ্টির জন্য, না জলাধারের অতিরিক্ত জলে উত্তর চব্বিশ পরগনার এই ভয়াবহ বন্যা — এই বিতর্কে না গিয়েও বন্যা কবলিত এলাকার গ্রামবাসীরা বলে দিতে পারেন বন্যার জল কেন বহুদিন ধরে জমে ছিল। আসলে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার উত্তরাংশে নিকানী ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে; এই কারণেই এবারের বন্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে।

বলা বাহুল্য, জল যে গতিতে এসেছে একই বেগে নদীপথে চলে যেতে পারলে বন্যা কোনো ব্যাপার হতো না।

এই জেলার উত্তরাংশে যেমন বনগাঁ, বাগলা, গাইঘাটা, মনলক্ষপুর, বরুণনগর, বাসুড়িয়া ইত্যাদি এলাকা এবার বন্যায় ভীষণ-ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অঞ্চলে যমুনা, ইছামতী, পদ্মা ইত্যাদি নদী রয়েছে। এইগুলি এই অঞ্চলে একেবারে নীর্ণ নদায়, খাল আকারের। বর্ষার জল ছাড়া নদী বলে চেনা ভার। জায়গা বিশেষে এইসব নদীখাত ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা, অনেক জায়গায় নদীকে আবার মাঝে মাঝে বেঁধে লম্বা পুকুর তৈরি করে মাছ চাষের ব্যবস্থা, কোথাও বা চাষবাস। এভাবে পুরনো নদীর ব্যবহার চলছে। এছাড়া রয়েছে ইটভাটা ও ডেড়ি। ফলে নদীখাত প্রায় বৃক্ষে এসেছে এবং জল বহন ক্ষমতা গিয়েছে। নিকানী ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তাই বন্যায় জল নামতে এত দেরি।

যমুনা-ইছামতীর মোহনা টিপি। এখানে রয়েছে বিশাল চর। বন্যার সময় মন্ত্রীমাণ্যের ছকুমদামা জ্বারি হয়েছিল, এই চর কেটে দেবার। গত নভেম্বর (১৯) মাসে টিপি-তে গিয়ে সেবা গেল চর রয়েছে। শুধু তাই নয়, শোনা গেল, এটিকে পিকনিক স্পট করা হবে। টিপি থেকে ইছামতী বেয়ে দক্ষিণে এলে বৃহত্তে অসুবিধা হয় না ইছামতীর গতিপথের বাক। এর অনেকগুলি একেবারে হেয়ার পিন ধরনের। বিশেষজ্ঞদের মতে পলি জমার কারণেই নদীপথ বাক নেয়। ইছামতীর এই বাকের মাথেরি রয়েছে গ্রুর সংখ্যা ডেড়ি।

এবারের মত বন্যা আগামী দিনেও হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞ অনেকের ধারণা। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে অকিলাবে কিছু ব্যবস্থা দরকার। যদিও মনে রাখতে হবে, বন্যা এসেছে

মানুষ কী না পারে।

ভোলানাথ আইচ

নদী নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদ সন্ধ্যাবহারে সমাজের মানুষদেরও লাভ আছে। সর্বত্রই কি সরকার মুক্তহস্তে নিতে পারে? তার জন্য সমাজকে কিছু লাভ নিতে হবে না? প্রকৃতির কাছে স্থানীয় মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া জল সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে না। সরকার উদ্যোগী হলে 'হেজা'সেবী সংস্কারে পরিণত নিক। সামাজিক পরিদ্রবোকেও নিজের অগ্রাধিকার পরকায়।

নতুন কিছু নয়। নদীতীরে গ্রামবাসীদের বর্ষায় কিছু অসুবিধে থাকেই। গ্রীষ্মে গরম বা শীতকালের শীতের মত মানুষ সাময়িক বানের অসুবিধা মেনে নিতে অভ্যস্ত। এছাড়া বন্যার পলিতে আগামী দিনে ফসলের উৎকল সম্ভাবনার বিষয় ভেবেও বন্যার মুখোমুখি হতে তাঁরা বিমুগ্ধ হন না। কিন্তু এবার যে ধরনের বন্যা, এইটি অসুবিধা পর্যায়ে নয়, সাংঘাতিক বিপর্যয়।

সেই বিক থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার বন্যার জন্য পূর্ণা বা ডল্লাবহতা ঠেকাতে এই অঞ্চলের নদী, নালা বিষয়ে বিশেষ কয়েকটি পন্থা নেওয়া একান্ত জরুরি।

ক) যমুনা, ইছামতী ও পদ্মা নদীর প্রচুর বাক। পলি ভরে ঘটেছে। এদের গতিপথ প্রয়োজনে নতুন পথ খেঁটে দোঁকা করে নিতে হবে।

খ) যমুনা-ইছামতীর মোহনা টিপি-র পলি সবচেয়ে হলে। টিপি-র চরগেতে পিকনিক করার পরিকল্পনা একেবারে বাড়িল করতে হবে।

গ) নদী পাড়ের ইট ভাটা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ঘ) নদীর ধারে কিছুটা ভায়াণ্য বসবাস ন্যা রাখতে হবে।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার উত্তরাংশের নদী নালায় জলবহন ক্ষমতা বাড়ালে শুধু এই জেলা নয় নদীয়া জেলার বন্যা সমস্যাও অনেকাংশে সমাধান হবে। কেননা এইসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক ঢাল পূর্ব-পশ্চিমে। প্রসঙ্গত, স্বরণ করা যায়, অতীতে মানুষের প্রায়ে বাল কেটে এদেশে নদী-নালা বিস্তারের ব্যবস্থা ছিল। সেই নদী বিজ্ঞানের জ্ঞান হারিয়ে গেলেও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতিতে একালেও অনেক কিছুই সম্ভব। নদী বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কার্যকরী করা সম্ভব হলে নদী সুস্থ থাকবে, একই সঙ্গে মানুষের সুখ, স্বাস্থ্যকে ফিরে আসবে।

একটি অতি মূল্যবান কথা স্মরণে রেখে আমরা এগিয়ে যাই — 'এই পৃথিবীতে ভূমি যখন এসেছিলো তখন সকলেই হেসেছিল, ভূমি একাই কেবল কেঁপেছিল। এখানে এমন কিছু করে যেও, যেন তোমার যাবার কেলয় সকলেই কানে, আর ভূমি একাই হাসতে হাসতে চলে যেতে পারে।' মানুষ হিসেবে সমাজকে আমার কী দেওয়া কর্তব্য এটা মুখ্য আলোচনার বিষয় নয়, কিন্তু একজন চলবিজ্ঞানী হিসেবে বক্তব্যটা সীমাবদ্ধ করে নিম্নি জলসম্পদ ব্যবহারে সমাজের বহুমুখী উন্নতির পন্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। কিন্তু, সমাজ তো শুধু জলসম্পদ সন্ধ্যাবহারের উপরেই নির্ভর করে উন্নতির সীমারেখা টানবে না। সুতরাং উন্নয়নের পথ বিবৃতিতর করার জন্য অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারও অনিবার্য হয়ে পাঁড়ালে মনুষ্য সম্পদ বার ঘায়ে অন্যতম।

সমাজে সকল মানুষই সমান, এটার সর্বস্বত্ব স্বীকৃতি পাওয়ায় কিছুটা মুক্তির আছে। একটা বিপদ বুদ্ধিভ্রমী গোষ্ঠীকে দিয়ে সমাজ শাসন যেমন চলে না, তেমনি দিনমজুরদের হাতে সমাজশাসন ব্যবহার ভার দেওয়া হবে ব্যতুলতা। জলসম্পদ সৃষ্টি এবং তার সুখম কন্টন, জলের উৎপত্তি এবং তাকে ধরে রেখে সমর্যোগেণী ব্যবহার is more of an art than mere engineering, এবং এই art-এ পারদর্শিতা লাভ সময়সাপেক্ষ। বর্ষায় উদ্ভূত জল ধরে রাখার technique এখন অনেকটা পুরনো। কিন্তু, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার দাবিতে এই চল ধরে রাখার জন্য বসতির পুনর্বাসন অনেক অগ্রাধিকার পেতে গেছে। পুনর্বাসনের জন্য সরকারি ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে এবং তার সন্ধ্যাবহারের জন্য প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই watch-dogs আছে। তবু বারো জমি এবং গৃহচ্যুত তারা আশ্বালনের পথে নেমে আসে। প্রকায় ধরে ধরে এর জন্য একটা দেশব্যাপী বিতর্ক হওয়া দরকার।

জল, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় একটি অমূল্য সম্পদ, সুতরাং এই সম্পদ সংরক্ষণের দাবি সমাজকেই নিতে হবে। ভোক্তাদের একটা গুরুদায়িত্ব থেকে যাচ্ছে এই সংরক্ষিত জলের সুখম কন্টনে। একথা অনস্বীকার্য যে সেটাই জলের সবচেয়ে বড় consumer এবং ব্যবহারিক জীবনে একথাও এখন প্রমাণিত যে জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব (participatory management) ছাড়া সেতের জলের সমকন্টন প্রায় অসম্ভব। যাঙ্গের জন্য এই জলসম্পদ সৃষ্টি করা তারা

* লেখক রাজ্য সরকারের সেও ও জলপথ দপ্তরে রাষ্ট্রম চিফ ইঞ্জিনিয়ার

যদি এর সমর্থন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার না নেন, তাদের যদি সে ভার দেওয়া না হয়, তা হলে কোনো ভুলসম্পন্ন সৃষ্টির পরিকল্পনাতেই সফলতা আসবে না। participatory management ভুলসংরক্ষণ এবং ভুলবন্ধনে যখন পৃথিবীকায়ী সফলতার দ্বার খুলে দিচ্ছে, তখন যারা উপকৃত তারা বিষয়কে আর একটি সোচ্চার হয়ে উঠছেন না কেন? কেন, যে কোনো সেতু প্রকল্পের জলবল্টন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার উপকৃত যারা তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না? আশ্চর্য ব্যাপার! একটা ভোটের জন্য political polarisation যত তাড়াতাড়ি দানা বাঁধে, সেখানে সমাজের অস্তিত্ব যার উপরে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমস্ত ব্যাপারে যত্নতা নেই কেন? এবং সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য দাবি আর-একই জোরদার হচ্ছে না কেন?

অতি জল, যেটাকে এককথায় 'বন্যা' অথবা ফেওয়া যেতে পারে, তার থেকে সমাজের দুর্ভাবার অন্ত নেই, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যেক বছর আসে এবং এই বন্যার জলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ-বাসীর সহবাস নিশ্চিত। এটা যেমন নিতেই হবে। তবু যারা ভূতভোগী তাদের জন্য বিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক বিধি (ground rules) বাতলে দিয়েছেন। ব্যবহারিক জীবনে সেগুলির মর্যাদা দিতে আমরা অক্ষম। অক্ষম সরকারের উদ্যোগ — flood protection আশ্রয় বা shelter নিয়ে অনেক লাফালাফি করা হয়। প্রত্যেক বন্যাই আমাদের স্বরণ করিয়ে দেয় যে, দুর্দিনে আমরা কোথায় আশ্রয় নেব। তবু, বলতে পারেন, সরকারি প্রকল্পের আন্তর্গত পর্বত কটা flood shelter তৈরি হয়েছে? এ বিষয়ে বাংলাদেশ অনেক অগ্রগামী, বিপন্ন যারা তাদের চেউয় এবং বেঞ্জামিনসী সংস্থা (NGO)-দের সহযোগিতায় সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে 'ফ্লাড শেল্টার' তৈরি হচ্ছে। সব কিছু বৃষ্টিমেও প্রাণে বাঁচবার একটা উপায় তো সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা এই সামান্য কাজটুকু করতে পারলাম না কেন?

'বন্যা সতর্কতা'র ব্যাটী আভিকাল টেলিভিশন/রেডিও মাধ্যমে কিছু কিছু নৌছর। কিন্তু এই কার্ডার মূল্য লোকের কতটা ব্যবহারে আসে? এগুলি এখন গবেষণার অন্তরালে। মুশ্যবোহে যারা beneficiary তাদের সহযোগিতা পলে পড়ে সরকার। তার মানে হচ্ছে engineer-এর সামিথ নিয়ে যখন মানুষ গড়ার কাজ নেমেছি, তখন মানুষের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধের শিক্ষা অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

জল এবং জলাভূমি বোজাবার হিড়িকটা না কমাতে পারলে সমাজের অযোগ্যতা খুব বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। 'মেগাসিটি'র নামে সমাজ পরিকল্পনার অগ্রগতির পথও

আন্তে সমুচিত হয়ে যাবে। সূত্রান্ত জলের নিকে একবার নজর রাখুন এবং সঠিক নজরই সামাজিক অগ্রগতির পথ বাতলে দেবে। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সূত্রম বন্ধন অনেকটা মহিলাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। অনেক গ্রামই এখনও মূর দুগ্ধস্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতে অভ্যস্ত এবং এখানে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিভের পরিবারিক প্রয়োজনের জন্য যারা জলকটনে অভ্যস্ত, তারা কিভাবে না এই ক্ষমের সার্থকতা বা অসার্থকতা। কেন এই পরিচালনা ব্যবস্থার সচেতন কর্মসূচি হাতে নেই? সবচেয়ে বড় কথা, এই কর্মসূচির আশীয়ার মহিলাদের কতটুকু করা হয়? এখানে কিন্তু অতি দ্রুত পরিবর্তন দরকার। মুখ বুখে সহ্য করার দিন কিন্তু আগে আগে চলে যাচ্ছে।

ব্যবহারিক জীবনে আমরা যা কিছু ব্যবহারের জন্য পাই, সব কিছুই একটা মূল্য আছে। এই মূল্যের বোঝা সমাজের সকলের মধ্যে জাগ্রত রাখাও শিক্ষার একটা অঙ্গ, যেটা মানুষ গড়ার কারিগরদের ভুলসে চলবে না। সব জিনিসই যদি সরকারকে মুক্তহস্ত দিতে হয় তাহলে সরকার চলবে কী দিয়ে? এই যে সামান্য জল, চাষের জলই হোক বা খাবার জলই হোক, এটা সরবরাহ করার তো একটা দায় আছে। সেই দায়টাই সবার কাছে চাওয়া হচ্ছে। সময়মত টাকটা পেলে সরবরাহে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। অবশ্য এটাও ঠিক যে সময়মত টাকা বা দান পেলেও জল সরবরাহে অনিয়ম দেখা যায় অনেক সময়। তবে এই জিনিসগুলি রাজনীতির আওতায় নিয়ে আসা অত্যন্ত অপরূহ। ক্ষমতা আছে বলে যখন ইচ্ছা কৃষি কণ মকুব করা, সবচেয়ে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের বেলা পাস (pass) দিয়ে আপায়িত করা, এটা নীতিগতভাবে নিশ্চল। ক্ষমতার অপব্যবহারের বোঝা আপনাকে আমাকেই বইতে হবে, এতে দেশ কতটা সমৃদ্ধ হল তার কোনো হিসেব নিকেশ করা হ'ল না। সাপেস এবং বিধায়ক বা Parliament অথবা Assembly-তে হাত তুলেই তাদের আর্থিক সচ্ছলতা একটু বাড়িয়ে নিলেন। খসিক করলেন না তাদের অন্যান্য সরকারি সহায়কদের, তাদেরও মাইনে ধাপে ধাপে অনেকটা বেড়ে গিয়ে দেশের অর্থনীতির ওপরে একটা ভয়ঙ্কর চাপ পড়ে গেল। কোনোও পর্যায়ে কিন্তু একটা review আন্তর্গত পর্বত হয়নি যে এই অর্থনৈতিক অসাম্য সৃষ্টি করার আন্তর্গত পর্বত দেশ কতটা উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে। তবুও সামাজিক জীব হিসেবে কিছু প্রকল্পে তো চালিয়ে যেতেই হবে।

আপনাদের সামনে কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরলাম, যে-গুলি মানুষ গড়ার কাজে অন্যতম অন্তরায়। ক্ষমতার অপব্যবহার বর্ধ করলে না পারলে শুধু কারিগরি ক্ষমতার সম্ভাবনার শোষণ সমৃদ্ধি আনা যাবে না।

বামফ্রন্ট সরকার ও জনগণ

২৩ বছর

২৩ বছর ধরে আমাদের এই জনগণের সরকার। দেশ তথা বিশ্ব সংসদীয় গণতন্ত্রে গড়ে তুলেছে এক অদ্বিতীয় নজির। নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ভেতরেও শিক্ষা-সাক্ষরতা, ভূমিসংস্কার (অপারেশন বর্গা), গ্রামোন্নয়ন, মৎস্য চাষের বিকাশ, বনসৃজন, পৌর ও নগর উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার, পর্যটন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আমাদের নিরন্তর সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। জনগণের সঙ্গে আমরা আছি — থাকব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং - ৫০৮৭/২০০০/তথ্য ও সংস্কৃতি

ফারাক্কার দায় কোথায়!

সেবেশ মুখার্জি

ফারাক্কা ব্যারেজকে বারবার আসামীর কাঁপড়ায় বীড় করানো হচ্ছে। এবারেও অনেক পোরগোল। কিন্তু এবারের বন্যার জন্য ফারাক্কা কেনোভাবেই দায়ী নয়। কেনোবাবে আরও অস্থায়ী সমাধান হিসেবে ব্যারেজের বী নিকের বন্ধ গেটগুলির মাত্র ৩০-৩৫ ফুট করে সত কাশলে কেটে দেওয়া যেতে পারে। এটা খুবই কাত্তবসংকত, স্বপ্নও বেশি হবে না। নদীর প্রবাহকে অনেকটা নষ্টেই ধরে রাখতে পারলে সে আর টপকে বহিরে গিয়ে গ্রামাঞ্চল বা পরিবেশ ধ্বংস করবে না, অল্পত অনেক অনেক কম করবে। আপাতত, সরকার চাইলে, এটাই বড় লাভ হবে।

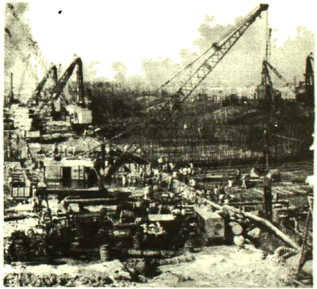
ফারাক্কা ব্যারেজের প্রধানতম স্থপতি, প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার সেবেশ মুখার্জি বর্তমানে যথেষ্ট প্রবীণ। কিন্তু শারীরিক গঠনে, বক্তব্যের দৃঢ়তায়, যৌক্তিকতায় এবং কঠোরের ক্ষমতায়, এই ৮৮ বছর বয়সেও সেবেশবাবু এক আকর্ষণীয় চরিত্র। সাম্প্রতিক বছরওয়ারি বন্যায় বারবার অভিযুক্ত হয়েছে, এখনো হচ্ছে, ফারাক্কার ব্যারেজ নির্মাণ প্রকল্প। বন্যার জন্য দায়ী করা হচ্ছে সরাসরি এই ব্যারেজকে যার রূপায়ণের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন, আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর আগে, এই বিশিষ্ট প্রযুক্তিবির। এই 'দায়' সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দীক দৃষ্ট অভিমত রেখেছেন তিনি এক সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনায়, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।

প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার ফারাক্কা ব্যারেজটা কিন্তু এ রাজ্যে বন্যা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কখনোই তৈরি হয়নি। হয়েছিলো কলকাতা

বন্দর বাঁচানোর জন্য। 'প্রজেক্ট ফর দি প্রিসার্ভেশন অব দি পোর্ট অব ক্যালকাতা' পরিকল্পিত হয় ১৯৫৪ সালে, আর আমার তত্ত্বাবধানে এর কাজ শুরু হয় ১৯৬৩ সালে, অক্টোবর মাসে, কেন্দ্রীয় সরকারের সেচ ও শক্তি মন্ত্রকের অধীনে। শেষ হয় ১৯৭৪-এ।

হ্যাঁ, আমি জানি, বন্যার বিপুল ক্ষয়ক্ষতি আর প্রাণহানির জন্য এখন বারবার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। ব্যারেজের মেট ১০৯টি গেটের মধ্যে এখন বী দিকের প্রায় অর্ধেক গেটই খোলা যায় না, বছরের পর বছর চড়া পড়ে আটকে গেছে। ফলে ডানদিক দিয়ে গঙ্গার মূলস্রোত যাচ্ছে আর ক্রমাগত পাড় ভেঙে চলেছে। এখন এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে। গোড়াতে কিন্তু ছিল না এরকম। সেই ৭০ মশকের শেষ দিকেও ব্যারেজের লেফ্ট ব্যাঙ্কে একটু একটু চড়া পড়ত, নদীর জলস্রোতের বাতাবিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। কিন্তু বর্ষাকালে সমস্ত ব্যারেজ জুড়ে, প্রায় ২

মাইল দৈর্ঘ্য বরাবর, সমান স্রোতে গঙ্গা বইত, বী দিকের চড়া ভেসে যেত। সেসময় ব্যারেজের সব কটা গেট ঠিকঠাক খুলত,



নির্মায়মান ফারাক্কা ব্রীজ প্রজেক্ট (১৯৬৭)

ওখা মরশুমে আর বর্ষার মরশুমে গেটগুলোকে নিয়মমাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হতো। এরজন্য কার্যনির্বাহে বা অপারেশন ম্যানুয়ালও তৈরি করে দেওয়া হয়েছিলো: আমি জানি না এখন সেই সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়াল ত্রিকমত অনুসরণ করা হয় কিনা। করা হয় বলে তো মনে হয় না। কৃষ্টি-বাইশ বছর হয়ে একটা প্রকল্পকে যদি ত্রিকমত যত্ন না করা হয়, নির্দেশমাফিক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করা যায় তাহলে তো সমুদ্র কতি হবেই। তাই হয়েছে। অতঃ এই ব্যারেক এবং সলয় নদীপাড় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাইনে-করা প্রচুর কর্মী রয়েছে, দক্ষ-অক্ষ-লোক রয়েছে। কিছুই করেনি তারা।

ত্রিকই কণাটা। এই তো সামনের বর্ষায় আবার বন্যা আসবে। আলো কতি, আরো বিপন্ন। তারপরের বছর আবার। এরকম যে চলা উচিত নয় সে তো সবাই চাইবে। কলি বালি ফারাফাফে লেব দিয়ে লাভ কী? এই ব্যারেক তৈরির পরিকল্পনার সময় সব নিক মেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিশেষী বিশেষজ্ঞরাও দেখে ওনে সম্মতি মেনে এবং খুব কারেকটুলিই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। কপিল ভট্টাচার্যের আপত্তির কথা অনেকবার অনেককে বলতে শুনেছি কিন্তু কপিলবাবু তো ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না, রিভার্স হাইড্রলিস্ট নিয়েও তাঁর গভীর চর্চার কোনো পরিচয় আমরা পাইনি। রাজনৈতিক মোটিভেদন নিয়ে অনেককই অনেক কিছু বলতে পারেন, সেগুলিকে প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষজ্ঞের অভিমত কথা যাবে না। মনে হয়, ও প্রসঙ্গ বাম দেওয়া ভালো। তার চেয়ে সংকট সমাধানের বর্তমান উপায়ের কথা অনেক বেশি ভাবনার দাবি করে। সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী দুটো দিকই রয়েছে। কিন্তু তারও আগে রয়েছে সরকারি বা প্রশাসনিক সদিচ্ছার কথা। যত বড় কারিগরি প্রকল্পই হোক, একটা নির্দিষ্ট সমাধানসূত্র হাতে নিয়ে প্রাণপাত করে কাজ করলে ২-৩ বছরে সমস্যার অনেকটা সুরাহা করা যায় বলে আমি এখনো বিশ্বাস করি। কিন্তু তা কি ওরা করবে? এই দেখুন না, আটাত্তরের বন্যার পর ডি ডি সি নিয়ে মহা নোরগোল পড়ে গেল। নিম্ন নামোদররের নদী উপনদী শাখানদীগুলির দ্রুত সংকটের জন্য রাজ্য সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটিও বসালেন ১৯৭৮-এ। ওরুতে কিছু জমি অধিগ্রহণ করাও হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু তারপর? আর কোনো উচ্চবাচ্য নেই। কী যে হল, কেন যে ধামা চাপা পড়ে গেল কে জানে! বেশ কিছু কার্যকরী পরামর্শ সে সময় কমিটির কাছে পেশ করেছিলেন আমরা। কোথায় কী। এখন যদি আত্ম সমাধানের কথা বলেন, আমি বলবো আগে সেই পুরনো ফাইলগুলো খুঁজে বের করে খুলো কাড়া হোক, তারপর কাজ ঠিক এগোবে।

হ্যাঁ, ফারাফার কথায় ফিরে আসি। অবস্থা তো এখন শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডানদিকের অঙ্গে গঙ্গা এখন

সঙ্কটিত হয়ে আরো গর্জবোহ নিয়ে বইছে, ডাঙন বাড়ছে। ওদিকে বাম ব্যাঙ্কের চড়ার হার আরো বাড়ছে — গেটগুলো প্রায় সম্পূর্ণই অকেজো হতে চলছে। তবু বলবো, আগামী বন্যার ডুবাবহতা কমাতে চাইলে কিছু কাজ এখনই করা যায়। ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব নয়। স্বেচ্ছা করে পলি সরানোর কথা আমি বলছি না, ওটা আত্ম এবং সুলভ সমাধান মোটেই নয়। আমি বলছি বুদ্ধি করে কিছু নিয়ন্ত্রণ মূলক ব্যবস্থা নেওয়া, এখনই। কাজটা খুব শক্ত কিন্তু নয়। বর্ষাকালে, যখন জল বাড়, তখন যদি খোয়াল করে রাইট ব্যাঙ্ক বা ডানদিকের গেটগুলো একটু কম খুলে বীদিকের যে-কটা সম্ভব গেট জোর দিয়ে যতটা সম্ভব একটু বেশি খুলে দেওয়া যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই নদীর প্রকৃতি হবে লেফট ব্যাঙ্ক বা বাম দিকে সরে যাওয়া। এর জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের তরফ থেকে অপারেশন ম্যানুয়াল তৈরি করে দেওয়া হয়েছিলো, মনে হয় না এখন সেই ম্যানুয়াল ফলো করে, বিশেষ করে বর্ষাকালে, গেট ওঠানো-নামানো নিয়ন্ত্রণ করা হয়; করলে অবস্থার এত অবনতি হয় না।

এছাড়া, আরেকটা উপায়ের কথাও আমরা ভাবনায় আসে — বিশেষ করে আপনি যখন খুব কম সময়ে আগামী বন্যার প্রতিরোধের কথা বা তীব্রতা কমানোর কথা বলছেন বারবার। এ কাজটা বেশ স্বল্পমেয়াদীও বটে, কম খরচেও করা যেতে পারে। গরমের সময়েরে, যাকে আমরা বলি শুধা মরশুম, যখন নদীর জল নেমে গেছে, সে সময় বা দিকে বড় গেটগুলোর সামনে কিছু পলিমাটি খুঁড়ে তোলা যেতে পারে। প্রতিবেকটা জ্যামুড় হয়ে যাওয়া গেটের সামনে যদি আমরা ২৫-৩০ ফুট চওড়া করে চ্যানেল মতন খেঁটে দি' চড়ার মধ্যে — যতক্ষণ না চ্যানেল দিয়ে সর্ক জলের ধারা যেতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত যদি চড়ামাটি খুঁড়ে তুলে দেওয়া যায় — তাহলে গরমের পরে ঠিক বর্ষা এলেই বর্ষার জল সেই সর্ক চ্যানেলগুলো দিয়ে বয়ে যাবে। সেই জল চড়টিকে ধুয়ে নীচের দিকে বার করে দেবে। ওনতে বিরাট কাজ মনে হলেও এতে খরচ খুব যে একটা বেশি হবে তেমন নয়, তবে কাজটা বেশ ভেবেচিন্তে হিসেব করে করতে হবে। কেবল কন্ট্রাক্টরদের হাতে ছেড়ে দিলে হবে না, সেচ-ইঞ্জিনিয়ারদের সব সময় তত্ত্বাবধি রাখতে হবে। অর্থাৎ এখনকার কাজের ধারা বা রীতি পন্থাতে হবে। ওয়ার্ক কালচারটা এই জরুরি ব্যবস্থায় অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে।

আমি জোর দিয়েই বলছি, চটপট সমাধান হিসেবে, এই বছরের আগামী বন্যার অন্তত মালা মুন্সিবাগের ধরুসে ঠেকাতে বা কমাতে হলে, এই চ্যানেল কাটার কাজটা অত্যন্ত যত্ন সহ সমাধান। তবে বীরা এ কাজ করবেন তাঁদের ভালো করে বুঝতে হবে। দীর্ঘ দিনের অবহেলার বাম দিকের গেটগুলোর

যে-স্বপ্নবস্থা হয়েছে তা তো হওয়ার কথা ছিল না। গেটগুলো ভালোভাবে অপারেশন করার ব্যবস্থা ছিল — ট্রিকমত কাজ করলে আভ্যন্তরীণ ফারাক্সা লোকের চোখে ‘অভিশাপ’ হয়ে দাঁড়াতো না। আমি আপনাকে বলছি, ফারাক্সাতে গেট-অপারেশনের অনেক ব্যবস্থা আছে, যেটা অন্য কোথাও নেই। যেমন, ম্যানুয়াল অপারেশন, ইলেকট্রনিক অপারেশন, রিমোট কন্ট্রোল অপারেশন — সমস্ত সিস্টেম আমাদের সেখানে লাগানো হয়েছিলো। এখন আমি ওনতে পাচ্ছি যে ব্যারিজের মাইনটেনেন্স-এর জন্য প্রোবাল টেকার ডাক হচ্ছে। আমি এটা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছি না যে, যে-ব্যারিজের প্ল্যানিং, ডিজাইন, নির্মাণ বা কন্ট্রোলিং আমরা ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা করছি এবং সমস্যার সঙ্গে ব্যারিজ চালু হয়েছে, তাকে রক্ষা করতে বিশেষ সাহেবদের ডেকে আনার কারণ কী। বলছে যে কোথাও নাটবন্টু খুলে গেছে, রং উঠে গেছে, জং ধরেছে, তেজ গেছে — জং ধরবে কেন? তার মানে নিশ্চয় আমরা এতদিন ধরে গেটগুলোতে জং ধরতে দিয়েছি বিনা প্রতিরোধে। তাই না? আমরা তো সেই পটিল-ভিরিল বছর আগে জং-প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আমরা তো রং লাগাইনি। এর তো নিয়ম আছে। নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে হবে বালি এসে কতটা ক্ষতি করছে। দরকার হলে এক বছর, দু বছর, বা তিন বছর অন্তর বিটুমিনাস পেট দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। তারের মোটা দড়িগুলোতে গ্রিড করতে হবে। এসব নির্দেশ পরিচালনা করে দেওয়া আছে। কিন্তু আমার মনে হয় সেদিকে কলকরই কোনো নজর নেই। আমি ওনতে পাচ্ছি এখন ফারাক্সা প্রজেক্টে ৫০০ দশক আর অদিক কর্মীদের ফ্রেক বসিয়ে রাখা হয়েছে, শুধু বসিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। কেন? বুঝতে পারছি না এর জন্য কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে না কেন!

অবস্থা এখন এরকম গাঁড়িয়েছে জো কী করব, কী বলব। তবে একটা কথা কিন্তু আমাকে বলতেই হবে, আপনারাও জানেন, নদী চিরকাল এক পথে বয় না। সে গতি পান্টায়। নরম মাটি পোলে সেদিকের পাড় ভেঙে দোত সেদিকে ঘুরে যেতে চায়। তাই আমি যে ফারাক্সার বন্ধ গেটের নীচে চ্যানেল কাটার একটা সমাধানের কথা বললাম, সেটা মোটেই স্থায়ী সমাধান নয়, কেবল গঙ্গার কিছু জ্বলকে ঝাঁ দিলে নিয়ে আসার এটা অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। এর জন্য মালশার উজানে ডাঙন কমবে কিনা বলা যাবে না। নদী কোন্ দিকে সরতে চাইছে সেটা ঠিক কথ। সামগ্রিকভাবে গঙ্গার প্রবাহকে বাম দিকে সরাতে চাইলে তার জন্য ব্যাপক, সুচিন্তিত, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দিতে হবে এবং তার জন্য কাজ করতে হবে।

গত সেন্টেম্বর-অক্টোবরের বীভৎস বন্যার জন্য ঘুরে ফিরে যারা ফারাক্সাকে দায়ী করছেন তারা হয় খবর রাখেন না কিংবা বোঝেন না। এই বন্যার সঙ্গে ফারাক্সার কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো ক্ষতিকারক ভূমিকা নেই — এটা কোথা যাবে ঘটনা দিয়ে। এবারের বান যখন হয়েছে তখন ফারাক্সা ক্যানেলের হেড রেগুলেটর গেট এবং ভল্লীপুর ব্যারিজের যে গেট আছে ভাগীরথী-বগলীর মুখে, সেগুলো সব বন্ধ করা ছিল। সেগুলো দিয়ে কানের জল ঢোকেনি। জল ঢুকছে কোথা দিয়ে? না, ফারাক্সার নীচে কতগুলো স্ট্রিট ক্যানেল আছে যেমন মাথাডাঙ্গা, ভৈরবী, জলসী ইত্যাদি, এবং তারও নীচে আমি যখন। ইছামতী এইসব নদীগুলো দিয়ে জল ঢুকছে। উত্তর চব্বিশ পরগণা ডাঙ্গিয়ারে। তবে এই জল এখান কোথা থেকে? এ প্রস্তাব উত্তর হল — পল্লার বেড়ে ওঠা জল ওইসব ছোট নদীগুলো দিয়ে এসেছে, ওপর থেকে মালদা-মুর্শিদাবাদের বৃষ্টির জল, আমাদের অনিয়ন্ত্রিত মন্ডারাক্ষী ডামের জল, এসের গাঙ্গায় ভাগীরথী বগলীর ডান পাড়ের বাঁধ বা রাইট এমব্যাঙ্কমেন্ট প্রচুর জায়গায় ভেঙে গেছে। প্রবল ভরবেগের গাঙ্গার, যথেষ্টে, বেললাইন ভেঙে বৈকে গেছে। এইসব বিশুল জল আবার বেগোতে পারেনি কারণ নীচের দিকে নিকানী ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ রাখা হয়ে আছে। আপনারা তো এখন সবাই জেনে গেছেন নদীগুলোর নীচের দিকে অজ্ঞাত ভেড়ি, ইউটালি, বে-আইনি বসতি ভেঁসি হয়েছে। নদীর স্বাভাবিক নিকানী ব্যবস্থা অটক দিয়েছে। এসব কথা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। আর ওগুলোয় জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ রয়েছে, সরকার রয়েছে। ... আপনি একেবারে এই বছরেই আস্ত সমাধানের কথা ভিজ্জেস করলেন, তাই একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ওই বড় গেটের নীচে চ্যানেল কাটার কথাটা বললাম। এতে প্রত্যক্ষ উপকারটা হবে — নদীকে আমরা অনেকটাই নদীর মধ্যেই রাখতে পারবো; সে পথ না পেয়ে উপড়ে উঠে আশপাশের গ্রামাঞ্চল ধ্বংস করবে না। নদী তো সবসময় পাইন অব লিস্ট রেজিস্ট্রেশন ফলো করে। যদি সে সোজা জায়গায় যেতে পারে তাহলে আর ঘুর পথে যাবে কেন? ফলে পাড় টপকে নদীপাড়ের গ্রামাঞ্চল আর প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হওয়াটা বন্ধ না হলেও অনেক কমবে।

তবে এখানেও যথারীতি কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হতে পারে, কারণ ফারাক্সা ব্যারিজটা সেতুলা গডর্নমেটের। কিন্তু সেটা ন্যায্যমূল্য হবে না। কারণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাভাবিকীকরণ ও সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। চ্যানেল কাটার অল্প খরচ কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে চাইলেই পাওয়া যাবে কাজ দেখিয়ে। না হলে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এটা বড় কিছু কাজ নয়। সরকারের সিস্টেমটি বড় হওয়া দরকার।

নূতন গতিপথে গঙ্গা

মালদহ ও ফারাক্কা রক্ষা পরিকল্পনা

ভরুণ কুমার চৌধুরী

যাত্রাপ্রাপ্ত নদী নরম পাড় ভাঙতেই থাকবে নিজের চলার পথ করে নিতে। অন্য প্রতিরোধ, সমীক্ষা থাকলেও এক বছরেই হবে না কিন্তু কর্তব্যকরী অর্ধশতাব্দী ধ্যানে নিলে এখনই প্রকল্প করবে। চারটি পন্থাক্ষেপের কথা স্মৃতি করে নিতে হলো এমন লেখক — ১) ফারাক্কার পলিতে বহু পেট, আর উজ্জ্বল চরের বাগা ফ্রেজ করে কটা শুক করতে হবে আজই। ২) ভাঙতিয়া চরের বাম পাড় ভেটে নদীকে সোজা পতিপথ বহিত নিলে সে নিজেই পথ খেটে নেবে। ৩) ২৮ ও ২৯ নম্বর স্পার উজ্জানে তৈরির সুশাসিত মূল আশে পনের বছর। এখন অস্বস্ত শুক মেতে : ৪) বহু বছরে সৌর প্রযুক্তি স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচাণে ছাড়া জোবের নতুন দিশা দেখিয়েছেন। লেখক। অর্থ, শ্রম, ঐক্য মাল এবং প্রযুক্তির উৎসাহ — সব নিয়ে সম্ভাবনাময় প্রত্যাহ।

সমন্যার উৎস :

মালদহে কুতনি বিদ্যার চরের উপর চক্রাকার বীধ প্রকৃতির উপর প্রথম আঘাত। আগে বর্ষার গঙ্গার বাড়তি জল এই চরের উপর দিয়ে যেত। সহজ সোজা প্রবাহ পথে হঠাৎ এই প্রতিবন্ধকতার ক্রমেই জেগে উঠল প্রায় ১০ কিলোমিটার লম্বা ও ২/৩ কিলোমিটার চওড়া বিশাল ডাকনদ্রিয়া চর, যা নদীর গতিপথকে সঙ্কীর্ণ করে রাজমহলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে গঙ্গার মূল প্রবাহ রাজমহলের প্রতীকীভূত ডান পাড়ে ধাক্কা খেয়ে বীধ নিয়ে মালদহের মানিকটান এলাকায় বাম পাড়ের নরম মাটিতে পৌছে গেল। তখন থেকেই শুক হয়ে গেল পঞ্চানন্দপুরের পাড় ভাঙার প্রক্রিয়া। এদিকে ফারাক্কা ব্যারেজ করে নদীর সমুখের প্রোতকে নিয়ন্ত্রণ শুক হয়ে গেছে। গোবের ওপর বিষফোড়ান মত প্রযুক্তিগত ক্রটিতেই হোক বা ঔদাসীন্যেই হোক, ব্যারেজের শতাধিক গেটের বাম পাড়ের অর্ধেকই অকেজো হয়ে পড়ায় ফারাক্কার উজ্জানে বাম তীরে বিশাল এক চরের সৃষ্টি হল।

গঙ্গার বহুদশ প্রবাহকে এই ভাবে পাশে ও সামনের দিকে চুপ করে সেওয়ায় বর্ষায় প্রবল প্রোতবিন্দী নদী বাম পাড়ের মালদহের নরম মাটি ভাঙতে ভাঙতে অবশেষে ৫০ ফুট থেকে ৭০ ফুট গভীর এক ঝাতে নিজের গতিপথ করে নিল। তার পূর্বেকার গতিপথে প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৬ ২ থেকে ৩ কিলোমিটার প্রশস্ত এক নয়াচর ডানপাড়ে বিহারের দিকে সৃষ্টি হল। আর বর্ষার মাসগুলিতে ধোয়ে আসা ২০ থেকে ২৭ লক্ষ

ঘনঘুট জল সামনে ব্যারেজের সমস্ত গেটগুলি খোলা না পেয়ে শুধু মালদহ পাড়ের ডানদই প্রকৃততর করছে না, একই সঙ্গে ব্যারেজের বাম পাড়ের অর্ধেকেরও বেশি বহু গেট বাধা পেয়ে উত্তরতর হয়ে ডান পাড়ের খোলা মুখ দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করে ফারাক্কার ভাটিতে জলসী পর্যন্ত প্রায় ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকাকে ডান্ডন করলিত করে ফেলেছে। সঙ্গে ফারাক্কার দিকে ব্যারেজের নির্মাণের উপরও প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে। এই অর্ধেও ব্যারেজ জ্ঞাত বিপর। মালদহে পঞ্চানন্দপুরের পশ্চিমাংশের ৫/৬ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এলাকা অনেক বর্ষিকু গ্রামসহ এখন গঙ্গাগর্ভে।

গঙ্গার সম্ভাব্য পথ

২০০০ সালের বর্ষার পর গঙ্গা স্থানীয় দুই নদী পাগলা ও পুরনো-ভাগীরথী থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার দূরত্বে পৌছে গেছে। মধ্যে আছে ২০০০ সালের বর্ষায় গড়া সবকারের নড়বড়ে ৭নং বলে চিহ্নিত একটি মাটির বীধ, যার থেকে গঙ্গার মূলপ্রবাহের ঝাটের দুরন্ত অতি সামান্য। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হতে এই প্রবাহের একটি ধারা অনতিদূর ভবিষ্যতে পাগলা-ভাগীরথীর সঙ্গে মিশে প্রাকৃতিক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ঢালের কারণে মহানন্দায় গিয়ে পড়বে। তারপর কোনো এক ভাংকর প্রাবনের বছরে গঙ্গার মূল প্রবাহ এই পথেই মালদহের অনেক জনপদ গ্রাস করে বাংলাদেশের রাজসাহীতে পড়ায় মিশবে। ফারাক্কা ব্যারেজ, ফিডার ক্যানাল প্রকৃতি মনুষ্যকৃত নিয়ন্ত্রণ সমূহ তখন আর কোনো কাজেই

* লেখক অতিথি নদী-ইঞ্জিনিয়ার; কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট থেকে অবসর প্রাপ্ত। বর্তমানে সক্রিয় উপদেষ্টা এবং 'প্রভাস' বৈদেশিকী সম্ভার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

আসবে না। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ৮০০ বছর আগেও বাংলার সেই সমৃদ্ধির যুগে পৌড়ের অবস্থান ছিল গঙ্গার উপর। হযত বা আবহাওয়া ও নিয়ন্ত্রণে অস্থির হয়েই নদী তার অতীতের গতিপথের সন্ধান; কে জানে।

প্রতিরোধের চারটি পদক্ষেপ

ভবিষ্যতের এই বিপদজনক সম্ভাবনা রুখতে প্রতিরোধের ইতিবাচক ব্যবস্থাপনা নিতে অনেক অনেক সেরি হয়ে গিয়েছে। এদিকে নদী তার অতীত পাশে প্রতিবছরই এগিয়ে চলেছে। আর সেরি করলে অবস্থা মানুষের সমস্ত ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারে। বিপন্ন মালদহ ও ফারাক্কা রক্ষা পরিকল্পনার মূল কথাই হল গঙ্গাকে যতটা সম্ভব আপন স্বরূপে গতিতে প্রবাহিত হতে দিতে হবে। তা করতে চারটি জরুরি পদক্ষেপ ২০০০ সাল থেকেই গ্রহণ করা সরকার।

১. ব্যারোজের মুখের সর্ষীপাত দূরীকরণ

আগামী বর্ষার আগেই ফারাক্কা শতাধিক গেটের সমস্তগুলি খুলে এবং উজানে বাম পাড়ের চরটি কেটে দিতে পারলে, মালদহ পাড়ের উপর অনেকটাই চাপ কমে যাবে, ডাটিতে মূর্শিগাবাদের প্রায় ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ তীরভূমির বর্তমান ভাঙন সমস্যা বহুলাংশে সাধব হবে। ফারাক্কা কর্তৃপক্ষের একটি ড্রেনার আছে পোনা যায়। কেন্দ্রীয় মূল সম্পন্ন মন্ত্রকের বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করা এখন অত্যন্ত জরুরি। দীর্ঘমেয়াদী কাজ হলেও গুরুত্ব এখনই করা সরকার। করা সম্ভব।

২. ডাকতিয়া চর ফ্রেজিং

রাজমহলের উজান থেকেই গঙ্গাকে যতটা সম্ভব তার পূর্বতন সোজা গতিপথ ফিরিয়ে দিতে হবে। ভূতনি সিলারার ঢাকাটার বাঁধের (রিং বাঁধ) প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ডানদিকের ডাকতিয়া চরটির বাম পাড় কেটে নদীর ঝাঁপড়প পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক হিসাবে ব্যয় ২০০ কোটি টাকার মত হলেও বর্ষার নদী নিজেই গতিপথ কেটে এ বরত অনেক কমিয়ে দিতে পারে।

৩. ২৮ ও ২৯ কিমি' এ দীর্ঘ দুটি স্পার গঠন

একই সঙ্গে ফারাক্কা ব্যারোজ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে গঙ্গার পরিবর্তিত অবস্থাকে সামাল দিতে ও নদী স্রোত মালদহের পাড় থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে ফাওয়ার জন্য পুনের 'সেন্ট্রাল ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার রিসার্চ স্টেশন' (CWPRS)-এর সুপারিশ অনুযায়ী ব্যারোজের উজানে ২৮ কিলোমিটারে ও ২৯ কিলোমিটারে দুই দীর্ঘ দীর্ঘ স্পার গঠন করতে হবে। এই সুপারিশটি ৮০ দশকের। তারপর দু'দশক কেটে গেলে, এখনও

একে কার্যকরী করা হয়নি। পরবর্তী কালে ৯৬ সালের বন্যার পরও এক কেন্দ্রীয় কমিটি এই দুটি স্রোত নিয়ন্ত্রণকারী স্পারের উপর জোর দিয়েছিলেন। তাতেও কাজ হল না। এটা সুবিনীত যে ভাঙন রক্ষার সমস্ত কাজ উজানেই করা নিয়ম।

স্বল্পব্যয়ের মিশ্র উপাদান প্রযুক্তি

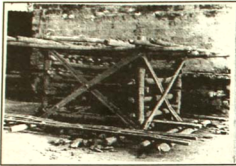
বোন্ডার ফেলে নদীকে বাঁধা নিয়ে নানা প্রয় উঠছে। অপচয় ছাড়াও এর কার্যকারিতার ওপর অস্বাভাবিকতা আছে না। সতের ও আশির দশকে কলিকাতা কনগ্রেস নদী নিয়ন্ত্রণ কাজের জন্য উন্নতমানের এক দেশীয় 'মিশ্র উপাদান' প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়। জাহাজের যাত্রাঘাড়ের পথে নাব্যতা রক্ষার জন্য ফ্রেজিং-এর বরত যখন খুব বেড়ে যায়, তখন বন্যার তৈরি হয় 'নদী শাসন' বিভাগ। উদ্দেশ্য নদীর ভাঙন রোধ, যাতে নদী চওড়া না হয়ে যায় এবং নাব্যতা বজায় থাকে। কাজে নেমে বন্যারের ইঞ্জিনিয়াররা সেখানে প্রচুর পুরাতন উপাদানগুলি অর্থাৎ ইট, বোন্ডার, পাথর, বাঁশ, বস্ত্রী ইত্যাদি এককভাবে ব্যবহার করলে কাজ নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে শেষ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। প্রকল্পগুলিও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। নদীতে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গেল উপরোক্ত উপাদানগুলি মিশ্রভাবে পরিবর্তিত কঠোরভাবে ব্যবহার করলে অনেক কম ব্যয়ের, কম অপচয়ের ও বেশি সাফল্যের হয়। এই পরীক্ষানিরীক্ষার চিন্তাভাবনা থেকে উদ্ভূত হয় সেমক নতুন 'মিশ্র উপাদান' প্রযুক্তি। আর ক্রমে তৈরি হয় একের পর এক মিশ্র উপকরণ।

- ১) কক্সিট হেক্সাপড — ৪০ কেজি ওজনের তিন ফুট মাপের এই উপকরণটি দুই এঙ্গেল বিভক্ত। এটি মিশ্র উপাদান প্রযুক্তির মূল উপাদান। (ছবি - ২নং)
- ২) মিশ্র বাঁচা — ১৭৫ কেজি ওজনের ছয়ফুট মাপের এই বাঁচা হেক্সাপড, বাঁশ, ইট ও পেরেকে তৈরি। এটি নির্মাণের মূল উপাদান। (ছবি - ৪নং)
- ৩) মিশ্র ব্লক — ৩৬ কেজি ওজনের এই ব্লক ইট, বাঁশ, পেরেকে তৈরি। এটি মিশ্র বাঁচার ভিতরে ব্যবহার করে খনন ও ওজন বাড়ায়। (ছবি - ৪নং)
- ৪) ইউ ক্রা বাঁশের বাঁচা — লম্বায় চওড়ায় সাড়ে পাঁচ ফুট এবং উচ্চতায় আড়াই ফুট এই বাঁচার ইট সহ ওজন প্রায় ৩০০ কেজি। এটি মিশ্র বাঁচার বিকল্প উপাদান। (ছবি - ১নং)
- ৫) কক্সিট টেন্ডারফেস — ২০০ কেজি ওজনের, লম্বা ও চওড়ায় সাড়ে চারফুট ও উচ্চতায় আড়াই ফুটের এই কক্সিট বাঁচার ইট খণ্ডে বিভক্ত। একবারে স্পারের উপর একে তৈরি করে ব্যবহার করা হয়। (ছবি - ৩নং)

৪. হালী/মোহনা প্রকল্পে মিশ্র উপাদানের ব্যবহার

এই মিশ্র উপাদান প্রযুক্তিতে সাতের দশকে ও আটের দশকের অনেকগুলি বছর কলিকাতা বন্যার কোটি কোটি টাকার

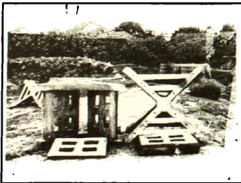
বড় বড় মাণের নদী শাসনের ক্ষতির প্রকল্পগুলির প্রত্যেকটি সাফল্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।



ছবি : ১ - ইট ভরা বাঁশের খাঁচা

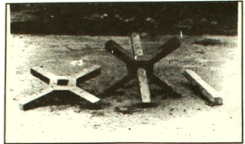


ছবি : ৩ - ফলতা প্রকল্পে ইটভরা বাঁশের খাঁচা ও হেয়ারপডে তৈরি নূরপুর সৈন্যদল ৬০০ মিটারের ৪টি দীর্ঘ দীর্ঘ স্পার (১৯৭১-৭৩) নদীর গভীরতা ৫০ ফুট

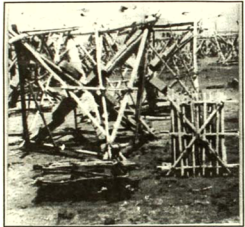


ছবি : ৫ - কংক্রিটের টোটারকস

উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিশেষ প্রকল্পের নাম ও চিত্র নীচে দেওয়া হল, সঙ্গে ব্যবহৃত মিশ্র উপাদান সমূহ :



ছবি : ২ - কংক্রিট হেয়ারপড



ছবি : ৪ - মিশ্র খাঁচা ও মিশ্র ব্লক
হলদিয়া প্রকল্পে ব্যবহৃত (১৯৮৫-৮৬)

এই প্রকল্পগুলি ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হল সাকরাইল — মায়াপুরে ভূমিকম্পরোধী স্পার (সাতের দশক), ফুলপীতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাড়ে ভাঙন রোধী স্পার (১৯৭২-৭৬), সাগরে ৪০০০ মিটার স্পার সহ মোট ৮ কিলোমিটার চওড়া সেকেন্ডারি চ্যানেল বন্ধের নেওয়ালের কাজ (সাতের দশক ও ১৯৮৫-৮৬) প্রভৃতি।

মিশ্র উপাদান প্রযুক্তির সুবিধা

- এটি দু'দশক ধরে নদীতে পরীক্ষিত। সাফল্য প্রমাণিত।



ছবি : ৬ - হলদিয়া প্রকল্পে নয়াচরা ভাঙন রোধে মিশ্র খাঁচা, ব্লক ও কংক্রিট টেট্রাফেসে তৈরি ১৯০ মিটার ক্রস স্পার (১৯৮৬);
নদীর গভীরতা ৪৫ ফুট।

- ইট, বোম্বার বা বর্তমানে ব্যবহৃত জিওফেব্রিক থেকে অন্তত ৪০ শতাংশ কম ব্যয়ের।
- সেপি মাল মসলা, গ্রামীণ লোকজন ও শিশি নৌকা দিয়ে সম্পন্ন করা যায়।
- এতে প্রমিত অনেক লাগে, ফলে বহু গ্রামবাসীর উপার্জনের সংস্থান হয়।
- মিশ্র উপাদানগুলি বড় মাপের হওয়ায় কাজ দ্রুতগতিতে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ হয়।
- মিশ্র উপাদানগুলি নদীর পলি ধরে রেখে একটি আংশিক ভেদ্য স্পারকে দ্রুত অর্জন করে। নদীর পলিকে এইভাবে কাজে লাগাবার জন্য মিশ্র উপাদানে গঠিত স্পার কম ব্যয়ের হয়।
- মিশ্র উপাদানগুলি ৪০ কেজি থেকে প্রায় ৩০০ কেজি পর্যন্ত ওজনের করা যায়। ফলে প্রয়োজন ভিত্তিক ওজন

তৈরি করে মোটে ভেঙে যাওয়ার প্রকণতা আটকানো যায়।

- প্রকল্পে গ্রামীণ শ্রমজীবীর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় কাজের উপর একটা স্থানীয় পাহারা থাকে, আত্মীয়তা থাকে, ফলে অপচয়ের বা চুরির সম্ভাবনা কমাতে পারে। এতেও প্রকল্পের খরচ কমে।

মিশ্র উপাদান প্রযুক্তির সীমিত প্রসারের কারণ

এই প্রযুক্তিটি যাটের দশকে উদ্ভাবন করেন কলকাতা বন্দরের চাকুরিজীবী ইঞ্জিনিয়াররা। ফলে বন্দরের নদী প্রকল্পগুলির মধ্যেই এর ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকে। এর শেষ ব্যবহার হয় হলদিয়ায় নাব্যতা বৃদ্ধির প্রকল্পে নয়াচরায় উত্তর গাইড ওয়াল নির্মাণে এপ্রিল ১৯৮৬ পর্যন্ত। ঐ বছরেই বন্দরের নতুন কর্তৃপক্ষ কুঁকে পড়লেন এক বিদেশী প্রযুক্তির দিকে, ফলে দেশের এই সম্ভাবনাময় স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি অবহেলিত হল। অথচ হলদিয়ার মূল প্রকল্পটি ছিল কম খরচের মিশ্র উপাদান

প্রযুক্তি ভিত্তিক। তাই পাচ/হয়ওণ বেশি বিদেশী প্রযুক্তির গুরু ব্যয়ভার বহন করতে না পেরে, কি সময়সীমার নিক থেকে, কি খরচের নিক থেকে, গোটা নাব্যতা বৃদ্ধির প্রকল্পটাই মুখ বুজে পড়ল। ফলও হল মারামরক। আর শত শত কোটি টাকার ড্রেজিং বিদেশীমের দিয়ে করিয়েও হলদিয়া নাব্যতা রক্ষা করা যাচ্ছে না। এই ভাঙ্গল্যমান ইতিহাস নিয়ে কেউ একই নাড়াচাড়া করলেই তোলা থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসবে জানিয়ে দিতে কেন দেশের অবিকাশে প্রকল্পই ফলদায়ক হয় না, মূল কারণগুলি কী:

পরবর্তীকালে এই মিল উপাদান প্রযুক্তির বিশদ বিবরণ ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সের ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত ও 'বিশ্বের আলোচিত হয় এবং ভারত সরকারের সেচ মন্ত্রকের পুরস্কার পায়। এই মিল উপাদান প্রযুক্তিতেই সম্ভব মালদহে ২৮ ও ২৯ কিলোমিটারে সুপারিশের দীর্ঘ দীর্ঘ স্পার দুটি গঠন করা। মেটামুটি ৫০ কোটি টাকার মধ্যে এই নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে।

রাজ্যমহল ও ফারাক্কার মধ্যবর্তী ড্রেজিং

একই সঙ্গে রাজ্যমহলের ভাটিতে মালদহের গ্রাস করা এলাকাগুলি ডানপাড়ে গমার পূর্বতন গতিপথে যে দীর্ঘ চড়ার সৃষ্টি করে নদী প্রবাহের সোজা পথটি র মুখটি বন্ধ করে রেখেছে তাকে ড্রেজিং করে খুলে দিতে হবে। স্বয়ং চওড়া করে হলেও চরটির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত কেটে স্রোতধারার একটি পথের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে বর্ষা নদী তার প্রবাহ পথ নিজেই তৈরি করে নেবে। প্রাথমিক ড্রেজিং-এর খরচ একটু বেশি হলেও মোট ব্যয় ৩০০ কোটির মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। প্রদেশ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ ১৯৯৯র বর্ষার পর যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতেও এই পদক্ষেপগুলির কথাই বলা আছে। বছর ঘুরে গেল, কাপায়নের কোনো ট্রেটাই দেখা যাচ্ছে না। এবার অন্তত চেষ্টাটা হোক।

আঁকাবাঁকা পথে নদী

সমীরকুমার ঘোষ

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বঁকে ... এ ছড়া পড়ে সবাই ভেদে যায় নদীর চলন। কিন্তু 'মহাশেবের জটা হইতে' ছুটে আসা নদী এমন সর্পিলা গতিতে বয় কেন? নদীকে 'বলো কোথায় তোমার দেশ?'-এ প্রশ্ন অনেক করে, কিন্তু তার চলন নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে কাউকে দেখা যায় না। কেউ না ঘামালেও ভূবিদ্যা ও নদী-বিশেষজ্ঞরা হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। তারা এ নিয়ে বিস্তার ভাবনা-চিন্তা করেন, এমনকি গবেষণাগারে হাতে-কলমে নানা



পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে ছাড়েন না। নদীর সর্পিলা গতিপথ (meanders) নিয়ে বেশ কিছু মত আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত যে মত ভূবিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক ড. সুপ্রিয় সেনগুপ্তের লেখায় তা জানা যায়। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জলস্রোত সোজা পথে চলার সময় তার বেগ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই জলকণাগুলি পাক খেতে থাকে। এই ক্ষুর মত পাক খেয়ে এগিয়ে

চলাকে ভূবিজ্ঞানের ভাষায় বলে হেলিক্যাল ফ্লো (helical flow)। এর ফলে নদীর জলস্রোত এক দিকের পাড়ে চাপ সৃষ্টি করে। জলের চাপে পাড় ভাঙতে থাকে। এই ভাঙনের ফলে নদীর গভীরতম খাতটি (thalweg) নদীগর্ভকে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করে। নদীর জলের ধারা আর সোজা পথে চলে না, দুমিকের বাক হুয়ে হুয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এর ফলে স্রোতের বাঁক বাঁকে কেন্দ্রাতিগ বলের (সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স) সৃষ্টি হওয়ায় নদীখাতের বাইরের অংশের জল উত্তাল হয়ে ওঠে (কেন্দ্রাতিগ বা অপকেন্দ্র বল বলতে বোঝায় যা কেন্দ্র থেকে দূরত্বে দূরত্বে বাইরের দিকে যায়; এককথায় বহিঃস্থী)। জলের গুঁতোয় নদীর পাড়ের একদিকে বাঁক-কাঁসা আলগা হয়ে জলস্রোতের সঙ্গে মিশে এগিয়ে চলে। এগিয়ে চললে কী হবে, আবারও ওপরের অংশের বেগ সব সময়েই নিচের অংশের চেয়ে বেশি হয়। তাই নিচের অংশের বাঁক-কাঁসা খিঁচিয়ে পড়তে থাকে নদীগর্ভে। যাকে পলি পড়া বলে। ধসে-যাওয়া পাড়ের সামনের বাঁকে অর্থাৎ বিপরীত দিকে স্রোতের বেগ কম বলে সেদিকে পলি পড়তে থাকে।

একটি বালির চরের সৃষ্টি হয়। এর চরে বাধা পেয়ে স্রোতের মুখ উল্টো দিকে ঘুরলে নদীও অপর পাড়ে আবার ধসের সৃষ্টি হয়। জলস্রোত যেদিকে পাড়ে ধাক্কা মারে সেদিকে পাড় হয় খাড়া। তার বিপরীত পাড় পলিস্তর জমে জমে ঢাল তৈরি করে। নদী সাগরের পানে এগিয়ে চলে। আর সমস্ত ঘটনাটা পর্যায়ক্রমে ঘটে যেতে থাকে। আমরা নদীকে সর্পিলা চোঁহায়ায় পাই।

গ্যানেটেই আছে 'এ কূল ভেঙে ও কূল ভূমি গড়ো'। এ কথাটা নদীর ক্ষেত্রে প্রবাস্য। এই ভাঙা-গড়া খেলার কারণ সেই পাক খাওয়া জলের ত্বির্যকগতি। সর্পিলা আকৃতিতে প্রবাহিত নদীর অবতল বাঁকে (কনকেভ বেড) কোনও জনবসতি থাকলে নদীপাড়ের ভাঙনে ক্রমে ক্রমে তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পাশাপাশি উত্তল বাঁকে (কনভেক্স বেড) পলি জমে জমে গড়ে ওঠে নতুন চর। প্রকৃতির এই নিয়মে অবতল বাঁকে অবস্থিত বহু জনপদ নদীতে হারিয়ে গেছে, অপর পাড়ে নতুন ভূমি জেগে ওঠায় সেখানে গড়ে উঠেছে নয়াবসতি। পূর্ব বঙ্গের

মানুহেরা পথ্য, মেঘনার দু ধারে এমন বহু ঘটনার সাক্ষী। ভাগীরথীর বহু জায়গাতেই তাই হয়েছে।

নদীগর্ভে খিঁচিয়ে-পড়া পলিকে ঠোলে নিয়ে যাওয়ার মত স্রোতের জোর যদি না থাকে তাহলে নদী ক্রমে ক্রমে বৈদীব্য রূপ ধারণ করে। সম্মিত পলি নদীখাতের মধ্যে একটি চরের সৃষ্টি করে। জল বইতে থাকে তার দুমিক দিয়ে। এ ঘটনার পুনরাবৃত্তিতেই নদীর চোঁহায়া হয়ে ওঠে বৈদীর মত।

নদীতে জলের প্রবাহ, তার পলি জমা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন আছে। মানুষ নিজের স্বার্থে নানা খোদকারি করতে গিয়ে নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনে।

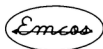
যেমন খাল কেটে সেচের জল নিয়ে যাওয়া। এতে মূল নদীতে জলস্রোত কমে যায়। স্রোত কমা মানেই পলি জমবে নদীগর্ভে। নদীর জলধারণ ক্ষমতাও কমবে। যার নিট ফল বর্ষাকালের বন্যা। মানুষ বন্যা প্রতিরোধ করতে নদীর পাড়ে বরাবর কৃত্রিম বাঁধ দেয়। কৃত্রিম বাঁধ সাময়িকভাবে বন্যাকে ঠেকালেও পলি পরিবহণ ও অবক্ষেপণে বাধা হয়ে পড়ায়। দুমিকের প্রাবলভ্যমিতে হুড়িয়ে পড়তে না পারলে নদীবাহিত পলি নদীগর্ভেই জমা হয়ে তাকে আরও অগভীর করে তোলে, বাড়ে বন্যার সন্তাবনা। আপন বেগে পাগল পারা নদীকে বাঁধতে গিয়ে আমরা নিজেদেরই নিজেদের পায়ে কুড়ল মারছি, যথার্থ অবিবেচকেরা যা করে থাকে আর কি!



"চলি ভাই! আসছে বছর আবার দেখা হবে!"

গভীর মুখাণী, ইরোড, ডাক্ষিণদ্যু

With Best Compliments from :



**EMCO General
Plastic Industries
Private Limited**

H.O. : P-30 Gariahat Road, Calcutta-700 029
Phones : 463-1464, 464-5369

Branches at :

Delhi ★ Bangalore ★ Cochin ★ Madras

ULTRALIFE PIPES FOR TODAY'S ENVIRONMENT

জীবিকাবিহীন জীবন : উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা

জয়া মিত্র

বন্যা হল বলে নানারকম প্রাণ ডেসে উঠল কলের ওপর। কিন্তু আজকে এমন প্রলয়ংকরভাবে সেবা মিলেও এ বন্যা খননছিল অনেকদিন, বা বলা ভালো, অনেক বছর ধরে। দেশের ডয়ানক উন্নয়ন বিধানের জন্য যখন থেকে জমি-জল-ভূস্বাসের নব্বাশাটা ঘেঁটে দেওয়া ঠিক হল মোটামুটি সেই কমবেশি পঞ্চাশ বছর ধরে ধ্বংস নড়া দিয়ে যাচ্ছে আমাদের। ১৯৬০ থেকে ৮০র মধ্যে প্রকল বন্যার সংখ্যা পরবর্তী বৃদ্ধি বছরের তুলনায় অনেক কম। গুনতিতে কম, বিধ্বংসের মায়াতেও কম। আগে বড়সড় বন্যা হত মোটামুটি চারবছরে একবার। ইসানীং ছিয়ানকই, আটানকই, নিরানকই, দু হাজার প্রায় পরপর।

বন্যা এসেছে নতুন নয়। বরং গঙ্গা-ব্রাহ্মপুত্রের বন্যার পলিতেই আমাদের এই বাসভূমি গঠিত হয়েছে যেখানে বসে আজকে আমরা বন্যার কুকল সম্পর্কে আলোচনা করছি। শুধু এইসেই নয় পৃথিবীর সমস্ত কটি প্রাচীন সভ্যতাই বন্যার পলিমাটির ওপরে গড়ে উঠেছে। সেই মাটিতে প্রথম কৃষিকাজ হয়েছে। মানুষের প্রথম বৃত্তি ভূগিয়েছে বন্যার পলি। সেই বন্যার যে কোনো ভয়জনক চেহারা ছিল না, এমন নয়। বাড়িঘর ডেসে যেত, পদ্মার মত কিছু নদী চিহ্নিত ছিল 'কীর্তিনাশা' নামে। কিন্তু আজকের মত সমস্ত নদীরই পরিচয় হয়ে ওঠেনি তা।

অথচ লোকে তনেছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যই নাকি তৈরি হচ্ছে বড় বাঁধ। শোনা গিয়েছিল সেচের খাল বেয়ে সমৃদ্ধি পৌছে যাবে চাষিদের ঘরে ঘরে।

বাত্তবে সেবা ছবিটা কীরকম?

একের পর এক বাঁধ গড়ে উঠেছে দেশভুজ্জে। ব্রাহ্মপুত্র ছাড়া একটি নদীও মুক্ত নেই কক্টিটের শৃঙ্খলভার থেকে। নিজেদের স্বাধীন স্বতাবমত জলধারা বলে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ। একটি পর একটি নদীকে হুত্যা করা হয়েছে টুকরো করে কেটে। সেই কাটা টুকরোগুলি বাঁধের রিজার্ভার হয়ে জলাকে বদ্ধ রেখেছে। সেচ ও বন্যাপ্রাণের পরিকথার টাঁকি ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যদি সেচ সিতে হয় বরার সময়ে, তাহলে রিজার্ভারে জল ভরা রাখতে হবে জোঁত আবাদে ছাড়ার জন্য; যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে বরার আগে রিজার্ভার

খালি রাখতে হবে অতিরিক্ত জল ধরার জন্য। দুটো একসঙ্গে করা কিছুতে সম্ভব নয়। তার ওপর আছে হিসেবের অনেক অনেক বেশি পলি ভরে বাঁধের জলাধার ক্রমশ ভরাট হয়ে যাওয়া, তার জলধারণ ক্ষমতা ক্রমশ কমে আসছে। অন্যদিকে বাঁধ সেচখাল পাইপের জলের ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলে দেশের বহু পুরনো পুকুর খাল বিলের কার্যকারিতা নষ্ট করা হচ্ছে। হাজার হাজার বছর ধরে একটু একটু করে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে বাপ খাইয়ে যে নিজস্ব জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছিল, যেমন তেমন করে প্রকৃতির ওপর খোদকারি করতে গিয়ে বৃহৎপাকি সেই জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে ফেলেছে অথচ পাশাপাশি এমন কোনো বিকল্প জীবনযাত্রা গড়ে উঠছে না যা মানবসভ্যতার উপযোগী ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো থাকে জীবিকার প্রকটি। নদীবীধ ও ক্রান্ত নগরায়ণের 'উন্নয়ন'র তলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা তছনছ হয়ে যাচ্ছে কারণ বিরাট সংখ্যক মানুষ তাদের জীবিকা হারাচ্ছেন।

বিরাট বন্যার পর মাসের পর মাস জল নামে না, বাঁধ থেকে ছাড়া জল ও বৃষ্টির গড়িয়ে আসা জল নিয় পায়েরার এলাকা, কাটোয়া, মাগনা, দক্ষিণ দিনাজপুর — এসব জায়গার জমে থাকে। আবার যে সব জায়গা অতটা নিচু নয় সেখানে যথেষ্ট বৃষ্টি হবার পরও ফাটনের শেষ থেকে কুয়ো, পুকুর শুকিয়ে যায়, ক্ষেতজমিতে জল থাকে না, বরার প্রভাবে গৃহপালিত পশুর খাদ্য বা পানীয় জল অ-মিল হওয়ায় অচ্ছ পত মারা যায়। জীবিত মানুষদেরও দুর্দশার শেষ থাকে না। এমন নয় যে কেবল পশ্চিমবাংলাতেই এরকম অবস্থা, মোটামুটিভাবে এটা আমাদের সারা দেশেরই ছবি। একবার শোনা যায় রাজস্থানে শ্রবল বন্যা হচ্ছে, তার চারমাসের মাধ্যম সেখানে প্রকল বন্যা। বরা তার আশপাশের রাজ্যগুলি ভুজ্জেও।

এইসব অজলের যেসব মানুষ নিজেদের জীবিকার টিকে থাকতে পারছেন না, তাঁরাও কিন্তু আমাদের মত দেশগুলিতে তথাকথিত এই 'উন্নয়ন'রই শিকার।

১৯৮৯ সালে যখন ভাগলপুর জেলার কলগাঁওয়ে গঙ্গামুক্তি আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় সেটা এই বিশাল আন্দোলনের বিস্তার মুহূর্ত। গঙ্গা থেকে মাছ

ধরতে হলে ভাগলপুর থেকে সাহেবগঞ্জের শীরশৈলি ঘটি পর্যন্ত জেলসের খাজনা দিতে হত দুটি জমিদার পরিবারকে। জমিদাররা, জল থেকে খাজনা নিতেন বলে তাদের বলা হত পানিদার। নিজেরা খাজনা আদায় করতেন না, সেটা করত তাঁদের অধীনস্থ ঠিকাদার ও তাঁদের মাসুলমানেরা। ১৯৮২ সালে হতদরিদ্র জেলেরা এই খাজনা বন্ধ করার আন্দোলন শুরু করেন। কহলগাঁওয়ের কাগজিটোলা নামে ছোট জেলে গ্রাম থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গার তীরবর্তী হাজার জেলে, শ্রান্তিক চাষি, ছোট কার্শিমী, ভাগলপুর



১ অক্টোবর ২০০০। বাংলাদেশের যশোরের শিকারপুর গ্রাম। অর্ধভুক্ত বিপন্ন দুই নারী আশা-সেনাবাহিনীর দেওয়া রিলিফের খাবার শুকনো রাখার চেস্তায় একটি ভেলার ওপর পুটলি রেখে নিজেরা সাঁতারাচ্ছেন আশ্রয়ের খোঁজে। ফটো □ এ এফ পি

শহরের বস্তিবাসী যারা গ্রাম থেকে উঠির হয়ে এসেছেন, এরকম সব মানুষদের মধ্যে। দীর্ঘ দশবছর ধরে সে লড়াই চলে ও ৯১ সালে সুপ্রিম কোর্টকে এই মর্মে আবেদন দিতে হয় যে অতঃপর বিহারের কোনো নদীতে মাছ ধরবার জন্য জেলসের আর খাজনা দিতে হবে না। কিন্তু সেই বিশাল বিজয়লাভ ততদিনে প্রায় নিরর্থক হয়ে পড়িয়েছিল কেননা গঙ্গায় আর মাছ পাওয়া যাচ্ছিল না। একে তো যেমন-তেমন ভাবে গজিয়ে ওঠা কারখানাগুলি গঙ্গার জলকে জলজপ্রাণীদের বাসের অযোগ্যভাবে দূষিত করে তুলছিল, তার ওপরে ছিল ফারাক্কা ব্যারাজ। ইলিশ চিতল মহাশোল কালবাউস — যে সব দামি ও সুস্বাদু মাছ জেলসের লক্ষ্মী তার বেশ কয়েকটিই মোহনার মিশ্রিত নোনাডল থেকে উজানে যায় ঠাণ্ডা ডলে ভিম ছাড়বার জন্য। মোহনার মুখে যেখানে মিষ্টি ও নোনাডল যথেষ্ট সেই অঞ্চলের জলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীবৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। এইসব মাছ নদী জুড়ে চলাচল করে। জেলেরাও

ভাগলপুর, পাটনা কিংবা আরও উত্তর থেকে মাছ ধরতে ধরতে গঙ্গাসাগর সূক্ষবন পর্যন্ত চলে আসতেন। তিনমাস চারমাস প্রচুর মাছ ধরে বিক্রি করে সারা বছরের ভাত রুটির মূল সংস্থানটুকু করতেন। সত্তর দশকের শুরু থেকে ফারাক্কা ব্যারাজ এই দুই রকমের চলাচলই বন্ধ করে দিল। ভয়াবহ দূষণ একদিকে নদীর মাছ শেষ করে দিচ্ছিল তার ওপর মাছ চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিহারের (বাংলারও) জেলেরা এসে দাঁড়ালেন সেই অবস্থার মুখে, মাঠে ক্রমাগত অনাবৃষ্টি চলতে থাকলে চাবিসের যা হবে। গঙ্গামুক্তির মত দীর্ঘ ও গৌরবময় আন্দোলনে বিজয়ী হবার পর দশবছরে এই লক্ষ্যধিক জেলে পরিবার বাধ্য হয়েছেন নিজস্বের বৃত্তি ছেড়ে আসাম পাল্লাব বয়েতে, কাছাকাছি পাটনা ভাগলপুর কলকাতায় মুটের কাজ করতে, রিকশা চালাতে, মানুষের বাসযোগ্য নয় এমন ঝুগুণি বস্তিতে থাকতে, মানুষের অনুপস্থিত জীবন কাটাতে।

ফারাক্কা ব্যারাজের দরুন তীর ভয়ংকর ভাঙনে মালদহ-মুর্শিদাবাদের যে মানুষদের পায়ের তলার মাটি, মাথার ওপরের ছাদ, নদীর গর্ভে গিয়েছে সেই প্রায় দশলক্ষ মানুষ কোথায় গিয়েছেন? কি ভাবে আছেন তাঁরা? এই দুটি জেলা আম ভাল শস্য সিদ্ধ গালা শিল্পে, অলঙ্কার শিল্পে, অতি সমৃদ্ধ ছিল। আজকে সেখানকার লোকেরা ভিখারির মত অবস্থায় কাদায় মুখওজে পড়ে আছেন ব্রাহ্মসামগ্রীর আশায়। তাঁদের একজন আমাকে বলেছিলেন,

বয়ের দাদার বাজারে একবার জোরে ডাক দেবেন 'মালদা জেলার কে কে আছে' বলে, দেখবেন বাজারের অর্ধেক কুলি উঠে দাঁড়াবে ...

তারপর আবার এসেই শিবসেনা পিটায়ে 'তড়িয়ে দেবে বাংলাসেলি বলে' বিহারের লোক বলে ওনবে কিন্তু আমরা তো বাঙালি! নিয়ত এই আতঙ্কে আছে অনেক অনেক মানুষ — শিশু থেকে অতিবৃদ্ধ, যারা বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন মালদহের চরে। মাটি ভেঙে গঙ্গা যেমন পূর্বদিকে সরে যাচ্ছে, সেই ভাঙা মাটি পশ্চিমে জমা হচ্ছে দিশন্তবিত্তার চরের চেহারা নিয়ে। এপারের বিশ্বস্ত মানুষরা নিরুপায়ে গিয়ে বসতি গড়ছেন সেই চরে। ব্রীহীন সহায়স্বল্পহীন কোণঠাসা মানুষ। কত বড় চর পড়েছে গঙ্গার এই ভাঙনে? কত লোক বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন সেই চরে? আড়াই লক্ষ। হ্যাঁ, ভুল নয় এই সংখ্যাটা — আড়াই লক্ষ। তার মানে অন্তত সত্তর হাজার শিশু, প্রায় সমসংখ্যক বৃদ্ধ। কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কোনো ডাক্তার,

কোনো স্থল নেই সমস্ত জায়গায়। ইলেকট্রিক কিংবা পানীয় জলের প্রসঙ্গও ওঠে না। কোনো সরকারই কিন্তু এসব ধরছেন না 'বীথের কারণে উদ্ভাস' বলে। ক্ষতি করা হয়েছে অপরিমেয় অর্থও ক্ষতিপূরণের কথা চিন্তাই করা হয়নি। কী করবেন এই জনগোষ্ঠী ধারা এখন স্যাকুল কেবল নিজেদের পরিচিতিটুকু না হারানোর জন্য?

নদী একসময়ে কালো-বিহারের সীমানা ছিল ঠিকই কিন্তু নদী যে ফারাকা হবার পর থেকে কেবলি পূর্বদিকে সরে যাসে। আমরা পশ্চিমতীরের চরে চলে এসেছি কিন্তু বিহারের লোক হয়ে যাব? আমরা যে বাংলায় কথা বলি, অন্য কোনো ভাষা জানিও না —

ভিভিসি'র বীথের দক্ষন পাকাপাকিভাবে জলভূমি এলাকা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিম্ন-দামোদর অববাহিকা — হাওড়া বগলি মেদিনীপুরের একাংশ। ভরা বর্ষায় যখন বীথের অতিরিক্ত জল ছাড়ে ভিভিসি, এই অঞ্চলগুলি প্রাবৃত হয়ে যায়। এমন কন্যা না-বীধা দামোদরে ঘটত না। একবারে তিন-সাত্বে তিন লক্ষ কিউসেক জল আসত না, আর, যে জল আসত তার বয়ে যাওয়ার পথ সে নিজেই খুলে রাখত। যে জল আজকে দুপাশের জনপদ ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, সেই জলই তখন সেই বিশুল শক্তি নিয়ে ধাক্কা দিত মোহনীর বাগিচের। বগলি-গঙ্গার সমুদ্রগমন ছিল স্বাভাবিক। ভি ভি সি দামোদরের সেই স্বাভাবিক গতি রোধ করায় প্রতিদিন জোয়ারের বালি ভরে গঙ্গার পলা টিপে ধরেছে। দামোদরের মোহনা অঞ্চল হয়ে উঠেছে উঁচু। ফলে বীথের ছাড়া জল বেত্রাবার মুখ না পেয়ে নিম্ন-অববাহিকাকে ঢুکیয়ে রাখে বছরে সাত মাস। তার দক্ষন এই পুরো অঞ্চলে হাজার হাজার বিঘা কৃষিজমি লবঙ্গীকরণে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষ নিজেদের পেশা থেকে চ্যুত হয়েছেন।

এরা কি বড়বীধ ও বড় 'উন্নয়ন'র শিকার শিকড়-হেঁড়া মানুষ নয়? এঁরা নিজেদের সৃষ্টিতে হিত থেকে সেইসব ক্ষেত্রে যদি সরকারি আনুসঙ্গ্য পেতেন তাতে কি রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অনেক বেশি স্থিতিশীল হত না, ডিম্বের ফুলি হাতে করে এন. আর. আই.-সের পায়ে নিঃশর্ত ঠেলমর্দনের চেয়ে?

এই বিরাট সংখ্যক মানুষের ক্ষতিপূরণের কথা কে ভাববেন?

আর, যেসব জায়গায় নামেমাত্র ক্ষতিপূরণের চেষ্টা হয়েছে, সেখানকার দ্বিবি বা কিরকম? হিমালয় প্রদেশের পং বীধ ভৈরবির জন্য বাধ্যতায় লোকদের পুনর্বাস দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার। সেই পার্বত্য

অধিবাসী মানুষগুলির কাছে চাওয়া হল তাদের জমির দলিল, যা প্রত্যয়িত করিয়ে আনত হবে কোনো গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে, পনেরো দিনের মধ্যে তা জমা দিতে হবে শহরের সংশ্লিষ্ট অফিসে। ফলে শেষ পর্যন্ত দুপাশের কিছু বেশি লোক পুনর্বাসনের জমি পাবেন — এই আশ্বাস পেলেন। তাদেরও মধ্যে অনেকেরই কাগজপত্রে 'ক্রটি' ধরা পড়ল, অনেক এই ক্রমাগত ছুটো-ছুটিতে দিলেহারা, সর্বশাস্ত, শহরে দলাদলার পাঁচ-ছপো নগদ টাকা ধরিয়ে দিয়ে নিয়ে নিল তাদের কাগজ। বাটটি পরিবার শেষ পর্যন্ত গেল ক্ষতিপূরণের জমিতে পুনর্বাস করলো। এবং রাজস্থানের সেই আধ-মক জলহীন পশ্চিমবঙ্গ-সীমান্তের জমি ছেড়ে তারা শেষপর্যন্ত ফিরে গেল পাহাড় আবার। বহুসংখ্যক মরার ভায়াগটিক পাবার ডরশায়।

পুনর্বাসনের নামে সৃষ্টি করা হচ্ছে আরো একরকম বিপর্যয়।

আমরা দেশের যে অংশে বাস করি তা সচল সরস মাটির অঞ্চল। ফলে এখানকার অধিকাংশ মানুষের বৃত্তি এখনও কৃষি সম্পৃক্ত। এই দেশের পশ্চিমাঞ্চলের চেহারা ভিন্ন। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর কপিটক — এইসব ভায়াগার জমি বলিষ্ঠতার প্রধান। বাতাস শুকনো। মদী কম, সূর্যতাপ প্রবল। এই অঞ্চলগুলোর গ্রামের সাধারণ মানুষদের প্রধান জীবিকা পশুচারণ। গরু, মোহা, ছাগল, ভেড়া, উটের বিরাট বিরাট পাল নিয়ে এরা বৃষ্টির জলের পেছন পেছন চলে। প্রতিটি গ্রামের সীমানায় থাকে একটি বা একাধিক গ্রামের জনা নিশিষ্ট চারণভূমি যাকে এঁরা বলেন চরবাধা কিংবা পৌচর। গ্রামের পাশে ক্ষেতে যেমন ব্যক্তি বা পরিবারের মালিকানা থাকে, পৌচরও ঠিক তা নয়। এগুলি সাধারণ গ্রামসম্পত্তি। গ্রামের বোলআলা লোক বা পক্ষায়েত (পশ্চিমবাংলার অর্থে নয়) এইসব পৌচরের দায়িত্বে থাকে। পশুই যেহেতু এ অঞ্চলের লোকদের প্রধান জীবিকার উৎস, পৌচর ও সাধারণের জলাশয় বা কুয়ো এদের কাছে চাষির ফসলক্ষেতের মতই বেঁচে থাকবার বুনিয়াশী উপাদান। বিভিন্ন বড় বীধ থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া লোকদের সরকার সাধারণত পুনর্বাসন সেন এইসব পৌচর জমিতে। ফলে নিজেদের বাসভূমি, পেশা ও নিজেদের পরিচিতি ছেড়ে আসা এই উদভ্রান্ত মানুষেরা মুখোমুখি হন তাঁদের নিজেদেরই মত বিপন্ন কোণঠাসা আরেকদল মানুষের। দুই দলেরই মরিয়া অবস্থা। ফলে দেশের সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত, 'উন্নয়ন'র শিকার, দুই দল মানুষ দুই যুগ্মদান পক্ষ হয়ে ওঠেন, কর্তারা অবস্থান করেন নিরাপদে,

দূরে। বিরানকসই সালে মহাকাড়ানা বাঁধের উদ্ভাসের দেখানো জমি দেখা হয়, তা হল অন্য গ্রামে মীনা উপত্যকার গৌচর। দু-শল সর্বস্বত্বা মানুষের মধ্যে মরিয়া সংঘর্ষে বোলভন উদ্ভাস গ্রাম হারিয়েছিলেন।

সরকার কোনো নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে ক্রমশ সাধারণ গৌচর (common pastures) দখল করে বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন করে বিচ্ছেদ। সেসব জায়গায় তৈরি হচ্ছে নতুন গুদাম, কারখানা। এমন সব কারখানা, যেগুলো তৈরি হয়ে যাবার পর আর অল্প দ্রুতি লাগে কম। এই দুই সংকটে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে এই অর্থগত রাজ্যগুলির অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রা, সামাজিক কাঠামো।

কাজেই যদি দেখা থাকুক, লোকসভা রাজ্যসভায় যতই বিল পাস হোক, কাগজ কল ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা, সরকারি ঠিকাদাররাও এমনকি অফিশে কেটে নিয়ে যাচ্ছে গোট গোট ভসল। পাহাড় থেকে, সমতল থেকেও। পাহাড় সমতলের পা বেয়ে তৈরি হচ্ছে জালের মত পাকা রাস্তা, যেন ট্রাক যেতে পারে সর্বত্র। কাটা পড়ছে ভসল, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঋণ বা প্রবণের মুখ। এসব রাস্তা তৈরি হয় মানুষের শ্রম দিয়ে নয়, বহুভাষিক কোম্পানিগুলির তৈরি সব স্বয়ংচালিত মেশিন দিয়ে। বিশ্বব্যাপক তৃতীয় সেলগুলির উন্নয়নে 'র' জন্য যে টাকা পাঠায় তার সবচেয়ে বড় অংশ যায় বড় বীথ আর রাস্তা নির্মাণে। সেই নির্মাণ প্রকল্পের নিচে চলে যায় লোকসভার গ্রাম, বসতি, ক্ষেত, গৌচর, নদী।

বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না সেই চাষিদের নিয়ে, 'উচ্চফলনশীল' কৃষি বিপ্লবের নিচে ওড়িয়ে গেল যাদের ফলনের, ফসলের, সার দেওয়া-না-দেওয়ার স্বাধীনতা। বাসারনিক সারের দাম, অতিরিক্ত সেচজলের ভাড়া যোগানোর পর যাদের ফসল দাম পায়না, মাঠ থেকে তুলে হাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ারও খরচা পোষায় না, ফড়িদের মুখে বলা দানে ফসল তাদের ট্রাকে তুলে দিতে হয় আলোচনা করছি না এই পরম উচ্চফলন সবুজবিপ্লবে ভীতির টান ধরে যাদের জমি এরমধ্যেই 'ভলিয়ে কাট' হতে শুরু করেছে যাদের উর্বরা জমি বন্ধ্য হতে শুরু করেছে, সেই হাজার হাজার সর্বস্বত্ব হয়ে যাওয়া কৃষকদেরও বিষয়ে।

আমাদের দেশের মুখের ওপরে কাশো মাকড়সার জালের মত ছড়িয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার পাকা রাস্তা। নদীগুলির হাত পা বেঁধে গলা টিপে ধরছে কয়েক হাজার মাকড়সি ও বড় বীথ। হুইল মাইল লম্বা সেচ বাল কেটে ফুরিয়ে যাচ্ছে আমাদের চাষবাসের পচতারণের জমি। কোটি কোটি

মানুষ, ঘাঁরা এ দেশের সভ্যতা গঠন করেছেন, শিল্পসমীচ-সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছেন তাঁরা ক্রমশই ভলিয়ে যাচ্ছেন নিজে। ক্রমেই তাঁরা পরিত্যক্ত হয়ে উঠছেন। বছরের পর বছর ধরে একেই বলা হচ্ছে উন্নয়ন। সমস্যার কথা তুললেই আমাদের পড়ে শোনানো হয় জনসংখ্যা হ্রাস। জনসংখ্যা সমস্যা নেই একথা কেউ বলবে না। কিন্তু সে সমস্যা সমাধানের জন্য যা করা ভুলকি ছিল তা 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্যান্সন' আর 'কণার-টি' র চেয়ে আর একটু গভীর, আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু। তার নাম শিক্ষা, তার নাম মেয়েদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তার নাম ভোগবাহী লোভের বিরোধী সমাজচিন্তা, যেখানে পণ্যের জিনিস পাওয়া ভবিষ্যতের নিরাপত্তা পাওয়ার লোভে হেলের জন্ম দিতে আমাদের বাধ্য-বাধকতা।

এবং, আমাদের মত বিরাট ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশের মূল সমস্যা প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা নয়। অন্যান্য পদ্ধতি উপাদানের মত ভ্রমশক্তি তো একটা প্রয়োজনীয় উপাদানও। যে দেশের যা সুবিধার নিক এবং যা সমস্যা সে দেশের উন্নয়নও তো সেই অনুযায়ীই হবার কথা। সেই হিসেব ঠিক রাখতে পারাই বৈজ্ঞানিকতার চিহ্ন। আধুনিক পরিকল্পনা ব্যবহারও। নিউট্রন বোমার যে বিশেষত্ব, তা মানুষ বা প্রাণীকে ধ্বংস করে, বাকি জিনিসপত্র অটুট ও চমৎকার থাকে, তাকে মানবসভ্যতার 'উন্নয়ন' মডেল হিসেবে ধরাটা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ বলা যাবে না নিশ্চয়ই।

উন্নয়নের নামে দেশের কোটি কোটি মানুষের জীবিকাভূতি নিয়ে চিন্তিত হওয়া একারণ নয় যে আমরা বিশেষ করণাপ্রবণ মহানহরয়। আসলে এটা সমস্ত দেশেরই সামনে একটা মরণবাচন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতদিন ধাক্কা বড় বীথ কি কৃষিপ্রযুক্তি, রাস্তা বা ক্ষেতজমি ভসল দখল করে নগরায়ণের ভয়গায় ছিল, আমরা নাগরিকরা নিশ্চুই উদাসীন থাকতে পারছিলাম। ফলে বিশ্বায়িত শিল্প বিপ্লব আধুনিকীকরণের ধাক্কা একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পও হুটহিয়ারে বন্ধককে সোনালি বড়ো তুলেছে। এখন এই প্রযুক্তি নতুন করে সামনে আসছে।

সাধারণ নাগরিকদের ভাবনা বন্ধক রেখেছে বহুবর্ণ বাস্তব। নতুন সাক্ষর সাক্ষীর গল্পে বোকাগুলোকে রঙিন যন্ত্রের মতন দেখতে। মাথা মেরুণও গলার নলি চিবিয়ে খাচ্ছে সাপ, তার গায়ে জরির কলর লাগানো। আমরা একা একা যে যার কবরে মরব, না স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়ার কথা ভাবব, ভাবনা দিয়ে ভাবনার অস্ত্র খণ্ডন করব — এই সিদ্ধান্ত আমাদেরই নিতে হবে।



চিত্র পত্র

প্রসঙ্গ : মালদা শেষ হয়ে যাচ্ছে।
প্রতিকার কী?

বর্তমানে বর্ষার সময় গঙ্গানদীর ভাঙন চলতে থাকে মালদা জেলার অন্তর্গত কালিয়াচক থানার পঞ্চানন্দপুর অঞ্চল থেকে মানিকচক পর্যন্ত। অসংখ্য চরের সৃষ্টি হয়েছে বিগত বছরগুলোতে। বিহার রাজ্যের রাজমহল পাহাড়ের কাছে মালদা জেলার সীমানা যেসে গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রবেশ করেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। পূর্বদিকে মালদা শহর কমবেশি ২৫ কি.মি. দূরে। রাজমহল পাহাড়ের পাথরে বাধা পেয়ে গঙ্গানদীর প্রোত আঘাত করছে অন্যদিকে, পঞ্চানন্দপুর থেকে গোপালপুর পর্যন্ত নরম মাটির পাড়ে।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আলানিটোলার অর্ধেক, হাছিমটোলা, উজিরটোলা, ভানুটোলা জনবসতি গঙ্গাপার্শ্বে তলিয়ে গেছে। তার সঙ্গে আমবাগান, বাঁশঝাড়, ফসলি জমি, একরের পর একর, সব চলে গেছে নদীর বুকে।



শেষ মুহূর্তে কোকরা ফেলা। স্রোত মাথা ঘুড়ি করে নিয়ে সরাসরি নদীর জলে। মালদা ৭ম ডিটার্ড। ফটো : পত্রলেখক

সরকারি সেচ দপ্তর এখনো তার পুরনো দাওয়াই জিইয়ে রেখেছে। বোম্ভার দিয়ে স্পার (spur) তৈরি করা, আর নদীর পাড় থেকে ৪০০/৫০০ মিটার দূরে মাটির বাঁধ (embankment) তৈরি করা। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে এ কাজে প্রতি বছর। রাজকোষ থেকে তো টাকা যাচ্ছে, তাই ভাববে কে? দায় কার? অথচ এই সমস্ত এলাকার মানুষ ডিহারিতে পরিণত হয়েছে। যাদের ৫০/৬০/১০০ বিঘে জমি ছিল, তারা আজ নিঃস্ব। কায়িক পরিশ্রম করে, লোকের ঘরে কাজ করে, ভ্যান রিক্সা চালিয়ে কোনও মতে জীবিকা নির্বাহ করছে।

আমরা জানি শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে উত্তর দিক থেকে বৃষ্টির জল, নদীর জল, উত্তর প্রদেশ বিহারের মধ্যে দিয়ে যখন

পশ্চিমবঙ্গের ভেতর প্রবেশ করে তখনই ভাঙন শুরু হয়। বাড়তে বাড়তে জল পাড়ের বাসিন্দাদের কাছে পৌছলে ডেউয়ের ক্রমাগত আঘাতে বাসিন্দাদের ভিতর খোল বা গর্ত তৈরি হয়ে যায়, এবং তখন উপরের মাটির ভাঙে বা চাপে ভাঙন শুরু হয়ে যায়। জল আবার আরো বেশি হয়ে কূল ছাপিয়ে গেলে কম ভাঙন হয়।



১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা নির্মিত ৭ম ডিটার্ড বীঘের অবস্থা।

ফটো : পত্রলেখক

তাই ভাঙন রোধ করতে হলে নদীর জলের সেভেন্স বা উচ্চতার স্তর নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। সেটা এখনই করা সম্ভব। পাগল্য নদী এবং তাগিরধী নদীতে শুধা মরসুমে ড্রেজিং করে নাব্যতা বাড়িয়ে এই পথে জল ছাড়তে হবে। শুধু বর্ষার সময়। কারণ অন্য সময় নদীতে ভাঙন হয় না। সুইস গোটের মাধ্যমে বাড়তি জল নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সারা বছর জল থাকলে এই মৃতপ্রায় নদীগুলোর পুনর্জন্ম হবে, নদী আবার জনজীবনকে পুষ্ট করবে। এটা ঠিক যে ড্রেজিং-এ খরচ অনেক, বিপুল পরিমাণ ভ্রমা পলি কেটে সরানোর ব্যয় প্রচুর। কিন্তু সরকারি অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কি কম? চুরি, অপচয়, বেহিসাব ব্যয় করলে যথেষ্ট টাকা সেচ দফতরের ও জেলা পরিবাদের হাতে থাকা উচিত।

বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বছর বছর বোম্ভার আর বাঁধ তৈরি করে নদীকে না বেঁধে স্বাভাবিক বন্যা হতে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ বানের জলের পরিমাণটি পাড়ে জমির উৎকর্ষ বাড়বে। আর, বন্যার সঙ্গে কিভাবে বসবাস করতে হয় তা স্থানীয় জনসাধারণ ভালোভাবেই জানেন।

মনতোষ সাহা

পঞ্চানন্দপুর, মালদা

এবারেও আমরা থাকছি কলকাতা বইমেলায়

পাঠকবৃন্দের প্রতীকায়

ষ্টল নং — ৭৩০

নতুন বই

জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?

অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম : ২০ টাকা



হসেছে

□ গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০, বুধস্পতিবার, দুপুর ২ টো। ফুলবাগান ডি আই সি মার্কেটের

ঘরে 'সূর্যের গায়ে কালো ছাপ' বা শৌর্যকলঙ্ক সেখানে হয় টেলিফোনে। বর্তমানে সৌরকলঙ্কের হার গত এগারো বছরে সর্বাধিক। এই পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজক — অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার। এরই সঙ্গে সঙ্গেও 'সূর্য ও মহাবিশ্ব' সাইড পো সম্মেলনে আলোচনা করেন অশিষ মুখার্জী।

□ মৌড়ীগ্রামের (হাওড়া) পরিবেশ অফিস। সম্পূর্ণ কোআইনিভাবে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় গাছপালা আর পুষ্করীর নির্মল পরিবেশে বসানো হয়েছে একটি কসাইখানা। কোনো প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র, আইনি অনুমতি, সাইনবোর্ড ছাড়াই এই বিপজ্জনক কারখানাটি গড়ে উঠেছে। ক্ষুদ্র আতঙ্কিত স্থানীয় মানুষ প্রাণের দামে স্বাস্থ্যঝুঁকিভাবে প্রতিবাদের স্বাক্ষর নেমেছেন। আশ্বোদানে নেতৃত্ব দিচ্ছে 'মৌড়ীগ্রাম পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি'। ২২শে ডিসেম্বর দুপুরে এসম্মেলনেও রানী রাসমনি রোডে সভা-কমাবেশ হয়, পরিবেশ মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি ও পল ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

□ হাতিবাগানের 'চেতনা গণসংস্কৃতিক সংস্থা'র 'বাদল বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা' হয়ে গেল সম্ভ্রুতি প্রত্যাশিত দক্ষতা বৈচিত্র্য জনপ্রিয়তা নিয়ে। ২৮ ডিসেম্বর ২০০০ উদ্বোধন হয়। তারপর ১ জানুয়ারি ২০০১ পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত ৯টা। প্রভূত জনসমাগমে সাধারণ মানুষ বৈজ্ঞানিক চিন্তা সম্পর্কে সহজবোধ্য ধারণা কিছু মাথায় নিয়ে যান — যেটা চেতনার মূল উদ্দেশ্য। ২ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিনোদিনী সেনী সন্ধান দেওয়া হয় প্রীণা অভিনেত্রী মায়া ঘোষকে।

□ ১লা জানুয়ারি ২০০১ বিকেলে বৌবাজারের ভারতসভা হলে 'শান্তি, প্রগতি এবং মানবিক সৌহার্দ্য' বিষয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ সেমিনার হয়ে গেল 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' সংস্থার ১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী।

□ ২০০১ সালের ১০-তম লোকবিজ্ঞান মেলা হয়ে গেল গত ৪ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি, রোজ ৩০টি থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং-এর এই গ্রামীণ মেলা সম্পূর্ণই ব্যতিক্রমী চরিত্রের হয়ে থাকে, একাধিক হয়েছিলো। দূরবীনে আকাশ দেবা থেকে শুরু করে, বায়ু পরীক্ষা, শিশুদের পুষ্টি, মহাকাশ, বায়ু পরীক্ষা, বায়ু তেজাল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ছাড়াও ছিল 'অলৌকিক নয় ম্যাজিক' শো, পুতুল নাটক, কথা কলা পুতুল, গণসংগীত, ম্যাজিক এবং নানাবিধ চেতনা বিকাশ মূলক অনুষ্ঠান।

□ এন সি এস টি সি'র সর্বভারতীয় মকের ব্যবস্থাপনায় ২০০০ সালের 'জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হয়

গেল এবার পশ্চিমবঙ্গে, শিবপুর বেঙ্গল ইন্সটিটিউট কলেজে। ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর কার্যকর অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে সম্পন্ন হল এই ব্যাপক আয়োজনের শিশুদের নিয়ে কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, উপাচার্য, জাতীয় অধ্যাপক, জাতীয় বিজ্ঞানসংস্থার অধিকর্তা প্রমুখদের দ্বারা অঙ্গীকৃত উদ্বোধনের পর পাঁচদিন ধরে বিবিধ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান হয় ছোটদের নিয়ে। গোটী অনুষ্ঠানের প্রধান সংযোজক ছিলেন অভিজিৎ বর্ধন।

ঘর চাই

উৎস মানুষের কার্য্যালয় ৯৮ নম্বর মহাশ্মা পান্ডী রোডে জন্ম নেই। এখন কলকাতা স্ট্রিট সলংস অফিসে ঘর চাই। আমাদের প্রতিকার শুভানুধ্যায়ী, পাঠক-বন্ধু ও অনুষ্ঠানিকের সক্রিয় সহযোগিতা চাই।

গ্রাহক চাঁদা

নতুন বছর ২০০১ থেকে উৎস মানুষের দাম হসেছে প্রতি সংখ্যা ৮ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা। ডাক খরচ যথারীতি আমাদেরই থাকছে। ডাকযোগে গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানাও একই থাকছে

বি ডি ৪৯৪

সেন্ট লেক

কলকাতা ৬৪

চেক বা ড্রাফট চাঁদা পাঠালে UTSA MANUSH নামেই দিতে হবে। M.O. কৃপনের নীচে নিজের নাম ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা চাই। রাজ্যের বাইরের চেক-এ অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হবে।

পত্রিকা পরিবেশক চাই

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের পরিবেশক বা এজেন্ট চাই। সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে ২০% কমিশন দেওয়া হবে। পর্যালোচনা যোগাযোগের ঠিকানা একই — বি ডি ৪৯৪, সেন্ট লেক, কলকাতা ৬৪।

টেলিফোনে যোগাযোগ, সকাল ৩ সন্ধ্যায়

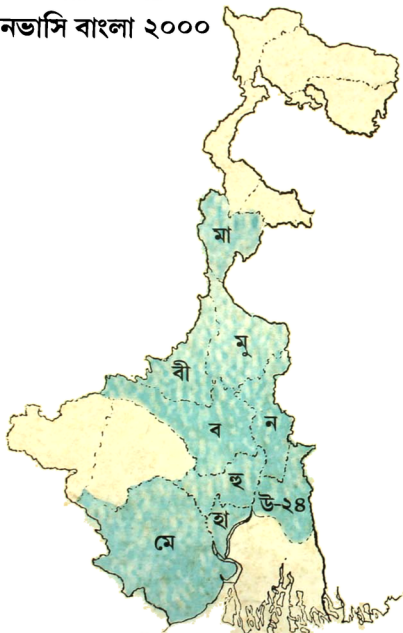
৩৩৪ ০৯০৪

৪৬৬ ২৪০৫

৩৩৭ ৩০২০

৩৪৩ ৪১২৫

বানভাসি বাংলা ২০০০



সচিব, 'উৎস মানুষ সোসাইটি' কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সেন্ট লেক, কলিকাতা ৭০০ ০৬৪ ইইতে প্রকাশিত এবং
 'শৈলী', ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা ৫৪ ইইতে মুদ্রিত।

We are thankful to CSIR, Govt. of India, for partial financial support in publishing this journal.



Carl
H. J. J. J.

- রোকেয়া • হেমন্তবালা
- এক নারীর যৌন হেনস্থা এবং মহাশ্বেতা-রিপোর্ট •
- কম্পিউটারে কুস্তমান • ভূমিকম্প এবং তারপর
- ডন ব্র্যাডম্যান এক মূল্যবোধের নাম •

সূচিপত্র

শৌন হেনহায় আইন	সুজিত কুমার দাস	৩৮
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	গোপা দত্তভৌমিক	৪৪
হেমন্তবালা : অনন্য নারী	অলকরঞ্জন বসুটৌধুরী	৪৮
ব্রাডম্যানের মৃত্যু	আশীষ লাহিড়ী	৫৪
কম্পিউটারে কল্পজ্ঞান	তবানীপ্রসাদ সান্ন	৫৫
বিজ্ঞান অন্বেষণ (পর্ব ৬)	সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়	৫৭
ভোট-ছড়া	চার্ভাকানন্দ	৬০
বিজ্ঞান মর্শন (পর্ব ১৮)	বাসুদেব মুখোপাধ্যায়	৬১
কেরোসিন অপচয়	জয়ন্ত দাশ	৬৩
ভুক্ত ভূমিকম্প	তবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৬৪
চেনা বিষয়, অচেনা জগৎ	সমীরকুমার ঘোষ	৬৭
পুস্তক পরিচিতি	মিত্রা রায়, অ. ব.	৬৯
প্রাপ্তি সংবাদ		৭০
চিঠিপত্র		৭১
সংগঠন সংবাদ		৭২

সম্পাদকীয়

উড়িষ্যা সুপার-সাইক্লোন, পশ্চিমবঙ্গে বন্যা, বিহারে অনাহার আর রক্তপাত, ঢাকায় ভূমিকম্প। দেশের কাৎসরিক চমকিত এরকমই বৈচিত্র্যময়। আমরা যারা নিরাপদ দূরত্বে থেকে কিঞ্চে দুঃখিত হই, কিছু ত্রাণদান দিয়ে বিবেক-ভূপ্ত হই, তারা বুঝতে পারি না এই সর্বনাশা বিপর্যয়গুলির পরিণাম: কত মর্মান্তিক, কত সুদূরপ্রসারী। সহানুভূতি এখনো সমাজ থেকে বিসৃপ্ত হয়নি, মনুষ্যত্ব এখনো কিছু আছে — এটা আশার লক্ষণ। কিন্তু সে-ও যেন বড় ক্ষীণজীবী। নিশ্চয়িত খুব দ্রুত সব অপহরণ করে নিয়ে যায়। এটা বাস্তব; তবে আরো প্রত্যক্ষ ক্রোধান্ত বাস্তব হল নিঃশ্ব, অসহায়, আর্ত মানুষগুলিকে নিয়ে রাজনীতি— মনুষ্যত্বহীনতার কদর্য রূপ। বিপন্ন ছিন্নিভিন্ন জনগণকে মূলধন করে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির হিসেব কষা আমরা দীর্ঘদিন ধরেই দেখে আসছি। এবারে এই কুটিল পদ্ধতি যেন আরো বেশি কৌশলী, আরো হিসেবি। কেননা সামনেই ভোট। আর কে না জানে ভোট কুড়ানোর জন্য যে-কোনো অপকৌশল অবলম্বন করা যায়! ঝড়-বন্যা-ভূকম্পনে সব-হারানো মানুষদের সহায়তা, ত্রাণ, পুনর্বাসন নিয়ে অনেক পরিকল্পনা আর প্রতিশ্রুতি শোনা যাচ্ছে। সবই উপলক্ষ, আসল লক্ষ্য হল ভোট।

কলেজ স্ট্রিট অফলে আগের কার্যসমিটি থেকে হানচুট ইওয়াং ফলে আমরা নিজেরা তো প্রতিগ্রস্ত হচ্ছিই, কথ আগ্রহী নিয়মিত গ্রাহক-পাঠকদেরও প্রবল অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। নতুন ঘর জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অসহায়। আমরা দুঃখিত।

উৎস মানুষ

ISSN 0971 - 5800

বি ডি ৪৯৪, সপ্টলেক, কলকাতা ৬৪
BD 494, Salt Lake, Calcutta 64

মসল, বৃহস্পতি, শনি / ১২টা - ২টা.

১০, কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা (নিবারণ সাহা'র ঘর)

অস্থায়ী কার্যালয় : শ্রাবণী আবাসন,

এস ৬/২ সপ্ট লেক, কলকাতা ৯১

ফোন : ৩৩৪-০২০৪, ৩৫৮-৬৩৯১

(সকালে ও সন্ধ্যার পর)

যৌন হেনস্থায় আইন পুরুষতন্ত্রই বিচারক

সুজিত কুমার দাস

ধর্ষণ ছাড়াও পুরুষের হাতে হাজার রকমের যৌন হেনস্থার শিকার হয় নারী। যৌন হেনস্তা কোথায় হয়? নিজের ঘরে হয়, বাইরে পথে ঘাটে হয়, ট্রামে বাসে, ঘাটে বাজারে, অফিস কাছাবিড়ে, দুলে কলেজে, মন্দিরে মসজিদে, এমনকী হাসপাতালে ভর্তি রোগীর ওশর হয়। প্রকটা ঠিক হতো — যৌন হেনস্থা কোথায় হয় না? যৌন আক্রমণকারী পুরুষের প্রথম পছন্দ হয়তো অজববদী মেয়ে কিন্তু সতি কলতে কি, ভয়লোক ছোটলোক কোনো পুরুষই এই ক্ষেত্রে নারীর বয়স নিয়ে বুঝে একটা বাছ বিচার করে না; খবরের কাগজ পড়লেই ডা চোখে পড়বে। কোনো নারীই যৌন হেনস্থা থেকে অনাক্রম্য নয়। মহারাষ্ট্রের এক মন্ত্রী কর্তৃক বিমানের ভিতরে প্রকাশ্যে বিমানসেবিকার উপর যৌন নিগ্রহের মতো অনেক কাহিনী হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন কিন্তু উচ্চ ক্রেনীর পুরুষ সমাজের হিরো পুলিশ কে পি এস গিল-কর্তৃক আক্রান্ত নারী আই-এ-এস অফিসার রূপন দেওল বাজাজ-এর মামলা নিশ্চয়ই এখনই ভুলে যান নি। পুরুষের এই যৌন হিংস্রতা সর্বভূমীন, দেশ কাল জাতি বর্ণ উচ্চ নিম্ন কোন পার্থক্যই মানে না। আমেরিকার একটি কাহিনী মনে করিয়ে দিই। ১৯৯১ সালে ক্লারেন্স টমাস সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে মনোনীত

হওয়ার পরেই ওকহামনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনবিদ্যার প্রফেসর আনিটা হিল প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে অভিযোগ করলেন যে তিনি যখন ক্লারেন্স-এর অধীনে চাকুরি করতেন তখন দু'বছর ধরে একনাগাড়ে ক্লারেন্সের যৌন আক্রমণে নিপুণীত হয়েছিলেন। এতে হৈ হে পড়ে এক তখন নানা তুরের নারী আনিটার সঙ্গে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে ডানের নিজস্বের নিগ্রহের কাহিনী ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট রেগান-এর স্ত্রী ন্যাশি রেগান জানালেন তাঁকেও যৌন নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল। পুরুষের যৌন আক্রমণ থেকে যে সব নারী নিত্যর পায় তারা বৈধ যায় শুধু সুযোগের অভাবে।

এদেশেও কাগজের খবর হওয়ার আগে থেকেই লোকের এই কাহিনী জানত কিন্তু এ নিয়ে কথাবার্তা নির্বিধি বলে ধরে নেওয়া হত। চুপ করে থাকার প্রধান কারণ সবাই জানে। যৌন হেনস্থার কথা জানাঘনি হয়ে গেলে নারীর নিগ্রহ আরো বেড়ে যাবে এবং সামাজিক দৃষ্টিতে 'দাগী' হয়ে থাকবে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে নারীমুক্তির ধাককা সত্ত্বেও একটি আর্থ চেতনা জাগার ফলে মেয়েরা নানা বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে ও প্রতিকারের উদ্যোগ নিচ্ছে এবং তার ফলে নানা ক্ষেত্রে অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। নারী

‘হাল ছেড়ো না বন্ধু
বরং কষ্ট ছাড়ো জোরে
দেখা হবে তোমায় আমায়
অন্য গানের ভোরে’

নির্যাতনের অপরাধটি আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেকদিন আগেই। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ নারী বৈষম্যের প্রতিকার করে 'নারীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্য বিবয়ে সনদ' গ্রহণ ও ঘোষণা করে। কিন্তু চাকরি ক্ষেত্রেও ও বাড়তি হেনস্থার ভয়ে এসেদের নারীকর্মী প্রতিকারের উদ্যোগে এগিয়ে আসে নি। যে দু'চার জন সাহস করে প্রতিবাদ করে তাদেরও সুবিচার কেটে না। এ বিষয়ে ১৯৯৭ সালে 'কিশাখা ও অন্যান্য কন্যা রাজস্থান রাজ্য' ও 'অন্যান্য' মামলাটির রায়ে ভারতের সূপ্রিম কোর্ট যা বলেছে তা একটু বিশদভাবেই জানানো সরকার :—

যৌন হেনস্থার মতো অপরাধটি সবিধানের ১৪, ১৫, ২১ ও ১৯(১) (ডি) ধারা সমূহে অস্বত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করে এবং আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। ভারত সরকার এই সমস্যার প্রতিকারকভাবে অস্বীকারবদ্ধ। ১৯৯৩ সালে সরকার উল্লিখিত রাষ্ট্রসংঘের সনদটি অনুমোদন করেছে এবং ১৯৯৯ সালে বেজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে ঘোষণা করেছে যে এই অপরাধের প্রতিকার কর্তৃক সর্বকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কার্যকর আইনকানুন নেই। তাই সাংবিধানিক কর্তব্য পালনের ডাঙিমে সূপ্রিম কোর্ট কর্মক্ষেত্রে নারীর বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মোকাদ্দমা করার উদ্দেশ্যে একটি নিম্নলিখিত কর্তব্য-বিধি জারি করছে এবং এই নির্দেশকে বৈধ আইনের সমতুল হিসেবে গণ্য করা হবে।

এক. ওপরওলাব কর্তব্য : কর্মস্থল বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে যৌন হেনস্থা নিরোধ এবং ঘটলে তার যীমাংসা, মোকাদ্দমা বা শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার পদক্ষেপ নেওয়া নিরোধকর্তা বা অন্য ডারগ্রাণ্ড ওপরওলা ব্যক্তির কর্তব্য।

দুই. যৌন হেনস্থা কাকে বলে? যে কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অব্যাহিত যৌন অবমাননামূলক আচরণ, যথা —

- ক. গায়ে হাত নেওয়া বা গায়ে পড়া ও হামলে পড়া
- খ. কুপ্রস্তাব
- গ. নারীর যৌন অবমাননামূলক মন্তব্য
- ঘ. অশ্লীল ছবি, বই, পোস্টার প্রভৃতি দেখানো
- ঙ. এ ছাড়াও অন্যান্য ধরনের অব্যাহিত শারীরিক, মৌখিক বা অঙ্গভঙ্গীসহ যৌন ইস্তিমূলক আচরণ
- চ. সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে বেতনভোগী বা ভাত্যভোগী বা অবৈতনিক কর্মীর উপর যৌন হেনস্থা যদি

স্বাভাবিক ঘটায়, যদি সে নিরাপত্তাহানির আশংকায় ভোগে, যদি ভয় হয় প্রতিবাদ করলে চাকরি খোয়াতে হবে, চাকরি করা দুঃসাধ্য হবে, হেনস্থাকারীর কথা না মানলে ক্ষতি হবে।

তিন. নিরোধক পদক্ষেপ : সরকারি/বেসরকারি ক্ষেত্রে নিরোধকর্তা বা অন্য ওপরওলা কর্তৃক যৌন হেনস্থা নিরোধের উদ্দেশ্যে —

ক. কর্মস্থলে যৌন হেনস্থা অনায়াস কাল — এই মর্মে কর্মক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র জারি ও ঠিকঠাক প্রচার করতে হবে।

খ. সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের অচরণবিধিতে যৌন হেনস্থার মতো দুভর্মের বিষয়টি চোকাতে হবে এবং হেনস্থাকারীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হবে।

গ. ইন্সটিটিউশন এমপ্লয়মেন্ট (স্ট্যান্ডিং অর্ডারস) অ্যাক্ট, ১৯৪৬-এর নির্দেশ অনুযায়ী বেসরকারি মালিকরাও তাদের প্রতিষ্ঠানে যৌন হেনস্থা বন্ধ করার জন্য এরকম পদক্ষেপ নেবে।

ঘ. কর্মস্থলে কাজ করা, বিশ্রাম করা, স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির জন্য এখন ব্যবস্থা ও আয়োজন করতে হবে যাতে নারীকর্মীদের পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতি না হয় এবং কোনো নারীকর্মীর পক্ষে যেন মনে না হয় যে সে প্রতিকূলতার শিকার হচ্ছে।

চার. সরকারমতো হেনস্থাকারীর বিরুদ্ধে যৌতদায়ী অভিযোগ দায়ের করতে হবে, হেনস্থার শিকার ও সাক্ষীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, চাইলে বদলি করে দিতে হবে।

পাঁচ. অভিযোগ পেশ করার একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন করতে হবে। যেখানে অচরণবিধিতে শাস্তির ব্যবস্থা আছে সেখানে শাস্তিদানের উপযুক্ত প্রক্রিয়ার আয়োজন করতে হবে।

ছয়. অভিযোগ কমিটি : ওপরওলাকে একটি অভিযোগ কমিটি গঠন করতে হবে। একজন মহিলা অভিযোগ কমিটির প্রধান হবেন এবং সদস্য বৃন্দের অর্ধেকের বেশি হবেন মহিলা। অসরকারি সংস্থা বা অন্য কোনো সামাজিক সংগঠন থেকে একজন থাকবেন, যিনি যৌন হেনস্থার বিষয়ে ওজস্বিকবাহাল। অভিযোগ ও তদন্তের বিষয়ে গোপনতা রক্ষা করতে হবে।

সাত. এই কর্তব্যবিধি যাতে সবাই ঠিকঠাক মেনে চলে তা দেখার জন্য কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

আট, লিঙ্গসাম্য বজায় রাখা ও নারীকর্মীর অধিকার রক্ষার জন্য সব কর্মক্ষেত্রে এই কর্তব্যবিধি যেন পালন করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর চারিদিকে 'গেল গেল' রব উঠল। পুরুষতন্ত্রের জমট আধিপত্য বহাল থাকে সত্ত্বেও এরকম একটা গারগা দানা বাঁধছিল যে আজকের দিনে অত্যন্ত শব্দে পঙ্কিত মহলে নারীবিশেষ অনেকটা কমছে। কিন্তু সংবাদপত্রে যে সব প্রতিবাদপত্র ও সমালোচনা প্রকাশিত হল তা হতাশাব্যঞ্জক। বার সন্ধ্যারই আশংকা একটি লেখাপড়া শিখে বা চাকরি বাকরি করে, দু'একটা নারীবলী সোপান শিখে মেতেগুলো এমনিতেই ধরাকে সরা জান করছে, খণ্ডরবাড়ির সুখের সংসারগুলিকে উচ্ছ্বসে দিচ্ছে, এখন আদালতের এই উত্থাননিম্নতা নির্দেশের পরে সেই প্রকৃতি বেড়ে যাবে। নারী যে যৌন হেনস্থার শিকার হয়, যৌন হেনস্থার কীর্তিটি যে দুব নোয়া যা যৌন হেনস্থাকারীগণ যে মনুষ্যতন্ত্রের জীব — এসব কথা কেউ উল্লেখও করে নি। কেউ কেউ আশংকা প্রকাশ করেছেন — দু'চার ঘা চড় চাপড়, একটু আধটু গায়ে হাত দেওয়া, একটু আদিরসের ঠাট্টা ইয়ার্কি করা, একটু হাফা সেল্লি রসিকতা ইত্যাদি নিরীহ পরিপাটি তন্ত্রকমোচিত বিনোদনগুলিও যৌন হেনস্থা হিসেবে মেনে দিয়ে সম্মান পুরুষদের কপঙ্কিত করার রাস্তা বুলে দেওয়া হল। এইসব সমালোচকের মনে কিছু নারীর নামও রয়েছে। এটা অকথা জানা যে, অধিকাংশ নারী এখনও পুরুষতন্ত্রের মাল্-মোলাই-এর শিকার বা পুরুষের ডাঙ্গামানুষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল জীবন বাপন করে এবং তাই পুরুষতন্ত্রের সমর্থন কো বটেই, বহুক্ষেত্রে নারী নিজেই পুরুষতন্ত্রের নারী নির্মাতাদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এবং সেই কাজগুলি নজির হিসেবে তুলে ধরে পুরুষসমাজ (যার মধ্যে পণ্ডিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীও আছেন) এক গাল হেসে নিজস্বের নির্দেশ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। তাই একথা বিবেচনার গভীর মধ্যে থাকা উচিত যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আইন হিসেবে গণ্য হলেও তাকে কলকল্প করার পথে অনেক দুজাধ বাধার মুখোমুখি হতে হবে।

সম্প্রতি কলকাতার একটি ঘটনা দেখির দিয়েছে প্রতিকারের পথ কত সমস্যাসংকুল। ডা জানানোর জন্যই এত কথার অবতারণা।

সীমাল বুক স্টোর-এর নাম হয়তো শুনেছেন। সাম্প্রতিক কালে নারীমুক্তি ও মহিলা লেখকদের নিয়ে প্রকাশনা ও অনুষ্ঠান করে প্রগতিশীল ও এলিট মহলে একই নাম কিনেছে। গার্লস্ চক্রবর্তী স্পিডাকবুত মহাশেখতা মেবীর গল্পের ইংরেজি অনুবাদ সীমাল প্রকাশ করে ইংরেজিভাষী জনগতে মাথোঁতা

মেবীর পরিচয় তুলে ধরেছে। এতে অনেক বাঙালি বেশ কুশি যে সাহেবরা জানল আমাদেরও এমন উদ্ভবের নারী সাহিত্যিক আছেন। এরকম এক অনুবাদই তো একদিন রবি ঠাকুরকে নোবেল প্রাইজ এনে দিয়েছিল।

এছেন সীমাল বুক স্টোর-এর এক পুরুষ ম্যানেজিং ডিরেক্টর তখন চ্যাটার্জি প্রতিষ্ঠানেরই এক নারী কর্মীকে ক্রমাগত একনাগাড়ে যৌন হেনস্থা করে। মেয়েটির নাম বরুন, অপরাধিনী। চাকরির দায়ে মেয়েটি ভানাজনি না করে এড়িয়ে যাওয়াত অনেক চেষ্টা করে কিন্তু পক্ষে ক্রমাগত আক্রমণ অসহ্য হয়ে পাড়ায়। তখন সে মিল্ক নবীন শিল্পোত্তরের কাছে অভিযোগ করে, কিন্তু কিছুই হয় না। পরে আরো কর্মঘণ্টা খটে, অপরাধিনীর উপর বলপ্রয়োগ করা হয় এবং সে তখন আবার গৃহভাষে মালিকের কাছে অভিযোগ জানায়। তখন মেয়েটিকে ডেকে মালিকপক্ষ বলে যে তার চাকরি সত্যম। অপরাধিনী যদি পদত্যাগ করে তাহলে তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না কিন্তু তা না হলে তাকে এমনভাবে বরখাস্ত করা হবে যে ভবিষ্যতে আর কোথাও চাকরি পাওয়া তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়াবে। অপরাধিনী বাধ্য হয়ে রেতিমেড পদত্যাগপত্রে সই করে। তারপর যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে এবং অন্যায়ভাবে চাকরি যাওয়ার বিরুদ্ধে দাবিভিত্তিক অভিযোগ পেশ করে। সীমাল তখন এক নিরপেক্ষ মহিলাকে প্রধান নিযুক্ত করে একটি অভিযোগ কমিটি গঠন করে দেয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই অজ্ঞাত কারণে সেই কমিটি পদত্যাগ করে। তখন সীমাল প্রগতিশীল ও নারীবাদী সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত মহাশেখতা মেবীকে চেয়ারপারসন করে এবং আইনজীবী গীতানাত গাঙ্গুলি (যার নাম মাঝে মাঝে কাগজে দেখে থাকবেন) ও অন্য এক মহিলাকে সদস্য করে আর একটি অভিযোগ কমিটি গঠন করে। এই কমিটির রিপোর্টই এই ঘটনার মুগা বিষয়।

কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে যৌন হেনস্থার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে নি। অপরাধিনী তার অভিযোগ চিকিৎসা প্রমাণ করতে পারেন নি। এখানে কমিটির পুরো রিপোর্টটি তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। বিশ্লেষণের জন্য বৈটুক মরকার তার উল্লেখ করা হবে।

যাত্রা কোনো তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেখেছেন তারা জানেন, রিপোর্টে কী কী থাকে। থাকে কে ও কেন কমিটি গঠন করেছে, কমিটির কী কর্তব্য, সদস্যদের পরিচয়, কমিটির কর্তব্যের কনি, কর্মপদ্ধতি, অনুসৃত কর্মপ্রণালী ইত্যাদি। এরপর থাকে সাক্ষী, দলিল ও সংগৃহীত তথ্যের বিবরণ। সবার সাক্ষ্য পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে সাক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিবরণ আদালত করে পরিশিষ্টে ছাড়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাক্ষ্যের যেসব অংশ ও তথ্য সিদ্ধান্ত তৈরি

করতে কাজে লাগানো হয় তার বহু বিবরণ (পক্ষে ও বিপক্ষে উভয়ই) রিপোর্ট খাটাকি আবশ্যিক। এইসব কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে মহাশ্বেতা দেবী কমিটির রিপোর্টটি অকেজো, কাজে লাগজের বৃত্তিতে ফেলে দেওয়ার মতো।

রিপোর্টটি পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে ওটি মহাশ্বেতা দেবী লেখেন নি। যদি মহাশ্বেতা দেবী একলা অস্বীকার করেন তাহলে তাঁকে জেরা করতে মিলে কথাটির সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। তবে মহাশ্বেতা দেবীর পক্ষে একথা অস্বীকার করা মুশকিল যে সীগাল-এর সঙ্গে তাঁর নিজের আর্থিক লাভের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এক্ষেত্রে সীগাল-এর এই কমিটির দায়িত্ব তাঁর পক্ষে প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল। অপরজিতার অভিযোগে তপনের সঙ্গে সীগালও অভিযুক্ত এবং সীগাল তপনের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। এভাবে মহাশ্বেতা দেবী সীগাল-এর কাজ থেকে সুবিধাভোগী, অর্থলাভ করেন, এবং তাই তাঁর পক্ষে অভিযুক্ত সীগাল-এর নিরপেক্ষ বিচার করা সম্ভব নয়। একথা সবাই বোঝে, আর তাই ধরে নেওয়া যায় মহাশ্বেতা দেবীও বোঝেন। এতো প্রায়ই দেখা যায় এই ধরনের সম্পর্কের জেরে বিচারক মামলা অন্য একলাসে বলি করে দেন, নিজের আত্মীয় পরীক্ষার্থী হলে পরীক্ষক নিজেকে সরিয়ে নেন। এটা নৈতিকতার দায়, এই নৈতিকতাহীনু না থাকলে বিধানসভাঘাতও থাকে না। কমিটির প্রধান হিসেবে মহাশ্বেতা দেবী সীগাল-এর মালিককে নিরপরাধ ঘোষণা করে বেআইনি কিছু করেন নি বটে কিন্তু কাজটি অনৈতিক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আর তিনি যে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি রিপোর্টই ডা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছে।

রিপোর্টটি পড়লে প্রথমেই মনে হবে আগাশপতলা অভিযুক্তের পক্ষে আগাশপক সমর্থনের একটি সওয়াল করা হয়েছে। জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে বৌন হেনস্কার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। বৌন হেনস্কার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়ারই কথা। একমাত্র অপ্রকৃতিস্থ পুঙ্খ হ্যাডা আর কেউই সাক্ষী রেখে বা অকটা দিলি দত্তাবেক তৈরি করে বৌন হেনস্কার করতে বাবে না। তাই বৌন হেনস্কার ক্ষেত্রে পরোক্ষ প্রমাণই বিবেচ্য। কমিটির সদস্যরা একথা না বুঝলে তাদের সদস্য হওয়াই উচিত হয় নি।

সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার হল চাকরি হারানোর অভিযোগটি কমিটি বিবেচনা করতেই অস্বীকার করেছে, যদিও এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বেশ স্পষ্ট। বিবেচনা করুন — যদি বৌন হেনস্কার অভিযোগটি মিথ্যাও হয় সেক্ষেত্রে এই ঘটনার নড়চড় নেই যে শুধু হেনস্কার অভিযোগ করার জন্যই অপরাধীতা চাকরি খুঁয়েছে; এখানে অভিযোগটি সত্যি না

মিথো সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। এই পার্থক্যটুকু বোঝার জন্য সাহিত্যিক বা আইনজীবী হওয়ার দরকার নেই। আবার দেখুন, সীগাল আগে চাকরি চেয়েছে তারপর তদন্তের জন্য অভিযোগ কমিটি পঠন করেছে। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা হয় নি। তাই মনে হয় কমিটি পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করেছে।

এছাড়া কয়েকটি বিষয় নজরে আনা দরকার।

ক. অভিযোগকারীকে উকিল বা অন্য কোনো ওয়াকিবহাল ব্যক্তির সাহায্য নিতে দেওয়া হয় নি।

খ. অভিযোগকারীকে অন্য সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নি।

গ. মালিকের সাক্ষাই নেওয়া হয় নি যদিও তিনি অভিযুক্ত।

ঘ. অভিযোগকারীর সাক্ষার মাত্র কয়েকটি টুকরো প্রশ্নের উত্তর করা হয়েছে যেগুলি কমিটি মিথ্যা বলে মনে করেছে। অন্যদিকের কারো সাক্ষার বিবরণ বা বিশ্লেষণ করা হয় নি, অভিযুক্তেরও নয়।

শুধু মাত্র এই কয়েকটি গাফিলতির জন্যই কমিটিকে ফেল করিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আরো আছে।

এক রিপোর্ট কলছে : '৯৯ সালের বইমেলাতে তপন অপরাধীতাকে নোরা ইস্টনিপূর্ণ কথা বলে ও হোটেল রাত কাটাবার কুশলতা দেয় — অপরাধীতার এই অভিযোগ বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তপন বলেছে যে আসলে সে তখন কোনো এক উৎসব উপলক্ষে সমস্ত কর্মীদের মহাফতোভাৎ খাওয়ানোর কথা বলেছিল এবং অপরাধীতা সেটাই ভুল বুঝেছিল।

অপরাধীতার মাথায় গোবর আছে তাই সে ভুল বুঝেছিল কিন্তু কমিটির মাথায় তো নেই। আচ্ছা ধরে মিল আগনিও মহাশ্বেতা দেবীর মতো আগে থেকেই বিশ্বাস করেন যে তপন সদা সত্য কথা বলে এবং অপরাধীতা সদা মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু সমস্ত কর্মীকে ভোজ খাওয়ানোর প্রস্তাব নিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তপন সামান্য এক বিক্রয়কর্মী অপরাধীতার সঙ্গে ঝঁটোলোয় আলোচনা করা দরকার মনে করল কেন? আরো অন্য কোনো নিম্নস্তরের বা পদস্থ কর্মীর সঙ্গে এ নিয়ে কি সে আলোচনা করেছিল? করে থাকলে, তাঁরা কারা? তাদের কেন জেরা করা হল না? মহাশ্বেতা দেবী এরকম অনেক প্রশ্ন করতে পারতেন যাতে হয়তো তপনের অবিবাস্য কথা অবিশ্বাস্য হিসেবে ধরা পড়ত। কিন্তু মনে হয় তিনি তপনকে অভিযুক্ত হিসেবে দেখেন নি, দেখেছেন মজল হিসেবে। তাই তপনের আঘাতে গল্প বিশ্বাস করতে বিবেকে আটকায় নি, বুদ্ধিতেও আটকায় নি।

দুই, রিপোর্টের বিরুদ্ধে অন্তরাধিকার অভিযোগ থাকবে যে '৯৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর তখন হতে পাণ্টেব বোতাম খুলে দেখিয়ে তাকে দেখানো হাত দিতে বলে কিন্তু সাফো বলেছে যে তখন পাণ্টের বোতাম খুলে তাকে দেখিয়ে ইমিত করবে। এটা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য। সুতরাং অপরাধিতার অভিযোগ মিথ্যা।

আপনি কি উপরেব দুটি বক্তব্যের পরস্পর বিরোধিতা বুঝে পেলেন? পেলেন না? আচ্ছা এক সাহিত্যিক ও এক আইনজীবীকে দেখান হো! কী বললেন? উত্তরও বুঝে পাচ্ছেন না? কিন্তু মহাশেষটা দেবীরা বুঝে পেরেছেন।

তিন, রিপোর্টে লেখা হয়েছে: অপরাধিতা একবার বলেছে যে বইমেলায় সে একাধিকবার তপনের বৌন হেনস্থার শিকার হয়েছে কিন্তু পরে এক প্রহর উত্তরে বলেছে, 'না ... বইমেলায় স্টলের ভিতরে নয়।' এটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। অতএব অপরাধিতার অভিযোগ মিথ্যা।

এর মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা কোথায়? দুটো হো একই কথা। বইমেলায় শুধু স্টল থাকে না, স্টলের বাইরে অনেক বেশি জায়গা থাকে — এ হো নাবালককে জানে। শুধু মহাশেষটা দেবীরা জানেন না? এবং স্টলের বাইরের জায়গাটিকেও বইমেলাই বলে।

চার, রিপোর্টের বক্তব্য: অপরাধিতা অভিযোগ করেছে যে ১৬ ডিসেম্বর সে আত্মরক্ষার্থে পতিভক্তীকে সঙ্গে নিয়ে সাটিফিকেট আনতে তপনের কাছে যায় কিন্তু তপন পতিভক্তীকে পান কিনতে বাইরে পাঠিয়ে দেয় এবং তারপর একা অপরাধিতার ওপর কর্তব্য বৌন আক্রমণ (কর্ণা উগ্রজ্ঞ) করে। কিন্তু পতিভক্তী বলেছে যে, অপরাধিতা কখনই তার সঙ্গে ওপরতলার তপনের কাছে যেতে অনুরোধ করে নি এবং (পাঠিকা, একটু মনোযোগ দিন!) তপনও তাকে কোনো পান আনতে পাঠায় নি। সুতরাং অপরাধিতার কথা যে মিথ্যা তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

মাননীয় ধর্মাবতার! আপনিই বলুন, অপরাধিতা যদি তার সঙ্গে তপনের কাছে যাওয়ার অনুরোধ না করে থাকে, যদি সে ওপরে তপনের কাছে না গিয়ে থাকে তাহলে তাকে পান আনতে পাঠানোর কথা পতিভক্তীর আবার অস্বীকার করার দরকার হল কেন? কিন্তু মহাশেষটা দেবী পতিভক্তীকে এ প্রশ্নটি করেন নি। অপরাধিতাকেও পতিভক্তীকে জেরা করার সুযোগ দেওয়া হয় নি। এরকম অসঙ্গতির বা অবান্তর কথা বলে তারাই যাদের দেখানো কথা বলতে হয়; জেরা করলে আরশই ধরে ফেলা যায়। যে শিথিয়ে গিরেছিল তার বুদ্ধিও, সম্বোধন হয়, কমিটিরই মতো। কারা 'সাধামিক পাশ করিনি' একথা বলার

পর 'উচ্চ সাধামিকতাও পাশ করিনি' আর বলাব বলতার হয় না — একথা পতিভক্তীর শিষ্যদের মাথায় আসে নি, তাই শেখায় নি। সীপাল-এর নিশ্চয়ত্বের কর্মী পতিভক্তীকে চাকরি খোঁজানোর ভয়ে দেখানো মিথ্যা কথা বলতে হতে পারে — এ সম্ভাবনা মহাশেষটা দেবীকে মনে করিয়ে দিতে কেউ হাজির ছিল না।

পাঁচ, রিপোর্টে বলা হয়েছে: চাকরি খোঁজানোর আগে অপরাধিতা একাধিকবার যৌনিক অভিযোগ জানিয়েছে — কমিটির মধ্যে অপরাধিতার এই বক্তব্য সত্যি নয়।

অথচ রিপোর্টেই কমিটি স্বীকার করেছে যে অপরাধিতার যৌনিক অভিযোগের প্রতিকার করার জন্য সীপাল-এর কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য করেছে। এমন কী অপরাধিতার কাছে মালিকের একটি চিরিতেও যৌনিক অভিযোগের স্বীকৃতি আছে।

সত্যি বলতে কী, রিপোর্টটি বোকা-বোকা লেখা হয়েছে। ক্রমাগত অপরাধিতার ঘোষ ধরতে গিয়ে এমন সব ছেলেমানুষী ও হাস্যাকর বুদ্ধিভর্যের অবতারণা করা হয়েছে তা আলোচনা করতে গেলে মিছামিছি পাতা নষ্ট হবে। একগোছা প্রশ্ন রাখা হয়েছে কিন্তু প্রশ্নগুলি কাকে উদ্দেশ করে তা বঙ্গা হয় নি। এই প্রশ্নগুলিই কেন যে মহাশেষটা দেবীরা তদন্তকারে সঙ্গতি কতিপয়ের করেন নি তা রহস্যময়। অথচ কমিটি তদন্তের এভিয়ারের বাইরের বিধার নিয়ে অনাবশ্যক মাথা ঘামিয়েছে এবং অকসেতা সুপারিশ করেছে। শুনে নিন সেটা। তপন চ্যাটার্জির কর্তব্যে অবহেলার একটি নমির আবিষ্কার করে কমিটি মালিকের কাছে তপনের শাস্তির সুপারিশ করেছে। এখানে কমিটি চালাকি প্রয়োগ করে বলতে চেষ্টা করেছে — দেখ, আমরা কত নিরপেক্ষ, আমরা তপনকেও ছেড়ে কথা বলিনি। বেকসই যায়, কমিটি মনে করে যারা রিপোর্টটি পড়বে তাদের বুদ্ধি কমিটিরই মতো। পদ্যবনতি, প্রামোশন অটকাসো, চাকরি বাওয়া, কর্মক্ষেত্রে বাধাসৃষ্টি করা প্রভৃতি সুধিম কোর্টের নির্দেশনামূলকী বৌন হেনস্থার এভিয়ারের পড়ে। মহাশেষটা দেবী চাকরি খোঁজানোর বিচার করতেনই অস্বীকার করেছেন কিন্তু নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা ঘেঁষিয়ে তপনের ভুল সাটিফিকেটেই সই করার একটি ঘটনার বিচার করেছেন সুধিম কোর্টের উপর টোকা দিয়ে।

ক'দিন আগে মুখাই-এর এক ব্যাচনামা সাপ্তাহিকের এক রচনার লেখা হয়েছে যে মহাশেষটা বিরম্বী রাজনীতি করেন। মহাশেষটা দেবী সম্পর্কে এই ধরনের এখানে অনেকটাই ভুল। না। এ প্রশ্নে একটা কথা বলে নিয়ে পরিণতি ও তর্কবাদের কথা ভুলতে হবে। কর্মক্ষেত্রে বৌন হেনস্থার অসংখ্য ঘটনা ঘটছে, সমাজের নিচুতলার বোধহয় সবকয়েক বেশি ঘটে তবু মেয়েরা

কেন যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় না, অভিযোগ করে না, থানা পুলিশ করে না তার একাধিক কারণ আছে। সামাজিক কলঙ্ক, প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনদের অপমান, চাকরি খোয়ানোর ভয়, কিংবদন্তির নামে হয়রানি ও আরো হেনস্থা, অবশেষে অবিচার জোটা প্রভৃতি। যেহেতুও তার বাবা মা স্বামীর উপর ভাল বোধ ব্যাপারটা হুমকি করে নিতে। এখন অপরাধিতার বাবা মা স্বামীর কড়া নির্দেশ যে ওকে আর কোনদিন চাকরি করতে হবে না, থানা পুলিশ মামলা করার দরকার নেই। ধর্মিত/অপহৃত মেয়ে বউ ঘিরে গৃহে স্থান পায় না — এরকম হাজার হাজার ঘটনা আগে ঘটত, এখনও ঘটত। যৌনকর্মীদের এক বিরাট অংশের এই ইতিহাস। গল্পে উপন্যাসে নাটকে চলচ্চিত্রে এ কাহিনী অনেক পুরনো হয়ে গেছে। এসব কথা মহাশেষতা দেবী জানেন না? এর মধ্যেও আবার যে দু'একজন মন্ত্রী হয়ে অভিযোগ জানায় তাদের কত বাধা অতিক্রম করে নিতে হয়, কত কী ভেবে চিন্তে তবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তা সবাই বোঝে শুধু মহাশেষতা দেবীরা না বোঝার ভান করেছেন। অপরাধিতা অনেক টানাপোড়েন পার হয়ে, অনেক খোঁজাখুঁজি করে, একটি সহানুভূতিশীল নারী সংগঠনের সাহায্য নিয়ে লিখিত অভিযোগপত্র পেশ করে। তার আগে একাধিকবার মৌখিক অভিযোগ করার ফলে চাকরি খোয়ালে বাধা হয়েছে। সামাজিক বাধা অতিক্রমের এই সংগ্রামী সাহসের জন্য তাকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু মহাশেষতা দেবীরা তদন্তকালে অপরাধিতাকে অপরাধীর কাণ্ডগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। গীতানাহ বাবু মন্ত্রী প্রশ্ন করে তাকে দিয়ে দিয়েছেন। তারপর কমিটি অভিমান জানিয়েছে যে অপরাধিতা ২২ সেরি করে (চাকরি খোয়ানোর দুই মাস পরে) লিখিত অভিযোগ করেছে যে তার কথা কিম্বদন্তি নয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আগেই অভিযোগ কমিটি গঠন করা হয় নি। কারণ তদন্ত না করেই চাকরি বাওয়া হল প্রভৃতি সীমান এর কীটিলি কমিটি বিনা বিচারে ক্ষমা করে দিয়েছে। এদেশে বিশপাটকে গড়াপড়া ২২৭ প্রায় কীইবা করা যায়।

কিন্তু গড়াপেটা রিপোর্ট সংগঠন অপরাধিতা হাল ছাড়েনি, সংস্কারকারী নারী সংগঠনটি আরো অন্যান্য অনেক সামাজিক সংগঠনের সাহায্য চেয়েছে ও পরেছে। ফলে মিনের পর দিন প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশ চলেছে থাকে ও বাড়তে থাকে। এটারে আঘাতে সীমান-এর তৎকালকালীন সুনামে চিড় খায়। প্রকাশের বাধা হয়ে সীমান ৬০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও পুস্তক প্রকাশ করে পর দিয়ে রেহাই কিনে নেয়। এর মধ্যে অনেক টানাপোড়েন ছিল। কলকাতার বুড়ীজীবী মহলকে বন্ধিয়ে দেখা দেয় এক বড় অংশ সীমান-এর সমর্থক। এক মহিলা সাংসদ-প্রধাপক কোনো তদন্ত না করেই ডুড়ি ঘেরে উড়িয়ে দিলেন

— ‘তখন একাজ করতে পারে আমি বিশ্বাস করি না।’ অথচ তপনের বিরুদ্ধে আগেও যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল। সীমান কীভাবে এরকম আনুগত্য অর্জন করতে পারল তা নিয়ে ওয়াকিবহাল মহলে অনেক কথা শোনা যায় কিন্তু প্রমাণভারে তা বলা যায় না। আপনি অনুমান করে নিন না।

এই অভিভক্ততার আলোকে যৌন হেনস্থার পিকারসের সতর্ক হতে হবে। রাজ্য পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা করে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থাকারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অভিযোগ পেশ করার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন তারা যেন অবশ্যই ওয়াকিবহাল সংগঠন বা ব্যক্তির সাহায্য খুঁজে নেন। একজন সংস্কারকারীর সাহায্য পেলে খুব ভাল হয়। আক্রান্ত নারীর যে পরামর্শ ও সাহায্য দরকার তার মধ্যে থাকবে —

নেওমানি ও টৌজদারি বিচার বিধির মাধ্যমে কী কী প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে।

তদন্ত কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকলে তা পেশ করতে হবে।

সঙ্গে উক্তি নিয়ে যাবার দাবি জানাতে হবে। না-মঞ্জুর হলে একজন সাহায্যকারীর সঙ্গে দাবি করতে হবে। না-মঞ্জুরের কথা কমিটির কাছ থেকে লিখিতভাবে আবার করতে হবে। টেপ রেকর্ডের আয়োজন থাকলে এই প্রয়োজনের রেকর্ড করতে হবে। টেপ-এর কপি চাই।

অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্যের বয়ানের কপি দাবি করতে হবে। নিজ সাক্ষ্যের বয়ানের কপি না পেলে সাক্ষ্যের দলিলে মই করা উচিত হবে না। এইসব দাবি অগ্রাহ্য হলে কমিটিকে পক্ষপাতমূলক ঘোষণা করে সাক্ষ্য নিতে অস্বীকার করাও চলে।

কমিটিতে মাননীয় মহাশেষতা দেবীর মতো প্রগতিশীল ও নারীবাদী হিসেবে খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব থাকলেই বিচার নিরপেক্ষ হবে এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়।

অন্যান্য সাক্ষীদের ভেরা করার অধিকার দাবি করতে হবে। না দিলে তা প্রচলিত বিচার শীড়ির বিরোধী হয়।

এই রচনা মুদ্রাত সেই নারীদের উদ্দেশ্যে যারা এই মুহূর্তে যৌন হেনস্থার আক্রান্ত হচ্ছেন এবং যারা পরে আক্রান্ত হবেন। তবু যেসব পুস্তকরা সেখাটা পড়ে ফেলবেন তারা একটু গমকে দাঁড়িয়ে ভাবুন নিজের শাপ স্বাস্থ্যের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করা কর্তব্য কি না, সংগ্রামরত নারী সংগঠনগুলিকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসা উচিত কি না। কী বললেন? আপনি কর্তব্যও যৌন হেনস্থা করেন নি এবং ভবিষ্যতে করবেনও করবেন না? তাতে কিছু যায় আসে না। যতই হোক আপনি তো পুস্তক। তাই পুস্তকের এই অমিহ, কলকলকল, প্রায় মজাগত পাপের আপনিও অশেষার।

প্রতিষ্ঠান-বিরোধী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

গোপা দত্তজ্যেষ্ঠিক



মনে পড়ছে কাজী আব্দুল ওদুদ বলেছিলেন মিসেস আর এস হোসেন আমাদের সমাজে 'একটি জাতি মানুষ'। 'জাতি' বিশেষণটি লক্ষণীয়। রোকেয়ার এই স্বভাবই বারবার তাঁকে আধমরা সমাজের জড় প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেছে। আমাদের বয় সৌভাগ্যে এই 'ঢেঁলঢালা শিঙাতনু' চির তন্ত্রাঙ্কুরের দেশে এমন দু-একজন মানুষ মাঝে মাঝে দেখা দেন। আমরা অবশ্য চিরাচরিত নিয়ম ও অভ্যাস অনুসারে তাঁদের চলার পথে বাধা-বিঘ্নের জুপ জমিয়ে তুলতে যিচ্ছা করিনা, কিন্তু তাঁদের এমনি অনন্য জীবনীশক্তি যে চতুর্দিকে পৃষ্ঠীভূত কুসংস্কার এবং অন্যান্য আক্রমণকে দলিত করে আপন বুকের পাঁজর ছালিয়ে উঠা একলা পথ চলেন। রোকেয়া এমনি একজন বিরল মানুষ।

আজ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ক্ষেত্রে তসলিমা নাসরিনের প্রোচ্ছল ভূমিকা নিয়ে আমরা সোচ্চার কিন্তু রোকেয়া (জন্ম ১৮৮০, মৃত্যু ১৯৩২) সমকালের তুলনায় যে কতখানি প্রাগ্রসর ছিলেন, কী অপরিমীম সাহসের সঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তার পূর্ণ মূল্যায়ন যেন আজও হয়নি। বয় আলোচিত হলেও 'নবনূরে' প্রকাশিত 'আমাদের অবনতি'র সেই বিখ্যাত ধাক্কা দেওয়া লাইনগুলির উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছিনা, 'আমরা যখনই উন্নতমত্বকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি অমনই সমাজ বলে: 'ঘৃণাও ঘৃণাও, ঐ দেখ নরক।' মনে বিশ্বাস না হইলেও অস্তত আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি। আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থটিকে ইশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ... যেখানে ধর্মের বন্ধন অভিশয় দৃঢ়, সেখানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ—সর্তীদাহ। যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থার আছেন। এ হলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান বৃদ্ধিতে হইবে।'

আব্দুল কাদির সম্পাদিত বেগম রোকেয়া রচনাবলীর সূচনায় মুদ্রিত একটি চিঠির পাণ্ডুলিপি বর্তমান প্রবন্ধ লেখককে সম্পূর্ণ মোহিত করে ফেলেছিল। ১৯২৬ সালের ২ই ডিসেম্বর ব্রিয় খানম সাহেবাকে চিঠিটি লিখছেন 'আপনার বয়ের বাই রোকেয়া বাতুন।' প্রথমেই চোখে পড়ে কীভাবে ভারসাম্য, সুবমা ও ছন্দবোধ নির্ভুল ঘুটে উঠেছে পরিচ্ছন্ন সূঠাম হাতের লেখায়। চিঠিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সুবমা ভারসাম্য উঠে আসছে একটি অসামান্য মনের উৎসতল থেকে। যুক্তিবাদী, কৌতুকবিয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের তেজি অথচ গম্ভীর মধুর সদাঙ্গগ্রন্থ ব্যক্তিস্বর্গ এই ছোট চিঠিটির জলদর্পণে বিবর্তিত হয় :

'মিস্ চৌধুরীর মৃত্যু হওয়ার আপনার সিনিয়র পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, ওনিয়া আমার হাসি পাইল। বাস। এক মিস চৌধুরীর মৃত্যুতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের ট্রেনিং স্কুলটা ধ্বংস হইয়া গেল। গোটা ইংরাজ ঝুজুটটা যে ধ্বংস হয় নাই এজন্য খোদাতালায় শোক করিতে ইচ্ছা করে।'

বিশ্বযুদ্ধের এই সাহসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল ১৩১১ ভাদ্রের নবমীর অর্থাৎ ১৯০৪ সালে। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার এই সূত্র ধরে মনে পড়ছে আর একজন সেবিকার কথা। কয়েক বৎসর পর ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ভাদ্রবর্ষ প্রকাশিত হয়েছিল জ্যোতির্ময়ী সেবীর 'নারীর কথা'। হিন্দু যুগের এই বিধবা কামিনী ও জড়বস্ত্র কাকমনকে এক গোয়ে ফেলে সন্ন্যাসী সৎসঙ্গের মতবাদের বিরোধিতা করে বঙ্গশ্রমীসমের ক্রোধের পাত্র হয়েছিলেন। পাঞ্জির বিবিনিবেধের তালিকা হুড়াত্ত অসম্মানজনক 'স্ট্রী-টেল-মৎস্য-মাসে সজ্ঞাপন নিবেদ' বচনটির প্রতিবাদও ছিল ঐ প্রবন্ধেই।

রোকেয়া ও জ্যোতির্ময়ী এই দুই মনবীর মধ্যে আরো কিছু চিন্তন সাধারণ লক্ষ করা যায়, দুজনেই প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের শানিত প্রতিবাদকে করুনো ঘ্যানটানি করুনো স্বপ্ন কর্ণনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। দুজনের মধ্যেই বেশি অসাম্প্রদায়িক, ভেদবুদ্ধিহীন উদার মনসিকতা। তবে রোকেয়ার প্রতিবাদ সাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর জীবনের নানা কর্মে এমন ভাবে সেবা দিয়েছে যে তাঁর তুলনা মেলা ভার।

ঐতিহ্যপন্থী বনেদী জমিদার বাড়ির মেয়ে রোকেয়ার আত্মজীবন্যের পঞ্চটি স্বভাবভেদই খুব সুগম ছিল না। জীবনীকাররা দেখিয়েছেন যে তাঁর মনে সাহিত্যানুগ, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানবাদী চিন্তাধারার বীজ বুনে সেওয়ার মূলে ছিলেন বড় ডাই ইব্রাহিম সাবের এবং বিনি করিমুন্নেসা। 'মতিচূর' ২য় খণ্ডের উৎসর্গ পত্রে রোকেয়া জানিয়েছেন যে অন্য আত্মীয়গণ উর্দু ও পারসী পড়ায় তত আগ্রহী না করলেও বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দিগির উৎসাহেই রোকেয়ার বাংলা শিক্ষা অগ্রসর হয়। করিমুন্নেসা কোনো নিক থেকেই সাধারণ মহিলা ছিলেন না। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি রোকেয়া উৎসর্গ করেছেন দাদা ইব্রাহিম সাবেরকে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্বরণ করেছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম অনুগ্রহ, 'অপর আত্মীয়স্বজনদেরা আমার শিক্ষার উৎসাহ দান করিবেন ঘুরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিগ্রহ ও উপহাস করিতেন — কিন্তু তবশি আমি পশ্চাৎগম ইই নাই। ভ্রাতাও কাহারও বিগ্রহে ভ্রমোৎপাদি হইত। আমাকে পড়হিতে ক্ষান্ত হন নাই।'

শোল বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল ধৌড় মোজব্বের বিভাবী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। পাত্রের বয়স তখন অন্তত অটত্রিশ। আপাত প্রতিকূল এই অসম বিবাহ থেকেও রোকেয়া তাঁর ব্যক্তিগত বিকাশের উপদান সংগ্রহ করেছেন। সুশিক্ষিত আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন উদারমনা সাখাওয়াত হোসেনের প্রভাব তাঁর কিশোরী বয়স মনোভূমিতে কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা অবশ্য স্বাক্ষরীকরণের অঙ্গোচ্চা

বিষয়। তবে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের নিয়মানুষ্ঠিততা, নিষ্ঠাবাহিতা, শ্রমশীলতা এবং কচিময় জীবনচর্যা রোকেয়াকে অনুপ্রাণিত করেছিল সম্ভব নেই। যুগ্মদাম লামুল আলম হবার অনুমান করেছেন যে রোকেয়ার শুদ্ধ স্বামী ইংরেজি লিখন শৈলীতে তাঁর লিখন স্বাক্ষর প্রভাব ছিল।

যদিও প্রচলিত অর্থে ভবপূর দাম্পত্য সুখ বলতে যা বোঝায় তা রোকেয়ার কপালে একবারেই জ্যোতিন। স্বামী দীর্ঘকাল ধরে দুরারোগ্য অসুখ ভুগে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেছেন। স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতাও প্রকৃত অর্থে উৎপীড়ন করেছেন, সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অন্যান্য আত্মীয় স্বজন। দুবার মা হারিয়েছেন, কিন্তু একটি মেয়ে পাঁচমাস, অন্যটি চারমাস বয়সে তাঁর কোল খালি করে চলে যায়।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের শোক ও কলম্বুত্বের অধ্যাত্মকে রোকেয়া পন্ডিতে রূপান্তরিত করেছেন, যেন মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিহার একটা রূপ। দুটি শিশুকন্যা ও স্বামীর মৃত্যুর মত ঘটনা সেকালে একজন অববোধবাসিনী মহিলাকে মানসিক ও সামাজিক দিক থেকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। রোকেয়ার জীবন সমাজের এই একমুখের গতানুগতিক চিন্তাধারাকে চুবনার কবে দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচমাস পরে পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে তিনি ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় চালু করেন কিন্তু প্রতিষ্ঠানশীল সমাজের আক্রমণ এমন ভয়ংকর হয়ে ওঠে যে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। হতাশা অনিশ্চয়তা ও দুঃখের সঙ্গে ছিল দুর্ভাগ্য মনোবল ও সাহস, না হলে দুখানা বেক আর আটজন ছাত্রী নিয়ে ভাড়াবাড়িতে আবার স্কুল শুরু করা যায়না।

(২)

রোকেয়ার জীবনের নানা পর্যায়ে কঠিন অভিজ্ঞতাই হয়তো 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের বিভিন্ন নারীচরিত্রের মধ্যে রূপান্তরিত আকারে সেবা দিয়েছে। বিবেচ্য কবে তারিণীভবনের প্রতিষ্ঠাতা বীনতারিণীর মধ্যে অনেকটাই মিশে আছে তাঁর আত্মজৈবনিক উপদান। স্কুল চালাতে গিয়ে বঙ্গশ্রমীল সমাজের অসহিষ্ণু প্রতিক্রিয়া তাঁকে নিরস্ত করে বসে বিভূষণার মধ্যে ফেলত, বীনতারিণীর অভিজ্ঞতায় যেন তারই প্রতিফলন।

রোকেয়ার স্বপ্ন ও কর্মোন্মোহণ শুধু একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পরিসীমামতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারিণীভবন যেন তাঁর মনে নারীমুক্তি, নারী কল্যাণের যে অঙ্গণ বাসা বেঁধেছিল তারই কলিত রূপ। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির লেশমাত্র সেখানে নেই, ধর্মনির্বিশেষে সমাজপরিভ্রান্ত অনাথা মেয়েরা যেখানে নিরাপদ আশ্রয় পায়। আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ লাভ করে। 'মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকলে যেন এক মাড়গর্ভজাত

সমোদগার ন্যায় ছিলরা বিশিষ্টা কার্য করিতেছেন।' —
'সুলতানার হুমেদ'-এ যেন আরেকটি পৃষ্ঠা।

পদ্মরাগের গুপ্ত অনেকানি চমকপ্রদ নাটকীয়তা আছে
সন্দেহ নেই, কিন্তু তারকীভবনে আশ্রিতা মেয়েদের আশঙ্কায়,
হেঁড়া হেঁড়া জীবন অভিজ্ঞতার সমাহারে রোকেয়া যে
সমাক্ষতায় তুলে ধরেছেন তার বাস্তবতা অস্বীকার করবে কে ?
কীভাবে আদ্য পুরুষশাসিত সমাজে সমস্ত অবিচার নারীর
মাথায় তুলে দেওয়া হয় সৌখিনী, রাফিয়া, হুসেন, সক্তিনা,
উবার জীবনে তারই দলিলীকরণ ঘটছে। স্নেহকাল ভেঙে এই
অত্যাচার যে একই থাকে ঘেরী করেণীর উপন্যাস অবলম্বনে
লেখা 'ডেলিশিয়া হুয়া'তে রোকেয়া যেন তাই বোঝাতে চান।

পদ্মরাগের মেয়েরা কেউ সপত্নী সন্তানের দ্বারা, স্বতর
বাড়ির আদীর দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন, কেউ বিশেষত তেরত
স্বামীর কাছে শাচ্ছেন রূঢ় প্রত্যাখ্যান, ডাকাতরা অশংখণ
করেছিল এই মোবে কারো কপালে ছুটছে নির্বাসন। এই
কাপুরুষ সমাজ রক্ষা করতে চায়না, জানে না অথচ মেয়েদের
বাড়ি দেবার সময় পরম তৎপর হয়ে ওঠে। রোকেয়া দেখাতে
ভোলেননি মেয়েরাই অনেক সময় প্রবল উৎসাহে
নিপীড়নকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মেয়েদের এমনভাবেই
বড় করা হয়, অত্যাচারের ছকটি ঝোঁকটাই থেকে যায়।
ডাকাতরা ছেড়ে দেবার পর উভা বাড়ি ফিরে এসে কী সেকল ?

'প্রথমে শাতড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাকে
সেবিয়া ভেড় ভেড় করিয়া কীভাবে লাগিলেন। বড়-জা
বলিলেন — "মেজ বউ! তুমি কোন আত্মলে আবার এখানে
ফিরে এসে?" "মেজ-জা বলিলেন — "পীরিত জমেছিল
ভালই, চারজন নিরে গেল; তিনজনে নিরে গেল।" ... জায়েদা
বিধুপ টিককারী ছাড়া অন্য ডাকাত কথা কহিলেন না। শাতড়ী
কেবল ব্রহ্মন ফ্রিয়াই করিতে থাকিলেন।'

আজকের সমাজে উভা কি এগিরেছে একটু ?

(৩)

গোটা জীবন ছুড়ে রোকেয়া অনগ্রসর সমাজের মেয়েদের
মনে আত্মবর্ষণা জাগাবার চেষ্টা করে গেছেন। পাশাপাশি
একজনে 'সৌন্দর্যগণ্ডে'র গওহর আলী বা 'পদ্মরাগে'র
লতিকার মতো সম্ভব পুরুষ চরিত্র, যাদের সহধর্মিতা নারীর
প্রশ্ন পাথের। সংখ্যার এরা অল্প হলেও এই আলোক রেখাটুকু
আঁকতে ভেলেছেন তিনি।

আসলে রোকেয়ার প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার গীতরতার সঙ্গে
সংঘর্ষের দূর্বল একটি ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। কোথাও তিনি
অন্যায় জলুসের সঙ্গে আপোষ করেননি কিন্তু তাঁর রচনার
সর্বত্র লক্ষ করি একটি শোভন কঠিনমরতা। তাতে প্রতিবাসের
তেজা ভিমিত হয়নি বরং মর্যাদাশীল হয়েছে। ইসলামের

অনুশাসনে শিষ্টা, স্বামী ও অনা অভিভাবাকের সম্পত্তিতে
নারীর অধিকার স্বীকৃত হলেও কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত হতে
পারেনি, পুরুষ নানা কৌশলে নারীকে তার স্বৈশ অংশ থেকে
বঞ্চিত করেছে। রোকেয়ার প্রতিবাসের ভাষা লক্ষ করুন,
'পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত
কি ছদ্মনা উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে তা কে না জানে ?
কোন শ্রাতা তাহা বুঝ ছুটিয়া বলেন না — সুতরাং সে
শোচনীয় কথা আমদিসাফেই বলিতে হইবে। কোন হুসে
আফিংখোর, গাফাখোর, নিরক্ষর, চিররোগী বৃদ্ধ — যে
মোকদ্দমা করিয়া কমিদারীর অংশ বাহির করিতে অক্ষম
এইরূপ লোককে কন্যাদান করা হয়। অথচ ভদীর দ্বারা
বিবাহের পূর্বেই লা-দাবী লিখাইয়া লওয়া হয় কিবা তরফদারকে
চিরকুমারী রাখা হয় এবং শ্রাতৃবধু মনদলিগকে দাসীর মত
ভাবে। ... মহাবদীর আইন পুস্তকের মসীরাখা রূপে পুস্তকেই
আবদ্ধ থাকে। টাকা দার, কমতা যার, আইন তাহারই।'

তাই কোরান পড়ার ওপর জোর যেন বোঝায়।
ইসলামের সমন্বিতভাবে, আধুনিকতাকে তুলে আনতে চান বার
বার। অতি সাম্প্রতিক কালেও ঘেঁষেছি মুসলিম নারী সমাজের
জন্য অধিকার রক্ষার আন্দোলনে নেমে সৈয়দা হাফিসেন মতো
হয়েছে, 'If only people would read the Quran and not
go by the Anglo-Mohammedan interpretation of
Muslim personal law that is still in use to day, the
myths, and confusions could be cleared.'

মিস মোরোর কৃপাত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে
তুলনামূলকভাবে কিছুটা অগ্রসর ও আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু সমাজের
পাশে পঞ্চাংগ মুসলমান সমাজের ছবিটি অপরূপভাবে তুলে
ধরেছেন রোকেয়া। সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি,
ইসলামের মূলনীতিকে দলিত করে কীভাবে প্রবাবক
পুরুষতন্ত্রের দাপট চলছে সেদিকে আব্দুল তুলেছেন। স্ব-
সম্প্রদায়ের অস্বাধা সবে রোকেয়ার এই আত্মবিকার উদ্ভূত না
করে পারছিলা, 'মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন তাঁহারা
যে অযোগ্য, ইহাতে কিছুকাজ সন্দেহ নাই। সুশিক্ষিতা সুযোগ্য
মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা
অযোগ্য মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা ত অতি
বাস্তবিক।'

তাঁর রচনায় যেন একই সঙ্গে আশ্রন আর যন্ত্রণ
মাথাখসি দেখতে পাই।

(৪)

জীবন সম্বন্ধে একটি গভীর ও পূর্ণভাবে রোকেয়ার
ব্যক্তিত্ব, কার্যকলাপে, সাহিত্যকর্মে উজ্জলিত হয়েছে। প্রতিপাদী

চেতনার সঙ্গে প্রব্রব মনন, স্বাভাবিক প্রসঙ্গতা এবং গভীর রসবোধের সমন্বয় তাঁর রচনার চোখে পড়ে। কখনো তীক্ষ্ণ বাস, কখনো কল্পনামেশ আকোশের হাসি 'অবরোধবাসিনী'র চূর্ণ কাহিনীগুলিতে বিকীর্ণ হয়েছে। হিউমারের এমন সার্বক প্রকাশ সে যুগের নারী লেখকদের রচনায় খুব বেশি লেখা যায় না। মনে পড়ছে সেই অনবদ্য গল্পটি, 'শি-ডাক্তার' শরৎকুমারী মিত্র ভাগলপুরের চারকোশ দূরে রেগিনীয়ার ধাঁহের বাথার ঘরের পেয়ে দীপ্তের চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে সেখান বসন্ত তা প্রসবেবেন। তবে দীপ্তের বাথার মিথ্যা স্বপ্ন সেওয়া হল কেন? বাড়ির কর্মীর মুক্তি অকটা, 'পুরুষ চাকরের দ্বারা ডাক্তারনীকে ডাকিতে হইল, সুতরাং তাহাকে দীপ্তের বাথা না বলিয়া আর কি বলিতাম? তোবা ছিয়া। মর্দুয়াকে ও কথা বলিতাম কি করিয়া? আপনি কেমন ডাক্তারনী যে, লোকের কথা বুঝেন না।'

কিংবা মনে করা যাক সেই সাহিত্যিক গল্পটি, বিয়ে বাড়িতে ঘরে আশুন শেগেছে, বিবিরা অগ্নিবৈষ্টি হইবে ও কাতর হয়ে স্কিজাস্য করছেন 'প্রাঙ্গণে পর্দা আছে কিনা — কোন ব্যাটা ছেলে থাকিলে তাহারা বাহির হইবেন কি করিয়া?' অবশেষে বেয়িয়ে যেই সেখান প্রাঙ্গণ ভরা পুরুষ, আবার দৌড়ে আওনেই ঢুকতে যাচ্ছেন তাঁরা — পুড়ে 'পসেখা কাবাব' হতে ও তাঁদের আগুনি নেই। সমকালীন হিন্দু সমাজেও একই চিত্র ছিল।

'মতিচূরে' 'বোরকা' প্রভৃতি পড়লে বোঝা যায়, অবরোধ সম্বন্ধে রোকেয়ার ধারণা ছিল 'তা স্বাভাবিক নহে নৈতিক' — অর্থাৎ সত্যতাই অগতে পর্দা বৃদ্ধি করেছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি লেফাফা ঢাকা চিঠি, সরণোষ ঢাকা সেওয়া খাদ্যের উল্লেখ করেছেন এবং কৃত্রিম পর্দা যথা সম্ভব কম করার অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন। 'বসীর নারী শিক্ষা সমিতি'র সভানেত্রীর অভিধাবত্রে তিনি 'পর্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোন মত প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি' বলে ও পর যুহুর্তেই প্রগাধা নারী বিদ্যাক্ষ গ্যাসের সঙ্গে অবরোধ প্রবাকে তুলনা করেছেন। এতেও কি তাঁর মানসিকতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়না? তাঁর মূল উদ্দেশ্য নারীমুক্তি ও নারী শিক্ষা — বিতার্কের অধি তুলে সেই বাস্তব লক্ষ্য থেকে এক পা সরতেও তিনি নারাজ। তাঁর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় উপায় কখনো উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে ওঠেনি। এই বাস্তব বুদ্ধি এবং গভীর আত্মবিশ্বাসের প্রণামনা ছিল বলেই মাত্র বাহায় বংশের পরমায়ুর মধ্যে এমন বিপুল কর্মোন্মোগ তাঁর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল।

'আমি চাই সেই শিক্ষা — যাহা তাহানিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, ... শিক্ষা মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। ... তাহাদের জীবন শুধু পতি-সেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অল্পবয়সে জ্ঞান কাহারও গলগ্রহ না হয়। তাহাদের জ্ঞান উচিত যে, তাহারা ইচ্ছাগতে কেবল সুখ্যা পাড়ী, ট্রিপ ও স্বয়ম্বা রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সজ্জিবার জন্য আইসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীকণে ভয়লাভ করিয়াছে।'

আজ দুহাজার এক সালেও তাঁর কল্পনার এই নারীশিক্ষা দূরের দীপ হইতেই রয়েছে। 'বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ' অনুবাস না করে পরোননি তিনি কারণ আত্মগনিপ্তানে আমদুদুয়ার উদারপন্থার পরাভব তাঁকে বেজেছিল। ভারি, নারী নিপেশবণের ধ্বজাধারী আজকের তালিবান আফগানিস্তান সম্বন্ধে কী বলতেন রোকেয়া, কতখানি বাবা পেতেন।

তাঁর স্বচ্ছ চিত্তাশক্তি, যুক্তিবোধ, হৃদয়বরা এবং আশ্চর্য আনুকূল্য আজও আমাদের বিমুগ্ধ করে, লগ দেবার। সীতা ও রামের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, একটি পুতুলের সঙ্গে কোনো বালকের যে সম্বন্ধ সীতার সঙ্গে রামের সম্বন্ধও প্রায় সেরকম। বালক ইচ্ছা করলে পুতুলকে প্রাণপনে ভালোবাসতে পারে; পুতুল হারালে বিরহে অধীর হতে পারে; আবার বিনা কারণে রাগ করে পুতুলটা কানায় ফেলে দিতে পারে, কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ হৃদয়ন থাকে সন্তেও পুতুলিকা অচেতন পরার্থ।

রাম, সীতার রূপকে সামনে রেখে রোকেয়া এখানে সামগ্রিকভাবে প্রথাবদ্ধ দাম্পত্যকেই বিদ্ধ করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র আক্রমণ আর প্রতিবাদ নয়, রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যিক্য আসলে আশাবাদী এক উজ্জীবন। তিনি এই অর্থাধার পার হবার স্বপ্ন মেবেছেন, সেই স্বপ্ন সার্বক করার জন্য জীবন অর্ঘ্যি দিয়ে কর্মযজ্ঞ করেছেন। আজ তাঁকে 'স্বরণ কবা, তাঁর রচনাপাঠ তাই আমাদের পক্ষে একান্ত ভক্তরি।

গ্রন্থপঞ্জি

আব্দুল কামির সম্পাদিত রোকেয়া-রচনাকলী।

মুহম্মদ শামসুল আলম : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন জীবন ও সাহিত্য।

গুরুজী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্মস্থান। দিবস উপলক্ষে বিশ্বকোষ পরিষদ আয়োজিত সভায় স্বস্তি অতিবাহন প্রবন্ধখনে লিখিত।

২০

হেমন্তবালা : বিদ্রোহে-দ্বন্দ্বে অনন্য এক নারীসত্তা

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী



১৩০১, ২৪ কার্তিকের শেষরায়ে মাড়গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হই। শুনেছি, মা বলেন ২৬ বেড়ি চাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতায় আমার জন্ম। বাবার মতে মদন মিত্র লেনে। মা'র কোনো কথা বাবা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন না, বলতেন মা'র মাথা খারাপ।

‘আমি মাকে অবিশ্বাস করিনা। চুনারে হুয় অয়গ্রাশন, বাবার মতে সেখানে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তখন ছিলেন। সুকুমার রায় আমাকে কোলে করে বেড়াতেন। ... মায়ের কীরকম পিসতুতো বোন ছিলেন শ্যামাসুন্দরী, ... তাঁর চ্যেষ্ঠ পুত্র হৃদীকেশ দাদাকে একবার মাত্র দেখেছি রাত্রিকালে ঘুম-ঘুম চোখে। আমাকে তাঁর কোলে এনে দিল, তাঁর দাড়ি দেখে ভয় পেয়ে ঝেঁসে উঠলাম, আর মনে নাই। ...’

এমন নিরাতরণ, অকপট অথচ চিত্তাকর্ষকভাবে যিনি আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই হেমন্তবালা দেবীর (১৮৯৪ - ১৯৭৬) নাম আজকের শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের একাংশমাত্রের কাছে পরিচিত ওধু বই‘প্রদর্শন’খণ্ড সঙ্গে পত্রাঙ্গণের সূত্রে (বিশ্বভারতী প্রকাশিত ‘চিঠিপত্র’ নং-২ খণ্ডের মাধ্যমে)। একে ঘটনাচক্রে-এক অদ্ভুত পরিহাসই বলতে হবে। সমাজ ও পরিবারের নানা সংস্কার, শাসন ও অবরোধের বাধা আর পিছুটান কাটিয়ে উঠে ও ব্যক্তিগত জীবনে নানা দুর্বিপাক ও দুরবস্থা সহ্য করেও এই অসাধারণ মহিলার কলম থেকে যতটুকু সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, ভাবীকালে তার যথাযোগ্য প্রকাশনা ও প্রচারের দিকটা উপেক্ষিত না হলে এমনটা নিশ্চয়ই ঘটতো না। তাঁর অনবদ্য আত্মকাহিনী অবশ্য সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে, যা থেকে এক সুজনকুল সংস্কারী নারীসত্তার যে-বিরল পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়, তা থেকে নির্বিধায় বলা যায় যে, অন্য কোনও মহীকহপ্রতিম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলাপচারিতার সুবাদে নয়, নিজস্ব চিন্তার দীপ্তি ও চারিত্রশক্তির মহিমাতেই এই অনন্যসাধারণ নারী কীর্তিত হতে পারেন।

ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর গ্রামের বারেন্দ্র জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন হেমন্তবালার বাবা। মা'র নাম অনন্তবালা দেবী। অনন্তবালা কবিতা রচনার ধারা পেয়েছিলেন তাঁর নিজের মা'র থেকে, নিজেও রামায়ণ ‘আদিকার’ রচনা করেছিলেন, ইংরিজি আর দেবনাগরী অক্ষরও চিনতেন। তাঁর জীবনে যে তাঁর মায়ের প্রভাব অনন্ত সে কথা উল্লেখ করে হেমন্তবালা তাঁর আত্মকাহিনীতে জানিয়েছেন যে, অনন্তবালার শেষ জীবন কেটেছিল কাশীতে ও সবসঙ্গে পুরীতে বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করে ওরুভজনা ও বৈষ্ণব সেবা।

এমন মা'য়ের মেয়ে হেমন্তবালার মনেও যে সাহিত্যের প্রেরণার উদ্বেগ হবে, সেটা অবশ্যই আশ্চর্য নয়। তবে জীবন-কাহিনীর বহিরসে যে-সাদুশাই থাক, চিন্তা ও মননে হেমন্তবালাকে আমাদের অন্য কারও মতোই মনে হয় না,

ফকীরাচার দীপ্তিতে মগ্নিত তিনি যেন এক 'সৈত্যকূলে প্রসূদ'-
এককমটাই মনে হয়।

নিজের রচনায় হেমন্তবালা তাঁর শিশুকুল ইত্যাদির
বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন, আপাতত আমাদের তাতে
প্রয়োজন নেই। তাঁর ছোটবোন ছিলেন বসন্তবালা সেনী এবং
ভাই বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সে-যুগের নাম কলা সঙ্গীতজ্ঞ।
ছেলেবেলায় গান-বাঁজনা শোনা বা 'মজার মজার বই পড়ে ...
ভালো ভালো খাবার খেয়ে' জীবন কাটাবার ইচ্ছা থাকলেও
মায়ের তর্পণে স্ট্রেচপাঠ ইত্যাদিও করতে হতো বা মায়ের
পুজোর আয়োজনে, রান্নাবান্নায় সাহায্য করতে হতো।
মু'হোনেক মা নানারকম ব্রতও করাতেন, তবে এসব আচার
নিয়ম পালনে হেমন্তবালার আত্মরিক আগ্রহ বা দীর্ঘা ছিল না,
পরিভার লিখেছেন :- 'মাকে তাকি দিয়েছি নানাভাবো' আরও
লিখেছেন :- '... কোনো জন্মে আমি কাজের মানুষ ইইনি বা
যেজন্মে কাজ করিনি। আমি আজম্বা হুঁড়ে তবু ভয়ের চোটে যা
করেছি, ঐ ব্যসের পক্ষে তা মন্দ নয়। ...' আবার হেমন্তবালার
বাবার ছিল সঙ্গীতচর্চা ও নাট্যাভিনয়ে আগ্রহ, গীতিকার শিল্পী
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর পরিচিত ছিলেন।

এরকম পরিবেশ-পরিচ্ছদের প্রভাবে গড়ে ওঠা
হেমন্তবালার বিয়ে হয় ১৯০৫ সালের রত্নপু ব্রজোর ভিতরবন্দ
বড়ভরতের জমিদার বরদাকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গে। তাঁর
নিজের কলমে সেই বিবাহের অনবদ্য কীর্তির কিছু অংশ :- '...
নানা জায়গা থেকে পাশাপাশি আসেন দেখতে। খাঁর পছন্দ
করেছিলেন, তাঁদের হাঁড়িতে চাল মিহি, তাঁরা বেঁচে গেছেন।
যাঁদের হাঁড়িতে চাল দিয়েছিলাম, জীবনযুদ্ধে তাঁরাই জিতলেন
বা হারলেন। তার ফলে অনেক গবেষণার পর অবশেষে ১৩১১
সালের ২৮ ফাল্গুন রাত তিনটার সময় ১৫০ দামের কার্বন
লাইট বিকল হওয়ার রান্নাঘরের কেবোসিন কুণির খোঁয়াটে
আলোয় চোখ খোঁজা নিয়ালু চোখে ভালো করে না দেখেই
আমার গুড়বিবাহ হয়ে গেল। শোলার মালাগাছি ভুতলে পড়ে
গেল, মুদ্রিত চক্রে সেটি যথাহানে অর্পিত হতে পারেনি।
শেটাকে বেন কে কুড়িয়ে নিয়ে ঝ-হানু হু করে বিলেন। তখন
আমার বয়স দশ বছর তার মাস। ...'

বিয়ের পর স্বস্তরবাড়িতে যে সংস্কারের অচলতানে
গিয়ে পড়লেন তার কথা কিছু কিছু হেমন্তবালার
স্মৃতিকথিত আছে। বিয়ের আগে বাবা তাঁকে হারমোনিয়াম
আর বশ্শিগাচরণ সেনের বই কিনে দিয়েছিলেন সঙ্গীত শিক্ষার
মানসে। কিন্তু — 'সে হারমোনিয়ামের সা রে গা মা, সা রে
গা, রে গা মার পর একটা গং ধরতে না ধরতেই বিরে হয়ে
গেল। সেবান থেকে হুকুম এল, স্ত্রীলোকের গানবাঁজনা সে

পরিবারে নিষিদ্ধ। তাঁদের থাকের বউ হারমোনিয়াম ঘুতে পারবে
না। পড়াশুনাও নিষিদ্ধই, তবে যখন পড়তে শিখে ফেলেছেই,
তখন 'সাক্ষী মেয়ে', 'সাক্ষী বউ', 'সাক্ষী মা', শিবনাথ শাস্ত্রীর
'মেজ বউ', কে একজন গিরিজাপ্রসাদ বাবু না তি, তাঁর সব
স্ট্রীপিকাশুলক বই, এই পড়াই থাকে। পুরাণাদি অশ্লীল
ধর্মগ্রন্থপাঠ নিষিদ্ধ, এবং মাসিকপত্র প্রভৃতিও নিষিদ্ধ। ...'

তাঁর শাওড়ি শরৎকুমারী ছিলেন নাট্যের রান্নাপরিবারের
মেয়ে, তিনি শিশুকুমারীও জন্মেছেন, সেইসূত্রে হেমন্তবালাও তাঁর
'ওচ্ছাচারিণী' শাওড়ির সঙ্গে কিছুদিন খেঁকছেন। তাঁর সম্পর্কে
হেমন্তবালা জানিয়েছেন যে, তিনি পুরুষের সামনে বের হতেন
না। বাইরের লোক দেখা করতে এলে কারশায়া বসাতেন, সে
লোক চলে গেলে সেখানে গোবর জল দেওয়া হতো।
সেতত্ত্ব— মুগী জাতীয় রোগ ছিল, কিন্তু তিনি ওষুধ খেতেন
না, তুলসীদালয় নিবেদিত 'হরির তেল' সর্বসম্মত মাখতেন। তাঁর
ভক্তিগ্রন্থাদি মাঝে মাঝে রোদে দেওয়া হতো। হেমন্তবালা
সেসব মাঝে মাঝে পড়তেন 'গল্পের বই হিসেবে'। তবে একবার
কাপের বাড়ি এসে 'গল্পের লোভে' ও 'মলাটির সৌন্দর্যে'
অধুষ্ট হয়ে অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ' পড়ে যে তাঁর মনে
'নুতন চিত্রের উদয়' হয়, সেকথাও হেমন্তবালা লিখেছেন।

এ-হেন পরিবেশে দুর্ভাগ্যবশত স্বামীর সঙ্গেও
হেমন্তবালার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। প্রথম থেকেই যে তাঁদের
বনিবনা হয়নি। হেমন্তবালা অত্যন্ত সঙ্গতিভ ভাবে শুধু তাঁর
স্বামীর কথাই লেখেন নি, নিজের মনের বিদ্রোহের কথাও
লিখেছেন :- '... পাত্রও বিমর্ষ, ক্ষুব্ধ। অন্য একটি সুপাত্রী পছন্দ
ছিল। নানাকারণে হয়নি। আমি কালো, কুশ্রী, মূর্খ, বোকা,
অর্ধমগ্ন, অপরিষ্রবী, ম্যালেরিয়াবশত জ্ঞান নিষিদ্ধ, চুলে
সর্বেভেল, গ্রাম্যকড়াক, সারাগায়ে সেকলে গহনা, রঙিন
কাপড়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমারও মনে হতো এ ব্যক্তি না
ভক্তিভাজন, না সবা, এর সঙ্গে আমার কোনোটিকেই কোনো
মিল নাই। আবার বান-দুই বইতে আছে, 'আমরা স্ত্রীলোক,
পুরুষের দাসী, স্বামী আমাদের ইষ্ট দেবতা'। পড়লেই গা জ্বলে
যেত। এমন ধর্ম আমি কিছুতেই মানতে না। নরনারী এক
বিধাতরই সৃষ্টি, ছোট বড় কেন হবে? আমি কেন কারো দাসী
হতে যাব? ধর্ম ভয় নাই। মানিনা ধর্মকথা। অম্বচ আমি বন্ধী,
পরানী, দুর্বল, আহত স্বাগনের মতো অসহায় বন্ধী। ...'

নিজের এই অসহায় অবস্থার কথাও হেমন্তবালা
কিশুম্বরা গোপাল না রেখে তাঁর অস্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কের
কথা জানান :- '... মনে বিষের পুবে মনের ভাব মনে চেপে
বাইরে আনুগত্য দেখাই। ভয়ে ভয়ে থাকি। ... কেউ কেউ
আমাকে শাসন করতে ওঁকে প্ররোচনা দিতেন। নানা কারণেই

সম্পর্কটা বিষাক্ত, অথচ ডয়ে ডয়ে সমস্ত সস্ত্রা করে নীরবে থাকি। ঐ ব্যক্তি কলকাতায় গেলে আমি নাটোরে পরমসুখে একা থাকি। ...” মনে রাখতে হবে, যে-সময় হেমন্তবালা দেবী এসব কথা লিখেছেন তখন নারীমুক্তি নারীবাদ ইত্যাদি শব্দ এখনো পাওয়া দূরস্থান, নারী পুরুষ-সাম্যের কথা অনেক চিন্তানীল মানুষও বলতে পারতেন না।

তবু নারীর অধিকার সচেতনতা প্রসঙ্গেই নয়, ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি প্রসঙ্গও নিজের সংশয়, সংস্কার ও আত্মজিজ্ঞাসার অসাধারণ উন্মোচন ঘটেছে হেমন্তবালার ‘পুরানোমিনের কথা’য়। পারিবারিক সম্পর্ক সূত্রে হেমন্তবালার আত্মীয়া এক মহিলার (‘শ্রী শ্রী মা’ নামে উল্লিখিত) কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হন তাঁর মা’র নির্বন্ধাতিশয়ো। এ বিষয়ে তাঁর নিজের সংশয় ও উৎসাহের অভাবের কথা আয়তকথায় তিনি অনেকবার বলেছেন। ১৯২০ বঙ্গাব্দে এই ‘শ্রী শ্রী মা’কে একবার হেমন্তবালার পিতা তাঁর গৌরীপুরের বাড়িতে আনান, তখন স্বতন্ত্রবাড়ির সঙ্গে মনোমালিন্যবশত তিনি শিব্রালয় গৌরীপুরেই অবস্থান করছিলেন। হেমন্তবালা যখন জানতে পারেন যে, তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্বতন্ত্রবাড়ি ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করবার জন্যই তাঁর বাবা এই ‘শ্রী শ্রী মা’কে আনিয়েছেন ও সে-জন্য ‘শ্রী শ্রী মা’ নিজেই অসুস্থি বোধ করছেন, তখন তিনি নিজেই তাঁকে শিখিয়ে দেন — তিনি যেন হেমন্তবালার পিতাকে বলেন যে ... “আপনি এ কথা আমাকে বলেছিলেন, আমি তবুও বলেছি আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, দুটি ভগবৎকথা বলুন আমরা শ্রবণ করবো, আমাদের সাংসারিক, পারিবারিক বিবাম-বিসংবাদের মধ্যে আপনি যাবেন না। এ-ধরনের স্পষ্টবাদিতা ও বিস্ফোহ তরুণ বয়স থেকেই ছিল হেমন্তবালা দেবীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য।

সেবার গৌরীপুরেই তাঁর “জননী কৌক ধরলেন, এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবেনা, এইবেলা তিনি আমাকে হরিনাম দান করুন। আমি বললাম, ‘আমি শিখা হবো না, আমি কোনো বন্ধনের মধ্যে যাবো না, কেননা আমি নিঃসরম্মা করতে পারব না। আমি এমনিই আপনাকে ভক্তি করি, একটি ভালোবাসি, সেই আমার ভালো’ কিন্তু জননী অত্যন্ত জেদী, তাঁর জেদ বহাল রাখতেই হয়ে। সুতরাং শ্রী হরিনাম গ্রহণ করলাম। ...”

ছোট বোন বসন্তবালা সহ হেমন্তবালা এইভাবে গুরুস্বরণ করলেও এই জাতীয় জগতপে তিনি স্বাক্ষর্য বোধ করেননি, লিখেছেন - ‘... আমাদের দুই বোনের জন্য মালা আনলেন। মধ্যে বাক, কেক কল্ল করতে পারে। বসনের যে সময়ের মধ্যে ১০০০ জপ পূর্ণ, আমার অষ্টিকষ্টে ৫০০। বসন অবলীলাক্রমে জপ করেন, আমার দক্ষণ কষ্ট। কেন তা

জানিনা, পারীষিক কষ্ট। ...’ আবার তাঁর এই গুরুমা’র প্রতি ভক্তি ভালোবাসাও সবসময় প্রবাহীন, সংশয়হীন নয়, তাঁর ‘নান্তিকের মতো’ কথাবার্তার তাঁর মা’ কষ্ট হয়। কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রিটের বাসায় এই ‘শ্রী শ্রী মা’কে সর্বপ্রথম যখন গৈরিক বেশে দেখেন, তখন হেমন্তবালা তাঁকে ‘শ্রদ্ধা করেন, ‘এ কী আপনি গেকুয়া ধরেছেন কেন? আপনাকে তো আমি হার্মিক বলে জানতাম, আমার শাওন্টি বলেন ভও সাধুসাই গেকুয়া পরে। ...’ একথা বলায় তাঁর ‘গর্ভধারিণী ধর্মক দিয়ে উঠলেন।’

মায়ের চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ে ধর্ম ও মানসিক চানাপোড়েনের কথা অকপটেই লিপিবদ্ধ করেছেন, এমনকি, নিজের ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়েও তাঁর নিজের মনের সংশয়ও তিনি গোপন করেননি।

প্রচলিত পরম্পরার নিরিখে তাঁর দেবদ্বিত্য ভক্তি ততটা গাঢ় ছিল না, ধর্মীয় বিধিবিধান নিয়েও মনের মধ্যে সতত প্রশ্ন ও প্রতিবাদ পুঞ্জিত হতো। চার বছর বয়সেই বাড়ির স্বর্গীপুত্রের পর ব্রাহ্মণের ‘পদরক্তঃ’ — লাগা কমলালেবু তুলে খেয়ে নেবার আদেশ মানতে পারেননি কালিকা (হেমন্তবালা — ‘ওনে আমার খোশাই করছিল। প্রজ্ঞা হয়নি। আমার নান্তিক প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে মা দুঃখিত হলেন।’ তাঁর মা মনে করতেন, মেয়ের এমন স্বভাব পিতার ‘কুশিক্ষার’ ফলে হয়েছে। কিন্তু হেমন্তবালা লিখেছেন — ‘বাবার কোনো সোধ ছিল না। ওটা আমারই নিমন্ত্র স্বভাবগত।’

আরও কিছুটা বড় হবার পর আর একটি ধর্মীয় আচার তাঁর মনে বিকোভের সৃষ্টি করে — এ ব্যাপারে অকণা তাঁর মা অনন্তবালাও তাঁর সঙ্গে সহমত ছিলেন। এই প্রথাটি হচ্ছে পণ্ডবলি। দুর্গাপূজায় পাঁচা বলিই হোক বা মাংস খাবার জন্য যে কোনো পণ্ড হওয়াই হোক, হেমন্তবালা তাকে অনুমোদন করতে পারেননি, একবার তাঁর বাবার ঘরের সামনে একটা কচ্ছপ কাটা হলে তিনি প্রতিবাদ করেন, যদিও ‘আমিখাহারে অগ্রবৃষ্টি তখন ছিল না। সোডও যে ছিল না তাও না। ...’ এসম্পর্কে হেমন্তবালা আরও লিখেছেন - ‘... কিন্তু জীবহিন্দো কিছুতেই অনুমোদন করতে পারিনি, এইসব যন্ত্রের ফলে ১৭ বছর পূর্ণ হলে সম্পূর্ণ নিরাশ্রিতা হবার চেষ্টা করি এবং কৃতকার্য হই।’ হেমন্তবালা স্পষ্টই লিখেছেন — ‘বলিপানের উদ্যোগক্রমের মধ্যে এই বলিপানের সময় দ্ব্যায়াময়ী এক বর্বর অন্ধ অসত্য উদ্ভাদনা দেখা যেত, এই ভিনিসটি মনুষ্যত্ব তথা ধর্মভাবের বিপরীত, অথচ যুগপুঙ্গাব ধরে এই যে কুপ্রথা চলে আসছে এর বিরুদ্ধে তখন ঐ সন্মানে একমাত্র আমার মা ছাড়া আর কাউকে দাঁড়াতে দেখিনি।’ এখানে জানানো যায় যে, হেমন্তবালার জননী অনন্তবালা দীক্ষিত শাক্ত হয়েও নিরামিষ

উপকরণে পূজা করতেন : আবার হেমন্তবালাকে দেখা রবীন্দ্রনাথের নানা চিঠিপত্রের শক্তি পূজায় এই জীবনসৌন্দর্য বিরুদ্ধে আলোচনা ও অভিমত পাওয়া যায়।

দীক্ষাওক 'শ্রী শ্রী মা'র সামনে 'উচ্চত নান্তিকের' মতো কথা বলে মা'য়ের বকুনি বাবার কথা হেমন্তবালা লিখেছেন আবার নিজের সংস্কার ও বিশ্ববিধানের কথাও কবুল করেছেন আয়কথার কোনো কোনো অংশে। এমন একটি অংশ :- 'আমি আত্মম নান্তিক, ... দু' একটি কারণে গৃহসেবতা শ্রী শ্রী শ্যামসুন্দর এবং শ্রী শ্রী মদনমোহনকে 'জাগ্রত' বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হলাম।' এই দু' একটি কারণ হচ্ছে একবার একটি সোনার হার হারিয়ে ফেলে হারির লুপ্টের মানত করে পাওয়া যায়, আর একবার '২১ বার কার্তীকীপূর্ণিমার কলচাপ্তি করে ফিরে পাওয়া যায় নাকি একটি হারিয়ে যাওয়া অংশটি।

বৈষ্ণবেরা আরাধ্যকে পতিরূপে যে-ভজনা করেন, সেই সংস্কার অনুযায়ী হেমন্তবালা নিজেও শ্রী শ্রী মদনমোহনের পথিত্যকালে কল্পনা করেন ও সে নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে তর্কবিতর্কও হয়। তাঁর মতে মদনমোহন "১০/১৫ বছরের ছেলের মতো অতবড় ঠাকুর, আর অশুভ সুন্দর। ... মানুষেরই মতো ভো বেবেহে- যোষ কী। জননী তখন বললেন, 'ওতে পাপ হয়। স্বামীকেই ঐ ভাবে দেখা উচিত।' তাঁকে ঐভাবে কেন দেখতে যাব? বয়ে গেছে। মামণি (অর্থাৎ হেমন্তবালার সিসি শাওড়ি) বৃদ্ধবয়সে কাত্যায়নী পূজা করেন কেন? স্বস্ত্রমাতা বলেন 'জন্মান্তরে শ্যামসুন্দরকে পতিরূপে পাবার জন্য।' ... মামণির বেলায় পাপ হয় না, আমার বেলায় হবে কেন? ..." বোকা যায়, প্রচলিত সংস্কারের প্রভাবে ইষ্টসেবককে স্বামী বলে কল্পনা করলেও মানুষ স্বামীটিকে ইষ্টসেবকের মতো পূজা করতে প্রস্তুত ছিলেন না হেমন্তবালা।

ঈশ্বরচিন্তা ত্যাগ না করলেও তিনি কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা সবকিছু সমর্পণ করে নিশ্চেষ্ট জীবন অতিবাহনের দর্শনে আস্থা রাখতে পারেননি। যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতার একটি ঐক্য তাঁর মধ্যে প্রথমাবধি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন মনে করতেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে মানলে ভক্তিকে খর্ব করা হয়না তার কারণ এই যে সেখানে "বিজ্ঞানেই ঈশ্বরের প্রকাশ এবং বিজ্ঞানবিরোধিতা নান্তিকতা, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক — বিজ্ঞানেই তাঁর লীলা, অবৈজ্ঞানিক ছেলেমানুষীতে নয়", হেমন্তবালাও তেমন শেষ বয়সে তাঁর কন্মাকে একটি চিঠিতে লেখেন :- "... কোনদিন কোনো প্রকৃত সাধকই পণ্ডিতের কথায় কান সেননি, মঙ্গল অমঙ্গলের জন্য তাঁরা প্রকৃতি, ভবিতব্য, অদৃষ্ট বা ঈশ্বরকে ভয় করে চলেছেন। ... ভগবানে আশ্রয়সমর্পণ করার কারণে কারো মঙ্গলামঙ্গল হয়, একথা ভগবৎ নিন্দা। যা হবার তা আপনিই

হয়। কার্যকারণযোগে খতাবতই হয়, তার উপর অন্য কারো হাত নেই। ..." (এই মাঘ, ১৩৫৮)। আজকের দিনেও এরকম হচ্ছে ও সংস্কারমুক্ত সৃষ্টি কল্পনা করা সহজ নয়।

এই বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসঙ্গে একটি বিতর্কিত বিষয়ে হেমন্তবালার মতামতের উল্লেখ করা উচিত। একথা সুবিদিত যে, মহাশত্রু খ্রীষ্টতন্ত্রের রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে এমন সন্দেহ প্রচলিত আছে যে, তাঁকে হত্যা করে তাঁর সেই সোখাও প্রোথিত করে ফেলা হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করতে গিয়ে কয়েকবছর আগে পুরীতে এক বাঙালি গবেষকেরও রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়। এই সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে পড়েছিলাম যে 'আনন্দময়ী মা'র মতো প্রসিদ্ধ সাধিকাও নাকি ঐ গবেষককে বলেছিলেন যে, খ্রীষ্টতন্ত্রকে হত্যার অনুমান হয়তো ঠিক, কিন্তু তা নিয়ে আবার অনুসন্ধানের দরকার কি।' এই রহস্য চাপা সেবার জন্য খ্রীষ্টতন্ত্র পুরীর মন্দির চণ্ডীগ্রাম বিগ্রহের মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিলেন — এই জাতীয় অশৌচিক কাহিনী অবশ্য বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রচলিত আছে। অথচ এ-সম্পর্কে পুরীতে বসে দীক্ষিত বৈষ্ণব হেমন্তবালা কী ভেবেছেন দেখা যাক :- 'শ্রীমদ্ব্যহস্ত্রের তিরোধান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকরা যেসব কথা বলেন, তার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত, এবং যদি তা সত্য হয়, তবে ওভিচা মন্দির বনন করে তার নিদর্শন উদ্ধার করে যথোপযোগ্যভাবে যথোযোগ্য মর্মান্বয় পুনঃস্থাপন করা উচিত। এবং কারা এ কাজের নায়ক ছিলেন, তাঁদের অনুযায়ী কেই এখনো আছে কি না, অনুসন্ধান করে দেখা উচিত এবং তাদের চিনে রেখে নিজেরা সাধনায় থাকা উচিত। ... অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কার দিয়ে ইতিহাসকে বিচার করা ঠিক নয়। ইতিহাস প্রত্যক্ষ বাস্তব প্রাকৃতিক ও তথ্য ভিত্তিক। বিশ্বাস ও সংস্কার ভাবনামূলক তত্ত্বমূলক। ইতিহাস পূর্ণনশায় অপেক্ষা বিজ্ঞানশাস্ত্রকেই কড় জাগরণ দেবে। ...' ('আমার মনের কথা')

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমন্তবালার পত্রালাপ তো আর সুগরিষ্ঠিত। সেখানে, মুক্তি, সংস্কার, ভক্তি, গুরুবাদ, মূর্তিপূজা নানা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। মৌলিক কথাবার্তার কিছু বিবরণও হেমন্তবালা রবীন্দ্রমুখি ভিত্তিক রচনাসিঙে লিখিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সূচনাও হয়েছিল এক ধরনের বিদ্রোহ থেকেই। এ-সম্পর্কে হেমন্তবালা লিখেছেন :- "... আত্মীয়স্বজনের মতের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার কড়িতে কিছুকাল আমার গতিবিধি ছিল সুনিরীক্ষিত, একরকম স্বাধীনতা বরণ করা হতো। ... পরে এইসময় শ্রীমদ্ব্যহস্ত্রের মতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করে যখন স্বার্থ হলাম, তখন দারুণ ক্রোধে-কোড়ে-মনস্তাপে মনসিক ভাবসম্মা হারিয়ে ফেলে কিছুপ্রায় হয়ে অবশেষে বললাম, 'আজ থেকে

আমি ধর্মের লাইন ছেড়ে নিলাম, আমি অন্য পথে চলব। ... আধ্যাত্মিক গুরুত্বনৈবা সম্ভব হয়। আমি ভক্তিগ্রন্থের পরিবর্তে মাসিক পত্রিকা, রবীন্দ্রগ্রন্থাদি পড়তে এবং সিনেমা-থিয়েটারে সেখানে গুরু করলাম। ... (নিজের কথা) এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন প্রথমে ছদ্মনামের আড়ালে কবিতায়, পরে চান্দ্রব পরিচয় হয়, সে-কাহিনী অনেকেরই জানা। তাঁর চিঠি পড়ে তাঁর লেখার ক্ষমতায় বিস্মিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন - "তুমি কে তা জানিনে — কিন্তু তোমার লেখা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তুমি লিখিয়ে, অর্থাৎ আমাদেরই দলের লোক ...।" (১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮)

রবীন্দ্রনাথ ও হেমন্তবালায় পর-বিনিময়ে অনেক সময়ই আলাচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালায় নানা বিশ্বাস ও সংস্কারকে অখ্যাত করতেন। যেমন, জ্যোতিষে হেমন্তবালায় বিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকসময়ই ঠাট্টা করেছেন, যদিও তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ নিজেও গণককে নিয়ে কোন্‌টা বিচার করিয়েছেন। 'আবার হেমন্তবালা প্রায়ই নানা সত্যোক্তমুক্ত তীক্ষ্ণ প্রশ্ন বা মন্তব্য করে রবীন্দ্রনাথকে চট্টিয়ে দিতেন। শুধু চিঠিতেও নয়, সামান্যসামান্য আলোচনা হেমন্তবালায় রবীন্দ্রনাথকে এমন সব প্রশ্ন করতেন, যা সচরাচর সাধারণ মানুষ করেন না।

রবীন্দ্রসাহিত্যের যে-সব বিবরণ হেমন্তবালা সেনী পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে তাঁর পর্যবেক্ষণের ওপর মানুষী দূর্বলতা, অসঙ্গতি সমেত এক অসাধারণ মানুষের রক্ত নাগসের ছবি ফুটে উঠেছে। যেমন ধরা যাক, তিনি কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর সাহায্যকারে হেমন্তবালায় দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, ত্রীলোকের দান গ্রহণ পুরুষের পক্ষে অগৌরবের বিষয়। সম্ভ্রতি একটি সাময়িক পরে চোখে পড়লো, হেমন্তবালায় রচনা সংকলনের সমালোচনা করতে গিয়ে এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি এরকম মন্তব্য করতে পারেন না, সেখানে হেমন্তবালায় স্মৃতিকেই সন্দেহ করা হয়েছে। সাময়িকপরে যারা গ্রন্থসমালোচনা করেন, সমালোচনা বিষয়ে তাঁদের পড়শাধার বহর সাধারণত এতই শোচনীয় যে, এ-সম্পর্কে বড় কয় মন্তব্য করা যায়, ততই ভালো। আমরা বরঞ্চ বলতে পারি, এ-জাতীয় বাস্তবনিষ্ঠ ঘোষণা বর্জিত দৃষ্টির জন্যই হেমন্তবালায় বিবরণী আমাদের কাছে অমূল্য।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আলোচনা বা দেখা সাক্ষাৎও প্রথম দিকে তাঁর অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে করতে হয়েছিল। পরে এই গোপনীয়তা বন্ধাব্দ ছিল না, তখনও এ-জন্য তাঁকে নানা রকম গল্পনা সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর পৌড়া সুচ্যাকালিনী

ছোটবোন বসন্তবালা একবার তাঁকে সীতমতো শাসিয়ে এক পরে লেখেন - "তোমাকে শ্রীমা যে শ্রীভাকুরের স্বরূপের প্রসঙ্গী বস্ত্রখানি আদর্শীকরণে দিয়াছিলেন, সেখানি যদি তুমি ব্যবহার না করিয়া থাক, তবে পরে পাঠ্যমাত্র আশ্রমে একখানি কাপড়ে জড়াইয়া ফেরৎ দিবে। কারণ তাঁহার আদর্শস্বের যোগ্যতা আর তোমার এখন নাই, তুমি শ্রীভক্ত বিদুষী হইয়াছ। তোমার রবী ও গাখীর সহিত শ্রীতি হইয়াছে, তোমার মহা অমঙ্গলের দিন আসিয়াছে ও আসিতেছে, আর সে অমঙ্গল কে হঠাইবে? ... ইত্যাদি।" হেমন্তবালা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখায় শক্তি ও পাথের লাভ করেছেন, শেষজীবনে স্বজন বিরহিত নিঃসঙ্গ ও উপেক্ষিত দিন যাপনের সময়ও তাঁর মনে হতোছিল ... "এ পর্যন্ত বড় কথা শুনে এলাম, যা কিছু বুঝলাম, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিবাদ। ..." ('আমার মনের কথা')

বার্ণকোর একাকিত্ব ও যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁর মানসিক জোরের যে-পরিচয় তাঁর এইসব রচনায় ছড়িয়ে আছে, তা এক কথায় বিশ্বাসকর। বিরহ-মৃত্যু, লাঞ্ছনার আঘাত আত্মহু করে ব্যবহার যেন তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই করতে চেয়েছেন 'মানবের মাঝে আমি ঐচ্ছিকারে চাই', নিজের সহোদরা বসন্তবালায় সঙ্গে তাঁর মানস গঠনের কতই না প্রভাব! নিম্নলিখিত দেখে যায় তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টি ও অক্লান্ত জীবন তৃষ্ণার নানা টুকরো ছবি - "অর্থাত্তাবকণত সংবাদপত্র রাখা বন্ধ করলাম। জানি না, দেশের কোথায় কী হচ্ছে! ... বা আমি কী মজায় আছি! নানা রোগজীর্ণ পশু, শব্দগুণি আমি। শ্রীভক্ত হুনে গুরুগতির ভিতর থেকে আমাকে বর্জন করেছেন। বড় বড় ভক্তেরা আমার মুখদর্শনই করেন না। আমায় সাহায্য করেন না কিছু। ... কেননা, আমি মনকে গতিবদ্ধ করিনি। এবং আমি টাকা দিতে পারছি না, আমি দর্শনে বাইনি, মালা-আসনে জপাণি করিনা, গল্পের বই ইত্যাদি পড়ি, বাজে গান করি ও তাস খেলি। আত্মীয়স্বজন চিঠিপত্র লেখা অনেক কমিয়েছেন বা বন্ধ করেছেন, কেননা আমি টাকা চাই, সেবাযত্ন ও চিকিৎসা চাই। ..." (ঐ)

বসন্তবালায় একটি উক্তি স্বরণ করে এই মনের কথায় হেমন্তবালা লিখেছেন - "হায় বসন! মৃত্যু ভো সকলেরই অবধারিত। তবে তুমি যেমন অজ্ঞান হয়ে গেলে, আমি তা নাও যেতে পারি। কেননা তুমি অপমান ও কষ্ট দিয়ে বাঁচতে চাওনি, কিন্তু আমি তৎসংস্কেও অন্তঃ, অতী বহর বাঁচতে চাই। এই পৃথিবীর আকাশ বাতাস আলো ত্রীত্র জ্যোৎস্না অন্ধকার বিজলীর সমস্ত সেবাওগ্রহণ পেতে চাই। ... ক্রমে ক্রমে ইন্ড্রিয়শক্তি ও মনোবাসনা স্থিমিত হয়ে এসে একদিন ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু এখন কী মজায় আছি! হে ভগবান, আছ নাকি? ... কে তুমি? কে তুমি? ... যেখানেই হোক, আছ তো? নাকি,

সবই মিথ্যা, মায়া? ... যদি থাকে, তবে তুমি আমার সঙ্গী হয়ে এই মজা উপভোগ করো ...' (৫) কতখানি মানসিক মারাত্মকভাবে নিজের জীবনের ট্রাজেডি ও তিক্ততা নিয়ে এভাবে লেখা যায়, তা প্রণিধানযোগ্য। এখানেও যেন শোনা যায় সেই রবীন্দ্রনাথেরই সুর :- 'বিশবে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা। ...'

জগৎ-জীবন ও ঈশ্বর নিয়ে তাঁর এই অবিবর্ত প্রমাণ ও সংশয় তাঁর মুক্তচিন্তা ও জাড়াবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গীই পরিচয় দেয়। মনের কণ্ঠায় যেমন নিজের নাটকীয়তা 'বিস্ত্রি দেখায়' ও তা নারীসুপভ কোমলতা নষ্ট করে বলে 'একটু তক্তিতায দাও' বলে সেই ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করেছেন, যেমন আবার ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কন্ঠা বাসন্তী দেখী লিখেছেন :- "... শেষ দিকে যা বলতেন — আমার মন এখন স্রোতের মতোই পরিভার। ... ভগবান নেই।" ('আমার যা')"

বিশ্রোহ, ধ্বংস, সংশয় ও প্রতিবাদ তাঁর মনে সর্বদা ধূমকিত থাকতো বলেই বোধ হয়, তাঁর রোমান্টিক কবিসত্তা, ভাবুক মন ও সুজননীসভ্য কটর ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক অবরোধের মধ্যেও বেঁচে ছিল। তারই নমুনা হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে পঠানো তাঁর একটি কবিতার অংশ (স্বার্থ) আমরা সবশেষে উদ্ধার করছি, যা-একদা রবীন্দ্রনাথেরই আগ্রহে ('জোনাকী' ছদ্মনামে) 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (মাঘ ১৯৪০) প্রকাশিত হয়েছিল। 'মরনের আগে প্রার্থনা রেখো, প্রিয়, একদিন শুধু একদিন মোরে/কদিন রাখবে বেঁধে নিয়ো/একদিন শুধু পুরায়ে মনের বাসনা/নয়না নয়নে মিলিয়ে দীরঘ ভাষণ/ কল্প অধরে রাখিয়া সাদরে/মিলেটু অমিয় রমণীয়া/যুগযুগান্তে নব নব

কণে/অসিদ্ধাচ্ছ মোর সাধনে/পড়িয়াছে বাধা: এই কীণ বাধাবাদনে/চিরজন্মমের শিখারী দ্বন্দ্ব/চাঁপিয়া গিয়াছি মরম কূচন —/এসেছে বাসর, হৃদয় পূজন/ ধনের কুসুমে রমণীয়/চিরিয়া গিয়াছে দার্প রজনী/কীরিয়া গিয়াছে পাণিয়া/যুগই অলস ভাগর ঘামিহী বাপিয়া/তোমার আমার মিছা সেখাসেখি/ নিহিতে নিহিতে চিরি সেখাসেখি/পূসকে কীরিয়া কীরিয়া। ..."

উল্লেখসূত্র

- ১। প্রচ্যুত চিত্রগ্রন্থ/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (নবম খণ্ড) বিশ্বভারতী প্রকাশিত সর্বশেষ সংস্করণ ১৯০০
- ২। প্রচ্যুত 'সেখসিঁদরী আত্মকথা'/স্বাধীন বাণী (১৯৩৮) 'সংগঠন' কর্তৃক প্রকাশিত।
- ৩। ভাট-এক শব্দ সংখ্যায় (১৯০৭) প্রকাশিত 'অতল বসু' প্রতিবন্ধক 'চৈতন্য ধ্বংস' প্রকাশনা কর্তৃক 'শিখ' পৃষ্ঠা ৩১০
- ৪। প্রচ্যুত 'সেখসিঁদরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় খণ্ড বিশ্বভারতী প্রকাশিত ১৯২২
- ৫। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রচ্যুত — 'পত্রিকাভিত্তি: পত্রিকা/অনুবন্ধ' বসু চৌধুরী-এস এম. এ. প্রঃ ১৯৩৪ ১৯২৪/পৃ ২৪২



চর্মজ

পাং বং রাজ্য চর্ম শিল্প উন্নয়ন নিগম
(পাং বং রাজ্য সরকারের একটি সংস্থা)

পায়ের শোভা

চর্মজের জুতো

মজবুত, টেকসই, রুচিকর সস্তায়।
চটপট সেয়ে নিন পূজার বাজারে।
শারদীয়ার চর্মজের হনকাড়া উপহার।
সকলের মনে তোলা সুরের অংকার।

সুলাভে ও গুণমান চর্মজাত জুতো,
চটি, ব্যাগ ও বেস্ট পাওয়া যায়।

● পূজায় বিশেষ ছাড় ●

গড়িয়াহাট সি. এম. সি. মার্কেট (৫ম তল),
হাওড়া সাবওয়ারী সীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাজার,
কলকাতা স্ট্রিট (গ্রেস নিমেনার নিকট) ও
শ্যামনগর (ফেশন সংলগ্ন):

দক্ষিণাপণ, (ঢাকুরিয়া)।



-এর নতুন বিক্রয়কেন্দ্র
এবং পরিবেশক

দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং

৫৪/৩ কলেজ স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ইন্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোম্পানি

৬৫/২ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা ৭০০ ০০৯



ব্র্যাডম্যানের মৃত্যু : মূল্যবোধের খেলা শেষ

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি. এইচ. হার্ডি ছিলেন একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ (আমাদের শ্রীনিবাস রামানুজান তাঁর ছাত্র ছিলেন)। হার্ডি-র কাছে যে কোনো বিষয়ে চরম উৎকর্ষের মানসপণ্ডের নাম ছিল ব্র্যাডম্যান।

আইনস্টাইন আর পেনিন-কে তিনি 'ব্র্যাডম্যান-কোঠার প্রতিভা' বলে সম্মান করতেন।

আশীষ লাহিড়ী

সেই ব্র্যাডম্যান আজ চলে গেলেম তিরানকই বছর বয়সে, গভীর ঘুমের মধ্যে। পাশে ছিলেন পুত্র আর স্ত্রী। ইচ্ছাপূরে পরিচর্যা করে বলে গিয়েছিলেন, অস্ত্রাঘটি নিয়ে কোনো লোক-সেখানে আদিমোখা বেন না হয়। তাই একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাঁর অস্ত্রাঘটি-অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ অবশ্য তাদের ভালোবাসা উজাড় করে নিয়েছে অন্য এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে। কী জীবনে, কী মরণে এই কিংবদন্তী পুরুষটি অতি যত্নে নিজেকে মিডিয়ায় বেকারুতা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। আজকে যখন ক্রিকেটরদের নাক-সোঁটা কিংবা খুঁচু-ফেলাও টিভি-ক্যামেরার 'ধর্তকা' বিষয়, তখন ক্রিকেট দুনিয়ার সর্বকালের অবিসংবাদিত এই সম্রাট নিজেকে এইভাবে উড়িয়ে রেখেছিলেন কেন? কোন অভিযানে?

উত্তরটা বুঝ পরিষ্কার। ক্রিকেট ছিল তাঁর ভালোবাসার ভিনিস, তাঁর অন্তরের অভিযান্ত্রিকী ও গুস্তাদের কাছে যেমন গান, কবির কাছে যেমন কবিতা। রসজ্ঞের অভিনন্দন তাঁর শিরোধার্য, বাজারের ফড়ের দর-যাচাই নয়। প্রেমিকাকে বাজারের পণ্য করতে তাঁর ঘৃণা বোধ হত। তাই তিনি রিকি অরকে রেখেছিলেন যে ক্রিকেটকে জীবিকা করবেন না। তাঁদের আমলে একটা গোটা টেস্ট ম্যাচ খেলে একজন ক্রিকেটার পেত দশ ডলার! আর অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব শেফিল্ড শীল্ডের (আমাদের রণজি ট্রফির মতো) 'সন্নিধা' ছিল মোটে কয়েক শিলিং। অথচ তিনি কিন্তু মোটেই অভিজাত 'চেটেলম্যান' ছিলেন না। অখ্যাত বাওরাল গ্রামের এক অতি সাধারণ গেরুই ঘরের ছেলে তিনি। পড়াশোনাতেও অতি সাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ কোনেদিন চোখেও দেখেননি। এরকম একজন মানুষের পক্ষে ক্রিকেটকে পুঁজি করে আয়ের গোছানোই তো স্বাভাবিক ছিল। অথচ ঠিক সেটাই তিনি করতে রাজি হননি। কারণ ক্রিকেট তাঁর ভালোবাসার ভিনিস, তাঁর আত্মার অভিযান্ত্রিকী। বিয়ের পর একবার ভেবেওছিলেন ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রফেশনাল ক্রিকেট খেলে পয়সা রোজগার করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি, দেশেই ব্যবসাবাণিজ্য করে অর্থ উপার্জন করেছেন।

একথা ঠিক, অল্প কালের মধ্যেই ভাবের হয়ে ওঠার পর তাঁকে শুধনকার মিডিয়া ছেড়ে কথা কয়নি। স্বভাব-সাজু মানুষটিকে খেলার মাঠের বাইরেও লোকসমাজে দাঁড়াতে

হয়ছে, ভোর করে হাসতে-হাসাতে হয়েছ, ডিউক অব এডিনবারা ক্রিকেট-দক্ষতা নিয়ে ছেঁলো রসিকতা। করতে হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

শেষ পর্যন্ত মিডিয়ায় প্রতি, প্রচার-মত্ততা প্রতি, তাঁর এমনই ঘৃণা ভাঙায় যে বেজ্ঞা-নির্বাসন নেন তিনি। কচিং কচিং কোনো তরুণ প্রতিভার সঙ্গে হয়তো দু পদও কথা বলতেন। যেমন বলেছিলেন শ্যার্পার সঙ্গে।

অথচ এমন শান্তিপ্ৰিয়, মিডিয়া-ভীক বৃদ্ধ মানুষটির প্রতি কী নোংরা আচরণই না করল অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ী সমাজ। তাঁর সুস্পষ্ট নিষেধ থাকে সত্ত্বেও তাঁকে না-ভানিয়ে নতুন মিসেলিনিয়ামে এভিপেড শহরের সবচেয়ে অভিজাত এলাকার নাম দেওয়া হল ব্র্যাডম্যান মার্গ। ব্র্যাডম্যান প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন। তখন ছুটে এল পার্লামেন্ট-মেম্বর-মন্ত্রী ইত্যাদি প্রতীতিরা। হাতে পায়ে ধরে তাঁকে বোঝাল, সারা পৃথিবীতে যখনটা চাইর হয়ে গেছে, কোটি কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে, কাজেই ...। ব্র্যাডম্যান অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিসেন। শত হলেও দেশের মর্যাদা যেখানে ক্ষতি। এইভাবে একবার তাঁর আধা-সম্মতি আদায় করে নিয়েই মাঠে নেমে পড়ল দেশপ্রেমিক বাজারি অর্থনীতির খেলোয়াড়রা। প্রথমে খোলা হল ব্র্যাডম্যান রোডের। সেখানে শ্রায়-বসনহীনা তরুণী পরিচারিকারা মদ্যমাংস সহযোগে আত্মীয়ত করবে খন্দেরদের। ক্ষুদ্র ব্র্যাডম্যান মামলা করলেন। শেষ পর্যন্ত বন্ধ হল নোংরামি। এর পর জানা গেল, ঐ ব্র্যাডম্যান মার্গেই ব্র্যাডম্যান-এর নামে এক প্রকাণ্ড 'যৌন-পণ্য বিপণি' (sex-shop-এর বাংলা তো তাই!) চালু করেছেন এক মহিলা। পবিত্র বাজারি অর্থনীতির ঠেলায় নকই বছরের বৃদ্ধকে আবার মামলা করতে হল। আদালতে বেশ-বেশারায় মুক্তি দিল, ব্র্যাডম্যান মার্গ এখন ভারতীয় সম্পত্তি, সুতরাং 'ব্র্যাডম্যান যৌনপণ্য-বিপণি'-তে যে-ব্র্যাডম্যানের মুখে রয়েছে, তিনি সার জোনাস নন, লোকান খোলা হয়েছে নিছক মার্গের নামে! এর পরেও ধরণী ঝিখা হননি।

ক্রিকেটের নামে, ক্রিকেটকে ভালোবাসার নামে, এই যে বেশরম বাণিজ্য—এরই বিরুদ্ধে এক চূড়ান্ত প্রতিবাদ ছিলেন ক্রিকেটের এই সম্রাট। কুখ্যাত মার্টিন নাইন, চটভলসি ক্রিকেটের শৈনিক মন্ততা, খেলার গতিপ্রকৃতিতে বিজ্ঞাপনের নিলক্ষ হস্তক্ষেপ, গড়াপেটার মোবাইল কারিকুর — এ সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি নীরবে একটা বার্ডা প্রকার করে গিয়েছেন : খেলাকে ভালোবাসে খেলা, বাজারি দুনিয়ার হাতের পুড়ল হয়োনা। আলু বেচো, পটল বেচো, আম্রা বেচো না, স্বপ্ন বেচো না।

আজ তিনি নেই। তিরানকই বছরের বৃদ্ধের চাপেচাপে আর বিস্তৃত করবে না ক্রিকেট-বিপণনকারীদের। এখন শান্তি। মূল্যবোধের খেলা এখন শেষ।

কম্পিউটারে কৃত্ত স্নান

ডুবানীপ্রসাদ সান্ন

ধর্মীয় কুসংস্কারের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মিশিয়ে নিলে সেই কুসংস্কার আরো কত হাস্যকর হয়ে ওঠে তার একটি উদাহরণ পাওয়া গেল ২০০১-এর কৃত্তমেলায়।

পৃথিবীতে হিন্দু নামে পরিচিত মানুষদের একটি বড় অংশই বিশ্বাস করেন যে, বিশেষ তিথিতে বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে স্নান করলে পুণ্য লাভ হয়, আগের সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ জীবনও বিপদমুক্ত হয়। অন্ধ বিশ্বাস এমন একটি প্রেরণা যাতে লক্ষ লক্ষ লোক দীর্ঘদিন ধরে আচ্ছন্ন থাকে এবং তার জন্য নানা কষ্ট সহ্য করেও স্নান করতে ছুটে যায়। পাপ-পুণ্যের তথাকথিত আধ্যাত্মিক ধারণাটিও পুরোপুরি ফাঁকিবাঁধি। স্নান করে নিলে পাপ ধুয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আরো ফাঁকির ব্যাপার। চামড়ার বহিঃস্থ এপিডার্মিস অংশে কি পাপ লেগে থাকে যে, জলে ধুলে তা চলে যাবে? অন্যান্য করলে তার জন্য অনায়াকারীকে শাস্তি দেওয়াই কাম্য। না হলে অন্যায় কাজকে পাপ বলে ধরে নিলে এবং শুধু স্নান করলে তার 'সেধ' কেটে যাবে বলে প্রতিষ্ঠিত করা হলে, অন্যায় কাজকেই প্রস্রাব দেওয়া হয়। খাবারে ভেজাল দেওয়া থেকে শুরু করে নারী ধর্ষণ — সব ধরনের অন্যায় আইনভিত্তিক 'পাপ' কাড় করেও সবাই শুধু ঐভাবে সাগরে বা কুন্ডে স্নান করে নিলে সব সোধ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তাহলে এই ধরনের 'পাপ' কাড় করার অপরাধবোধও থাকবে না। ফলে আরো দুর্ভিক্ষ করার সাহসও অর্জিত হবে। অন্য দিকে 'পুণ্য' জিনিষটি সম্পূর্ণ ধোঁয়াশায ঢাকা পরিপূর্ণ ফাঁকি। একে চোখে দেখাও যায় না, কোনোভাবে অনুভবও করা যায় না। তবু ধর্মীয় কর্তারা তাদের সরলবিশ্বাসী অনুগামীদের এই পুণ্যের গোড সেখানে হাজারো কাক্ষ করিয়ে নেয়। এই সব কাজের মধ্যে ঐ ধর্মীয় নেতার (তথাকথিত অকতার, স্বামীজি, বাবাজি, সাধু-সন্ন্যাসী, অবধূত ইত্যাদি) সেবা করা ও তার জন্য অর্থ ব্যয় করা যেমন আছে, তেমনি বসোপসাগরের উপকূলের বিশেষ জায়গায় ('সাগর') বা এলাহাবাদের গঙ্গায় ('কুন্ড') স্নান করার মত অর্থহীন ফ্রিডাওও আছে। পরিষ্কার কলের জলে বা পুকুর-নদী-তটের নির্মল জলে ভাসভাবে স্নান করার চেয়ে ঐ সব বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে স্নান করা আদৌ বেশি উপকারি নয়।

প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর নানা এলাকায় এইভাবে স্নানের জন্য স্থান-মাহাত্ম্য সম্পর্কিত বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে কৃত্ত মেলা সম্পর্কিত বিশ্বাসটিই মনে হয় সবচেয়ে প্রবল, — অজ্ঞত প্রানার্থী মানুষের সংস্কার বিচারে। এ সম্পর্কিত পৌরাণিক গল্পটি অতি সুন্দর ও মনোপ্রাণী। দেবতা ও দৈত্যেরা মিলে সমুদ্র মন্থন করে এক কলসী (কুন্ড) অমৃত পায়, যা খেলে নাকি অমর হওয়া যায় ও প্রবল পরাক্রমের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু দেবতারা তার ভাগ দৈত্যদের দিতে অস্বীকার করে। ফলে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে দৈত্যরাই ছতী হয়। তাহলে অমৃত তাসেবই পাওয়ার কথা, কিন্তু দেবতারা তাদের দ্রবুত না দেওয়ার জন্য বড়পরিচর। তার জন্য অন্যান্যের আশ্রয় নিতেও তারা শিছপা নয়। দেবরাজ ইন্দ্রের ছেলে ভয়ত তাই দৃষ্টিয়ে ঐ অমৃত-কুন্ডটি নিয়ে চম্পট দেয়। নিয়ে যাওয়ার সময় নাসিক, উচ্ছয়িনী, হবিষ্যার ও প্রয়াগ (এখনকার এলাহাবাদ) এই চার জায়গায় সে নাকি কুন্ডটি নামিয়ে বিশ্রাম নেয়। এই চারটি স্থানই তাই হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থ হিসেবে পরিগণিত হয়ে গেছে। বিশেষ করে প্রয়াগের গঙ্গায় নাকি দু'চার ফোঁটা অমৃত ঢলকে পড়েও যায়, তাই এর স্থান মাহাত্ম্য সবচেয়ে বেশি বলে মনে করা হয়। যদি সত্যিই অমৃত নামে কিছু থেকে থাকত তবে তো ভাবতবর্ষে এত হাজার স্বাস্থী (অর্থাৎ অমর) বেশ কিছু জনের সন্ধান পাওয়া যেত। আসলে গঙ্গা হিসেবে এটি বেশ চিত্তাকর্ষক হলেও তা যে নিছক গল্প এবং তার সঙ্গে বাস্তবকে মেলানোটা যে নিছকই ধর্মীয়, এটি আর ধর্মবিশ্বাস মণ্ডিত মাধ্যম রাখা হয় না। পুরো ব্যাপারটি শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর ভর দিয়েই চলছে। আর তাই অন্ধ বিশ্বাসে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রয়াগ-হবিষ্যার গঙ্গায় স্নানের জন্য ছুটে যান। এত মানুষের আবেগ ও বিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়ার অনিচ্ছা না থাকলেও, এটি অবিতর্কিত সত্য যে অমৃত নামে কিছু ছিল না (যা খেয়ে অমর হওয়া যায়)। এও বিশ্বাস করা হয় যে, দেবতাদের বার দিন মানুষের বার বছরের সমান। তাই অমৃত কুন্ড পিয়ে ফেলে দেবতাদের বার দিন সময় পেগেছিল বলে বার বছর অন্তর ঐ স্নানের পবিত্র সময় নির্ধারিত হয়। আসলে পুরো ব্যাপারটিই বহাধীন কল্পনা ও দ্বিধাধীন অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপার। এর মধ্যে কোনো সাধারণ বুদ্ধি, যুক্তি বা নান্দনিক বিচার বিবেচনার ব্যাপার নেই।

এরই আরো হাস্যকর রূপ দেখা গেল ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে মহাকুস্ত্র মেলার সময়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই সময়ে ধর্ম ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে হাঙ্গির করা হচ্ছে। কুস্ত্রমেলার সময় গঙ্গা-যমুনা (সরস্বতী)-র সঙ্গমে কেউ যদি নাও যেতে পারে, তাহলেও মোক্ষলাভ আটকাবে না। উত্তরপ্রদেশ সরকারের তথ্যবিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় চালু হওয়া একটি হিন্দি ওয়েবসাইটে নাম লিখিয়ে পাসপোর্ট সাইজের ছবি পাঠালেই হবে। সবার জন্য উদ্ভূত এই 'অনলাইন সাইবার কুস্ত্রস্নান' এ বিশেষ পূণ্য সময়ে (যেমন ২৪শে জানুয়ারি মৌনী অমবসায়) এ ব্যক্তির জন্য স্নান কম্পিউটারেই হয়ে যাবে। কারণ উলোকাঙ্কনের মতে এই ধরনের মানের জন্য গঙ্গায় যে যেতেই হবে তার কোনো মানে নেই। বিকল্প (সটিকটি!) বাবস্থাও করা আছে। বাড়িতে বসে কিছু মন্ত্র পড়লে গঙ্গা-ই বাড়িতে চলে আসবে। এমনই মন্ত্রের জোর। 'বিশ্বাসে মিলায়ে হরি, তর্কে কং দূর'।

আর এইভাবে কম্পিউটার-স্নান যে ধোঁকাবাচ্চি নয়, তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য ছবিও সরবরাহ করা হচ্ছে। যেমন ১৯শে জানুয়ারি ২০০১ তারিখের 'দি স্টেটসম্যান'-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই অটলবিহারি বাজপেয়ি ও অমিতাভ বচ্চনের মানরত্ন রত্নী ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। খালি গা, কোমরে গেরুয়া তোয়ালে বা গামছা জড়ান। ব্যাকগ্রাউন্ডে গঙ্গার জল ও জনতার ছবি। স্নান করে গোবেচার মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন বাজপেয়ি ও বচ্চন। দেখে মনে হবে যেন সত্যিই তাঁরা স্নান করে উঠছেন। কিন্তু আসলে কম্পিউটারের কারসাজি।

এইভাবে 'কুস্ত্রস্নান' করে মোক্ষলাভের জন্য ইচ্ছুক ভক্তের অভাবও নেই। শুধু পূর্বোক্ত ওয়েব সাইটই নয়, আরো বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইটেও এইভাবে 'স্নান' করানো হচ্ছে এবং আরো উল্লেখযোগ্য হল, তাঁরা সবাই জানিয়েছেন ১৭ই জানুয়ারি থেকে ২৭শে জানুয়ারির মধ্যবর্তী সময়কালে আর কাউকে নেওয়ার মত অবস্থায় তারা নেই। পুরো সময়টাই ভর্তি হয়ে গেছে। এই সময়কালটা নাকি মোক্ষ-স্নানের সবচেয়ে

'গুড মুহূর্ত' এবং ২০০১-এর এই কুস্ত্র মেলায় নক্সা সমাবেশ এমনই যে ১৪৪ বছর পরে এমনটি ঘটেছে। তাই এত ভিড়। ১৯শে জানুয়ারির স্টেটসম্যানেই এসব তথ্য জানানো হয়েছিল।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেমন একদিকে মানুষের সুখস্বচ্ছন্দ্য বাড়ানো, একদা নুরাণোগ্য প্রাণঘাতী রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করছে সফলভাবে, তেমনি তা ধর্মোচরণ ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে অনুসরণ করার কাজকেও সহজ করে দিচ্ছে। আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কে কিভাবে ব্যবহার করছে সেটিই আসল ব্যাপার। 'নাহলে দর্শনগত দিক থেকে বা তাত্ত্বিকভাবে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পূর্ণ বিশপরীত মেকুর বিষয়। (এখানে ধর্ম বলতে ঈশ্বর তথা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে পড়ে ওঠা



বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা religion-কেই বোঝানো হচ্ছে।) ধর্মীয় নেতারা সম্প্রতিকালে যতই 'বিজ্ঞান ও ধর্মের কোন বিরোধ নেই' জাতীয় গোঁজামিল দেওয়া কথাবার্তা বলুন না কেন,

আসলে ব্যাপারটি কখনোই এই ধরনের হতে পারে না।

বিজ্ঞান পরীক্ষা-প্রমাণ-যুক্তি মধ্য দিয়ে সত্য জানার চেষ্টা করে এবং কোনো-কিছুকেই চরম সত্য হিসেবে ধরে না নিয়ে প্রমাণসাপেক্ষে কোনো তথ্য বা তত্ত্বকে গ্রহণ বা বর্জন করার মানসিকতা পোষণ করে। অন্য দিকে ঈশ্বর-বিশ্বাস বা ঐ ধরনের ধর্মে পরীক্ষা-প্রমাণ-যুক্তির কোনো গুরুত্ব নেই; গুরুত্ব রয়েছে একমাত্র বিশ্বাস, প্রত্নহীন অন্ধ বিশ্বাসের। এবং এক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোনো সন্দেহ বা দ্বিধার জায়গাই নেই। ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন' জাতীয় তত্ত্বকে চরম সত্য হিসেবেই সেখানে গ্রহণ করা হয়। তবু সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ জনবিরোধী শক্তি যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যুদ্ধায় তৈরি ও মানুষ মারার জন্য ব্যবহার করছে, তেমনি ধর্মবাজ, মৌলবাদী জনবিরোধী শক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবিজ্ঞানকে টিকিয়ে রাখা ও মানুষকে প্রতারণা করার জন্য ব্যবহার করতে গুরুত্ব করেছে।

ভিন্ রাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলন

সবাসাচী চট্টোপাধ্যায়

‘হ’ মনে চেনা ... ভুল গয়া, হম্মে সেবা ... ইয়াস রহা, হম্মে করকে সেবা ... সমস্ত গয়া’! হ্যাঁ, এমনটাই ছিল তাদের স্লোগান। তাদের বলতে মহাপ্রদর্শনের বিজ্ঞান শিক্ষা। আরও ভাল করে বলতে গেলে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান যে শুধুই বই পড়ে ‘শেখা’ হয় না, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিখতে হয় — এই আদর্শই একলবোর কাজের চারিত্র্যসূচী।

একলব্বা সংস্থার জন্ম ১৯৮২ খ্রিঃ। তবে এই ধারার কাজের সূচনা তারও একদশক আগে। ‘ককা আর শেবা’র আদর্শে কাজ শুরু ১৯৭২-এ। ঐ বছর মহাপ্রদর্শনের হোসানাবাদ জেলার হোমস্টি কুলে ‘কিশোর ভারতী’ এবং ‘ফ্রেডস্ রুয়াল সেটোর’-এর মাধ্যমে এক বিশেষ ধরনের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হয়। এর পোশাকি নাম ‘হোসানাবাদ সায়েন্স টিচিং প্রোগ্রাম’। পরে এই বিশেষ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির আরো বিস্তার ঘটে, জেলাস্তরে এই পদ্ধতি গৃহীত হয়। এত চাপ নেওয়া ফ্রেডস্ রুয়াল সেটোর বা কিশোর ভারতীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ ফ্রেডস্ রুয়াল সেটোর গ্রামীণ উন্নয়ন এবং স্বনির্ভরতার লক্ষে নানা প্রকল্প নিয়ে কাজ করত। এই হাতে-কলমে শিক্ষা ছিল এদের অন্যতম কাজ। কাজেই পরে শুধুমাত্র এই কাজ করার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই তাগিদ থেকেই এই বিশেষ ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষা সূতৃভাবে চালানোর জন্য ‘একলব্বা’-র জন্ম। এ কাজে অনেক ব্যক্তিই এগিয়ে আসেন; তাঁদের মধ্যে অনিলা সমাগোপালের নাম আলাদা করে করতেই হয়।

কেমন ছিল এই অন্য ধারার বিজ্ঞান শিক্ষা? এর উত্তর খোঁজার জন্য আমরা মূল তথ্যসূত্র হিসেবে নির্ভর করব বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬)-তে প্রকাশিত সুভাষ গাঙ্গুলীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর। সাধারণত প্রতি বছর গ্রন্থের ছুটির সময়ে একলব্বা বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। ১৯৮৫তে উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত এরকম এক

বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন সুভাষগাঙ্গুলী।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে শিক্ষার্থীরা ছিলেন মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আর তাঁদের পেছানো ইচ্ছা বিজ্ঞান বিষয় কী পড়াবেন আর কেমন করে পড়াবেন। মোক্ষা ব্যাপারটা হলে, বর্ণনায়ক বিষয়কে যতটা সম্ভব কমিয়ে পর্ববেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরিসংখ্যান সংগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল বিষয় বোঝানোর চেষ্টা। আর এই কাজে প্রয়োজন হয় নানান শিক্ষাসামগ্রী। তবে সেগুলোর কেন্দ্রটিই কমুলা নয়; হয় কম মুশ্কেল, না হয় বিনা পैसेয় চারদিকে ছড়িয়ে থাকা ভিনিসপত্র (গোলা কলি অথবা নো কলি)।

এই শিক্ষা পদ্ধতিতে সফল করার জন্য একসব বেল কয়েকটি কাজ করেছে: নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন, তার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক (শিক্ষার্থী নির্দেশিকা) রচনা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিক্ষা সামগ্রী (টিচিং-এড্‌স্) নির্মাণ। এই নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয়। পরে মাধ্যমিক স্তরেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শুধু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নয়, এই পদ্ধতিতে সমাজবিজ্ঞান শেখানোর প্রয়াসও নেওয়া হয়েছে।

শুধু বিজ্ঞান শিক্ষা নয়, একলব্বা বিজ্ঞান প্রচারের অন্য মাধ্যমও কাজ করে। যেমন ‘চকমক’ নামে শিশুদের জন্য বিজ্ঞান পত্রিকা বের করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং গণমাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে পাঠানো হয়ে থাকে ‘সোড’ নামে এক বিজ্ঞান বার্তা। এর ফলে পৌঁছে দেওয়া যায় বিজ্ঞান ডাবনার ফলক। রয়েছে একলব্বার শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা — সম্বর্ভ। রয়েছে অন্য প্রকাশনাও। এছাড়া জাঠা (বাছা), প্রশ্নমী, প্রশ্নোত্তর, কর্মশালা প্রভৃতি প্রথাগত পথে বিজ্ঞান প্রচারের কাজও করে একলব্বা। আর রয়েছে ‘ইস্টিভিক’ কাজ — আন্দোলন। যেমন ঘটেছিল ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর, ১৯৮৪তে।

১৯৮৪-র ২ ডিসেম্বর ভূপালে ঘটে ভয়াবহ গ্যাস দুর্ঘটনা। মারা যান আড়াই হাজার মানুষ আর বিবাক গ্যাসে

অক্লান্ত হন পেড়ে লক্ষ মানুষ। সারা দেশের বিজ্ঞানকর্মীরা এই মারণযন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। একদিকে গুরু হয় চিকিৎসা, ঝাড়া, কাসস্থান ইত্যাদি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাসত্ত্বে দাবিতে বিজ্ঞানকর্মীদের আবেদন। অন্যদিকে ছিল দৈবী কোম্পানির শাস্তির দাবিতে আবেদন। পালাপালি দাবি ছিল, যাতে আর এককম দুশ্চিন্তা না ঘটে যে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার। এই ঘটনার ভিত্তিতে নানা বৈধে ওঠে বিজ্ঞান আন্দোলন, মধ্যপ্রদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ান সারা ভারতের বিজ্ঞানকর্মীরা।

মহারাষ্ট্রে বিজ্ঞান আন্দোলনের ঐতিহ্য উল্লেখ করার মত। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে বেশ করেকজন বিজ্ঞান অনুরাণী মানুষের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'মহারাষ্ট্র বিজ্ঞান পরিষদ' সংস্থা। গোড়ার ছিল খুবই ছোট আকারের। পরে তার নিজস্ব ভবন পর্বত গড়ে উঠেছে। সংস্থার সদর দপ্তর মুম্বাইতে। আর সেখান থেকে পরিচালিত হয় সারা মহারাষ্ট্রের বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ। এমনকি এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অল্পপ্রসঙ্গের কোনো কোনো জায়গায় কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। সংস্থার শাখা সংগঠনের সংখ্যা তিরিশ আর সদস্য সংখ্যা আড়াই হাজারেরও বেশি।

বিজ্ঞান আন্দোলনের দৃষ্টি ব্যাঘ্র কাজ করে মারাঠী বিজ্ঞান পরিষদ; বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটানো। পাশাপাশি রয়েছে জন প্রযুক্তি ব্যবহারের কাজ। এই কাজের প্রাথমিক লক্ষ্য হল ছাত্রছাত্রীরা। তাই তাদের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান কর্মশালা যাতে শিক্ষকরাও যোগ দেন। এছাড়া বিদ্যালয় স্তরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এবং প্রস্তাবের প্রতিযোগিতা। কাজ শুরু হয়েছে 'সামগ্রিক রেকর্ডের সেবার' গড়ে তোলার। এখানে বিজ্ঞান প্রচারের চিত্রচিত্রিত উপলব্ধি বই আর পত্র-পত্রিকা নয়, ঝাড়া হয়েছে রাইড, ভিডিও ক্যাসেটও। কিন্তু বিজ্ঞান মানে তো আর শুধু তথ্যের ভাণ্ডার নয়। বিজ্ঞান মানে যাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। গ্রামাঞ্চলে অনেক বিদ্যালয়েই যাতে-কলমে কাজ করার মত পরীক্ষাগার নেই। তাদের জন্যই পরিষদের উদ্যোগ। প্রায়মান পরীক্ষাগার। এতে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন গ্রামে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকছে তেমনই রয়েছে, পাঠ্যবিষয় প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে বোঝানোর ব্যবস্থা।

গুরু ছাত্রদের জন্য নয়। পরিষদ সাধারণ মানুষের জন্য প্রকাশ করে মারাঠী ভাষার বিজ্ঞান পত্রিকা যার নাম 'পত্রিকা'। রয়েছে বিজ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বই প্রকাশনা। আয়োজিত হয় বিজ্ঞান কর্মশালা। নেওয়া হয় নানান প্রকল্প। জনপ্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে সৌর কুকার এবং ধোঁয়াহীন চুড়ির ব্যবহার, পানীয় জল এবং মাটি সংরক্ষণ, শহরে ঘরে বাগানের

প্রকল্প। পরিষদ বিশেষভাবে জোর দেয় স্বাস্থ্য সচেতনতা বিকাশের ওপর। এক্ষেত্রে আবার বিশেষ নজর থাকে নারীদের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্য সমস্যার ওপর। সার্বিক সাক্ষরতা অর্জনে প্রয়াসী মারাঠী বিজ্ঞান পরিষদ। এই উদ্দেশ্যে তারা ১৯৯০ সালে আয়োজন করে 'জ্ঞান বিজ্ঞান জাঠা' -র।

মহারাষ্ট্রে এই ধরনের বিজ্ঞান যাত্রা অবশ্য এটাই প্রথম নয়। ১৯৮২ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয় 'মহারাষ্ট্র বিজ্ঞান যাত্রা'। এর আয়োজক ছিল লোকবিজ্ঞান সংগঠন। এই যাত্রার মাধ্যম ছিল নাটক, গান, ছবি, হাডেল, ফিল্ম, রাইড প্রভৃতি। জেটা শুরু হয় মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের। উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমানো। আলা করা হয়েছিল মানুষ তাদের ভীষন এবং পরিপার্শ্বিকের বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠবেন, বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং সৈন্যবিন সমস্যা মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর সেজন্যই বিজ্ঞান যাত্রায় ছিল 'বিজ্ঞান গল্পো' নামক এক বোমাবুলি প্রস্তাবের এবং আলোপ-আলোচনার আসর। এখানে উপস্থিত জনসাধারণ, স্বাস্থ্য, জল, মাটি, বনা প্রভৃতি বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। উদ্দেশ্য ছিল এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলো যাতে সাধারণ মানুষ কোনো সম্ভেদ না করে তাদের মনের জিজ্ঞাসা মতোতে জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় এই বিজ্ঞান যাত্রা থেকে শুরু হল এমন এক গণবিজ্ঞান আন্দোলন যার প্রধান লক্ষ্য 'সমাজের সর্বস্তরে — বিশেষত মিরকর এবং অধশিক্ষিত অংশের মধ্যে — বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটানো। এই যাত্রা উপলক্ষে জীবনের সর্বক্ষেত্রের বিভিন্ন মানুষ — বিজ্ঞানী, শিক্ষক, প্রমিক, কৃষক ছাত্র এবং অন্যান্য-পারম্পরিক সান্নিধ্যে' এসেছিলেন।

১৯৮৩র জুন মাসে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক বিজ্ঞান যাত্রা। লোকবিজ্ঞান সংস্থার মতে, এসেদের প্রচলিত স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী নয়। আর তাই দরকার বিকল্প কর্মসূচি। এর প্রাথমিক ধাপ নিচ্ছেদের শরীর, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য সক্রিয় ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠা। আর তার পাশাপাশি এই বোধ জাগানো যে স্বাস্থ্য আমাদের এক অধিকার। এই বিজ্ঞানযাত্রায় সাধারণ অনেক অসুখবিসুখ ও তাদের প্রতিরোধ, নারীদের স্বাস্থ্যসমস্যা এবং সে সম্পর্কে নানা প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা, কর্মক্ষেত্রের দৃষ্টি পদ্ধতিগুলোর কারণে প্রমিকদের পেশাপত রোগের ঝুঁকি ও বিপদ, ভেজল ও ঘুঘুর অপব্যবহার

প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এই যোদ্ধাই খাদ্যের যোগ বিবেচনাসহ বিভিন্ন আঙ্গুরের চিকিৎসক, শিক্ষক, সমাজসেবী, শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ, নারীকল্যাণ এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন। কার্যক্রমের মধ্যে ছিল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা হাতে-কলমে করে দেখানো (যেমন — টেটথোডোপ কি করে কাজ করে, রক্তচাপ কিভাবে মাপা হয়, রক্তপরীক্ষা কিভাবে করা হয়, অন্ত্রীক্ষণ যন্ত্রে রক্তকে কেমন দেখায়, প্রসাবে শর্করাভাণ কিভাবে নির্ণয় করা হয় ইত্যাদি), পেশাগত রোগ বিষয়ক ফিল্ম এবং ব্রাইড শো, দূরবীনের সাহায্যে আকাশ সেবা, বিজ্ঞান বিষয়ক বই প্রদর্শন এবং বিক্রি এবং অবশ্যই 'বিজ্ঞান গার্ডো'। কিছু পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। নাটক এবং ফিল্মের বিষয়ের মধ্যে ছিল নারী স্বাস্থ্যের নানান সমস্যা (যেমন রক্তাক্ততা) এবং সেই নিয়ে নানা ধরনের ভুল ধারণা, বৈজ্ঞানিক ওষুধ কোম্পানির ক্ষতিকারক কাজকর্ম, তাদের স্বার্থে অপপ্রয়োজনীয় ওষুধ (যেমন, টনিক)-এর বাড়বাড়ন্ত প্রভৃতি।

এতক্ষণ যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে তা কম-বেশি সারা দেশেই প্রয়োজন। কিন্তু 'বিসিনোদিস'-এর সমস্যাটি পুরোপুরিই আঞ্চলিক। বাড়গ্রামের পাথর-ভাড়া শ্রমিকদের মিলিকাকসিস রোগের কথা আমরা জানি। বিসিনোদিস যেমনই এক পেশাগত রোগ। তুলনাকণা থেকে এই রোগ দেখা দেয়, সূতাকলের কর্মীরা এই রোগে খুব বেশি ভোগেন।

এ থেকেই বোকা যায় বিজ্ঞান আন্দোলনের সামগ্রিক দর্শনের পাশাপাশি প্রয়োজন স্থানীয় সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া। আর সেজন্যই সরকার বিজ্ঞান আন্দোলনের আঞ্চলিক ধারা সম্পর্কে আরো অনুশীলনের। কল্লত মহারাজের বিজ্ঞান আন্দোলন যে নানান ধারায় কাজ করেছে তার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন সংগঠনের নাম এবং কাজের ধরন থেকে।

১৯৮৮ সালে কেরলের ডিক্টেবল পুরমে অনুষ্ঠিত গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সর্বকালের সর্বোচ্চ মহারাজের বেশ কয়েকটি সম্মেলন যোগ দিয়েছিল — ভূমি সেনা আন্দোলন, ওয়ার্থার 'সেন্টার অব সায়েন্স ফর ডিলেজেন্স', কোলাপুরের 'সমাজবাদী প্রবোধিনী', মুম্বাই আই. আই. টি. 'শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ', মুম্বাইয়ের 'সায়ন্স এডুকেশন গ্রুপ'। ১৯৭০এ ওরু হওয়া ভূমি সেনা আন্দোলনের লক্ষ্য প্রাথমিকভাবে আদিবাসীদের জমি উদ্ধার এবং কর্মদাসত্ব থেকে মুক্তি হলেও সে দাবি পূরণের জন্য জোর দেওয়া হয় জীবনের সার্বিক বিকাশের ওপর। আর এখানেই জোর পড়ে শিক্ষার, বিশেষ করে বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার ওপর। ওয়ার্থার কর্মব্যোপারের

সূচনা ১৯৩৫এ গাছীর উদ্যোগে। নামেই এর কর্তাবাদ (গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহার) স্পষ্ট। এই সংস্থার লক্ষ্য জনকল্যাণ আর তা রূপায়ণের পথ জনপ্রভুতি নির্ভর স্বল্প উদ্যোগ। কোলাপুরের সংস্থা আসলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র চর্চার কেন্দ্র। এই বিন্যাচচার পরিপূরক হিসেবেই তারা পত্র-পত্রিকা-পুস্তিকা প্রকাশ, গ্রন্থাগার পরিবেশা প্রদান প্রভৃতি কাজে উদ্যোগী হয় যার উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষাসমৃদ্ধ করে তোলা। ১৯৭৪ সালে ওরু হওয়া মুম্বাই-এর শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদের কর্মধারার মূল লক্ষ্য স্থানীয় ভাষায় (মারাঠীতে) সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং বিজ্ঞানকে আরও বেশি সামাজিক করে তোলা। অবশ্য এ প্রসার তোলা যেতেই পারে যে আই. আই. টি-র মধ্যে সংস্থার কার্যকরত্ব এবং কেরিয়ারস্থানীয়তার মধ্যে বিজ্ঞানীর সামাজিক হয়ে ওঠা কতটা সম্ভব? কিন্তু কার্যত এরা বিজ্ঞান প্রচার, প্রদর্শনী, আলোচনা, প্রসারের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বেশ কিছু কার্যক্রম সার্থকভাবে পরিচালনা করেছেন। 'সায়ন্স এডুকেশন গ্রুপ'-এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৬-এর মাঝামাঝি। উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলা। প্রথমে এই সংস্থা গঠিত ছিল পেশাদার বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের নিয়ে। পরে বিভিন্ন পেশার মানুষ এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন। এদের কর্মধারার মধ্যে রয়েছে সদস্যদের বৈদিক মান বাড়ানোর জন্য সাপ্তাহিক পাঠচক্র, বহির্ভূতে শিক্ষা প্রদান, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদি। এক কথায়, এই সংস্থার লক্ষ্য বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং বিজ্ঞান মনস্তত্ত্বের বিকাশ ঘটানো।

কর্ণাটকের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞান সংগঠনের নাম কর্ণাটক রাজ্য বিজ্ঞান পরিষৎ। ব্যাসাগারের 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স' ক্যাম্পাসে অবস্থিত এই সংস্থাটিই রয়েছে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের 'রাজ্য সমন্বয়কর' দায়িত্বে। সংস্থার প্রতিষ্ঠা ১৯৮০তে। লক্ষ্য দ্বিবিধ : বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব বিস্তার। রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় রয়েছে এর শাখা। যুক্ত রয়েছে বিজ্ঞানী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিৎ, ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্য পেশার মানুষেরাও।

কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান প্রচার। এছাড়া বের করা হয় মাডুভাষা কল্পে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তিকা। রয়েছে নবদল্লর এবং শিশুশিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক পত্রিকা — 'বালবিজ্ঞান'। এতে রয়েছে 'বিজ্ঞে করো', 'বিজ্ঞানের প্রয়োজন', 'বিজ্ঞানের বিশ্ব' জাতীয় বিভাগ। ছোট্টদের জন্য রয়েছে আর একটি মাসিক পত্রিকা — 'বিজ্ঞান মীণ'। এটি মুদ্রিত দেওয়াল পত্রিকা। বইপত্র ছাড়া বিজ্ঞান প্রচারের অন্য উপায় হল

আলোচনা, কর্মশালা, ফিল্ম এবং প্রাইড শো। প্রাইড শোর বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মহাবিধ, নক্ষত্রযুক্ত, শক্তি, অরণ্য ও বন্যপ্রাণী, ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রভৃতি।

পরিবেশের সাবাগুলি প্রতি বছর দুই থেকে চার সপ্তাহ ব্যাপী 'বিজ্ঞান উৎসব' করে, এই উৎসবে বিজ্ঞানের নানা বিষয় এবং পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সেমিনার, পোস্টার প্রদর্শনী, ফিল্ম এবং প্রাইড শোর মাধ্যমে সচেতন করার চেষ্টা করা হয়। পরিবেশের সুরক্ষা বিষয়ে অকণা শুধু উৎসবে নয়, পরিবহন ধারাবাহিকভাবে কাজ করে। নিয়মিত 'পরিবেশ শিবির' আয়োজিত হয়। পরিবহন ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক পরিবেশ নিয়ে কাজ করছে। এর পূর্ণাঙ্গ তালিকা মিলবে Centre for Environment Education, Southern Regional Cell প্রকাশিত 'Environmental Education Initiatives in South India - A Directory' বইতে (ব্যাঙ্গালোর, ১৯৯৭)। কর্তৃক রাজ্য বিজ্ঞান পরিষদের আর একটা বড় কাজ হল টেলিফোন তৈরি করা এবং তা ব্যবহার করে রাতে আকাশ দেখা। এতে শুধু যে জ্ঞান বাড়ে তা নয়, ডাক্তার মহাকাশ নিয়ে নানা রহস্য-কিস্তি, কুসংস্কার, যেমন — হ্যালির ধূমকেতু দেখার সময় (১৯৮৬) ধূমকেতু বিষয়ক কুসংস্কারের ওপর আঘাত হানা হয়। পরিবহন, বিজ্ঞানের নানান পরীক্ষা হাতে-কলমে করে দেখানোর জন্য 'সায়েন্স কিট' তৈরি এবং স্বল্পমূল্যে তা বিপণনের কাজে নিয়োজিত। এক্ষেত্রে অগ্রণী, পরিষদের প্রধান শাখা সংগঠন 'বেলগাঁও বিজ্ঞান কেন্দ্র'।

বেলগাঁও-এর আর একটি সংস্থার কথা বলে এই আলোচনার ইতি টানবো। তা হল 'গ্রাম বিকাশ মণ্ডল'। এর প্রাথমিক লক্ষ্য অবশ্য ছিল বেলগাঁও এবং তার সম্বন্ধিত অঞ্চলের শক্তি-চালিত তাঁত শিল্প (পাওয়ার লুম) সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সংগঠিত করা। এই সংগঠনের কর্মসূচিতে যুক্ত হয় জনশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিজ্ঞানের ব্যবহার এবং বিভিন্ন বিকাশ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কাজ। এই সংস্থা ১৯৭৮-এ গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সর্বভারতীয় সম্মেলনেও যোগ দেয়।

আপাতত আমাদের তিন রাজ্যে বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারার ওপর চোখ বোলানোর পালা শেষ। এবার আমরা চোখ রাখব বাংলাদেশে। সেখানকার বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক রূপরেখা প্রদানের পর আমরা চলে যাব এই ধারাবাহিক আলোচনার শেষ পর্বে — এই বাংলার বিজ্ঞান সংগঠনগুলোর বর্তমান স্থান-স্থিতিতে দেখতে।

ভোট-ছড়া

(দাদাঠাকুর 'মরণ')
চার্বাকানন্দ

১

ভোটের ঢাকে পড়ল কাঠি,
লক্ষিয়ে ওঠে সকল পাঠি,
দেয়াপলিখন গলাবাজি,
সামাল সামাল ভোটের ঘাটি!

২

এসো ভোটের বসো কাছে,
চা-সিগ্রেট মজুত আছে।
ধরেছি হাত (ধরাছি পা-ও),
ভোটটি কিন্তু ঠিকসে মাও!

৩

মোসেমশাই মাসিমায়া,
বলেছি তো স্পষ্ট—
ভোটগুলোতে গিয়ে কেন
মিছে পাবেন কষ্ট?
ভোট যা দেবার সেয়া সারা
না বাড়িতেই অষ্ট,
একটাও ভোটপত্র কিন্তু
হয়নি মিছে নষ্ট!

৪

যাও হে ভোটার বাড়ি যাও,
আবার বুঝি পাড়ি চাও?
ভোট তো সেয়া হয়ে গেছে,
এখানে তোমায় ডেকেছে কে?
কী বলছ — বেতে চাও —
পয়সা থাকে কিনে বাও!

৫

ভোট দিয়েছ বেশ করেছ,
কিনেছ তাই মাথা?
ভোটের আগে কী বলেছি—
মনেই পড়েনা তা!
অমন কথা সবাই বলে,
কাজ হলে উদ্ধার
সকল কথাই রাখতে হবে—
এ বড় আশার!

ইতিহাসের শিক্ষা

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

ধরা যাক কড়িকে কল হল বিজ্ঞানের গুণ একম বছরের প্রধান প্রধান আবিষ্কৃতিকে তালিকাভুক্ত করার জন্য। সেখা যাবে তিনি যে তালিকা তৈরি করবেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আবিষ্কারের উল্লেখ থাকবে যাদের বিজ্ঞানের আবিষ্কার বলে স্বীকৃতি পেতে বহু সময় পেয়েছে। এমনকি সেই সময়কার বহু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী এসব আবিষ্কারকে আজগুবি, বুদ্ধবলি ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে এমন সম্ভাবনা থাকতেই পারে যে আজকের প্যারানর্ভালের ঘটনার তালিকায় হয়ত এমন দুটি একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যাদের হয়ত একম বছর পরে সঠিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার বলে প্রমাণিত হবে। আমরা এই কথাগুলি সাহস করে বলতে পারছি এই কারণে যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন কিছু নিম্ন, দীর্ঘ, জটিল শিকা আমরা পেয়েছি যা আমাদের নত হতে শিখিয়েছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা সেখিই সুপুঙ্খ শতাব্দীতে যান্ত্রিক কলবাহীরা বিজ্ঞানের বিজয় পতাকা বয়ে নিয়ে এসেছেন কিন্তু এই বিজয়গতের সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা বস্তুনিচয়ের অন্তর্নিহিত গুণের মধ্যে নিষ্ক্রিয়তা, যান্ত্রিকতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কেবনা এইসব বস্তুনিচয় কখন তাদের নিজেদের ক্ষমতায় গতি তৈরি করতে পারে না। তাদের গতির মধ্যে নিয়ে আসা তখনই সম্ভব, যখন ঐ একই ধরনের বস্তুনিচয়ের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি করে বা অন্য কোনো অ-পার্বিণ শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে তা ঘটে। এই যে 'অ-পার্বিণ কোন শক্তি'র ধারণা এটা প্রধানত তৈরি হয়েছে 'মানসিক শক্তি'র ধারণা থেকে। আমরা প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে সেভাবে পাখি প্রাণী বা মানুষের প্রাণ ও মন (প্রাণ ও মন যুক্ত হয়ে হয় আত্মা) এক অদ্বিত শক্তির অধিকারী অথচ প্রাণ বা মন কখনই বস্তু নয়। সুতরাং মানুষ বা প্রাণীর ক্ষমতার উল্লেখ এমন কোনো বড় ধরনের আত্ম (ডিভাইন এজেন্সি) থাকাই স্বাভাবিক যিনি বা যীরা এই জগৎসংসার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন। এই সমস্ত ধারণাগুলি ছিল সেই সময়কার প্রায় সব বিজ্ঞানীর জীবনচর্য্য ও প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা সুগঠিত প্রত্যয়। ঠিক একই ধারণার তাঁরা প্রাণী ও মানুষের কোষকলা অধি-স্বক্সা ইত্যাদি সবকিছুকে যান্ত্রিক ও নিষ্ক্রিয় বলে মনে করতেন। এবং বোকা বা বোকানো হত যে 'প্রাণ' বা 'আত্মা' এইসব যান্ত্রিক বস্তুগুলিকে পরিচালনা করে।

ফলে ডাইটালিজম বা অধিপ্রাণবাদের ধারণা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আগেই বলেছি যে নিউটনের বিশ্বজগৎ সম্পর্কে দার্শনিক চিন্তাভাবনায় এই ধরনের 'বোধ' সর্বময়, সর্ববাপ্ত ছিল, ফলে তিনি ভাবতে পারতেন — জগৎসংসারের নিষ্ক্রিয়, যান্ত্রিক বস্তুনিচয়ের মধ্যে গতি সঞ্চার করছেন কোনো ডিভাইন এজেন্সি এবং তাঁর ধারণা ছিল যে 'ক্ষেত্র' (ফিল্ড) হচ্ছে সেই হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। ঠিক এইখানেই লেবনিজের আপত্তি ছিল, কেননা নিউটনের এই 'ডিভাইন এজেন্সি'-র 'মিরাকেলস' সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল যে এসব ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা শিষ্-সংস্কৃতিতে ঢলতে পারে কিন্তু প্রকৃতির কোনো ঘটনায় ওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আজকের দিনের 'চিন্তাশীল মানুষ'র ধারণা এসব বিজ্ঞানীদের কাছে কতখানি অসম্ভব ছিল তা আমরা ভেবে দেখতে পারি:

আজ আমরা চারপাশে বছর পর বছর ও যন্ত্রের মতোকার ধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছি। সেইসঙ্গে কোনো দ্রষ্টব্য শক্তি বা আত্মার ধারণারও বহু পরিবর্তন ঘটেছে: সুপুঙ্খ শতাব্দীতে 'বস্তু' সম্পর্কে ধারণা এমনি সুগঠিত ছিল যে 'চিন্তা', মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র, বিন্যস্তরস এবং কিছু ক্ষেত্রে গ্যাসীয় জিনিসগুলিকে বস্তু মনে করা হতনা, অ-পদার্থ ভাবা হত। পরবর্তীকালে অণুত্ম শতাব্দীতে লা মেট্রি এবং প্রিসলে এই সাহস দেখালেন যে তাঁরা ঘোষণা করলেন সুপুঙ্খ শতাব্দীতে বস্তু ও প্রাণের মধ্যে যে সীমারেখা টানা হত তা ভুল এবং জীবজগতে বস্তু ও প্রাণ একই পদার্থ, এর মধ্যে কোনো ঘরবাড়ীতা নেই।

ঠিক একইরকমভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে একদল বিজ্ঞানী হিপনোটিজমের ওপর : 'সংস্কৃত হুলেন এবং একে 'অচৈতন প্রেরণা' বলে মনে করা হলেও এর সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা এতখানি সম্মেই পোষণ করলেন যে ফরাসি বিজ্ঞানীরা স্যাক্রেটসিয়াসকে দায়িত্ব দিলেন এই 'প্রাণী চূষক' (তখন সম্মোহনকে তাই বলা হত) বিস্ময়িত আলৌ বিজ্ঞানসম্মত কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখার জন্য। এইরকম সম্মেহের কালে তালিকা মেট্রেই ছোট নয়। যেমন আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব, ক্রস-জেনেরিক সংকর, জৈবতপ্তর মধ্যে জিনকঠামোর বিস্তার ইত্যাদি অনেককিছুকেই আজগুবি বা অবিজ্ঞান বলে মনে করা হত। কিন্তু এই সবকিছুকে ছাড়িয়ে বলা যায় সবচেয়ে বেশি থাকা সামলগতে

হয়েছে ডারউইনকে তাঁর প্রকৃতির নির্বাচন ও জীবজগতের বৈচিত্র্যের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এমনকি মৃত্যুর আগের দিন অসি ডারউইন জানতেন যে, অধিকাংশ পদার্থবিদ মনে করেন তাঁর বিবর্তনের তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার সঙ্গে মানানসই নয়। সত্যি তখন খাঁটি বিজ্ঞানের লোকেরা মনে করতেন যে ডারউইনের তত্ত্ব বিজ্ঞান পদব্যা নয়। কেননা সেইসময়কার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য দিয়ে (বিশেষত পদার্থবিদ্যার) ডারউইনের প্রস্তাবিত তত্ত্বকে নিরসনভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছে না।

বিজ্ঞানানুশীলনের আলোচনার স্বার্থে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা সংক্ষেপভাবে একটু আলোচনা করে নিতে পারি। ডারউইন তাঁর তত্ত্ব-প্রকল্প গঠন করার ব্যাপারে দুটি ঘটনার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এর একটি হল পৃথিবীর বয়স কত এক দ্বিতীয়ত বিকর্ভনের মতো দিয়ে প্রকৃতি যে প্রাণীদের একে একে ক্রমাগত প্রাণীতে নির্বাচন করেছে তাতে বিভিন্ন পর্যায়ে কত সময় লেগেছে। পৃথিবীর মত কোনো গোলমাকার বস্তুর ঠাণ্ডা হতে কত সময় লাগবে — এটা জানার জন্য তখনকার দিনের পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব ছিল নিউটনের 'ঠাণ্ডা হওয়ার তত্ত্ব'। তা দিয়ে জানা গেল এইভাবে ঠাণ্ডা হয়ে পৃথিবী প্রাণের বসবাসযোগ্য হয়ে উঠবে, এটা হতে ২৫০ লক্ষ বছর লাগবে। সুতরাং সেই সময়কার বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে বুঝ সহজেই ডারউইনের তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা গেল, কেননা বিজ্ঞানের 'ঠাণ্ডা হওয়ার তত্ত্ব' দিয়ে সূর্য ও পৃথিবীর ঠাণ্ডা হওয়ার পর্যায়কালের অনেক তফাৎ ঘটে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে চার্লস সেল বুঝ সাবধানে মন্তব্য করলেন যে পৃথিবীর মধ্যে তাপ উৎপন্ন হওয়ার সমস্ত উৎসগুলি কী উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা জানে? দেখা গেল সত্যি তা জানা যায়নি। কেননা দুটি বিকিরণ পদ্ধতি থেকে তাপের উৎস, পরবর্তীকালে ১৯০০ সাল নাগাদ আবিষ্কার হল। এর একটি নিউক্লীয় গলন যার দ্বারা সূর্যের তাপ রশ্মিত হই, অন্যটি পৃথিবীর নিম্নের তাপ বিকিরণ যার ফলে পর্বতগুলির সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে প্রাণীর বসবাসের যোগ্য তাপ বজায় থাকে।

এছাড়াও এই শতাব্দীর শেষ পর্বত গাঁড়া পদার্থবিদ্যের জন্য আরও অনেক বিষয় অন্বেষণ করে গেল। ১৮৯৯ সাল নাগাদ ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বকে, ব্র্যাক বডিংর কপানোত্ররূপে পল্লির বিকিরণকে অণুবাদ থেকে বাঁচানোর জন্য ম্যাক্স ব্র্যাক তাঁর কপাবিদ্যার পরিমাপাধিক রশ্মির তত্ত্ব প্রস্তাব করলেন। এটাকে অন্য পদার্থবিদরা বিজ্ঞানের কিছুতে যত্ন বড় বেইমানি আখ্যা দিলেন। এর থেকেও বারোপ হল 'ইলেকট্রন' কণার আবিষ্কার। জে. জে. টমসন কেমব্রিজ কিসলকিক্যাল সোসাইটির প্রিন্সিডিস-এ তাঁর প্রথম পদকোপাত্র পেল করলেন। তাতে তিনি বললেন এমন একটি কণাকণ্ড তড়িৎ-আধিত কুণ্ড কণার সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন,

যার ভর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর থেকে এক হাজার গুণেরও কম। এটাকে বিজ্ঞানীরা এক 'মহাণুগাণবী' আখ্যা দিলেন। কেননা উনবিংশ শতাব্দীর পরমাণুবাদীরা হাইড্রোজেন পরমাণুর থেকে কুণ্ডতম কোনো কণার কণুগত অস্তিত্ব কখনও করতে পারতেন না। সুতরাং এটা অনুমান করতে কষ্ট হয়—না যে বিজ্ঞানীর সংশয়বাদিতা কীভাবে মতান্তরাত রূপান্তরিত হয়।

অস্পষ্ট চেতনাবোধ

এইসব আলোচনা থেকে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বিজ্ঞানের যে প্রচলিত অনুসন্ধান পদ্ধতি (পরীক্ষা — পর্যবেক্ষণ — সিদ্ধান্ত) তা থেকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। বিশেষ করে প্যারানর্মাল ঘটনাগুলির থেকে যখন দাবি করা হচ্ছে যে প্রকৃতির খাঁটি ঘটনা হিসাবে তাদের বিজ্ঞানের চৌহদ্ভিতে জায়গা করে দিতে হবে। কেননা কেউ কেউ এমন দাবি করতে পারেন যে দেখাই যাচ্ছে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবেশিক সত্তা, বিশেষত যুগের কালের পরিপ্রেক্ষিতে।

বোকা যাচ্ছে, আমাদের অবস্থাটা শাখের করাতেই মত যেখানে অভিবিক্ত সংশয়বাদিতা মতান্তরাত গৌড়মিতে পর্যবেক্ষিত হচ্ছে। কতটুকু যথাসম্ভাব্যে জানা সম্ভব তার একটি সীমারেখা গঠন করা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে সেইসব প্যারানর্মাল ঘটনার দাবির উল্লেখও থাকবে যেখানে আমাদের বলতে হবে যে বিজ্ঞানের বর্তমান জ্ঞানের মধ্যে থেকে আমরা এইসব ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করতে পারছি না। এছাড়া একটা কথা মনে রাখতে হবে যে 'বিজ্ঞানের প্রত্যয়' কথটা বুঝ অদ্বত শোনালেও তা বাস্তবিক ও যুক্তিগ্রাহ্য। কেননা বিজ্ঞানীরা এই প্রত্যয় গঠন করেন কণ পরিপ্রাণে, কণ গবেষণার একঘেয়ে ক্রান্তিকর সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। যাকে আমরা বিজ্ঞানের সারাংশের বলি। কেননা অনেক উত্থানপতনের পরও বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কার আমাদের ভাবনায় উদ্ভল হয়ে আছে। যেমন করে নিউটনের বিজ্ঞানের ভাবনা এতবছর পরেও আমাদের 'বোহর' ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এটা স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে বিজ্ঞানের 'লক্ষ্যশূন্য গতি' এখনও আমাদের কাছে অস্পষ্ট ও অজানা এবং এই অস্পষ্টতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস প্পষ্ট হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি গতি বড় হয়েছে। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে এমন একটা অবস্থা সব সময় থাকবে যখন গতি ও পারের অবস্থা, অস্পষ্ট বিষয়গুলি আমাদের প্যারানর্মাল ঘটনা হিসাবে আমাদের চোখে পড়বে। তবে একথাও ঠিক যে এইসব অপরিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের আকর্ষণি ঘটনাগুলি ও তার অদ্বত দাবি লাগু সম্পর্কে বেশি মাথা না ঘামানই ভাল কেননা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ভাবনাচিন্তা মিলিয়ে যাবে। ততদিন বিজ্ঞানীদের অত্যন্ত প্রহরীর মত বিজ্ঞানের এই পূর্ণ রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে।

[চলবে]

ব্যারেল ব্যারেল কেরোসিনের অপচয় বন্ধ করুন, মশাল আর নয়

জয়ন্ত দালাল

শ্যাম পূজো—শান্তিপূরের মশাল কাশীপূজো। কাশীনাথকুর বিসর্জনের রাতে ডাকাতকাশির সঙ্গে জ্বলন্ত মশালের মিছিল নাকি শান্তিপূরের ঐতিহ্য এবং প্রথা? আর এই প্রথাকে রক্ষার তাগিদে একটা ছোট খাটো সভাও করে ফেললো সম্প্রতি কতিপয় মশাল কাশীর উদ্যোক্তা।

যেহেতু অসম্ভবসম্মত পাত্ত অঙ্ককার রাজ্যকে আলোকিত করে শান্তিপূরে কাশী প্রতিমা নিরঞ্জন শুরু হয় প্রথম — সর্বাঙ্গীক আর্চান এবং বৃহদায়তনের দক্ষিণাকাশী মূর্তি আগমেখম্বীর বিসর্জনের রাতে। বিজলীবাতি বিহীন সেই মুণের সঙ্গে সহজেই মনিয়া যেত — অপেক্ষাকৃত কম বরচে বেশি আলো দেওয়া ঘুটে কেরোসিনের সাহায্যে জ্বালানো সেই মশাল। এর অনেক পরে, দেশ ভাণের প্রাক্কালে শান্তিপূরের কাশী মুখার্জী মাঠের মাঠে ব্যারোয়ারী প্রথায় পূজো হতে শুরু হয় বামাকালী মূর্তি, যা ডাকাতকাশী নামেই সর্বাধিক পরিচিত। এই কাশী প্রতিমা পূজার পরের রাতে নিরঞ্জন সময়ে ব্যবহৃত হতে শুরু হয় ব্যাপক সংখ্যক জ্বলন্ত মশালের মিছিল। এর পর থেকে আসতে আসতে ক্বারোয়ারীও শুরু করে ডাকাতকাশী পূজো এবং পত শত জ্বলন্ত মশালের মিছিল।

পূজো এবং পূজোকে কেন্দ্র করে উৎসবে মাতোয়ারা হওয়া—এ ছিল কাশিলী জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আর এখন উৎসবের মানে হৃদয়হীন লক্ষ্যহীন রক্তহীন অজুহাতের উদ্ভাস সন্ধান? তাই দেখা যাচ্ছে, পূজো ডাঙা ধর্মের ব্যক্তিগত আত্ম সামাজিক যুক্তি ও মান্যতা পূজো। অকর্মণীয় কাজেটের আত্মজরিতা নিয়ে প্রকৃত হচ্ছে বেশ কিছু পূজো কমিটি। অসং অবিবেচ পথে অর্জিত টাকার পূজো মহত্ব পাচ্ছে—বিশিষ্ট ব্যক্তির সর্ব উপস্থিতিতে। তাই শান্তিপূরের কাশী পূজার বিসর্জনের রাতে কম করেও বিশ হাজার সিটার কেরোসিন আর হাজার হাজার বক্স ঘুটে অপচয়কারী এবং ভয়ঙ্করভাবে পরিবেশকে বিধিবে দিয়ে চলে যাওয়া ওই মশাল মিছিলকে কেউ কেউ ঐতিহ্য, প্রথা বলে উল্লেখ করছেন ও সেই প্রথাকে বজায় রাখার জন্যে সচেষ্ট হচ্ছেন। প্রশাসনের বিভিন্নস্তরে যাওয়া আসা করছেন। কাশী পূজার ভাসনের রাতে ডাকাতকাশী দ্বারা মশাল নিয়ে বের করে তাদের মধ্যে

আমার, আপনার সবার ঘরেরই ছেলেরা থাকে কম বেশি, এসব অধিকাংশই থাকে অপ্রকৃতিস্থ, মনের ফোয়ারা ছোট শহুরে! তো এটাও কি ঐতিহ্য? এক সময়ে সর্দার, গৌরীদান হতো। তো সেওলোও কি ঐতিহ্য ছিলো? সেই কুপ্রথাওপিত্ত কি সমাজসংস্কারকরা আশ্বাশন্য করে তুলে দিয়ে তুল কাচ করে গিয়েছেন?

শান্তিপূর থেকে প্রকাশিত তিনটে সংবাদ পত্রিক এই কুপ্রথা — ভয়ঙ্কর মশাল মিছিলের বিরুদ্ধে সর্ব বর্নিন ধরে। সর্বব এখানকার বেশ কিছু গুডবুন্দি সম্পন্ন মানুষ এবং কয়েকটি বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠনও। ২০ সাল থেকে কাশাপপাড়ার ডাকাতকাশী, তার পরের বছর থেকে কাশী মুখার্জী মাঠের ডাকাতকাশী এবং আগমেখম্বী কাশী পূজো পরিচালন সমিতি মশাল মিছিল বন্ধ করেছেন। এদের দেখাশোনা আরও বেশ কয়েকটি গুডবুন্দি সম্পন্ন ডাকাতকাশী পূজো কমিটি মশাল মিছিল থেকে বন্ধ করেছেন। জনগণের আবেদনে এবং বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠনের প্রতিবাদের ফলে প্রশাসনও বহুদৈ সতর্ক হওয়ায় অনেক পূজো কমিটি মশাল বন্ধ করলেও দুঃখের কথা, এখনো বেশ কিছু ডাকাতকাশী কমিটি প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মশাল মিছিল বার করে চলেছেন।

তাই প্রশ্ন জাগে, প্রায় ধীরে ধীরে হ্রাসিত হতে থাকা এই মশালকে যারা ঐতিহ্যের নামে আবার চালু করার স্বপ্নকে দাঁড়ালে—ভাড়া কারা? ধর্মের নামে এই সুড়ঙ্গ কি না দিলেই নয়? ঐতিহ্যের জন্মে যদি মন কাঁদে—তাহলে আসুন না আমাদের পর্ব এবং গৌরব শান্তিপূরের কথা ভাবা, যে ভাষা বাংলা সহিত্যের ভাষা—সেই ভাষা আজ বিধ্বস্ত, তাকে রক্ষা করি। আসুন না আমাদের ঐতিহ্য কবি কল্পনাদান, কাব্য বিনোদ, নির্যাসে লাইভীডের স্মৃতিবাঁধ সম্প্রতিওঙ্গো প্রমোটাররা ধ্বংস করে দিলো—সেওলোকে রক্ষা করে তাঁদের স্মৃতি রক্ষা করি। তাইবা তো আমাদের ঐতিহ্য। এরকম ঐতিহ্য শান্তিপূরের বন্ধ আছে—সেওলো যাতে বজায় থাকে তার জন্যে একান্তভাবে সচেষ্ট হই। সরকারের কাছে দরবার করি। তা সে সব না ভেবে কাশীপূজার প্রার নিজে যাওয়া মশালকে ঐতিহ্য বলে কেন আবার জ্বালানোর চেষ্টা করছেন?

ভূজ ভূমিকম্প : প্রাসঙ্গিক ভাবনা

ডুবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গত ২৬শে জানুয়ারি, সময়টা ছিল সকাল পৌনে নটা, সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট শিশুরা যখন ব্যাণ্ডের সঙ্গে পা মিলিয়ে গাইছে ‘এমন দেশটি কোথাও বুড়ে পায়ে নাহো তুমি’ তখন দেশের পশ্চিমপ্রান্তে কয়েক হাজার শিশু পাখর চাপা পড়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিতে লড়াই করেছে। হ্রত অধিকাংশেরই কিছুক্ষণ পরেই ত্ত্ব হয়ে গেছে চিরকালের জন্য। বৃকের হৃদপিণ্ডের ধুক ধুক শব্দটা। মৃগটা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির। মাত্র দু’বছর ক’মাস আগেই পোখরানে পরমাণু বোমা ফাটিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়ঢাক বাজানো হয়েছে। আবার কোনো কোনো শহরকে ‘উচ্চ প্রযুক্তি নগরী’ বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞান নিয়ে কত চিন্তা-ভাবনা সবই ধমকে মাড়িয়ে থাকে দরজা বন্ধ বাতানুকূল প্রেক্ষাগৃহে। তা গিয়ে আর পৌছতে পারে না বান-বন্যা, ভূমিকম্পের কাছে, অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করা মানুষলোর কাছে। ভূজ ভূমিকম্পের শেষ হয়ে যাওয়া মানুষদের শেষ নিশ্বাসের সাথে দীর্ঘশ্বাস পড়ে বিজ্ঞানেরও। কারণ সেও তো অসহায়। ২৬শে জানুয়ারি, দু’হাজার এক সালের ভূজ ভূমিকম্প ভারতের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দীর্ঘ তালিকায় এক নতুন সংযোজন।

গত এক দশকে ভারতবর্ষে যে কটি ভূমিকম্প হয়েছে তার মধ্যে এই ভূমিকম্প হল সবচেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক। ১৯৯১ সালে উত্তর কান্ধী, ১৯৯৩ সালে লাটুর, ১৯৯৯ সালে চামোলি ভূমিকম্প, উত্তর কান্ধী ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৬ রিখটার স্কেল এবং নিহতের সংখ্যা ৭৬৮ জন। চামোলি ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৮, নিহতের সংখ্যা ১০০-র একটু বেশি। কিন্তু ১৯৯৩ সালে মহারাত্রের লাটুরে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৩, নিহতের সংখ্যা ৭,৬০১ জন। গত ২৬শে জানুয়ারি ভূজ ভূমিকম্পের তীব্রতা ভারত সরকারের হিসাব অনুযায়ী ৬.৯ রিখটার, মৃত্যুর সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি বলে অনেকের ধারণা। এই চারটি ভূমিকম্পের তীব্রতা প্রায় কাছাকাছি কিন্তু অনেক বেশি মানুষ মারা গেছেন সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে। স্বাভাবিকভাবে ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেশি। একটি কারণ হলো ভূজ এলাকাটা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ। অধিকাংশ বাড়ি ঘর ছিল শাকা। এই কারণেই শহরাক্ষরে মৃত্যুর



সংখ্যা গ্রাম্যাক্সের তুলনায় বেশি। আসলে কোনো ভাষণগাতে ভূমিকম্পে ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে যেমন ভূমিকম্পের প্রকৃতি, তীব্রতা, উৎসকেন্দ্রের থেকে দূরত্বের উপর, তেমনি নির্ভর করে সেই অঞ্চলের মাটি, শিলার প্রকৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপাদানের উপর।

আমেরিকার বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ এইচ. এফ. রিড ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তার এই ব্যাখ্যা ‘ইলাস্টিক্ রিবাউন্ড থিয়োরি’ নামে পরিচিত। পৃথিবীর গঠনের উপাদানগুলির মধ্যে বিভিন্ন অংশে পার্থক্য দেখা যায়। সেই অনুযায়ী তিনটি আলাদা অংশে পৃথিবীকে ভাগ করা যায় — ক্রাস্ট, ম্যান্টল, কোর। ক্রাস্ট হল পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের অংশ এবং একে ‘ভূত্বক’ও বলে। রিডের তত্ত্বের মূল বিষয় হল যে ভূত্বকের শিলা স্তরগুলির উপর ভূ-গাঠনিক কারণেই (tectonic causes) চাপ পড়ে। শিলাগুলির চাপ সন্থ করার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এইভাবেই চাপের মাধ্যমেই শিলার মধ্যে শক্তি জমা হতে থাকে। নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেলে শিলায় ফটল ধরে এবং ফটল বরাবর দুটি অংশে ভেঙে যায়। এইসময় শিলার থেকে কম্পন শক্তি বেরিয়ে ভরসের মাধ্যমে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে সমুদ্রের তীরে এবং ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। একইভাবে সেই ভরস্রও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ভরস্রই ঝাঁপিয়ে তোলে মাটিকে।

বিজ্ঞানী রিড এই তত্ত্বের জন্য ১৮৫০ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন ভূ-গাঠনিক ঘটনা

বিস্তারিত করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন শিলার মধ্যে শক্তি ক্রমা হ্রাস ধারাবাহিকভাবে এবং ধীরে ধীরে। ১৯০০ এবং ১৯০২ সালে এই অঞ্চলে ভূমিকম্প রিডের তত্ত্বকে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। এর থেকেই বোঝা যায় ভূমিকম্প হঠাৎ হলেও প্রক্রিয়াটির প্রকৃতি ঘটে দীর্ঘ এক সময়কাল ধরেই।

যদিও কিছু কিছু ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানীর মতে ভূমিকম্পের আগাম কোনো আভাস পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত জাপান, চীন, আমেরিকা, রাশিয়ায় এ বিষয়ে কিছু উন্নত পরীক্ষা হয়েছে। যেমন ১৯৭৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার হোলিস্টারের কাছে ৫.২ তীব্রতার একটি ভূমিকম্পের আগাম আভাস দেওয়া সম্ভব হয়ে ছিল। ১৯৭৩ সালের মাক্সারভি নিউ ইয়র্কের অভিরণজ্যাক পর্বতমালায় একটি ছোট ভূমিকম্পের আগেই পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, তারমধ্যে একটির মাত্রা ৭.২ রিখটার স্কেল।

১৯৬০ সালের মাক্সারভি রাশিয়ার দুই বিজ্ঞানী ১৯৫৪ সালে সাইবেরিয়ার গার্ম অঞ্চলের ভূমিকম্পের পর্যালোচনা করছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, যে কোনো বড় ভূমিকম্পের আগে কয়েকটি কম মাত্রার ভূমিকম্প হয়। অর্থাৎ বড় ভূমিকম্পের আগে ভূ-কম্পনের বিভিন্ন তরঙ্গগুলির গতিবেগের অন্বাভাবিক পরিবর্তন হয়।

ওই দুই বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে শিলার উপর যখন চাপ বাড়তে থাকে তখন চূড়ান্তভাবে ভাঙার (rupture) আগে ছোট ছোট ফটিলের সৃষ্টি হয়। শিলার আয়তনও বাড়ে। ফটিলের জন্য শিলার মধ্যে শূন্যস্থান তৈরি হয়। ধীরে ধীরে ফটিলের মধ্যে ভৌমজল (ground water) ঢুকে যায়। ফলে শিলার মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহন তৈরি হয়। এটি পরীক্ষা-যন্ত্রসমূহাই নির্ণয় করা সম্ভব।

এছাড়াও চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন, ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন রূপের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভূ-বিজ্ঞানীরা শিলার প্রকৃতি, গঠন এবং চাপের সাথে শিলার গঠনের পরিবর্তনের সময় ও পরিমাণ থেকে ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকায় আগের থেকে একটা ধাক্কা পেতে পারেন।

কীভাবে বিজ্ঞানীরাও ভূমিকম্পের আগে প্রাণীদের মধ্যে আচারণ-স্বভাবের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। এই পরিবর্তন চীন এবং জাপানে কয়েকটি ভূমিকম্পকে আগের থেকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। সাপ, ইঁদুর, বিড়াল, গরু, হরিণ, এমন কি কচ্ছপের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন ধরা পড়ে। যেমন ১৯২০ সালে চীনের হাইয়ুয়ানে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৮.৫ রিখটার। ভূমিকম্পটি হয় শীতকালে। শীতকালে সাপেরা গর্তেই থাকে। কিন্তু ভূমিকম্পের আগে কং সাপ গর্ত থেকে

বেরিয়ে এসেছিল বলে শোনা যায়। কুকুরেরে অন্বাভাবিক চিংকার, চড়াই পাখির এসোপাখাড়ি ওড়া চোখে পড়েছিল। প্রাণীদের ভূমিকম্পের বিষয়ে বিশেষ অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ এখনও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা যায় নি। ফলে অনেকেই এই বিষয়ে একমত মনে। ভূত-ভূমিকম্পেও গির জরগোর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা গেছে যে প্রাণীদের মধ্যে অন্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করা যায় নি।

১৮১৯ সালের ১৬ই জুন ওজরাটের কচ্ছ এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই সময়ও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভূজ নগর। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালের ২১শে জুলাই আনন্দের অঞ্চলে অল্পমাত্রা ভূমিকম্প হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ভূ-বিজ্ঞানী ভূ-কম্পনের মাত্রা অনুযায়ী ভারতবর্ষের মানচিত্র তৈরি করেছেন। সেই মানচিত্রেও ভূজ এলাকাকে সবচেয়ে বেশি তীব্র ভূমিকম্পের সম্ভাবনার অঞ্চল হিসাবে দেখানো হয়েছে। কাজেই ভূমিকম্পের কারণে ভূজ অঞ্চলে যে বিপর্যয় ঘটতে পারে তা কারুর অজানা ছিল না। সঠিক পর্ববেক্ষণ ও সূচিকৃত বাস্তব পরিকল্পনা এই বিপর্যয়ের মাত্রাকে কমাতে পারতো।

প্রশাসকদের এই দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাতে ভোলেন নি গার্মের ক্ষমতাস্বার্থী মানুষের দল। তাই কুস্তমেশ্বর এক সম্মানী সর্বশ্রেণে ঘোষণা করেছে — সাধুসন্তদের তপস্যাই ওই এলাকাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে বিশেষ করে কুস্ত অঞ্চলকে। আসলে কুস্ত মেলাই ছিল ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু, তার নিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে সাধুসন্তদের উপস্থিতি (দ্য টেলিগ্রাফ, ২৮শে জানুয়ারি ২০০১)। কিছু কিছু অঞ্চলে তথাকথিত ধর্মওচ্ছরা ভূমিকম্প নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণীর কাজটিও চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে বিজ্ঞানী, গবেষক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সরকারি দপ্তর, মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, পৃথিবীর অন্যতম বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান থাকতেও বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র পারমাণবিক বিস্ফোরণ, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বিংবা তথা প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায়, সেখানে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত হয় তথাকথিত ধর্মওচ্ছরের মতো মধ্যস্থণীয় বিজ্ঞান বিরোধী চিন্তাভাবনা। তাই পকাশের দশক থেকে যখন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয় তখন বিজ্ঞানী মেঘনার সাহা তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। হয়ত সেদিন তিনি বুঝেছিলেন যে বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির সামাজিক পারদর্শিতাকেই পক্ষান্তরে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে আনা হচ্ছে। এই সময়ের অভিজ্ঞতাও তাঁর চিন্তা ভাবনার থেকে আলাদা কিছু নয়।

ভুল ধারণা এবং বাস্তব সত্য

যে—কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার ফলে বাণক আতঙ্ক বিজাতি ওজব ছড়িয়ে পড়ে। কব ভুল ধারণায় মানুষের দুরবস্থা এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থা আরো বেড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা মাথায় অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করা এবং বিপর্যস্ত মানুষের ও স্থানীয় প্রশাসনের ভুল ধারণা দূর করার জন্য প্রকৃত সত্য প্রচার করা বিপর্যয়ের সময় অত্যন্ত জরুরী কাজ। আমাদের দেশের তথ্য-প্রচার সপ্তর থাকলেও সময়মত এই জরুরী প্রচারের কাজটা হতে দেখা যায় না। জাণুয়ারির ওজরাত ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এই প্রয়োজনীয় প্রচারের কাজটি করেন; ইন্টারনেট মারফৎ আও কর্তব্য ও ভুল-ঠিক ধারণা বিস্তারিত অঞ্চলের সরকারি বেসরকারি সংস্থাদির কাছে নৌছে পেওয়া হয়। যদিও কার্যক্ষেত্রে ক-এর এই প্রচার ও পরামর্শের প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে আমরা দেখিনি।

ভুল ধারণা

বাস্তব সত্য

- ধ্বংসকাতোর পর বিশেষ চিকিৎসক দল ও বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্যকর্মী অবশ্য দরকার, অপরিহার্য।
- শ্রেণ, কলেরা ইত্যাদি মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে।
- অতাবিত দুখটনায় বিহুল তত্ত্বিত দুর্গতজন এতটাই অসহায় বোধ করে যে নিজেদেরও বাঁচানোর বদলে বেজ্ঞ-সেবকদের সাহায্যের ভরসায় সব ছেড়ে দেয়।
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লগুভও হলে জনসাধারণ ঔশুখল, লুটেরা ও অমানবিক হয়ে ওঠে।
- ভূমিকম্প বা এই জাতীয় বিপর্যয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তারপর আর অত তৎপরতার দরকার হয় না।

- বিপর্যয়ের সাথে সাথে স্থানীয় ডাক্তার ও কর্মীরা চিকিৎসার কাজে এগিয়ে আসেন। কেবল যে-মেশে বা অঞ্চলে কোনোরকম চিকিৎসাব্যবস্থা নেই, সেখানেই বিশেষি সহায়তার আক্যকতা থাকে।
- মহামারী কখনেই আপনি-আপনি ছড়ায় না, মৃতদেহ থেকেও সহজে রোগ ছড়ায় না। প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে মৃতদেহ সংকার, জল নিকাশ, পয়ঃপ্রণালী ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দ্রুত হস্তক্ষেপ দরকার হয়। মানুষকে সচেতন রাখতে হয়।
- বরং উৎপেটাই ঘটে। মানুষ জাতিধর্ম বিচার না করে ঈশিয়ে পড়ে দুর্গতকে বাঁচাত। ১৯৮৫ সালে মেক্সিকা সিটি ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা এবারেও হরোত ভূচ-এ। বেজ্ঞাসেবকদের কাজে উশুখ হয়ে হাকলারা হুটাত মানস নতুন শক্তিতে দু'হাতে ধ্বংসস্থাপ সরিয়াড়ে।
- না, সামগ্রিকভাবে এরকম কখনই দেখা যায় না। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সমাজবিরাোধী দুর্ভারের সুযোগ দিতে পারে কিন্তু সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষ পরতঃপূর্ততঃ এবং দরদের সাথে দুর্গত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ান।
- একেবারেই ঠিক নয়। দীর্ঘ সময় লাগে মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হতে। স্থানীয় প্রশাসন সাধারণত দুখটনার পরবর্তী কয়েক সপ্তাহে ত্রাণ-সাহায্য ও প্রত্যাগ পুনর্বাসনে অর্থব্যয় করে থেকে যায়। তখন দীর্ঘিত দুর্গতদের দিকে নজর কমে। যে মেশে এরকমটা ঘটে, সেখানেই ধ্বংসেধী সংস্থা ও বিশেষি সাহায্য দীর্ঘকালীন পরিচর্যার সহায় হয়। বাস্তবে তাই দেখা যায়।

সূত্র : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বুলেটিন 'Earthquake in Gujrat-India, Humanitarian Assistance', ৩০ জানুয়ারি ২০০১।

সংকলন □ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

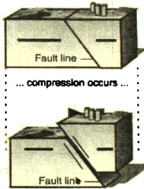


থর থর থর কাঁপিছে ভূধর

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যেন অলিখিত লড়াই চলে। মানুষ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে মস্ত কিছু করবে, আর প্রকৃতি তাকে ভুলুটিত করবে, এটাই যেন রীতি। মানুষকে কাবু করার অন্যতম প্রাকৃতিক প্যাচ ভূমিকম্প। গুজরাটে ভূজ, ভারুচ, সুরাট ইত্যাদি মহাত্বকম্পে ধ্বংসস্থাপে পরিণত হল। মারা গেল লক্ষাধিক মানুষ ও অন্য প্রাণী। কাগজে রোজ ফলাও করে সে খবর ছাপা হয়েছে। খবরের মধ্যে এসেছে রিখটার স্কেলের কথা, এপিসেন্টার, ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা ইত্যাদি শব্দাবলী। কী এসব শব্দের মানে, ভূমিকম্প কেন হয়, এর হাত থেকে পরিত্রাণের কি কোনো উপায় নেই ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর হাতড়ালে দেখা যাক কী মেলে।

ভূমিকম্পের কারণ — সহস্র যুগযুক্ত বাসুকী নাগের মাথায় চেপে আছে পৃথিবী। বাসুকী মাথা নাড়ালেই কঁপে ওঠে পৃথিবী। এ জাতীয় বহু লোককাহিনী ছড়িয়ে আছে নানা দেশে। লোককাহিনীর কথা বাম দিলে আর যে যে কারণে ভূমিকম্প হতে পারে তার মধ্যে আছে পাহাড় থেকে বরফ বা পাথরের মস্ত টাই গড়িয়ে নেমে আসা। যাকে ল্যান্ড স্লাইড বা আভালাঞ্চ বলে। আঘেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে মাটি কাঁপতে পারে। ভূগর্ভে নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণেও সৃষ্টি হতে পারে ভূমিকম্পের। তবে এগুলোর সঙ্গে গুজরাটের ভূমিকম্পের যোগ নেই।

ভূমিকম্পের কারণ নিয়ে একাধিক বৈজ্ঞানিক মত পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মতটি নিয়েই



আমরা আলোচনা করব। ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন, গড়ে প্রতি মিনিটেই নাকি ভূমিকম্প হয়। কিন্তু তা এতই কমজোর যে প্রচণ্ড অনুভূতিশীল যন্ত্র ছাড়া ধরা মুশকিল। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল এখন তেতে আগুন। তরল আর আধা-তরলে ভর্তি। বাইরেটা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাপ ছড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। কেন্দ্রে তরল পদার্থের ওপর রয়েছে আধা-তরলের স্তর। তার ওপর কঠিন। কিন্তু এই কঠিন স্তর এক নাগাড়ে নেই। আছে খণ্ড খণ্ড অবস্থায়। এই খণ্ডগুলোকে বলা হয় 'টেকটোনিক প্লেট'। ভূবিজ্ঞানীরা এরকম আটটি প্লেটের কথা অনুমান করেন। একশো কিলোমিটার পুরু এই টেকটোনিক প্লেটগুলো আধা-তরলের ওপর ভেসে রয়েছে। ভেসে থাকার জন্য ওরা স্বাধীন। এদিক-ওদিক বেড়াতে যেতে পারে। যদিও ওদের মোরাফেরা বা নড়াচড়ার বহর খুবই কম। বছরে বড়জোর এক থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার।

পদার্থ বিজ্ঞানে তাপ পরিবহনে পরিচলনের (কনভেকশন) কথা আছে। উনুনে চাপানো জল এভাবে গরম হয়। পাত্রের একদম তলার অংশের জল গরম পেয়ে হাল্কা হয়। ওপরে ওঠে। ওপরের ভারী জল নেমে আসে নিচে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পাত্রের পুরো জলটা গরম হয়। তাপের এই চলাফেরাকে পরিচলন স্রোত বা কনভেকশন কারেন্ট বলা হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল অংশে পরিচালন স্রোত চলছে। এরই রেশ গিয়ে পড়ে ভাসমান টেকটোনিক প্লেটগুলোর ওপর। ওরা নড়াচড়া করতে থাকে। নড়াচড়া করতে গিয়ে দুটো প্লেটে ঠোঁটোঙতি হলেই কেলঙ্কারি। শুরু হয় কাঁপনি। ধাক্কাধাক্কিতে অংশ নেওয়া প্লেটগুলোর ধারের দিকের

অংশে কম্পনের হার হয় বেশি। এই কম্পন ক্রমশ ধীরে চলে ওপরের দিকে। ভূ-পৃষ্ঠে উঠে আসার পর আবার ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ভূব পেরা কেউ যখন ভূস কণে তেমে ওঠে, তার ওঠার ধাক্কা তাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে জলের তরঙ্গ। পুকুরে গেলে যা সহজেই চোখে পড়ে। ধাক্কা যত জোর, কম্পন তত বেশি, ধ্বংসের মাত্রা ও পরিধিও তত বেশি।

উপকেন্দ্র (এপিসেন্টার)— মাটির গভীরে, যেখানে টেকটোনিক প্লেটগুলোয় সংঘর্ষ বাধে, সেটাই হল ভূমিকম্পের কেন্দ্র (সেন্টার)। এই সেন্টার ধরে সোজা ভূপৃষ্ঠে উঠে এলে যে অঞ্চলটা পড়ে তাকেই বলে এপিসেন্টার বা উপকেন্দ্র। গুজরাটের ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ভূক্ত, তার মানে ওই অঞ্চলের নিচে পাওয়া যাবে উৎস কেন্দ্রকে। কেন্দ্র যত নিচে হবে ভূমিকম্পের জোর ততই কম হবে।



রিখটার স্কেল— অনেকের ধারণা এই স্কেলেই কুর্কি ভূমিকম্প ধরা পড়ে। তা নয়, ভূমিকম্প ধরা পড়ে সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে। সিসমোগ্রাফ থেকে পাওয়া সর্বোচ্চ সীমার সঙ্গে ভূমিকম্পের শক্তির সম্বন্ধ আবিষ্কার করেন মার্কিন ভূতত্ত্ববিদ রিখটার। তাঁর নাম থেকেই রিখটার স্কেল। এই স্কেল থেকে ভূমিকম্পের জোর কতটা ছিল, মানে ভূকম্পনে কতটা শক্তির প্রকাশ ঘটেছে, তা বোঝা যায়। যেমন গুজরাটে ভূমিকম্পের মাত্রা ৬.৯। হিসেব করে দেখা গেছে রিখটার স্কেলে ৬.৫ মানে তা আড়াই লক্ষ টন টি এন টি বিস্ফোরণ শক্তির সমতুল। ভূমিকম্পের মাত্রা ছয়ের বেশি হলেই ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মক হতে থাকে। এখনও অবধি জানা ভূমিকম্পের মধ্যে সর্বোচ্চ মাপ হল ৮.৯।

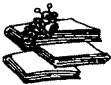
ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা— বিজ্ঞানীরা কয়েক হাজার উপকেন্দ্র বুঝে বার করেছেন। তা থেকে তাঁরা দুটো প্রধান

ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করেছেন। প্রথম বৃত্তটি হল হিমালয় পর্বতশ্রেণী এবং কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী ঘুরে, পামির ও ককেশাসের ওপর দিয়ে আকস পর্বতমালা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। তারপর অটলান্টিক উপসাগরের তলা দিয়ে মেক্সিকোতে গেছে। সেখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এসেছে। এটাকে 'হিমালয় ও আকস পর্বতীয় মেঞ্চলা'ও বলা হয়। দ্বিতীয় বৃত্তটি শুরু হয়েছে জাপানে। তারপর চীন, আসাম, ব্রহ্মদেশ, মালয় ও বঙ্গোপসাগরের পূর্ববংশের ওপর দিয়ে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্নিও হয়ে নিউজিল্যান্ডে পৌঁছেছে। সেখান থেকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার আন্ডিজ পর্বতমালায় এসেছে। আন্ডিজের ওপর দিয়ে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম ধার দিয়ে আলাস্কায় এসেছে। এই বৃত্তের নাম 'প্রশান্ত মহাসাগর বেষ্টিত মেঞ্চলা'।

পূর্বাভাস— ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোতে মানমন্দির তৈরি করা হয়েছে সতর্ক নজরদারির জন্য। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রকে আরও উন্নত করা হচ্ছে। চীন দেশের ভূবিজ্ঞানীরা পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যাপারে দারুণ সফল হয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে। লিয়ানওনিং প্রদেশে ভূমিকম্পের অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। হাজার হাজার লোককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা গেছিল ভূমিকম্প গুরু ১০ ঘণ্টা আগে। ঘরবাড়ি ভাঙলেও প্রাণহানি হয়নি। তবে এমন পূর্বাভাসের আর নজির নেই। পশুপাখি কীটপতঙ্গের আচরণ নিয়েও বিশ্বের পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। তবে তাতে আশানুরূপ ফল মিলছে না।

করবীর কী?— ভূমিকম্পের সঙ্গেও আগে পাবার চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি বাস্তবিকজ্ঞানীরা তৈরি করছেন এমন বাড়ি যা বড় ধরনের ভূমিকম্পেও ভেঙে পড়বে না। চীন-জাপানে আগে কাঠের বাড়ি তৈরি করা হত। এখন আকাশচোঁড়া বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তিয়েন-সান পর্বতে নারিন নদীর ওপর টোকটোওই নামে উঁচু বাঁধ ও ১২০০ মেগাওয়াট পাওয়ার স্টেশন তৈরি করা হয়েছে এমনভাবে, ভূমিকম্পে হার কোনও ক্ষতি হবে না। তবে সব বাড়িই তো এমনভাবে তৈরি করা সম্ভব নয়। তাছাড়া অর্থসোভী প্রমোটররা তো আছেই। তারা ভূমিকম্প সহ্য করার ন্যূনতম নির্দেশাবলীও বহুতল তৈরির সময় মানে না। যার উদাহরণ গুজরাট। ঠিকমত তৈরি হলে ধ্বংসের পরিমাণ এত ব্যাপকতার আকার নিত না।

সমীরকুমার ঘোষ



সাহসী প্রয়াস

নিশীথ স্মরণে

নিশীথের 'রোদ্দুর'-এর কলক সেখলাম আবার, বেশ অনেকদিন পর। আর 'রোদ্দুর' পত্রিকার এই স্মরণ সংখ্যাটি মেখে আনন্দবোধকে ছাপিয়ে মন খারাপ বেড়ে গেল — নিশীথ চৌধুরীর জন্য।

আমাদের, উৎস মানুষের, এবং সমমানসিকতার আরো অনেক ছোট আদর্শনিত সংগঠনের, অকৃত্রিম একাঘ হয়ে যাওয়া বন্ধ নিশীথের কথা বলছি। যে ছিল, এখন আর নেই। অথচ আজকের এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অঙ্ককার সময়ে নিশীথের মত নির্ভেজাল আলোকিত দৃষ্ট বিখ্যাসের 'মানুষ'টির থাকা বড় দরকার ছিল। আমাদের সকলের জন্য। মাত্র ৩৮ বছর বয়সে, দু'বছর তিন মাস আগে দুরারোগ্য অসুখে বিস্তর দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা পেয়ে হাসপাতালের বেড়ে শুক হয়ে যায় চিরকালের মত, আমাদের এই দুর্লভ বহুচি।

নিশীথের মত আপাত-নিরীহ, প্রশান্ত, প্রচার-বিমুখ, মিডিয়ায় নজর-বর্জিত, এক আশুত্ম প্রতিবাদী প্রাণবন্ত যুবকের মৃত্যুর পর তাকে ভুলে যাওয়াই নিয়ম। নিষ্ঠুর সময় ভুলিয়ে দিতে ওড়াম। কিন্তু 'রোদ্দুর' নামের পিটল মাগাজিনের যে ছিল জন্মদাতা তার স্মৃতিকে নিভিয়ে দেওয়া সহজ নয়। কৃতিত্ব নিশীথের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর, যারা প্রচুর শ্রম ও দরদ দিয়ে নিশীথ-পরিচালিত 'রোদ্দুর'-এর শেষ সংখ্যাটি ('শেষ' পড়তে কষ্ট হয়) প্রকাশ করেছেন সেই বাগনানের খালোড় থেকেই — জানুয়ারি ২০০১-এ। এই 'নিশীথ চৌধুরী স্মরণ সংখ্যাটি নিশীথকে নিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ দলিল। পরিচিতদের স্মৃতিচারণ, মূল্যায়ন, গল্প, কবিতা, চিত্রিত্র, নিশীথের জীবনপঞ্জী এবং অবশ্যই ওর বিশ্ব্কারক ফুলের মত ছড়া-কবিতা নিয়ে এ এক বৃক্ক আঁকড়ে রাখার মত সংখ্যা।

অ. ব.

'রোদ্দুর' নিশীথ চৌধুরী স্মরণ সংখ্যা

প্রকাশক - বন্দনা চৌধুরী
খালোড়, পোঃ বাগনান, হওড়া ৭১১ ৩০৩
কলকাতায় — হেমন্ত ভবন (৪র্থ তল)
১২, বি বা দী বাগ, কলকাতা ১
দাম ১২ টাকা

ভারতের মানবতাবাদী সমিতির মুদ্রণ 'মানবজমিন' হাতে (পেলাম)। (বিমানিক) পত্রিকাটির এটি প্রথম বর্ষ এবং প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি ২০০১)।

আলোচনা শুরু হয়েছে 'জ্যোতিষ বনাম জ্যোতির্বিদ্যা' নিয়ে। আধুনিক প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যের সাথে সাথে সমান ভালে কৃসংস্কার মানুষের মনের অক্ষিত পলিতে মিশে থাকছে। দিকৃষ্টি-কোষ্ঠী, ভাগ্যগণনা, গ্রহমন্ত্রের প্রতি মানুষের মন এখনো ভয়ঙ্কর রকমের দুর্বল, বিচ্যাবহীন। জ্যোতিষশাস্ত্র আস্তী বিজ্ঞানসম্মত কিনা এই লেখায় তার স্বকপ উদঘাটন করা হয়েছে। বিতীয় লেখা 'বিজ্ঞান আন্দোলনে রাজনীতি'। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া বিজ্ঞান আন্দোলন সফল হতে পারে কিনা, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের সম্পর্ক কী — এ প্রশ্নের উত্তর বোঝা হয়েছে এই লেখায়। স্বপ্নে মৈববুধ লাভের রহস্য নিয়ে রয়েছে তৃতীয় লেখা। স্বপ্নে ওষুধ পাওয়ার পেছনে প্রকৃত ঘটনা কী, এসব প্রশ্নের উত্তর মনোবিজ্ঞানের আলোকে আলোচিত হয়েছে এই লেখায়। 'শেওড়ায় লিভে নাগ-নাগিনীর ভর' : এই ঘটনার পেছনের রহস্য এবং প্রতারণার অনুসন্ধান করা হয়েছে সবাসরি শেওড়ায় লিভে গিয়ে তলস্তের মাধ্যমে। পঞ্চম লেখা হেমিওপ্যাথি বিজ্ঞান না অবিজ্ঞান। হেমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগমুক্ত হওয়া যায় কিনা ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই লেখায়। শেষ লেখা 'ভিয়েতনাম : একটি স্বপ্নের সমাধি'। রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোকে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের জনগণের পড়াই, যা সারা পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের মনে লড়াইয়ের ধারণা বৃগিয়েছিলো, তার পর্যালোচনা রয়েছে এই লেখায়।

মানুষের মনে লুকিয়ে থাকা অঙ্কতা, কৃসংস্কার এসবের বিরুদ্ধে চেতনা জাগ্রত করার এক হাতিয়ার এই পত্রিকা। যা সকলের পড়ার প্রয়োজন রয়েছে। লেখাওলি সহচ সবল ভাষায় রচিত। ছাপাও যথেষ্ট ককমকে। প্রচ্ছদই প্রমাণ করে নিচ্ছে এই পত্রিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র "মানুষ" ও সমাজ।

মিত্রা রায়

'মানবজমিন'

ভারতের মানবতাবাদী সমিতি
সম্পাদক : চিত্রবঙ্কন পাল, বাক্সেল দল, সূতপা বন্দোপাধ্যায়
২৬, সুরিপাড়া লেন, বাগবাড়ার, চম্বননগর,
হুগলী ৭১২ ১৩৬
দাম ৮ টাকা

প্রান্তিসংবাদ

□ মুখপত্র চেডনা/ দশম বর্ষ জুন-আগস্ট ২০০০
সংখ্যা/সম্পাদক সুরেশ কুণ্ডু/ বিধানপল্লী, মহাশয়গ্রাম, উ.
চব্বিশ পরগণা/দাম ৮ টাকা।

বাংলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা রয়েছে এই সংখ্যার অর্ধেক রচনায়। বিজ্ঞান আন্দোলনের বিবিধ মাত্রা, ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন, নিজস্ব অভিমত রেখেছেন — শ্রীশ্রী ভট্টাচার্য, জয়সেব দে, দীপক কুমার দী, বিজ্ঞান রত্নদী, ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মিহিরলাল রায় এবং সুরেশ কুণ্ডু। অনেক সমালোচিত, বিক্ষিপ্ত, পুনরাবৃত্ত বক্তব্য রয়েছে লেখকদের মধ্যে। একটা 'সামিৎ আপ' ছাড়া এই নবীন আন্দোলনের চরিত্র-চিত্রণ বেশ দুর্বল। তবু, আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লেখকের লেখা একত্রিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ রয়েছে এই সংখ্যায়। পরিপ্রসঙ্গাধ্য তথ্যসমৃদ্ধ রচনা, তবে একাত্তীয় লেখা খুব বেশি সুখপাঠ্য হওয়া মুশকিল, ঠিক যেমন 'গণস্বাস্থ্য' থেকে পুনর্মুদ্রিত ডাঃ নৃপেন চৌমিকের বাংলা চিকিৎসা পরিভাষা নিয়ে রচনটি। অন্যয় ভট্টাচার্যের 'পরিবেশ দূষণে উদ্ভূত ছাই' ছোট কিন্তু ভালো লেখা।

□ অলৌকিক নয় বিজ্ঞান — বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার পুস্তিকা। প্রকাশক, বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া, উ.
২৪ পরগণা। দাম ১ টাকা, সাহায্য ১ টাকা।

'সমাজকে বিজ্ঞানমুখী ও বিজ্ঞানকে সমাজমুখী' করতে অসীকারবদ্ধ কাঁচরাপাড়ার বিজ্ঞান দরবার 'অলৌকিক নয় বিজ্ঞান' নামে একটি চটি বই প্রকাশ করেছে। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সমাজোপযোগী এই পুস্তিকার বিষয়গুলি নির্বাচনে তারা নানান পত্র পত্রিকার সাহায্য নিয়েছে যেগুলি বিভিন্ন সময়ে এসব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়সূচিতে রয়েছে :—

মহত্ব, তথ্য-কবজ, ব্যপ্ত মারার বুদ্ধকল, বাস্তব পোকা, শ্যাম্পুর ব্যবহার, রক্ত-চিকিৎসা, জটিল (ন্যাবার মালা), জলাতজ, বাপের কামড়ের চিকিৎসা, হরলিকস, কমলান, দুকোন-ডি, বেকিমুড। বোকাই যাচ্ছে বিজ্ঞানের বুদ্ধি দিয়ে মানুষের অস্বাভাবিক বিকাশ কটানোর চেষ্টা। যাতে ব্যাপক সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া যায় তাই বই-এর আয়তন যেমন ছোট, দামও তেমন নিম্নাত কম। প্রকৃতই গণবিজ্ঞান চিন্তা প্রসারের সহায়ক কাজ এটি।

□ ডোরের আলো/ আখিন ১৪০৭, সেপ্টেম্বর ২০০০/রামনগর রাও হাইস্কুল, বালিসাই, মেদিনীপুর/ সম্পাদক — সুশাসিন্দ্র মাইতি ও অন্যান্য।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক সূচেনির এটা নয়, রীতিমত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য প্রবন্ধ পত্রিকা। সম্পাদকের বক্তব্য অনুযায়ী —

'সাহিত্যানুগামী ছাত্রসেব (এবং শিক্ষকসেবও নিশ্চই) বৃত্তঃ'ফুট ডাবনারে' প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয় 'ডোরের আলো'। নানা কারণে অনিয়মিত প্রকাশন। তবে বর্তমান সংখ্যাটি বেশ কিছু ভালোমত রচনায় রীতিমত পুষ্ট। গোটা পঞ্চাশেক কবিতা রয়েছে — খুব উচ্চমানের নয় অধিকাংশই। এগারোটি গল্প : সুখপাঠ্য অধিকাংশই। দুটি ভ্রমণ কাহিনী। কাইশ-ডেইশটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধ রচনায় ডাবার সাবলীলতার অভাব একটি পরিচিত ঘটনা। তবে বিষয়বৈচিত্র্যে প্রগতিশীল চিন্তার ছাপ আছে আট-দশটি প্রবন্ধে। সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সাহসী, সুপরিচিত প্রবন্ধ তাপসকুমার কান্না'র 'ব্যয়ঃসঙ্গিকাল ও বৈশিষ্ট্য'। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে যে বিষয়টি শিক্ষকরাও গোপন রাখেন অথচ রাখা উচিত নয় প্রকৃত শিক্ষা ও মানসিক সুস্থায়ের কারণে, সেই বৈশিষ্ট্য বিষয়েই তাপসবাবু অনাম্যসে সহজ সত্য তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। কাজটি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্থী।

□ নানাচোষ প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র / সম্পাদক — সেব্রত মণ্ডল / প্রকাশনা সহযোগিতা — গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি/পরিবেশক 'শেখা', মহাশয় গাড়ী রোড/ প্রকাশ—৩১ জানুয়ারি ২০০১/ দাম ৮০ টাকা।

বোর্ড বীথি ল্যামিনেট করা একশ ছোটমিশ পৃষ্ঠার বই হলো দাম অনুযায়ী আকর্ষণীয় নয়। তবে বিষয়গত প্রসঙ্গ এই বই-এর মূল্য অপরিসীম। জীবিতাবস্থায় যে মাটির-কাছের অবহেলিত, প্রকৃতিতে আশ্রয়, বিজ্ঞানীটিকে প্রাপ্য মর্যাদা প্রায় কেউই নেননি, প্রায়ত অবস্থায় সেই গোপালচন্দ্রকে নিয়ে স্মৃতির বন্যা বইয়ে সেন প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানলেখক। সেই বইয়ে কয়েকটি নিবন্ধ এবং ২টি কবিতা রয়েছে বইটিতে। বড় কম কথা নয়। এত মানুষ গোপালচন্দ্রের প্রতি অধিকারের দিনে কোথায় ছিলেন কে জানে! তবু ভালো, সম্পাদক সেব্রতবাবু স্বয়ং পরিশ্রমে এই বিবলশ্রেণীর প্রকৃতি-বিজ্ঞানীর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্থ নিবেদনের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তবে বক্তৃতা বানান ভুল, ছাপার গোলমাল, প্রচ্ছদের ল্যামিনেশনও ভালো নয়। আরেকটু যত্ন দেওয়া কি যেত না?

□ অপ্রতীক রবীন্দ্রনাথ, মূল্যের হুড়ানো মূল্য/অলকবরণ কস্টোদুর্গী। প্রকাশক — কৌরব, ২৫এ এগ্রিকা বাগান, জাহাঙ্গিরনগর ৮০১০০২। প্রকাশ — ফেব্রুয়ারি ২০০১। দাম ৪০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের অন্তরের অন্তহলে বিরাজ করেন। তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত নন এমন বসভাবী পূঁজো পাওয়া যাবে না। শুধুপি এখনো তাঁর অপ্রকাশিত রচনা একটা দুটো করে প্রকাশিত হয় নানা ভাষাপার। এই বিরাট মানুষটির রচনা ভাষাবের কটকটুই বা আমরা জানি! সেরকম কিছু জ্ঞানো মূল্যে প্রাচীন পাতুলিপি খেঁটে, রীতিমত একদিক পণ্ডেবগায়, লেখকের এই গ্রন্থিতকরণের কাজ দারুণভাবে প্রশংসনীয়। এর অসংখ্য বিচিত্র ছোট-বড় রচনার পরিচয় গ্রন্থটি পাঠে না করলে কেওয়া সম্ভব নয়।



প্রসঙ্গ : গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবে নতুন মাত্রা

যথার্থি উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ২০-২১শে জানুয়ারি আমাদের 'নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব' এর বিংশতি বর্ষ উদ্‌যাপিত হল। আমাদের এই সামাজিক ক্রীড়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরো গোটা চারেক এলাকায় গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব শুরু হয়েছে। সর্বত্রই দেখছি মহিলা দর্শক, মহিলা অংশগ্রহণকারী — তুলনামূলকভাবে পুরুষদের থেকে অনেক বেশি। কোনো কারণে যদি ক্রীড়া উৎসব বন্ধ হয়ে যায় তবে সবচেয়ে বেশি অভাববোধ করবে মেয়েরাই। মুসলিম মহিলারাও শুধু দর্শক হিসাবে নয়, প্রতিযোগী হিসাবে ভূমিকা রাখছেন।

আমাদের এই বিশ বছরের ক্রীড়া উৎসবের ইতিহাসে একটা উল্লেখ করার মত ঘটনা রয়েছে। আমাদের নারায়ণপুর গ্রামের মেয়ে রাধালক্ষ্মী, দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে। ও যখন ক্লাস সেভেনে পড়ে, তখন ওর বাবা মারা যান। সাথে সাথে ওর পড়াশুনাও বন্ধ হয়ে যায়। সংসারের ছোট ভাইবোনদের আহার

ও পড়াশুনার যোগান দিতে ওর মা মাঠে মাঠে বাটতে শুরু করে। আর রাধালক্ষ্মী রাধাকালার ঠাঁয়ে ঠাঁয়ে বিভিন্ন বৈধ সংসারে দু'পচসা যোগান দিতে থাকে। বছর আটেক পর ওর মা-ও মারা যান। তখন থেকে রাধালক্ষ্মীর একান ওপর সংসারের ভার। ভাই যখন কড় হল এবং কিছু কৃত্তিরোধগার করতে শিখল তখন ভাইকে প্রথম বিয়ে দিল। প্রায় বছর দুয়েক হল ও নিজে বিয়ে করেছে নারায়ণপুর থেকে প্রায় ছ'কিলোমিটার দূরে অননন্দপুর গ্রামে।

বিয়ের আগে আমাদের ক্রীড়া উৎসবে প্রতিটি বছর ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। গত বছর ডামাই-মেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ ছিল। এবার ও নিজে অননন্দপুরের মহিলা-পুরুষদের সংগঠিত করে গত ২৩শে জানুয়ারি ক্রীড়া উৎসব উদ্‌যাপিত করেছে। আমরা কয়েকজন সারাদিন মাঠে উপস্থিত ছিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম পুরুষপ্রধান সমাজে বছর দুয়েক আগে আসা মেয়েটিকে গ্রামের পুরুষ ও মহিলারা তাদের ক্রীড়া উৎসবের মুখা সংগঠক হিসেবে সাগ্রহে যেন নিয়েছে। আমাদের ক্রীড়া উৎসবের কিল বছরের ইতিহাসে রাধালক্ষ্মীই প্রথম মহিলা যে নিজ উদ্যোগে এলাকার মানুষের সহযোগিতা নিয়ে একরূপ ক্রীড়া উৎসব সংগঠিত করল। আমাদের আশা ও বিশ্বাস ওর উদ্যোগ দীর্ঘতর উদাহরণ রাখবে।

নিরঞ্জন বিশ্বাস
নারায়ণপুর
ছাওলিয়া, নদীয়া

DECLARATION বিধিসম্মত ঘোষণা

প্রকাশক	করণ ভট্টাচার্য (স্ব.)
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	বি ডি ৪৯৪, স-ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪
প্রকাশস্থান	ঐ
প্রকাশকাল	বি-মাসিক
বছাধিকারী	সচিব, 'উৎসব মানুষ' সমিতি (করণ ভট্টাচার্য)
ঠিকানা	বি ডি ৪৯৪, স-ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪
মুদ্রক	করণ ভট্টাচার্য
মুদ্রণস্থান	শৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৪
সম্পাদক	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (স্ব.)
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	ঐ

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে সত্য।

স্বাক্ষর করণ ভট্টাচার্য
প্রকাশক

- ৭



হয়েছে

□ উৎস মানুষের নবতম প্রকাশ ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিষ কি আসলো বিজ্ঞান?' বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার ৪-১০টায়, কলকাতা বইমেলা প্রাসাদে

সেমিনার হলে। চমৎকার আর্জিট, পরিনীলিত অঙ্ক সরল সাধারণ অঙ্গিকে রোভার সারাক্ষণ আকৃষ্ট করেছিলেন। সম্মেলক রঞ্জন দত্তের পর প্রকাশকের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিরা অঙ্গালক শিবনারায়ণ রায় ও শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের হাতে নতুন বই সমর্পণ করেন লেখক অমলেন্দুবাবু। সীমিত সময়ে প্রতিনিয়ম সহজ বক্তব্য রাখেন অমলেন্দুবাবু, শিকারায়ণ রায় ও উৎস মানুষের একান্ত শুভানুধ্যায়ী 'প্রতুলদা'।

□ ডেভিড হেয়ার-এর ২২৫তম জন্মবার্ষিকী পূর্তিদিবস ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১। প্রায় বিশ্বিতি ও অবহেলার অন্তরালে চলে যাওয়া এই সর্বভাষা সাহেব-মানুষটির অবহৃত রক্তিত সমাধি রয়েছে কলকাতার কলেজ রোডের 'এর দক্ষিণ প্রান্তে, করণ এক অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে। সাধামত কাড়পোছ করে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিস্তম্বে মালাদান আর পুখ অর্পণ করা হল ১৭ তারিখ বিকেল সাড়ে তিনটায় সময়। নির্দিষ্ট কোনো সংস্থার উদ্যোগে নয়, 'প্যানিক' উৎস মানুষ, সুব্রতনাথ কলেজ ছাত্রসংসদ, বিশ্বকোষ পরিবদ এবং কিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তির সম্মিলিত উদ্যোগে এই ছোট মূল্যবান অনুষ্ঠানটি উদ্বোধিত হল।

□ পশ্চিমবঙ্গের বেঙ্গালসেবী প্রতিষ্ঠান জনসংহতি কেন্দ্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষের জন্য ষাট পরিষেবা অব্যাহত রেখেছে। এই জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের মিলনভোদে গড়ে তেগো হয়েছে মাষিক ষাট শিবির। এই শিবির থেকে গ্রামের গরিব মানুষরা দাঁত, চোখ এবং চর্মরোগ সহ সাধারণ রোগের চিকিৎসার সুযোগ পায়ছেন। এই সপ্তাহে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কুলপি, মধুরাপুর, পাথরপ্রতিমা ব্লকে ৫টি ষাট শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার মধুরাপুর ২ম ব্লকের নগেন্দ্রপুর অঞ্চলের আমরিয়া গ্রামে এক চোখের চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ৬৫ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং গুরুতর ক্ষেত্রেরা দেওয়া হয়।

□ ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ বেহালার শিবরামপুর ফ্রেডস সোসাইটি খ্যাত লাইব্রেরির উদ্যোগে আয়োজিত হল 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শীর্ষক বিজ্ঞান প্রদর্শনী। চন্দননগরের ভারতের মানবতাবাদী সমিতির পরিচালনার এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন স্থানীয় অঞ্চলের গ্রাম ভেদে হাজার মানুষ। আড়াই

ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে শুধাকবিত 'অলৌকিক' ঘটনা ঘটয়ে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির বিজ্ঞানসম্মত কারণ ব্যাখ্যা করা হয়।

□ ২-১০ জানুয়ারি ২০০১ বাংলাবেডিয়া জি.এস.এফ.পি. মূল মরদান অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় বার্ষিক শৌহাদ্য উৎসবের অঙ্গ 'শৌহাদ্য মেলা'। উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলাবেডিয়া ৫নং ওয়ার্ডের অধিবাসীবৃন্দ। মেলায় মূল মঞ্চে ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত 'বিজ্ঞানের যুগে জ্যোতিষ অচল' শীর্ষক আলোচনা সভায় ভারতের মানবতাবাদী সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রঞ্জন দত্ত। ত্রিবেণীর দুই জ্যোতিষী শ্রী রাম ও শ্রীরামানুজ বিভর্তে অংশগ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষমেষ সমিতির মুখোমুখি হন নি। প্রকাশ মঞ্চে সমিতির পক্ষ থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে ৫০,০০০ টাকার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়। আলোচনার শেষে জ্যোতিষ প্রসঙ্গে রোভারদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।

ঘর চাই

উৎস মানুষের কার্যালয় ৯৮ নম্বর মহাশা গান্ধী রোডে আর নেই। এখন কলেজ স্ট্রীট সংলগ্ন অঞ্চলে ঘর চাই। আমাদের পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী, পাঠক-বন্ধু ও অনুসরণীদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই।

গ্রাহক চাঁদা

নতুন বছর ২০০১ থেকে উৎস মানুষের দাম হয়েছে প্রতি সংখ্যা ৮ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা। ডাক বরড যথাযথিতি আমাদেরই থাকছে। ডাকযোগে গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানাও একই থাকছে —

বি ডি ৪৯৪, সন্ট লেক, কলকাতা ৬৪

চেক বা ড্রাফটে চাঁদা পাঠালে UTSA MANUSH নামেই দিতে হবে। M.O. কৃপনের নীচে নিম্নের নাম ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা চাই। রাজ্যের বইরের চেক-এ অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হবে।

পত্রিকা পরিবেশক চাই

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের পরিবেশক বা এক্সেপ্ট চাই। সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে ২০% কমিশন দেওয়া হবে। পত্রযোগে যোগাযোগের ঠিকানা একই — বি ডি ৪৯৪, সন্ট লেক, কলকাতা ৬৪।

টেলিফোনে যোগাযোগ, সকাল ও সন্ধ্যায়
৪৬৬-৯৪০৫, ৩৪০-৪১২৫

দুপুরে
২৪৪-২১৩৬



রেজিঃ অফিস — বিডি ৪৯৪, সন্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪

ফোনে যোগাযোগ : ৪৬৬-৯৪৩৫/৩৪৩-৪১২৫/৩৩৪-০৯০৪/৩৫৮-৬৫৯১

পুস্তক তালিকা

খাবার নিয়ে ভাবার আছে	২৫.০০	ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচলিশের নাসা	২৫.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)	৩০.০০	সাপ নিয়ে কিংবদন্তী	২০.০০
চলতে ফিরতে	১০.০০	বিবেকানন্দ অনা চোখে	২৫.০০
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়	২০.০০	প্রমিথিউসের পথে	১২.০০
অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে	৩০.০০	তিন অবহেলিত জ্যোতিষ	১৮.০০
শেকসপাড়া সংস্কৃতি	২৫.০০	কি আর কেন	২০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	৩০.০০	চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	১৫.০০
প্রতিরোধ : অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	২৫.০০	লুট হয়ে যায় স্বদেশভূমি	৩০.০০

মতুন বই

জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় / ২০.০০

প্রধান প্রাপ্তিস্থান : ১) দাণ্ডগুপ্ত এণ্ড কোং, কলকাতা স্ট্রীট : ২) ইন্ডিয়ান বুক ডিসট্রিবিউটিং কোং,
৬৫/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা

এছাড়া

পাতিরাম / বুক মার্ক / চন্দ্রবাহু গ্রন্থালয় (১০, হিদারাম বানার্জী সেন, বরবাজার। ফোন : ৩২১-৭৩৮১
শ্রাবণী আবাসন (এস ৬/২, সন্ট লেক) এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি — ১০ কার্টিক ক্লাব স্ট্রীট, কলকাতা
(আমহার্স্ট স্ট্রীট ডাকঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে বেলা ১২টা — ২টা। নিবারণ সাহার ঘর)

পরবর্তী সংখ্যা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে

উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সন্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত
এবং শৈলী. ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত

Cent
Art



- কোন্ অঙ্ককারে ধায় আমাদের ভবিষ্যৎ •
বর্তমান রাজনীতির বিকৃত হাল
- বিষণ্ণতা/মনের অসুখ/সারানোই যায় •
পাবলিক বনাম ডাক্তার
- ধাপার সবজি, ভেড়ির মাছ, নিরাপদ কি? •

সূচিপত্র

ভবিষ্যতের ভবিষ্যৎ	সুনন্দ সান্যাল	৭৪
রাজনীতির অবসর	পাচু রায়	৭৮
সংস্করের মালা	সুপ্রভ গোস্বামী	৮০
বনের স্বপ্ন (গুরু)	বিক্রমপদ চক্রবর্তী	৮৪
বিশ্ব রক্তাসমাক (অনু.)	বরুণ ভট্টাচার্য	৮৫
ধাপার সবজি এবং মাছ	চির দত্ত	৮৬
বিহঙ্গতা যখন অসুখ	সত্যজিৎ আল	
	মোহিত রণধীপ	৮৯
লগ্নি বনাম স্টেথো	শ্যামল চক্রবর্তী	৯৩
কাল্পনাহাতি তালিবান	অমিতাভ ভট্টাচার্য	৯৬
বাংলাদেশে বিজ্ঞান আন্দোলন সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়		৯৮
বিজ্ঞান দর্শন (১৯)	বাসুদেব মুখোপাধ্যায়	১০৪
চেনা বিবয় অচেনা জগৎ	সমীরকুমার ঘোষ	১০৬
চিত্রিত	বিপ্লব মুখোপাধ্যায়	১০৭
পুস্তক পরিচিতি	পৃথীশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৮

উৎস মানুষ

ISSN 0971 - 5800

বি ডি ৪৯৪, স-টলেক, কলকাতা ৬৪
BD 494, Salt Lake, Calcutta 64

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি / ১২টা. - ৪টা.
১০, কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা (নিবারণ সাহায় ঘর)

অস্থায়ী কার্যালয় : শ্রাক্ষী আবাসন,

এস ৬/২ স-ট লেক, কলকাতা ৯১

ফোন : ৩০৪-০৯০৪, ৩০৮-৬০৯১

(সকালে ও সন্ধ্যায় পর)

আবার ভোট এলো



ভোটাভিনন্দন

দাদাঠাকুর

(শরৎচন্দ্র পণ্ডিত)

হে বায়তশাসনের বাহন, হে ভোট, হে অশ্বতন খটন-
পটিয়ান, তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।

জমিদারকে তুমি মীনের দুদারে লইয়া যাও ; শক্তিমানকে
দুর্বলের করতলগত করাও, সুব্রাহ্মণকে শূন্যবনের আশ্রয়ভে
বসাও। হে ভোট, তুমি অনন্তশক্তির তোমাকে নমস্কার।

বন্ধুতে বন্ধুতে তুমি বিচ্ছেদ ঘটাও ; বলহীনের লীড়নে
তুমি উদ্যোগ হও ; চিরমনোবিধারের খনি তুমি রচনা কর।
হে নারদের মানসপুত্র তোমাকে নমস্কার।

চিরাহ্বকারময় পথ তুমি আলোকিত কর—অন্ততঃ পক্ষে
সেখানে light post বসাও ; ভাষা পথ ভেড়া দাও ;
সেবতার বেদী ও মন্দির নির্মাণ করাও। হে কুহকী তোমাকে
নমস্কার।

অভাবগ্রস্তকে তুমি অগদান কর, পদপ্রার্থীর সম্মুখে তুমি
পদের হ্রস্বভন প্রসারিত কর ; মধুর বচনে তুমি মনের কোভ
নিবারণ কর। তোমার গুণের তুলনা নাই। তোমাকে নমস্কার।

তোমার দয়ায় রাগিতে লোকে ঘুমাইতে পায় না, পথে
বিনা বাধায় স্বচ্ছন্দচিত্তে কোথায় বাইতে পায় না, ...সকল
লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা তুমি ঘুচাইতে পার। তোমাকে নমস্কার।

চণ্ডীদাসের ভাষায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা
হয়—‘কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান!’ একবার
Election—এ যে বল যে আর লীড়হিব না, পনের বার
আবার সে লীড়ায়, আবার তোমার জন্য খারে খারে কাঁদিয়া
বেড়ায়। হে অপূর্ব যাদুকর, তোমাকে নমস্কার।

দাদাঠাকুরের উক্ত এই রচনার সমগ্রভাগ বাংলা ১৩৩৮ সাল, অর্থাৎ ৭০
বছর আগে লেখা। সত্তর বছরের কালগ্রন্থিতত্তে আজরা সমগ্রচিত্তের
মৌলিক কোনো পরিবর্তন দেখিনা—অন্ততঃ ভেট-ভিন্ন আভ্যাজনে। রচনাটি
দ্বিবর্ষী প্রকাশিত, জমীপুত্র-সংবাদগোষ্ঠী সম্পাদিত ‘বাবাঠাকুর রচনা সমগ্র’
যেতে বেওয়া। পৃ. ৩১২।

ভবিষ্যতের ভবিষ্যৎ

সুন্দর সান্যাল

শিশুর শিশু নাকি শিশুর অন্তরে ঘুমিয়ে আছে। ওরই নাকি আমাদের ভবিষ্যৎ? কিন্তু ওদের নিজেদের ভবিষ্যৎটা কেমন? রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহপাতালে বেসামান্য, এবং দলীয় স্বার্থ বিপরীত পশ্চিমবঙ্গের ন্যাপক বাড়ালি সমাজে এই প্রশ্ন ওঠার সময় এখনও হয়নি। প্রকটা তাই করছি কিন্তু অথচ ডাবুং উৎস মানুষের পাঠকবর্ণের কাছে। উত্তর খোঁজার আগে স্বরণ করি, এখন যারা যুবক এমনকী মাদের বয়স ৪০ এর সামান্য এপাশে বা ওপাশে, তাদের অনেকেই অণুভূত বা নিউক্লিয়ার পরিবারের সন্তান। চিত্রটা হৃদয়বিরহ বাড়ালিসের এবং প্রত্যন্ত গ্রামের মধ্যবিত্ত বাড়ালিসের ক্ষেত্রে কমবেশি ভিন্ন, কিন্তু এক, এই প্রবন্ধের পরিসরে দরিদ্র বাক্যের কথা উল্লেখকুই সম্ভব এবং দুই, একমিকে গ্রামের মধ্যবিত্ত বরাবরই শহরের অনুবর্তী এবং আর একমিকে খোলা-বাজার অর্থনীতির কারণে গ্রামের নগরায়ণও দ্রুততর হচ্ছে।

রেখে ঢেকে না বসলে, সমসাময়িক সমাজ যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে অবিচারমূলক বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে। সাধারণভাবে ওরা জোষ্ঠের ঘেঁষ-বন্ধিত। বন্ধনা চম্বাঝি। কিন্তু এটা হোঁ জানা যে মানবিক মূল্যবোধ অনেকটাই পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নির্ভরতা যতটা মননের তার চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। ফলা সম্পর্ক পড়তে পালাপালি কাছাকাছি হতে হয়। টিভিতে দেখা মানুষ — টেলিফোনে শোনা কণ্ঠস্বর তো বটেই — অনেকখানি বিমূর্ত। ওদের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। কারণ ওরা অস্বাভাবিক।

মানবিক-মূল্যবোধশিক্ষার সূত্রপাত ক্রমমুখুর্ত থেকে হবার কথা। তখন মনন-কর্মতা প্রারম্ভ হয়। সবকুই সম্প্রদায়-গ্রন্থ। সমগ্র শৈশবেই — অতি শৈশবে হোঁ বটেই — নিরাপত্তা বোধের জন্য জোষ্ঠের, বিশেষত মায়ের সঙ্গে, অসামান্য সম্পর্ক অপ্রতিরোধ্য। কিন্তু ছোট্ট পরিবারে জোষ্ঠের সঙ্গে শিশুর পারস্পরিক সম্পর্কের সুযোগ কম। বিশেষত শহরবাসী অনেক শিশুই এখন পরিচরিতা-অপ্রতিভ। ঠিক, যে মা উপার্জনের প্রয়োজনে নিজে বাইরে বেরন না, তিনি সন্তানকে নিয়ে সারাদিনই ব্যস্তব্যস্ত থাকেন। ছবি আঁকা, সঁতার, নাচগান শোনারের ফুলে বাচ্চাকে নিয়ে যেতেই তাঁর দিনান্ত হয়। আদতে তাকে কোলে নিয়ে গল্প শোনানোর সুযোগ খুব কম

মায়েরই আছে। অথচ কাছে টেনে নিয়ে গল্প শোনানো মূল্যবোধ তৈরির পদ্ধতি হিসেবে অতিদীর্ঘ। টিভিতে গল্প শুনিতে সে কাঁচ হয় না। কারণ, সেখানে গল্পকারের গা বেঁসে বসা যায় না, তাঁকে বসা যায় না, 'আবার বসো।'

ইস্কুলে গিয়ে শিশু সমবয়সীদের সঙ্গে ডাঙ করে নিতে শেখে। সে শিক্ষার সুযোগ ছোট্ট পরিবারে কম — বা আসেই নেই। ফুলে শিক্ষক-শিক্ষিকা পিতামাতার তুলনা — মারগেটে পেরেটস। তাঁদের গা বেঁসে বসার সুযোগ না থাকলেও এ রাজ্যের বাংলা-মাধ্যম স্কুলগুলিতে এবং বেশ কিছু ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলেও সে-সুযোগ এখন অস্বস্তিত। ফুলে ভর্তি হওয়াই এখন শিশুর পক্ষে গ্রামিকর অভিজ্ঞতা। অধিকাংশই ফরা 'মামজান' ফুলে ভর্তি হতে পারে না তাদের বন্ধনাবোধ অপরিণীম। অনেক বাংলা-মাধ্যম স্কুলেই এখন এক-একটি সেকশনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমবেশি ১০০। কিন্তু পুরনো স্কুলগুলির পাঠকক মোটামুটি ৪০ জন বসার উপযুক্ত। প্রচণ্ড গরমেও তাদের এত ঘোঁষাঘোঁষি করে বসতে হয় যে পারস্পরিক সাধিগা সেখানে যন্ত্রণাকর। এমন অবস্থায় সমবয়সীরা একে অপরেরে অস্বস্তিত বোধ করতে করতে বড় হয়ে, তাঁতে বিশ্বাসের কী আছে।

অনেক ভায়গায় স্কুলবাড়ি ভোটে পড়ছে, তাই ছেলেমেয়েরা চড়া রোসে বাইরে বসে। এমন ক্রাসে পড়াতে ভাল না লাগারই কথা। তার ওপর রাজ্যে গত ২৪/২৫ বছর যে-পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছে, এবং সাধারণভাবে শিক্ষার অঙ্গন এতই কলুষিত হয়ে গেছে যে, শিক্ষা নামক তথাকথিত মহৎ বৃত্তি বা 'নোবল প্রফেশন'টি অমানুষ-অস্বস্তিত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কিছুদিন আগে পাঁচ বছরের একটি মেয়ে পড়া পারেনি বলে শিক্ষিকা তার মাথা ধোঁক চুল মুঠি করে আকরিক অর্ধেই উপড়ে ফেলেছেন। টিভিতে দেখছি, বাচ্চাটির মুখের কুসি এখনও আঁখো আঁখো। অপর্যাপ্ত শিক্ষা প্রথমে তাঁর অপরাধ অস্বীকার করেন, পরে তাঁকেই পুলিশের সামনে বলতে দেখলাম, কী করে যে তাঁরই হাতে এতবড় অঘটন ঘটল তা 'আমি বুঝতেই পারছি না'।

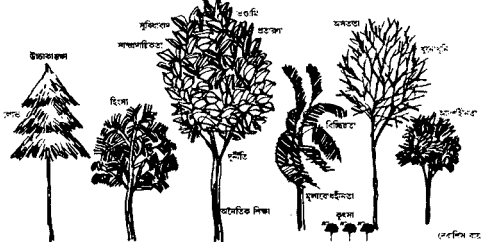
ঘনিটনা নিভাত্ত ব্যতিক্রমী নয়। অকপাই শুধু শিক্ষিকা নয়, শিক্ষকও চড় ঘোঁষে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছেন। একজন তে। এতই মেয়েছেন যে মস্তিষ্কে আঘাতজনিত কারণে দারুণ ছুর

গায়ে ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। এক প্রধান শিক্ষক শায়েস্তা করার জন্য বেয়াদব ছাত্রকে ২৪ ঘণ্টা টরলেটে বন্ধ করে রেখেছেন। নৈহাটির একটি গ্রামবাসী কুলে এক শিক্ষক সবার আগে আসা শিওটিকে 'মেঝা' ধর্ষণ করে ফেলেছেন। শেখোক্ত ঘটনাটা বোধ হয় পাঠক ভুলেই গেছেন, কারণ অমন বাপার আচরাস আকছারই ঘটছে। কুল এবং কলেজে ক্রাস ক্রমের ভিতরেই শিক্ষকের 'মুখ ফসকে' অশ্রাব্য কথা বেরিয়ে গেছে, আবার সম্প্রতি অন্তত তিনজন অধ্যাপকের বিরুদ্ধে বৌন ইয়রানির অভিযোগে বীতিমত আন্দোলন হয়ে গেছে। ওই তিনজনই নামকরা কলেজের অধ্যাপক, এবং তাঁদের একজন নিজের বাড়ির কিছু দূরে গ্লাট ভাড়া নিয়ে গ্রাইভেট ছাত্রীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ আচরণ করছেন বলে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে তদকালের অধিবাসীরা অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগকারীদের একজন ওই অধ্যাপকেরই স্ত্রী — তাঁকে টিভির সামনে কানদে কানদে বলতে শুনেছি, "আমি প্রেগনান্ট, আমার so-called husband কথা শুনেছেন না ... অভ্যেকের পর কী করে আমি বাড়িতে থাকব জানি না।"

এই সব ঘটনা যে 'কোটিতে গুটি করে' নয় তাই বোঝাতে আরও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। এ রকম শিক্ষকদের নিজেনের মধ্যে মারামারি, ছাত্র-শিক্ষকের দাঙ্গা এবং ছাত্রশিক্ষক মিলেমিশে অপরাধের ঘটনাও খুব কম নয়। উত্তরবঙ্গ একজন

প্রধান শিক্ষক তাঁর নিজ-হাতে গড়া কুলে যাকে সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করেন তাঁরই হাতে কুড়ুলে কোপ চাকরিসহতার প্রাণান্ত হয়। জনৈক মধ্যবয়সী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা কুলেরই আবাসনের ভিতর কিছু ছাত্রের দ্বারা গণধর্ষিতা হন। সময়ের আগে তিনি অবসর নিলে বহুদিন তাঁর পেনসন দেওয়া হয়নি। হাওড়া অঞ্চলে একমল ছাত্র তালুরই শিক্ষকের মেয়েকে ধর্ষণ করবে চমকি দিতে নিতে তাঁর বাড়িতে ঢুক পড়ে। তার আগেই শিক্ষকমশায় মেয়েকে নিজে বাড়ির বাইরে চলে গেছেন। 'কুল ছাত্ররা' মেয়েটির মাঝেই ধর্ষণ করে। সহপাঠিনীকে ধর্ষণ; ১০ বছরের ছেলে ১০ বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করে, খুন করে, কুপিয়ে কেটে, মারপিটগুলিকে বহুবানি করে পুকুরে ফেলে দিয়েছে; ছাত্র এক মুন মেয়ে সহপাঠীকে মেরে ফেলেছে; আর একজন ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে শিটিয়ে তার নিজের মা'কে খুন করেছে; আর একজন সবাকার তার নিজের বাবা সং-মা ও এক সং-ভাইকে খুন করে সেই ঘরে বসেই পেটপুরে বেয়েছে; একজন এবারম শ্রেণীর ছাত্রী তার ৫০ বছর বয়সী গৃহশিক্ষকের সঙ্গে প্রেম করে তাঁরই অন্য বিব বাইরে তার নিজের মা ও ঠাকুরপকে মেরে ফেলেছে; অশা করি, বি এ পাঠরতা সংযুক্তকে এখনও কেউ ভালে নি। মেয়েটি তার 'জানেনন', প্রমিক উর্দুভাষী মোক্তারের সঙ্গে একজোট হয়ে তারই দাদুর বাড়িতে ডাকতি কবতে গিয়ে ধরা পড়ে এই সেবার সময়েও হালত বান করছে।

চিত্রা প্রতিভা



বর্তমান রাজনৈতিক অরণ্যসূজন

স্বীকার করতেই হবে, জোটের সহায়তা কোনও ছেলেমেয়ের ভাগেই ঘটে না এমন নয়। পরীক্ষায় নকল এখন ঢালাও। তাতে নানাভাবে সহায়তা করছেন গ্রাইডেট শিক্ষক, এমনকী বাবা মা-ও। নকলে বাধা দেওয়ার পরীক্ষার্থীদের বাবা ও অন্যান্য অভিভাবকরা তুল বাড়িতে ভাগচুর করেছেন। যুক্তি হ'ল নকল, বন্ধ করে অল্পবয়সীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার অধিকার শিক্ষকদের দেওয়া যায় না। অর্থাৎ, এমন সব ব্যাপারে কমা-সুখের হতে জোটের কোনও আপত্তি নেই।

কলেজে উঠে বেশ কিছু অধ্যাপকের স্নেহভাজন হয়ে ওঠা যায় সঠিক রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে। সে ক্ষেত্রে ওই দল-কর্তৃক পঠিত ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়ে পাটির কাজ করতে হয় — যেমন, মিটিং-মিছিলে যাওয়া, দেওয়ালে লেখা,

পোস্টার সঁটা, ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনে তো বটেই, বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচনেও বোমাবাজি, ছুঁচি-চাকু চালানো; প্রয়োজনে 'মডার' করা, ছাত্রা ভোট দেওয়া, এই আর কি। যে যত বেশি যুক্তি নিয়ে সফল হয় সে পাটির সদস্যদের স্নেহের ততখনি অধিকারী। এ-

ব্যাপারে প্রশিক্ষণের আয়োজনও চমৎকার। পাঠক নজর রাখলে দেখতে পাবেন, আগামী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরলে কলকাতার অনেক কলেজের সামনে রাত ১০/১১টার সময় ছেলেরা লাইনে পাড়াবে, পরদিন বেলা ১২টার পরে সংশ্লিষ্ট কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যরা খুব 'সুশৃঙ্খলভাবে' তাদের নার্কসিট পরীক্ষা করে 'যোগ্য যারা' তাদের ভর্তির আবেদনপত্র দেবে। যারা ভর্তি হবে তাদের সঙ্গে অলিখিত চুক্তি হল, ইউনিয়নের কাজ করতেই হবে।

অবশ্য চুক্তির বেলাপ কেউ করে না তা নয়। তাই কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন এলে ছাত্রনেতাদের পক্ষি কর্তৃক সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন অধ্যাপনায় রত দাদা দিদিরা, এমনকী স্বয়ং অধ্যাপক বা অধ্যাপিকা। কলে বিরোধী ছাত্রগোষ্ঠীরা মনোনিয়ন পত্র পাবে না, বা তাদের শ্রায় সবক'টি মনোনিয়ন নির্বাচনের আগে বাতিল হবে, বা গণনার সময় তাদের পাওয়া ভোট বাতিল হবে। সমস্ত দ্বিধাভ্রান্তিকে নসংগভাবে চাপাতে সংশ্লিষ্ট কলেজের সামনে নির্বাচনের দিন

দুয়েক আগে বোমা ফাটবে। তার ফলে শান্তিপ্রিয় অথচ বেরাড়া ভেটোররা নিশ্চিষ্ট দিনে কলেজেই আসবে না। তারপর স্বাঙ্কিত ছাত্রগোষ্ঠীর অনিবার্য ভয়পাত হলে পাটির সংবাদপত্রে বিজ্ঞোষণে ঘোষিত হবে কতজন বিনা-প্রতিশ্রুতিতে জয়লাভ করেছে এবং কতগুলো কলেজের ইউনিয়ন পাটি-সমর্থিত ছাত্রদল জিতে নিয়েছে।

কখনও যে একটি-আধটু গোলমাল হয় না তা নয়। যেমন হতেছিল কয়েক বছর আগে দমদম মতিঝিল কলেজে। সেখানে বিবাহমান দুই নেতার অনুরাগী এস এফ আইয়েরই দুটি বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যেই ইউনিয়ন দফলের লড়াই। এমন আর একটি উদাহরণ হল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আনন্দের মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে টানাচড়া। সংবাদ প্রকাশ,

ডাঃ মুখোপাধ্যায় সি পি এম-এর সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের প্রিচ-পাত্র, অর্থাৎ অলিমুদ্দিন স্ট্রিট মনোনীত (হতেই হবে!)। তবু ডঃ মুখোপাধ্যায় যেদিনীপুর জেলা সি পি এম মনোনীত ব্যক্তিদের বৈধিত্য ইত্যাদি উক্তপদে বসাতে রাজি হননি। দ্বংষ্টা এখানে জেলা সি পি এম-এর

সঙ্গে অলিমুদ্দিনে অবস্থিত সদর কার্যালয়ের। তার ভের ধরে, স্থানীয় এস এফ আইয়ের ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির (যা প্রধানত সি পি এম নিয়ন্ত্রিত) সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্যের সামনেই ডঃ মুখোপাধ্যায়কে হেনস্থা করে — এতটাই, যে উপাচার্য, কলকাতা ঘিরে, বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম করতে বাধ্য হন, যেমন হয়েছিলেন বাম শাসনের গোড়ার দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য। সেখা যাচ্ছে অবহুঁতা এখন বিলকুল ঘুরে গেছে। সন্তোষবাবুকে কাজ করতে মেনি সি পি এম-এর রাজাঘরের নেতৃবৃন্দ আর আনন্দেরবাবুকে কাজ করতে পিচ্ছেন না ওই দলেরই জেলাস্তরের নেতৃবৃন্দ। একে 'বুমেসো' বলা চলে কি না তা তত্ত্বাবধীনা বিবেচনা করুন; আমাদের বিবেচা হল দু'দশকের অধিক কালের ব্যবধানে সংঘটিত ঘটনা দু'টির অন্তর্ভুক্তিকালীন ধারাবাহিকতায় যে ছাত্র তথা যুবচরিত্র হীন খটে গেছে, তা-ই!

চরিত্রহননের ইতি ওখানেই নয়। এভাবে সেখানভা-
শিখে (?) যে বিপুল সংখ্যক গ্রান্ডমেষ্ট এবং অন্যান্য উচ্চ-
শিক্ষিতরা অস্কেল-বিজ্ঞানবিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই সেখা, ভবিষ্যৎ
তাদের অসীম অঙ্ককার। রাজ্যে নবিত্বত্ব শিক্ষিত বেকারের
সংখ্যা ৬০,০০০০০ এবং বেশি। স্পটলিই চাকরি-
প্রত্যাশীদের প্রায় সকলকেই হত্যা হতে হয়। তবে এটা ঠিক,
কম গ্রান্ডমেষ্ট ছেলে (এক বেশ কিছু মেয়ে) এখন 'কিছু-না-
কিছু' কাজ করে অর্থ উপার্জন করে। যারা সরাসরি রাজনৈতিক
দলের কর্মী হয়ে যায় তাদের সংখ্যা কম। অবশিষ্টদের
অধিকাংশকেই বিভিন্ন মাদ্রাসা দলের কাজ করতে হয়।
তৃণমূল দল সক্রিয় হয়ে ওঠার পর এই অবস্থার অনেকটা
পরিবর্তন হয়েছে। ঠিকই, কিন্তু সেটা অন্য কাহিনী। আনন্দ কথা,
এইসব শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামান্য ক'জন যারা
পুরোপুরি বনিভর ব্যবসায় নামতে পারে তারা জানে পাটিকে
সম্পত্তি না রাখলে ব্যবসা করাই হবে না; সোজা কথায় 'সম্প্রদায়
হবে'। উদাহরণত, আশনি যদি টিকাদারির কাজ করেন তা হলে
সময়ে অসময়ে পাটি ফাটে চাঁদা দেওয়া ছাড়াও পাটির
প্রতিনিধি পাড়ার দলার মনোনীত ব্যক্তির কাছ থেকে ইট-গিট-
সিমেন্ট ইত্যাদি আশনাকে কিনতেই হবে, না-হলে বিপদ!

বর্তমান প্রাবৃত্তিক ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে
অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টি জেলার বেশ কিছু গ্রামে
যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার কথা
হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং বেশ
কিছু শিক্ষিত যুবক-যুবতীর। নিরঙ্কর গ্রামবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি
কথা বলার সুযোগ পেয়েছি সামান্যই, যদিও তাদের কথা
জানার চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাংবাদিকসহ সব
সাক্ষাৎকারের কাছ থেকেই। আমার ধারণা (পাঠক নিজে যাচাই
করে নেন), মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শিক্ষিত বা নিরঙ্কর, উভয়
শ্রেণীর যুব সম্প্রদায় অত্যন্ত একটা স্থাপত্যের তাদের শ্রেণীচরিত্র
বিসর্জন দিয়েছে। তাদের কণ নাবাধে সমান। তারা সমানভাবে
বিশ্বাস করে যে সমাজের যারা মাথা তীরা তাদের সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছেন। সমাজশাসকরা এখন প্রত্যেকেই
কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে উদ্ভিত। এদের
বিশ্বাস, নেতারা সব ঠগ-জোক্তার অর্থগুণ্ণ মদ্যপ কামুক এবং
দল্লপ নিতারা।

তবে প্রচলিত অর্থে এরা এখনও বিশ্বাস করেনি, কারণ
অনেকের বিশ্বাস, যুববৃত্তে সচ্য করলে এক পাটির জন্য কিছু
খটান মিলে আখেরে লাভ হতেও পারে। নানান কণ প্রকল্প
আছে, সুদৃষ্টান্তসহ মাইক্রোক্রেডিট পাওয়া যায় — সেই
টাকার কিছুটা পাটির দানকে ঋণদানের পরে ব্যক্তি অংশ দিয়ে
জীবিকা অর্জন শুরু করা যায়। উদাহরণত, রেল স্টেশন সংলগ্ন
যে-মাঠটা আছে তার একটা অংশ বেআইনিভাবে কেটে নিয়ে,

ত্রিশপল বাড়িতে, সাইকেল রাখার আড়ানা করলে, রেলবাড়ীসের
কাছ থেকে যে-পয়সাটা বোজগার হবে তার ভাগ পাটিকে দিয়ে
হাতে কিছু অকরবে। পাটি যুগি থাকলে মাঠের প্রকৃত মালিক
কিছু বলতে সাহস করবে না। পল্লভ্যেতের মধ্য-বড়লোক-ইওয়া
দাদার ফাইফরমাস খেতে দিলে, তাঁর কথা শুনে অন্যদলের
কর্মীদের 'বোম' মারলে, এমনকী তেমন দরকারে খুনটুন করে
নিতে পারলে, বলা যায় না, অমূল্য ভবিষ্যতে পুত্র-কটা-
বোজানোর এবং রাজ্য তৈরির গোষ্ঠীময় ঠিকারও মিলে যেতে
পারে। যারা কিছু পাশপাশও করেছে তারা পাটি দাদাকে সমুদ্র
রাখলে মেয়াদভিত্তিক 'শিক্ষাকেন্দ্র' পড়ানোর চাকরি পেতে
পারে; আর শহরাঞ্চল হলে তো কথাই নাই, বেআইনি
অটোরিক্স চালানোর অধিকৃত 'সাইসেল'ও জুট যেতে পারে
— পুলিশকে সামলাবে পাটি।

তাই প্রকৃতির ওরুতে বলেছি, সমাজে তরুণ প্রজন্মের
ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময় এখনও আসেনি। 'সেখানে
না, অন্যান্য রাজ্যে এমনকী দুনিয়া জুড়ে কী চলছে। পশ্চিমবঙ্গ
তো বিভিন্ন কোনও ধীপ নয়' — এই কথা শাসকদলের অনেক
নেতাই বলে থাকেন। বলতে পারেন, কারণ, সাধারণ বিশ্বাস
এখনও আছে, যা-হট্টছে তার সবটাই ভবিষ্যৎ বলে যেনে মিলে
নিজের করণলতা হয়ত পুড়বে না। তবু আশা, 'উৎস মানুষ'-
এর বিশিষ্ট পাঠকবর্ণ মানবেন, যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা এভাবে চলতে মিলে আমাদের সামূহিক ধ্বংস
অনিবার্য। আগে বলেছি, এরা 'প্রচলিত অর্থে' বিশ্বাস করেনি।
কিন্তু নিজেদের ধ্বংস করা যদি বিশ্বাস হয় তা হলে এরা দল্লপ
বিশ্বাসী। প্রবল উচ্চনিত্রে এদের অনেকে নেতা হ'লে করে
হত্যা ভুলতে চাইছে, এবং ক্রমাগত অকাল ও অপরিমিত
যৌনতার মিকে বুক পড়ছে। যেন, এই সমাজে ধীর্ঘজীবন
অসম্ভব, অকাম্যও বটে। অতএব দেশের আত্মহন হয়ে সৈন্যধিন
জীবনযাত্রা থেকে পালাও এবং যা-কিছু ভোগ আছে তার
সবটুকু এখনই ভোগ করে নাও। যে সব ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে
তা'তে আশঙ্কা হয়, এরা ক্রমাগত বেশি সংখ্যায় মহামারক
ব্যাহিতে মারা পড়বে।

সেটা অশোককৃত দূর ভবিষ্যৎ। আর নিকট ভবিষ্যৎ?
গত শতাধী ৭০-এর দশক থেকে ওরা খুন হয়ে আসছে। খুন
হওয়া যুবক যুবতীর সংখ্যাটা এখন কেমন হতে পারে তা
পাঠকের আশ্রাজের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। বোধ করি, সকলে
একমত হবেন, সংখ্যাটা আগামী নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে
এক বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত অনেকটাই বেড়ে যাবে। অথচ
এরা, এই খুন-ইওয়া তরুণ-তরুণীরা, সুস্থ জীবন যাপনের
সুযোগ পেলে, কেবল ওদের নিজেদের নয়, জোটদের ভবিষ্যৎ
নিরাপদ করত;

রাজনীতির অবক্ষয় এই বাজার-রাজত্বে

পাচু রায়

মূল্যবোধের রাজনীতি— এই কথাটা এখন খুব চালু। মূল্যবোধ কথাটার একেত্রে মানে কি? বোধের মূল্য? নাকি মূল্যের বোধ? ইংরাজিতে আমরা প্রায়শই আক্ষেপ করে বলে থাকি, ভ্যালুসগুলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! কার ভ্যালু? বস্তুর বা মালের, না মানুষের? নাকি মানুষ মানুষের সম্পর্কের? মালের মূল্য হ্রাস পাওয়া এক জিনিস, মানুষের মূল্য হ্রাস পাওয়া অন্য জিনিস। এবং এ দুটোর মধ্যে সমানুপাতিক কোনও পারিগণিত থাকার কথা নয়। কিন্তু মানুষের মূল্যহ্রাস এবং মানুষ মানুষের অন্তর্গত সম্পর্কের মূল্য হ্রাস পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয়। কিন্তু মূল্য নির্ধারণ করে কে এবং কিভাবে? যদিও দাম এবং মূল্যের মধ্যে কিছু ফারাক আছে যা কখনও কখনও প্রকট। এক এক সময় তুলোর দাম এমন ধরা হয় যার ফলে তুলো চাষীরা আত্মহত্যা করে বেঁচে যান। কেননা দাম সেখানে মূল্যের তুলনার অনেক কম দার্ব হয়। আবার মজুতদারেরা যখন পৈয়াজের দাম কিলোতে ৫০ টাকা করে দেয় তখন তার কোনও সমতাই থাকে না মূল্যের নিরীখে। তথাপি যে-কোনও পণ্যেরই একটি মূল্য নির্ধারিত হয় যা সময় অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। কেননা পণ্যের মূল্যের সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকে কীচা মালের মূল্য এবং শ্রমের মূল্য। শ্রম যেহেতু একমাত্র মানুষই বিক্রি করে, তাই এই মূল্য অর্জন বা বর্জনের ভিত্তির দিয়ে এক ধরনের বোধও নির্মিত হয়, ক্রিয়ানীল হয়। মূল্য যেহেতু পান্টার অনিবার্য নিয়মে, বোধও পান্টার।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনও এক সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রিপ্রার্থী এক যুবককে তার পিতা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই যে রিসার্চ টিচার ছেড়ে মাকরাত পর্যন্ত কিসের করে বেড়াস, কী হবি শেষ পর্যন্ত, মন্ত্রী? ঘুমের ঘোরে হেসেটি তার বাবাকে বলেছিল, আমরা মন্ত্রী হওয়ার জন্য লড়িমা, ডানহাতের তলসী তুলে সে পিঙ্গল ঢালাবার ভঙ্গি করে বলেছিল — সব পাণ্টে বের! ৩৫টি বছর পর কোনও অসম্ভব উপায়ে সেই পিতা জীবন ফিরে পেয়ে তার পুত্রকে যদি দেখতেন কী করণ অবস্থা হত তাঁর। সম্ভাব্য সেই বিদ্রোহী আজ সমাজটাকে না বদলে নিজেকে কতটা বদলেছেন



মেঘনিস রায়

তা দেখে প্রয়াত পিতা চিনতেই পারতেন না তাঁর ভুবন। অপরিচয়ের অন্ধকার ঘিরে থাকত তাঁর চারপাশে। অথচ এই সময়ের বিচারে কত আলোর কলকানি চারদিকে। আলোয় ঢেকে যায় সব মুখ। অন্ধকারে বোকা যায় না মুখোশের রঙ। এই নির্মিশা কেন, কীভাবে?

গত ৪০ বছরে উৎপাদনের উপকরণের যেমন ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে, তেমনি তুলুল পাণ্টে গেছে সমস্ত সম্পর্ক। রাজনৈতিক থেকে সামাজিক সব সম্পর্ক। ১৯৬৮ সালে ইলাকো হাউসে কম্পিউটার বসাবার কিছুতে আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা রাত জেগে রিলে প্রথম ফুটপাথে অবস্থান করে পাহারা দিয়েছিলাম। সেই পাহারার প্রসঙ্গ আজ হাস্যকর। তখন হলধর ভর্তি বিদ্যালয় যন্ত্রদানবের মতন এক একটি কম্পিউটার। ঐ সৈত্য যে কাজ করত, আজ একটা ছোট টেবিলে কমানো কম্পিউটার তার অন্তত দশগুণ কাজ করে। এটা যেমন একটা দিক, তেমনি অন্যদিকে কম্পিউটারের কিছুতে নয়, নীর্থব আন্দোলন চলাছে কম্পিউটারের সপক্ষে। যারা একদিন কম্পিউটার বসানোর কিছুতে 'অটোমেগন রুখছি রুখব' রণধ্বনি তুলে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করেছিল, তারা আজ নিজেদের দলীয় দপ্তর থেকে শুকু করে সর্বত্র সর্বস্তরে কম্পিউটার বসাবার প্রয়াস উন্মুক্ত করেছে। কেন? এই

মোটামরকোসিস এই বকম একটা ইস্যু সহ প্রায় সব ইস্যুতেই কেন?

এই প্রশ্নে বিস্তারিত হওয়ার আগে একটা গল্প বলি, শুনুন। দুটি ছেলেমেয়ে প্রেমে পড়ে বিয়ে করতে ঠিক করল। ছেলেটি তার কাবার কাছে প্রস্তাবটি রাখল। বাবা বললেন—সেখি, ওর বাবা তো বামপন্থী। আমরা দক্ষিণপন্থী। বামপন্থী পরিবারের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী পরিবারের কোনও বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে না। হলে ছি ছি পড়ে যাবে চারদিকে। ছেলে বলল—ঠিক আছে, তবে আমি ধর্মভীরু হয়ে বামপন্থী হয়ে যাব। বাবা বললেন, তা হয় না কি! শিশুপুত্রের ধর্ম অমন হট করে ছাড়া যায়? বরক মেয়েটিকে বল ধর্মভীরু হয়ে দক্ষিণপন্থী ধর্ম গ্রহণ করতো।

মেয়েটি তার কাবার কাছে একই ভাবে বিয়ের প্রস্তাব রাখল। একইভাবে বাবা বললেন, আমরা বামপন্থী, দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারেনা। মেয়েটি ধর্মভীরু হয়ে দক্ষিণপন্থী হতে চাইলে ওর বাবা একই পোহাই পাড়লেন। মেয়েটি তখন তার কাবাকে বলল যে, ওকে ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করব না। আর ওকে বিয়ে করতে না পারলে আত্মহত্যা করব। ছেলেটিও তার কাবাকে এমন কথা জানিয়ে দিল।

দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী ব্যবারা এবার মহা ঝাঁপরে পড়লেন। তাঁরা মিলিত হয়ে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করলেন। বললেন, বামপন্থীর সঙ্গে দক্ষিণপন্থীর বিয়ে হলে ভোট ব্যাঞ্চে বড় ধাক্কা লাগবে। কিন্তু আত্মহত্যার প্রস্তাবনা ওঁদের একটা সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করল। ঠিক হল, এই বিয়ে হবে, কিন্তু বিয়ের পরই ওঁদের বিশেষ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ছেলেটি মেয়েটি প্রস্তাব শুনে প্রাথমিকভাবে খুশি হলেও কেশভাঙ্গের ব্যাপারটা মানতে পারল না। ২০ ফেব্রুয়ারি বিয়ের দিন ধার্য হলে ওরা রাষ্ট্রসভার মহাসচিবের কাছে বিষয়টা নিয়ে আবেদন জানিয়ে তাঁকে বিয়েতে নিমন্ত্রণ করল। মহাসচিব ক্রমবশিষ্টে সিদ্ধান্তে, এই বিয়েতে যাওয়ার তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঐ দিন তাঁর চীন সফর। তাই তিনি আসবেন না। কিন্তু ওঁর প্রতিনিধি বিয়েতে উপস্থিত থেকে মহাসচিবের এক নির্দেশনামা নিয়ে যাবেন যা নবদম্পতির পক্ষে সুখের হবে।

২০ ফেব্রুয়ারি মহা ধুমধামে বিয়ের আয়োজন চলছে। কানে বাড়িতে বরপক্ষ হাজির। হঠাৎ সকলে দেখল, দুজন রাইফেলধারী পরিবৃত হয়ে এক সাহেবের আবির্ভাব। সাহেব নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানিয়ে মহাসচিবের এক নির্দেশ পড়ে পৌঁছাচ্ছি। এখন থেকে রাষ্ট্রসভার নির্দেশানুযায়ী বামপন্থা দক্ষিণপন্থা বলে কোনও

ভেদাভেদ থাকবে না। থাকবে না বামপন্থা এবং দক্ষিণপন্থার অস্তিত্ব। এখন সকলকে একটা মীতিই মেনে চলতে হবে, তার নাম কাক্সারনীতি। এখন আর কেউ দক্ষিণপন্থী বামপন্থী নয়। সকলেই বাজারপন্থী।

রমানাথ রায়ের লেখা গল্পটি আমার মতন করে আপনাদের পেশাদার। গল্প চম্পিত বছরে মূল্যবোধই বলুন বা সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডই বলুন পরিবর্তনের ধিম মিউজিকের সুর নির্মাণ করেছে বাজারনীতি: 'ভারতবর্ষ' আজ একটা বিরাট বাজার। সমস্ত মানুষ, মানুষ-মানুষের যাবতীয় সম্পর্ক, সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং অবশ্যই রাষ্ট্রসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল এই যুগে বাজারের এক একটি পণ্য। সমস্ত কর্মকাণ্ডের পেছনে আজ কাজ করে লাভালাভের উদ্দেশ্য এক প্রহ। যেখানে লাভ নেই, সেখানে কেন?

শীতের সকালের সেই যুবকটির প্রশ্নে ফিরে আসি। যার কাছে মত্বীভ নয়, সমাজ পরিবর্তনের জন্য আত্মত্যাগের প্রস্তুতি ছিল মুখ। কি এক বিচিত্র প্রক্রিয়ায় সে এখন এমন একটি স্তরে উপনীত যে ইনকাম ট্যাক্সের উকিলের শলাপরামর্শ এবং স্বপ্নরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া সে এক পা চলতেও অপারগ। হ্যাঁ, এটা সত্য যে, ভাল থাকার জন্যই তো যাবতীয় সংগ্রাম। একজন বামপন্থী ছাত্র যখন কলেজ অধ্যাপকে পরিণত হল— সেই ছাত্রের দলকের শোবে, তার যিঞ্জি একতলা ঘরে আগে যেমন আড্ডা চলত, তেমন আড্ডা মারতে গেলে অধ্যাপকের স্ত্রী বলেন, আপনাদের বন্ধু এখন সংগ্রাম করছেন। অর্থাৎ বাড়িতে কোচিং চালাচ্ছেন। সেই সময় এই প্রক্রিয়ার 'সংগ্রাম' নামকরণ কানে ডায়ালক বাকত। কিন্তু তখনও আমরা মূর্খ। ভাবতাম, যে-প্রক্রিয়ায় সমাজটা বদলে দিয়ে সকলের ভাল থাকার মতন অবস্থায় উপনীত করা যায় তাকেই বলে সংগ্রাম। ভাবতাম, যে-প্রক্রিয়ায় নিজের এবং নিজের পরিবারের ভাল থাকার গ্যারান্টি অর্জন করা যায় তার সঙ্গে সংগ্রামের কোনও সম্পর্ক নেই; কেউ যদি শুধু এটা নিয়েই পাড়ে থাকে, যেমন সেই অধ্যাপক বন্ধুটি থাকতেন, তবে তাকে বলে সংগ্রামবিমুখ আধ্যাত্মিকতা। এই সব তখন ভাবতাম। তখন যে লেখাপড়া জানা যুবক শুধু নিজের ও নিজের পরিবারের কথা ভাবত তাকে আমরা কেরিয়ারিস্ট বলতাম। কেরিয়ারিসম তখন কোনও প্রাথমীয় ব্যাপার ছিল না, নিশ্চয়ই ছিল।

আমরা এখন আর তেমন তখনকার মতন মূর্খ নই। এখন আমরা জানি যে কেরিয়ারিসম অত্যন্ত প্রাচুর্য বিঘ্ন। এবং যে কথাতায় একসময় আমাদের তীব্র আপত্তি ছিল, পলিটিক্স্ ইস দ্য লাস্ট রেসর্ট ফর ডাউন্টেলস্, সেই কথটিই মনে প্রাণে মেনে

নিষ্কি। বাটের দশকে যারা রাজনীতি করতেন তাঁদের প্রতি একধরনের বিনয় প্রজ্ঞা শুধু আমাদেরই ছিল না, যে কোনও সচেতন সাধারণ মানুষেরই ছিল। তিনি যে রাজনীতিরই ধারক হোন না কেন। আর আজ কংগ্রেস কিংবা বিজেপি — দু'মুদ্রা কিংবা সিপিএম - সব পাটির নিজস্ব ক্যাডারদের সম্পর্কেই কোনও প্রজ্ঞা নেই নিজেদের। ধান্দাবাদী এমন একটা ভুলে এবং এত তীব্রতায় সংক্রামিত যে, নিজের পাটি ক্যাডারদেরই নিজেরা বিশ্বাস করে না। অথচ সেই ৩০/৪০ বছর আগে বিশ্বাসই ছিল সমস্ত পাটির অস্বাভাবিক শক্তির প্রধান উৎস। নীতি থেকে পারস্পরিক বিশ্বাস।

কিন্তু কেন এই বিশ্বাস লুপ্ত হয়ে গেল? কেন লোপাট হয়ে গেল সেই অক্ষরখা যা প্রাথমিকভাবে যে-কোনও রাজনৈতিক কর্মীকে সংখ্যাকার শ্রেণিগত জোড়াতালি? কে দায়ী এই বিনির্মাণের জন্য? নিশ্চয়ই সেই সন্তান বা নানান পাটির আত্মকের ক্যাডাররা ব্যক্তিগতভাবে এইজন্য দায়ী বলে চিহ্নিত হয়, তবে এটি এক সামগ্রিক অবস্থারই বিষফলের প্রতিফল।

অবশ্য ঘটেছে, না ঘটানো হয়েছে? সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার থেকে আমরা শিকার হয়েছি। অনেকে বলেন, রাজনৈতিক নেতারা পথ সেখানে পারছেন না, তারা অসংযত্নে ধান্দাবাদ, তারা রাজনীতি করেন গদির জন্য, নয়তো ওছিয়ে নেওয়ার জন্য। ব্যাপারটা এমন, যেন নেতারাও নিয়ন্ত্রণ, তাদের ইচ্ছায়ই সব কর্ম। না, ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আসলে নেতারাও হয়ে গেছেন শিকার। কবে গেছেন পণ্য এই বৃহৎ বাজারের। বাজারের নিরাপত্তা যদি কিছু দেখেন — যে কোনও প্রকল্পকে, তবে লাভ লোকসানের প্রশ্নটা কোথাও কোনওভাবেই আর সৌগ থাকে না। বাজারে ব্যবসায়ীই মুখ্য, আর সব সৌগ। বিক্রিবাটা বাড়াকার জন্য চাকচিক্যই সব, এই ধারণটা মজ্জায় মজ্জায় গেঁথে নিতে পেরেছে আগ্রাসনের হেতুগা। আর বহিরাবরণই যদি ধ্যানজ্ঞান হয় তবে অন্তরের চেতনা ভাঙার এবং শক্তি শূন্য হতে বাধ্য। বাজারে ঘুরছি আমরা বিক্রি হওয়ার জন্য। সর্বদা বুজি কোন প্যাকেজে নিজেকে ঢাকলে ভাল লাগে পাওয়া যাবে, মার্কেটে ডায়ালগিটি বাড়বে। এই ডায়ালগিটির সন্ধান লুপ্ত করে নিচ্ছে আমাদের যাকতীয় ডায়ালগিটি। সংসদীয় রাজনীতির নেতা কর্মী বর্গী সবাই অন্ধ নিছকই এক নির্বিকার পণ্য। রাজনীতি করেন ওয়ালা "সংগ্রামীরা" যদি এখনও আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলিটা একটু বুঝতো, যদি ব্যক্তি হিসেবে এক দু'জন মানুষও একটু খুঁজে পাড়িয়ে মূল্যবোধকে হাতিয়ার করে নিত বাজারের ভিড় তৈলে, তাহলে এখনো হয়তো পণ্য হয়ে না-বাওয়ার রাজ্যটা বৃদ্ধ পেত। এখনো সময় ছিল।

সংকরের মালা

সুরত গোমেশ

ফুলের রঙে শুধু একবার দেখ মালবিকা, কী অপূর্ব। গড়িয়াহাট থেকে কিনলাম। ফুলেই বিক্রি হচ্ছিল। কথাগুলো বলতে বলতে শ্যামাপন নিজেই ফুলদানির চকনো ফুলগুলো ছেলে দিয়ে কেনা ফুলগুলো রেখে দিল। মালবিকা পাশের ঘর থেকে একটু তড়াতাড়ি এসে সেখান থেকে ফুল উঠল, সত্যি অপূর্ব।

পাখাটা চলিয়ে দিয়ে সোফায় বসে ডামার বোতাম খুলতে খুলতে বলল, রোভই ফেরার পথে ফুলগুলো দেখি। এত সুন্দর কিন্তু নকল বলে কি একটা সম্ভাচ কাঁজ করছিল। নতুন সবকিছুতে কি যেন একটা অসন্তোষ, প্রতিবাদ কাঁজ করে। এ যেন একটা ব্যতিক্রম। কিসের প্রতিবাদ? কার বিরুদ্ধে? ভালো ঠিক ঠিক উত্তর খুঁজে পাই না। মালবিকা বলল— তো মিছামিছা পাটাগুলো কী করে?

সেইটাই তো কলহি। ডাকলাম প্রকৃতি না কলক, সৃষ্টি তো কোনো মানুষেরই! সুতরাং অপণ্ডিত কীসের! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে শ্যামাপন—

যখন তোমার সামনে ফুল ফোটেনা, পানি ওড়েনা, এক টুকরো খোলা মীল আকাশ নেই, তখন—

কথটা শেষ হচ্ছিল। হঠাৎই খোলা দরজার মুখে কে বলে উঠল, 'কী এত কাব্য— খোলা আকাশ নেই।' দুজনই চেয়ে দেখল — অনন্ত।

বোস, বোস কী খবর?

খবর আর আমার কি, খবর তো তোমারই। তা এখনই ফেরা হল?

মালবিকা বলল— হ্যাঁ, এখনই, আর সঙ্গে এই কাব্য, বলে ফুলদানিতে কৃত্রিম ফুলটা দেখাল।

বিরহিত হয়ে অনন্ত বলে উঠল, আর ওরু করেছো কি! তুমি নকল ফুল কিনেছো, তাই এত কাব্য?

হালকা হেসে বলল শ্যামাপন— কী করা যাবে। তাই বলছিলাম যখন তোমার সামনে নেই আকাশ, পানি, ফুল তখন বাঁচবে কী নিয়ে? সম্ভবত জানিয়ে অনন্ত বলল— রাইট, বাঁচবে কী নিয়ে, আমি তো তাই বলে আসছি এতদিন। ভুলি তো কীই করিস নি।

বালি গায়ে সামান্য পাউডার ছিটিয়ে এসে বলল শ্যামাপন। ঘ্যানের হাওয়াটা যেন ক্লাস্তি বেশ মাপন হল। তারপর বল খবর কী?

অনন্ত বলল— বলহিলাম তোদের গ্রামের জমিটা কি বিক্রি হয়ে গেছে?

—ইয়েস, হয়ে গেছে। আমার কপালে সেড জুটেছে। অশ্বা প্রত্যেকেই তাই জুটেছে। কিন্তু ব্যাপার লাগছে কি জানিস অনন্ত, অভাব পুঙ্খ, কত খেপা করেছি, সাঁতার কেটেছি, মাছ ধরেছি, সব শেষ। আসলে মা মারা যাবার পর কেউ আর দায়িত্ব নিতে চাইল না। অশ্বা আমিও পারিনি। কী করে পারব, চাকরি টাইশন, নইলে বাঁচব কী করে! সে যাক। টাকটা কী ভাবে রাখব বল।

অনন্ত বলল— অসুবিধে নেই, ব্যাঙ্কেই রাখ। তবে একটা ব্যাঙ্ক রাখিস না। ভাগ ভাগ করে তিন চারটে ব্যাঙ্ক রাখবি। শ্যামাপন জিজ্ঞাসা করল, কেন একটা ব্যাঙ্ক রাখলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি মানে ইনকাম ট্যাক্স-বাক্স, এর কামেলা হতে পারে এই আর কি? এখন বল পুরোটাই ফিস্কড করবি, না কিছু সেভিংসএ রাখবি? বলল অনন্ত।

—না তাবছি এক রাখব, বাকিটা সেভিংস—এ। কারণ কিছুটা অন্য কাজে লাগাবার ইচ্ছে আছে। মানে বাড়িতে কিছু খরচ আছে।

* *

কত রাত ঠিক নেই। মালবিকার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। সেখল শ্যামাপন পাশে নেই। রাতের বাতিটা স্নান আলো ছড়ান্নিল সমস্ত ঘরটায়। খাট থেকে একটু দূরে শ্যামাপনকে দেখা গেল। মশারি সরিয়ে ধীরে ধীরে উঠে এল মালবিকা, আসতে আসতে বলল, কি গো, ঘুমাওনি? এখানে কী করছ? ধীরে ধীরেই বলল শ্যামাপন— সের্বি ফুলটাকে, সতিয়া সুন্দর না? সে কথার উত্তর না দিয়ে মালবিকা বলল, কত রাত জান?

—কী হবে জেনে, একটা সময় তো সকাল হবেই!

—ঘুমোবে না, বিজ্ঞান তো চাই, আবার সকালে বের হতে হবে তো — শ্যামাপনের কীমে হাসকা হাত রেখে বলল মালবিকা।

শ্যামাপন ধীর পায়ে জানলার কাছে সরে এল। ঘুমন্ত শহরের উর্ধ্বকাশে তখন নক্ষত্রেরা একদুট্টে চেয়ে আছে। তাদের নিচে প্ল্যাম্পপোস্টের আলোর প্রহরীর মত জ্বলে। জানলা দিয়ে অনেক দূরে চোখ মেলে চেয়ে রইল।

খুব কাছে গিয়ে মালবিকা জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে তোমার?

—পিতৃপুরুষের ভিটে চলে গেল। চার বিঘে জমি, কত গাছ, পুকুর, ফুল, ফল, মাছ, শাক, সব—একটা বিশাল অতীত নীরবে প্রহান করল।

সকাল বেলাটা বহু তাড়া। পাশাই, কম্পি, শ্যামাপন সবাইকেই সকালে বের হতে হবে, সকলেরই তাড়া।

সকাল বেলা সব সামলানোর দায় মালবিকার। টেবিলে শ্যামাপনের সামনে বসে খাবার বাড়িয়ে দিতে নিতে বলল— শোন না, বলহিলাম কি, আমাদের বাথরুমটায় মার্বেল বসালে কেমন হয়? কত রকম লোকজন আসে। শুধু তাই না, হিমম্মম রাখতে অনেক সুবিধে।

যেতে যেতেই মাথা নাড়ছিল শ্যামাপন। শুধু একবার বলল— ঐ।

—কি ঐ? আমার কথা শুনলে?

মালবিকা জানে শ্যামাপন মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে ঐ বলে কিন্তু শোনে না। অন্য কি সব ভাবে। তাই সবেশ কাটাতে আবার জিজ্ঞাসা করল — কী কলসাম বলত?

একটু হাসল পরে বলল — মার্বেল বসানোর কথা।

আবার জিজ্ঞাসা করল মালবিকা — কোথায় বসাব বলছি বলত?

আবার হাসল শ্যামাপন — বাথরুমে।

দুজনে একসঙ্গে হাসল।

আসলে শ্যামাপন সত্যিই অন্য কিছু ভাবছিল, সেটা আর মালবিকাকে বলল না। সেটা হল শ্যামাপনের ইচ্ছে দেওদায় সিঁড়িটায় মার্বেল বসানো। সিঁড়ির ধাপগুলো কেমন ধপধপ করবে, কম্পির ছোট পা তার ওপর লাগিয়ে লাগিয়ে উঠবে; মালবিকার দিকে তাকিয়ে বলল— তোমার কথা শুনে ভাবহিলাম ঠিকই মার্বেল বসানো যেতেই পারে। হালকা পঞ্চাশেক টাকাতো হাতে রাখছি ঘরটাকে সাজাবার জন্য। আইডিয়াটা ভালই দিয়েছে। তবে কি ভান মালবিকা টাকা পয়সার এখন বড়ই দরকার। যা দিনকাল পড়ছে, ছেলে মেয়েদের ডিবাভারের কথা ভাবতে হবে তো। আত্মকাল ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো আর সম্ভাব্য হচ্ছে না। প্রাইভেটাইজেশান চলছে। লাখ লাখ টাকার ধাক্কা। কসিগরা তো প্রাইই বলছে— মিস্টার দাশ ইনকামের অন্য পথ দেখুন। মালবিকা বলল— তোমার সময় হয়ে যাচ্ছে যে। তড়াক করে লাগিয়ে উঠল।

ঠিক সাতটা মিনিয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে! বিনয়ের বাড়িতে যেতে যেতে মালবিকার কথা চিন্তা করছিল। মালবিকা থেকে মার্বেল, সেশান থেকে অর্থ উপায়, প্রাইভেট টাইশান, জমি বিক্রি, লাখ টাকা, অতীত ভিটে; শ্যামাপন তলিয়ে গেল। পুকুর পাড়ে কত বড় শিরিষ গাছটা থেকে কোনো এক দুপুরে ঠকঠক শব্দ আসছিল। লম্ব অনুসরণ করে করে গেছিল এগিয়ে। সেখেলি এক কাঠোকাটা তার বিশাল ঠোঁট দিয়ে শিরিষের প্রকাণ্ড ডালে আঘাত করে চলেছে। দুপুর বেলায় সেই লম্ব। কত বড় ভিটে, কত গাছ, পাখি, ফুল, ফল।

মা বেঁচে থাকতে পাণাই রুশি গেলেন আনন্দে মেতে যেত ওরা।

বিনয় সামরে ডেকে নিয়ে বলল। বলল — এখন পুরো দস্তুর সংসারি কী বল। এ মিকে তো আর মাফাসই না।

—আর বলিস কেন, সংসারের যা কষ্ট, শোন বেশি কণ বসব না, মেটাছুটি সাড়টায় বোরাব। ষণ্ডরবাড়িতে তলব, যেতে হবে। তাই নাকি? উপযুক্ত ভাষাই হয়েছিল, পাওড়ি মাতা নিশ্চর খুব খুশী— বলল বিনয়।

কথাগুলো বাসাবাক না নেহাতই ঠাটা বুকেতে পারল না শ্যামাপন। প্রসঙ্গটাকে ঢুকতে চাইল না কারণ ভাষাই আরকাল শাওড়ির না গর্ভধারিণীর এই বিতর্ক বিশাল, নারীবাদ, পুরুষতন্ত্র অনেক কিছু। তাই বেশি এড়িয়ে যাওয়া। ঘড়িটা লক্ষ্য করল। ছটা চটিল।

কলেক্টর কথাগুলো মনে পড়ে শ্যামাপন? বলল বিনয়। সেই যে বলল, প্রতিফ্রায়ালীল, কত কী, না! সাংস্কৃতিক পরিবর্তন? তুই তো লেখাটোখা মিনিস, এখন আর লিখিস চিঠিস?

দায়সারা উত্তর দিতে চেষ্টা করল শ্যামাপন— না। ও সব এখন অতীত। সময়টাতে এক জাপগায় কোনোদিন দাঁড়িয়ে ছিল না, কোনো মতবামও না। সব কিছু বদলাচ্ছে, নিজেকে অনড় রাখা মানে পিছিয়ে যাওয়া। আসলে ওসব নিয়ে ভাবতে আর ভাল লাগে না। অনেক ভেবে দেখছি, পারছি না কিছুই। তাই পরিবর্তনটাকে বোকবার চেষ্টা করছি, এ্যাডভান্স্ট করার চেষ্টা করছি। দেবছি টেনসান কাটছে। পিঠটা এলিয়ে মিল চেষ্টা করে।

বিনয় বলল— কাটছে বললেই কাটছে? সব কি ফুলে বেতে পারছিস? ভাবনাগুলো কি সব মিথো হয়ে গেল যা আগে ভাবছিলি? অবাক্য কি রোজ চোখে পড়ছে না?

বাধা দিয়ে বলল শ্যামাপন— অবাক্য? কিসের অবাক্য? এ অবাক্য চিরকালই ছিল। এই যে আমি ব্রাইডেট পড়াই। অতীতে কি এ প্রথা ছিল না? অনেক জাদীওণী, দার্শনিকও এ কাজ করেছে।

— ব্রাইডেট পড়ানোতে আপত্তি নয় শ্যামাপন। আপত্তি পড়ানোর পছন্দে অর্ধের মোহ যা তোর শিক্ষকতার দেশকে ছাপিয়ে যায়। কথাটা বলেই নিজেকে সামলে নেয় বিনয় — এই দেখ, কি সব আছে বাজে বকুতে শুরু করলাম। শোন বলছিলাম কি, একটা পত্রিকা বের করব ভাবছি।

আবার পত্রিকা, ক্লেপেদিস?

হ্যাঁরে ক্লেপেদিস। আয়ত্রা বিপদে পড়ছি। অনেক অনেক বিপদে সীমিত সাহায্যে যদি ভা প্রকাশ করতে পারতাম। যে দুলাবোনের ক্ষয় দেখছিস তার ওপরেই লেখ না। তোর একটা

গ্রামীণ অতীত আছে, তোর চোখে তো বেশি করে পড়বে।

একটু হাসল শ্যামাপন, বলল— পঁচিশ বছর হল গ্রাম ছেড়েছি। গ্রামের ভিটে বিক্রিয়ে দিয়েছি সেড় লাখ টাকায়। এখন চিন্তা কোন কোন ব্যাংকে রাখব যাতে ইনকাম ট্যাক্স না দিতে হয়। আরো একটু গভীর হয়ে বলল বিনয়— বেশ তো সেইটাই লেখ না, কোন পরিস্থিতিতে ট্যাক্স দিতে চাচ্ছিস না সেইটাই লেখ। বিনয় এবার চোয়ার থেকে দাঁড়িয়ে একবার জানালার কাছে গেল। তারপর বলল— এই যে এখানে এলাম, এটা কেয়ার। এখান থেকে আকাশ দেখা যায় না। যার সীমানা চোখে পড়ে না তাই আকাশ। ক্রমশই সেওয়াল সব আকাশ গ্রাস করছে সেটাকে লেখ না।

ঠিক ঠিক মনেতে দিয়ে বটকা লাগে, তবু একটু ভেবে বলল শ্যামাপন, ঠিক আছে। বলছিস যখন ভেবে দেখব, আর উঠি।

মনের মধ্যে একটা অড়ুগি নিয়ে ষণ্ডর বাড়ি পৌছল শ্যামাপন। মালিকা ঘণ্টারীতি পৌছে গেছে।

পাণাই ব্যাবকে দেখে ছুটে এল, বলল, বাবা দেখ— শ্যামাপন দেখল বাড়িতে যেমন ফুলের তোড়া কিনে নিয়ে গেছিল ঠিক তেমনই এক গোছা ফুল।

পাণাই বলল— ঠকে দেখ... শ্যামাপন ঠকল। সুন্দর একটা গছ। বলল, কী করে এল রে এত সুন্দর গছ, এ তো এই ফুলের গছ নয়। পাণাই বিস্ময়ে বলল— কী করে বুঝলে? শ্যামাপন উত্তর বুঝে গেল না। বলল, কী করে এত মিষ্টি গছ এল এতে?

পাণাই বলল— তুমি এই ফুল বাজারে ছাড়া অন্য কোথাও দেখেছ কি?

শ্যামাপন মনে করবার চেষ্টা করল, বলল, না। পাণাই বলল— যে ফুল তুমি দেখনি কোনো দিন, কী করে জানলে তার গছ এটা নয়?

শ্যামাপন বলল— তুই কি তবে বলতে চাস এই গছটা এই ফুলের নিজস্ব?

পাণাই বলল— হ্যাঁ।

সামনে শ্যালিকার শাওড়ী বসে ছিলেন। ঘণ্টে আধুনিকা, ছোট করে কাটা চুল, লিপস্টিক। গর্বের সঙ্গে বললেন— অজকালকার বাচ্চারা কত ইন্টেলিজেন্ট দেখেছ, কেমন কাবু হয়ে গেলে তো।

ছোট বাচ্চাটি ততক্ষণে তার ঠাকুরমার পারের কাছে চলে গেছে। শাড়ি ধরে উঠতে চাইছে। হঠাৎই বৃদ্ধা বলে উঠলেন— অনু শিগগির এস, দেখ তো ভোমার ছেলোটা আবার অপকীর্তি করল না কি?

অনু ছুটি এল। বাচ্চাটি সতী প্যাটে পায়খানা করে ফেলেছে। বৃদ্ধা ভাল করে শাড়ি উন্টিয়ে পানিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলেন শাড়ির কোনো অংশে কোনো কিছু লেগে আছে কিনা।

শ্যামাপদ নির্জের মায়ের কথা মনে পড়ল। পাপাইও প্যাটে ময়লা করে ফেলেছিল একদিন। মা পাপাইকে নিয়ে গিয়ে নির্জে হাতে ধুয়ে দিয়েছিল। নির্জের শাড়ি দিয়েই ধুয়ে দিয়েছিল। ডাবছিল সে, তখনই শালিকা অনুপমার শাওড়ী শ্যামাপদকে বললেন, ওয়েল ফেয়ারের কাছে আমাকে অনেক রিমোট ভিসেজে যেতে হত। বেক্ষি 'আমাদের গ্রামের মায়ের হাইজিন সেল একময় নেই। নির্জের শাড়ি দিয়েই মোছায়।

শ্যামাপদ বলল— ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে, সেটা কি অস্বীকার করতে পারবেন?

— মানতে পারলুম না, বললেন বৃদ্ধা। এ কোনো আন্তরিকতা নয়, অজ্ঞতা।

শ্যামাপদ ভাল পরিচ্ছন্নতা যদি স্বাস্থ্যসম্মত ভাবেই হয়, তবুও এই শাওড়ীরা কি নির্জের নাতিকে নিজে হাতে পরিচাল্য করছেন? আসলে পরিচ্ছন্নতার নামে দামিড এড়ানো, নাতি নাতনীকে নির্জের করে না দেখতে পারার মনোভাব। এমন হাইজিনের গ্রন্থ তুলে ডালাবাসা, আন্তরিকতা, দরমকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। এইসব যখন ভাবছে হঠাৎ মালবিকার চিংকার। ওনহো শিগগীর এস। শ্যামাপদ ছুটল। দেখল পাপাইয়ের ডান হাতের কবজি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বরছে। মালবিকা চেপে ধরেছে। একুনি হাসপাতাল যেতে হবে, বলল মালবিকা। শ্যামাপদ ব্যাভেজ্ঞ এনে এঁটে বাঁধতে লাগল, বলল— মিন্টার সেনের নার্সিং হোমে নিয়ে যাব, ওনার ছেলে আমার কাছে পড়ে, খুব ভাল সার্জেন। কিন্তু কী করে হল? মালবিকা বলল, দেওয়ালে একটা পুরনো ছবি ছিল। ওটার পেছনে একটা টিকটিকি খুরছিল। পাপাই খুল কাড়ুটা দিয়ে টিকটিকিটাকে ভাঙাচ্ছিল, হঠাৎই ছবি থেকে কাঁচটা বসে পড়ল একেবারে হাতের ওপর।

এরপর নার্সিং হোমে। সিভিলিয়ার ইনজুরি। খরচ ভালই হবে জানালেন ডাক্তার সেন।

হ্যাঁ, অনেকদিন ডুগতে হল পাপাইকে। নয় নয় করে তিন মাস। পাপাইয়ের খুল বন্ধ গেল। এখন বী হাতেই এগুতে হবে।

ফোনটা বেজে উঠল।

ফোন আর ধরতে ভাল লাগেনা শ্যামাপদ। একই কথা পাপাই কেমন আছে। সকলের সহানুভূতি আছে তবু ওর হাতটা ঠেকানো গেল না। টাকা জলের হত খরচ হল। অপারেশন

সফল হল না। এখন পাপাইকে বী হাতে লেখায় উৎসাহিত করতে হচ্ছে। কত আশা পাপাইকে নিয়ে ডাক্তার নবুখা ইজ্রিনিয়ার। একটা অসীম আশার বহুলাত ঘটল।

ফোনটা ধরতেই হল। অনন্তর ফোন— আরেকবার চেষ্টা করতে হবে শ্যামাপদ। কিছু বরচ আছে কিন্তু সম্ভাবনাও প্রবল। খুবই নামকরা সার্জেন। হতাশ হোস না। ফোনটা কেটে গেল। পাপাইকে আবার খুলে নিয়ে খাওয়ার ডোড়কোড় শুরু হল। আজ থেকে পাপাই খুলে যাবে। নৃত বৃকের কোনো শুভ পাখায় যেন সবুজ একটি পাতার আকর্ষণ।

পাপাই-এর শরীরটা বেশ দুর্বল। ডানহাতের কবজি থেকে আঙ্গুলগুলো অসহায়ভাবে খুলছে। অনন্ত কী সম্ভাবনা দেখল কে জানে। মালবিকা প্রস্তুত হচ্ছে। পাপাই ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে গেল। বী হাতে সেই ফুললানিটা তুলল। নাক বাড়িয়ে গন্ধ ঠকল। রংটা অক্লিত আছে। মায়ের ড্রেসিং টেবিল থেকে সেপ্টটা এনে হাড়িয়ে দিল। কৃষ্ণির মাথার লাগানো প্রজাপতি ক্রিপটা ফুলের ওপর বসিয়ে দিল।

মালবিকা বেরিয়ে গেল ওদের নিয়ে।

এখন শ্যামাপদ একা। পাপাইয়ের ডাক্তারি পড়ার বাসনা হবে কোন গোপন কোণে উন্ময় হয়ত হয়েছিল শ্যামাপদ। এখন মনে হল কি জামি আবার হতভাগ্য শ্যামাপদকে পুয়ের হাত হারানোর যন্ত্রণা সহিতে হত হয়তো। কিন্তু যদি পাপাইয়ের হাত ভাল হয়ে যায়, যদি অনন্তর প্রচেষ্টা সার্থক হয়— পরমুহূর্তে পাপাইয়ের কবজি থেকে খুলে বাক্সে অংশটা মনে পড়তেই চোখ বন্ধ করল সে। হয়েতো সবটাই ছুয়া বেলা। এই কি অবক্ষয়? ডাক্তার সেন বেশ বড় ডাক্তার। তবু অনেক অবহেলা হয়েছে। মনে পড়ল বিনয়ের কথা—অবক্ষয়, মূল্যবোধ। কিছুটা লেখার চেষ্টা করলে হয় না? কানের কাছে শিরিষের ডালে ডাকা কাঠচোকরার চৌটারে শব্দটা যেন আর্তনাদ করে কানে বাজল।

প্যাডটা টেনে নিয়ে লিখতে চাইল— মার্বেলের মেঝে থেকে কাঠচোকরার আর্তনাদ উঠছে। হঠাৎ দরজা ঠেলে ঢুকল অনন্ত।

—এখনি যেতে হবে তোকে, বলল অনন্ত।

শ্যামাপদ যেন জাক্কেপ ছিল না, সে যেন পরসেক্টর হয়ে বলল— অনন্ত, মার্বেল পাথর, কাঠচোকরার শব্দ, প্রাস্তিকের ফুল, বসে পড়া হাত, অথবা গাছ নিয়ে এক মসে কি মনো পাখা যায়?

অনন্ত বলল— এখন পাগলামি করার সময় নয় শ্যামাপদ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না।

শ্যামাপদ কোনো ওজর চালল না। একরকম টেনে নিয়েই বেরিয়ে গেল ওকে।

'বনের খবর' পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর হুঙ্কা হয়ার মাধ্যম হঠাৎই খেলে গিয়েছিল ব্যাপারটা।

অনেক দিন ধরেই ডক্টর হুঙ্কা হয়া ভাবছিলেন — কী করে 'বনের খবর' পত্রিকার পাঠকের সংখ্যা বাড়ানো যায়। পাঠকের সংখ্যা বাড়তে হলে, পত্রিকায় বৈচিত্র্য আনতেই হবে। পত্রিকায় এমন এমন বিষয় যোগ করতে হবে — যা পাঠকদের কাজে লাগবে। নতুন করে ভাবতে শেখাবে।

হঠাৎই মাথায় এল চিন্তাটা। 'দি আইডিয়া' বলেই লাফিয়ে উঠলেন হুঙ্কা। ডেকে পাঠালেন মিস কিচির-মিচিরকে।

মিস কিচির-মিচির সব্য দুকেছে 'বনের খবর' পত্রিকায়। একেবারেই ব্যাচ্চা মেয়ে। কত আর ঘাস হবে। কড় ভোর মাস তিনেক। সাংবাদিকতায় পনেরো দিনের কোর্স করেছে হুঙ্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

'আসব স্যার?'

ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল কিচির-মিচির। নতুন তো! এখনও আড়ষ্ট ভাবটা কাটেনি।

ডক্টর হুঙ্কা হয়া কম্পিউটারের পর্যায়ে চোখ রেখেই বললেন, 'এসো'।

'আমাকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার?' গলা শুকিয়ে আসছে কিচির-মিচিরের।

'হ্যাঁ। একটু বোসো। বলছি।' ব্যাসবেসে গলায় বললেন হুঙ্কা।

'কী বলবে রে বাবা! কিছু কি ভুল-মূল করলাম কোথাও? চাকরিটা চলে যাবে না তো?' মনে মনে ডেকে পাঠানোর চারপাটা বোঝার চেষ্টা করে কিচির-মিচির। নানা রকম উত্তর উকি মেঘ মনের চিলে-কোঠায়।

কম্পিউটারের পরদা থেকে চোখ সরিয়ে, হুঙ্কা বললেন, 'মুগ্ধিত! অনেককণ বসিয়ে রেবেছি তোমাকে। কী খাবে বলো। পোকা-মাকড় কিছু আনাও?'

'না স্যার। ধন্যবাদ। এই মাত্রই টিফিন করলাম ঘাস-পোকা আর ফড়িং দিয়ে।' কিচির-মিচিরের গলায় কৃতজ্ঞতার সুর।

'শোনো, যে কারণে তোমাকে ডাকা— তোমাকে একটা কাজ করতে হবে কিচির-মিচির।' হুঙ্কা এমনভাবে বললেন কণ্ঠগলো, যেন চাঁমে যেতে হবে কিচির-মিচিরকে।

'কী কাজ স্যার?' কৌতূহলে চক চক করে কিচির-মিচিরের চোখ দুটো। উদ্বেজনাও বাড়ে।

'বনের খবর' পত্রিকার জন্য বিভিন্ন ধরনের বনের প্রাণীদের সাংস্কাংকার নিতে হবে। এদের মধ্যে অনেকেই আছেন— যারা দুর্ভাগ্যবশত, মানুষদের হাতে ধরা পড়ে, বনের বাইরে আছেন। এতক্ষণে বহুসংখ্যক কীটিনা বুললেন হুঙ্কা।

'মানে, যারা ডিডিয়াখানায়, বা সার্কাসে, বা কারও বাড়ির সাজানো বারান্দায় বাঁচায় আছেন— তাঁদের কথা বলছেন স্যার?' কিচির-মিচিরের কুজিঙ্গীপ্ত উত্তর। আনন্দে ফুঁড়ক করে একটু উড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু, এটা সম্পাদকের অফিস। এখানে চকলতা দেখানোটা ঠিক হবে না। একেবারেই না।

'ঠিক তাই। বৃকতে পারছি— তোমাকে দিয়েই হবে। তুমিই পারবে কাজটা করতে।' হুঙ্কা নিশ্চিত হলেন।

'আমাকে ঠিক কী করতে হবে স্যার?'

'তুমি সিংহ, বাঘ, হাতি থেকে শুরু করে, পাখি, মাছ, সাপ, ব্যাড, প্রজাপতি— সবাই কাছ য়াও। তাঁদেরকে প্রম করো বনে টীরা কেমন আছেন? বনে থাকার কী কী সুবিধে আছে? অসুবিধেই বা কী কী?' হুঙ্কা যে সম্পাদক হিসেবে কতটাই মক্ষ— তা বৃকতে পারে কিচির-মিচির।

'মানুষদের শহরেও কি যাব স্যার?' কিচির-মিচিরের উচ্ছ্বাস।

'অবশ্যই যাবে। যেখানে মানুষরা আমাদের যে-সব আশ্রয়-বন্ধন বা বন্ধ-বান্ধবদের জোর করে আটকে রেখেছেন— তাঁদেরও সাংস্কাংকার নেবে।' হুঙ্কার গলা একটু গভীর শোনায়।

'তাঁদেরকেও প্রম করব— কেমন আছেন আপনারা? এখানে কী কী সুবিধে পাচ্ছেন? কী কী অসুবিধে আছে?' কুজিঙ্গীপ্ত সংযোগান কিচির-মিচিরের।

'ঠিক তাই। আরও জানতে চাইবে, বনে ভাল ছিলেন, না একানেই ভাল আছেন? মানুষরা যদি আপনাকে ছেড়ে দেয়, তা হলে কি আবার বনেই ফিরে যাবেন? না কি মানুষদের সঙ্গেই থেকে যাবেন?' যোগ করেন হুঙ্কা।

'মানুষরা এদের প্রতি কেমন ব্যবহার করছেন— তাও কি জানতে চাইবে স্যার?' এ প্রশ্নে যে সম্পাদক মশাই বেশ খুশিই হবেন— তা জানত কিচির-মিচির।

'বা। দারুণ বলেছ তো! হ্যাঁ। জিজ্ঞাস করবে বইকী। অবশ্যই জিজ্ঞাস করবে।'

'আগে তা হলে কোথায় যাব স্যার?' বিনীত প্রশ্ন। ওপরওফালারা এমন প্রশ্নে খুশিই হন।

‘আগে তুমি কেনও চিড়িয়াখানাতেই যাও, বুঝলে?’ কথা বলতে বলতেই ফোন ধরেন হৃৎকাক। আফ্রিকা থেকে এক হাতির ফোন।

‘কেন স্যার?’ বুঝেও না বোকার ডান করে কিচির-মিচির। হৃৎকাকও টের পান সেটা।

‘বেশা, বনের পাত-পাখি-পতঙ্গরাই আমাদের পরিচায়ক পাঠক। বনের কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে— তার অনেকটাই তীরা জানেন। কিন্তু মানুষদের হাতে পড়ে কার ভাগ্যে কী যে ঘটছে— তা বড় একটা কেউ জানেন না। কাজেই, আমাদের পরিচায়ক তাঁদের কথা ধারাবাহিকভাবে লেখা হলে, পাঠকরা যাকে বলে একেবারে কীপারে পড়বেন আমাদের পরিচায়ক ওপর। হৃৎকাকের বিক্রি বেড়ে যাবে আমাদের কাগজের।’ একটু অন্যমনস্ক দেখায় হৃৎকাকে।

‘ঠিক বলেছেন স্যার।’ ওপরওয়ালার কথার সঙ্গে ডালে-ডাল মেলায় কিচির-মিচির। ‘কী? কাজটা কেন?’ ঘোরানো

চেয়ারের সেল খান হৃৎকাক।

‘ওঃ। দারুণ স্যার। দারুণ লাগছে আমার এ কাজটা হাতে পেয়ে।’ বলে কিচির-মিচির।

‘তোমাকেই এ কাজে বেছে নিলাম কেন জানো?’ হৃৎকাক চশমা ধোঁলে।

‘কেন স্যার?’ কিচির-মিচির জানে এবার তার বুদ্ধি আর কাজের জর-পাখা গাওয়া হবে।

‘কারণ, এক, তোমার ডানা আছে। উড়তে পারে। বন থেকে এক উড়ানেই শহরে শৌছে যেতে পারবে।

দুই, বিশপে পড়লে, উড়ে পল্লভাতে পারবে।

তিন, বাহিরে তোমার আত্মীয়দের বাস আছে। সেখানেই থাকতে পারবে।

আর চার, তুমি বুদ্ধিমতী।’

‘তবে আর মেরি কেন? কাজে লেগে যাও।’

[চলবে]

নিকৃষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিপন্ন ক্রেতাসমাজ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন কোনো না কোনো সাফল্যের খবর প্রায়ই খবরের কাগজে বেবোয়। বেশিরভাগই বিশেষণে। অন্যদিকে আমাদের দেশের সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগ যেন প্রস্তর যুগে পড়ে রয়েছে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্লোজুইনল (cloquinal) বহুল প্রচলিত আশ্বাশ্বাসের ওষুধ। ১৯৭০ সালে জাপানে এই ওষুধ খেয়ে অনেকেই দৃষ্টিশক্তি হারায়। সারা বিশ্বে আলোড়ন ওঠে ওষুধটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মাধ্যমে। দৃষ্টি হারানো কিছু মানুষ ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিছু ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয় ওষুধ কোম্পানিটি। সম্ভবত সেটাই প্রথম ক্ষতিপূরণ আদায়ের ঘটনা, ওষুধ বাজারের ক্ষেত্রে।

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, যিনি আবার ওষুধ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পরিচায়ক সংগঠন, জানানো — কার্যকরী NGO (বেসরকারি স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা) ও ক্রেতা সংগঠনের তরফ থেকে কিছু ওষুধ নিষিদ্ধ করার তথ্যে সুপ্রিম কোর্ট মামলা করা হয়। মামলাটি এখনও কোর্টেই কূলে আছে। ওষুধগুলি দিবা বিক্রি হচ্ছে। মানুষ কিনছে এবং খাচ্ছে। এরকম আরো বেশ কিছু ওষুধ ঢালাও বিক্রি হচ্ছে যেগুলি আবার বিশদে নিষিদ্ধ, এসেছে নব। আমাদের রাজ্যের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের (Directorate of Drug Control) এক পদস্থ আমলার কাছ থেকে জানা গেলো কোন ওষুধ নিষিদ্ধ হবে তা

ঠিক করেন কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারের পর্যায়স্থ নিষিদ্ধ ওষুধ বাজারে বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখার। বছর চারেক আগে অ্যানাশ্বাসিন ট্যাবলেট (কিউ) নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় কারণ এই ওষুধের ভয়ঙ্কর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। হাড়ের ক্ষয় ও তার জন্য রক্তাক্তজটিলিত (aplastic anaemia) নামান রোগ উপসর্গ দেখা যায় এই ওষুধ ব্যবহারকারীদের মধ্যে। কিন্তু ওষুধ কোম্পানিগুলো আইনের ঠাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যায়। আইন আছে সরকার কর্তৃক ‘নিষিদ্ধ’ ঘোষিত ওষুধ একটি নির্দিষ্ট তারিখের পর আর উৎপাদন করা যাবে না। কিন্তু আগের তৈরি হওয়া বাজারে চালু ওষুধের কী হবে? আইনে সে বিষয়ে যা বলা আছে তা স্পষ্ট নয়। হাস, এই তো সুযোগ। ওগুলো যদিও বাজারে চলে চলুক। লাভ আসবে। ভূগবে ক্রেতাসা। বুকুন অবস্থাটা।

কেন্দ্রীয় সরকারের ওষুধ মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (Central Drug Standard Control Organisation)-র এক পদাধিকারী পরিভার জানানো যে, রাজ্য সরকারেরই নিষিদ্ধ ওষুধ বিক্রি বন্ধ করার দায়িত্ব কারণ রাজ্য সরকারই তো ওষুধ বিক্রি ও প্রস্তুত করার লাইসেন্স প্রদান করে থাকেন। অথচ বাস্তবে দেখা যায় দুটোই চলছে, একদিকে নিষিদ্ধ ওষুধ ও অন্যদিকে সরকারি উপসিন্ডা।

তথ্যসূত্র : দি স্টেটসম্যান ; ২২ মার্চ, ২০০১

অনুবাদ □ বরুণ ভট্টাচার্য

ধাপার সবজি এবং মাছ — সুখাদ্য না অখাদ্য

চির দত্ত

সী

তের মরওম চলে খেল। বাজারে এতদিন নানা ভাজা শাক-সবজির সমারোহ ছিল। বিরাট আকারের ফুলকপি সাজিয়ে বসে থাকত সবজি-ওয়ালারা, তার সঙ্গে থাকত বীথাকপি, লাউয়ের ডগা, পালংশাক, লাঙ্গশাক—হরেকরকম তরি-তরকারি। এর মধ্যে চিকিৎসকদের নির্দেশ—খাদ্য-প্রণালীতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমিষের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ তরকারিও সমপরিক্রমে গ্রহণ করুন। তাই, সবজির বাজারে এত ভিড়!

এর সঙ্গে মাছের বাজারেও নানা আকর্ষণীয় জাণের। সবচেয়ে সোভনীয় হল জ্যাক মাছ। ক্ষেতাদের দৃষ্টি ফেঁসাবার জন্য মাছ-বিক্রেতারা সমুদ্রে ভেড়ি থেকে তোলা মাছ জীবন্ত

অবস্থায় বাজারে আনার চেষ্টা করেন। বিশেষত উচ্চরক্তচাপ বহিত মানুষেরা এবং খারাপ ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন, তাঁরা বাজারে এসেই এসব জ্যাক ছোট মাছ বোকার চেষ্টা করেন। কারণ, ডাক্তারবাবুৱা বলেছেন — এ ধরনের ছোট জ্যাক মাছ তাদের পর্বীরের পক্ষে উপযোগী। দুধের

বিষয়—এ জাতীয় সতেজ সবজি ও মাছ কলকাতার বাজারে যতই সোভনীয়রূপে দৃশ্যমান হোক না কেন, আসলে এসব খাদ্যবস্তুর অধিকাংশ পরিমাণ শহরের পূর্বপারে ধাপা এবং সিম্রিড অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয় বলে—এতে বিবক্রিয়ার পরিমাণ উদ্ভ্রান্তের বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রতি বিভিন্ন সমীক্ষক দল সবজি এবং মাছের নমুনা সংগ্রহ করে এবং তাতে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যে ফলাফল পেয়েছেন তা রীতিমত উদ্বেগজনক!

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত হল—অতিরিক্ত বিবক্রিয়ার ফলে ধাপা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের সবজি আর মাছও সংক্রমণ মুক্ত নয়। ফলে তা আর মানুষের নিশ্চিন্তে গ্রহণের পর্বায়ে নেই।

কৃষকমাস আগে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এবং

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগ এই সমীক্ষার কাজ শেষ করে। ১৮ মাস ধরে এ সমীক্ষার কাজ চলে। তাতে দেখা যায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী যেখানে একটি মানুষ প্রতি সপ্তাহে তার দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য ০.৫ মিলিগ্রাম দিসা গ্রহণ করে সহ্য করতে পারে, সেখানে ধাপার সবজিতে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০১.৫ মিলিগ্রাম। অনুজপভাবে একজন মানুষ প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য যেখানে সপ্তাহে ০.০০৮৩ মিলিগ্রাম ক্যাডমিয়াম গ্রহণ করার যোগ্য, তা বিবক্রিয়ায় আক্রান্ত সবজিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৯ মিলিগ্রাম।

তাই এই ভয়াবহ বিবক্রিয়ার ফল সহজেই অনুমেয়।

**বিশেষজ্ঞদের মতামত হল— অতিরিক্ত
বিবক্রিয়ার ফলে ধাপা ও নিকটবর্তী
অঞ্চলের সবজি আর মাছও
সংক্রমণমুক্ত নয়। ফলে তা আর মানুষের
নিশ্চিন্তে গ্রহণের পর্বায়ে নেই।**

দিসা-বিবক্রিয়ায় যে সমস্ত সৈকি উপসর্গের আধিক্য ঘটে, তাহল—বমি-বমি ভাব, কুদাহীনতা প্রভৃতি। দিসা সংক্রমণ দেহের যকৃতে এবং মাথার, অভ্যন্তরে দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি করে। তাছাড়া, দূষণে জড়িত ধাতুগুলি ফসল সবজির দেহে ছড়িয়ে পড়ে,

তখন তা গ্রহণে নানা দুরারোগ্য ব্যাধি ছাড়াও মানুষের ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। ক্যাডমিয়াম শরীরের বিভিন্ন অংশকে আক্রমণ করে এক ফুসফুস, যকৃত, হাড় এবং মস্তিষ্ক অবস্থানের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

সবজির ওপর বিবক্রিয়ার মূল কারণ হল—মলমিশ্রিত যে জল ধাপা এবং বানতলা অঞ্চলে সবজি ফলনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাতে বিভিন্ন কেরনামার বর্জ্য পদার্থ বেরিয়ে এসে মেলে এবং এতে এত বেশি দূষিত পদার্থ থাকে, যার ফলে দূষণযুক্ত জলের সাহায্যে উৎপাদিত সবজিও বিধাক্রান্ত হয়ে পড়ে। শহরের পূর্ব-সীমানায় অবস্থিত শিল্প কারখানাগুলি এসব বিষ ছড়ায়। এতে রয়েছে এসিড, রাসায়নিক পদার্থ, রঙ, বার্নিশ কাটারি, রঞ্জক পদার্থ, গলানো সীসা প্রভৃতি উৎপাদনকারী নানা কারখানা।

ওইসব শিল্প-কারখানা ছাড়াও টাংরা, তপসিয়া অঞ্চলের ১৪০টি চামড়ার কারখানা নিকশি খালের প্রবাহকে আরও দুর্বৃত্ত করে তুলছে। চামড়ার ১ কোটি হাইড্রক্লোরিক অ্যাসিডের জন্য জলের প্রয়োজন হয় ১০ গ্যালন। এভাবে ১ কোটি গ্যালন দুর্বৃত্ত জল ট্যানারির বর্জ্য পদার্থ হয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এখানকার নির্গত জলে এত বেশি ক্রোমিয়াম থাকে যে, কাপড়ের হওয়ার জন্য যে পরিমাণ ক্রোমিয়াম দাবী, তার চেয়ে প্রায় ১০০০ গুণ বেশি। বর্জ্য পদার্থের বিক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে আকর্ষণ হয় শাক-সবজি, দিম্বা এবং ক্যান্টারিয়ার অংশ এতে জমা হয়। পাল-শাকের তা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তাছাড়া পালশাক, পুঁই শাক, মূলা, ফুলগুঁড়ি, ফুলডা, বেগুন প্রভৃতিতেও তা বিস্তৃত হয়। এ সমস্ত সবজি রান্না করে খেলে উনুনের উত্তাপে হয়ত ব্যাকটেরিয়াও লি মরে যায়, কিন্তু এর ভেতরের সঞ্চারিত যেসব ধাতু থাকে, তা থেকে দূষ্টি পাওয়া দুঃস্বপ্ন!

ধাপা এবং বানতলা অঞ্চলের প্রায় ২০০০ একর জমির ওপর এসব শাক-সবজি ফলে। এখান থেকে ৫৫,০০০ টন সবজি বছরে কলকাতার বাজারে চালান হয়। সন্টলেক, শিয়ালমহি, শ্যামবাড়ার, পার্কসার্কাস, লেকমার্কেট, গড়িচাহাট, বোধপূর পার্ক, মাদকপুর, বিমিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের বাজারে ভেড়ারদা তা সবজি বিক্রয়ভাণ্ডারের কাছে পাইকারি দরে বিক্রি করে। পরে তা বুচকো এবং গৃহস্থের কাছে বিক্রয়।

ওইসব বাজার থেকে সংগৃহীত ধাপা, বানতলার সবজির সঙ্গে অন্য এলাকার মিষ্টি জলের উৎপাদিত সবজির তুলনা করে দেখা গেছে— অন্য অঞ্চলে বেড়ে ওঠা সবজি ধাপা, বানতলার সবজি থেকে অনেকটা বিষমুক্ত।

তবে, শুধুমাত্র নিকশি খালে প্রবাহিত বর্জ্য পদার্থ নয়, সবজির পাতার বিক্রিয়ায় আর একটি কারণ হল— শহরে লক্ষ লক্ষ গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ার কুফল। কিংবা স্থায়ী সংস্কার মর্মানকে পেছনে ফেলে যেভাবে কলকাতায় বায়ুদূষণ ৪/৫ গুণ বেড়ে গেছে, তার তীব্র প্রতিক্রিয়া গাছ-পাল্লার ওপরও পড়ছে। এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সবজি হল সাউ এবং ডুটী। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এ সমস্ত গাছ বেশি পরিমাণে ধাতু গ্রহণ করতে অপারক। তাই ধাপা-বানতলা এলাকায় তা উৎপাদিত হলেও ততটা বিক্রান্ত নয়। তাই বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ— এ সমস্ত অঞ্চলে শাক-সবজি চাষ করতে হলে বর্তমান জারাইটিকে বাদ দিয়ে ভিসমের শাক-সবজি এবং গাছ উৎপাদনে নজর দিলে ভালো হবে।

এ বিষয়ে আরও একটি সমীক্ষক দলও ধাপা-বানতলা অঞ্চলের শাক-সবজি এবং মাছের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা

চালান। বৃটিশ ও ভারতীয় ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি ইনস্টিটিউশন-এর অর্থসূক্ষ্মে 'সেমসাপান' গ্রুপ কলকাতার পরিবেশ সমস্যার সমাধানের পথ সম্বন্ধে সুপারিশ জানাতে গিয়ে সমাধানের পথ সম্বন্ধে সুপারিশ জানাতে গিয়ে ধাপা, বানতলা অঞ্চলের সবজি এবং মাছ সম্বন্ধেও প্রতিবেদন পেশ করেন। এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে একমুখর পরিশোধিত ওয়ার্কিং পেপারে। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা জানান— ধাপা অঞ্চলের শাক-সবজিতে মিশে থাকা ভারি ধাতু মিশ্রিত অংশ নানা রকম পরীক্ষী এবং জীবাণু-সংক্রান্ত সংক্রমক রোগ ছড়িয়ে যে-কোনও সময় জনস্বাস্থ্যে বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসতে পারে। শাক-সবজির মত ধাপা এবং সরিষিত অঞ্চলের ভেড়ি থেকে তোলা মাছের মধ্যে বিক্রিয়ার প্রভাব দেখা গেছে। এ সম্বন্ধে কলকাতা কলেজা রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে ১৯৯২-৯৩ সালে এক সমীক্ষার কাজ চালানো হয়। ডাঃ এস পি সি এবং ডাঃ এম কে সাহার সেই রিপোর্টে দেখা যায় কলকাতার মলমিশ্রিত জলে মাছ চাষের ফলে মাছের মধ্যে প্যাথোজেনের উপস্থিতি বরা পড়ছে। শতকরা ৩৮ ভাগ মাছের মধ্যে কলেরার জীবাণুর অংশ রয়েছে।

১৯৯৪ সালে এস এল ভৌমিক এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ ৪টি অঞ্চলের মাছ চাষের পুকুর থেকে মাছ তুলে এসে যে পরীক্ষা করেন, তাতে দেখা যায়— এদের শরীরের মধ্যস্থর থেকে উচ্চতর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কলিফর্ম রয়েছে, যা রোগ ছড়াতে সহায়তা করে।

ডাঃ এস পি সি ১৯৯৫ সালে কলকাতার বাজারে ধাপা থেকে আসা মাছ পরীক্ষা করে দেখেন শতকরা ১০ ভাগ মাছের মধ্যে প্যাথোজেন জাতীয় বিক্রিয়া রয়েছে। এর ফলে মানুষের যেহে গ্যাস্ট্রো-এন্ট্রাইটিস রোগ ছড়াতে পারে।

ডাঃ এস এল পাণ্ডে ১৯৯৫ সালে মাছ-চাষের জন্য সম্ভাব্য সমস্ত জলের মাছের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে পেয়েছেন— মলবাহিত জলে মাছ চাষ করলে মাছের দেহে সবচেয়ে বেশি ভারি ধাতুর অবস্থান ঘটে। আইএস আইএ-এর মান অনুযায়ী যেখানে পানীয় জলে ভারি ধাতুর পরিমাণ ৩৩৫ মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটার, সেখানে মলবাহিত জলে তা পাঁচগুণ কমেও ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার, লোহার ক্ষেত্রে ০.০৩ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার, মৃৎরর ক্ষেত্রে ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার এবং ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার উচিত, সেখানে মলবাহিত জলে তা পাঁচগুণ কমেও ০.০৩, ০.০৬, ০.০৬৭ এবং ০.০২৭।

এধরনের নানা দুঃখ ধাপা এবং বানতলার শাক-সবজি এবং মাছকে বিক্রয় করে তুলেছে।

তাই, এদের বাজারে বিক্রি করার আগে শোধন করে নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করতে কর্তৃপক্ষকে যত্নবান হতে হবে।

* পি পি এম ০০ Parts per Million = গাঢ়ত্বের পরিমাপের ক্ষর আনুপাতিক একক।

সংকর বীজ ও বিপদ

সম্প্রতি যাববপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ইন্দুঘড়ী সভাপণ্ডে 'হাইব্রিড বীজ ও তার বিপদ' নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। কল্যাণ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া), এবং সায়েশ ফর সোসাইটি (ইন্ডিয়া)র যৌথ উদ্যোগে। কল্যাণ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ারস (ইন্ডিয়া)-র চেয়ারম্যান চির দপ্তর আলোচনা বিষয়কস্তর ওপর আলোচনা করেছেন গুরুত্ব। তিনি বলেন, 'মনসবটো' ও অন্যান্য কৃষকৃতিক কোম্পানির (যারা হাইব্রিড বীজ তৈরি করে প্রচুর মুনাফা করে) চক্রান্তে ভারতবর্ষ কৃষিকে সম্পূর্ণভাবে তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। বায়োফার্টাইলিজারের উৎপাদন ও ব্যবহারের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

বিশিষ্ট কৃষিবিশ্ব ডঃ সুশীল মুখার্জী বলেন, একদিকে প্রচুর মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে, অপরদিকে শস্য জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আবার বিদেশে রপ্তানিও হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের ধরে নিতে হবে উৎপাদন নিশ্চয় বেশি হচ্ছে। হাইব্রিড বীজ নিয়ে ছোট ছোট ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, ওগাওগা বিচার না করে, সোজাসুজি বৃহত্তর ক্ষেত্রে নতুন শ্রেণীর বীজের ব্যবহারের ফলে কৃষি অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। নতুন নতুন বীজ আনার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি পোকামাকড়ের দ্বারা আক্রান্তও হয়ে পড়ছে। ফলে কীটনাশক রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে। একে বিপজ্জনক ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করে শ্রী মুখার্জী বলেন, সঠিক পরিমাণে এর ব্যবহার না করলে অনেকসময় কীটের পাশাপাশি মানুষের শরীরের ওপরও আক্রমণ করে এই কীটনাশক। এমনকি ক্ষুদ্র পর্বত ঘটে যায়। আকার, বেশি রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ভূমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। কারণ, মাটিতে অসংখ্য অণুজীব বসবাস করে, বেশি সার দিলে তাদের সংখ্যা কমে যায়। ফলে মাটিতে অবস্থিত বিভিন্ন অপরিহার্য প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়ার অভাব দেখা যায়। মাটির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। রিও-ডি-জেনেরিও-তে বীকৃত 'বায়োসেফটি প্রোটোকল'-এ কলা হয়েছিল, কোনো নতুন বীজ পরীক্ষা করে না দেখা পর্যন্ত ব্যাপক হারে ব্যবহার করা যাবে না। তবুও মনসবটোর মত কৃষকৃতিক কোম্পানিগুলি তাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে কিছু বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক মানুষের সাহায্যে এই বীজগুলি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে আমাদের মত দেশে। তিনি একথাও বলেন কিছু ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানীর তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও

ভারত সরকার মনসবটোর মত সংস্থাকে ব্যবসা করার হাউপস দিয়েছে।

কৃষি বিপদন মন্ত্রী বীরেন মৈত্র বলেন, পরিকাঠামো না থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কাজের এক-মশামলেও ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না। বলছেন, সংকরবীজ ব্যবহার না করলে ফলন অনেক কম হয়, ফলে চাষীরা মারা যাবে।

বিধানসভা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নবীনন্দন ঘোষ বলেন, শুধুমাত্র উন্নত মানের বীজ ব্যবহার করলেই ১০-১৫% উৎপাদন বাড়ানো যায়। চাষীদের কাছে সঠিক তথ্য না জানানোর ফলে হতত তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানের বীজ ব্যবহার করেন।

সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারী স্টাডিজের প্রধান মেগ মেব তাঁর আলোচনায় কৃষিবিপদন মন্ত্রীর অভিযোগকে খণ্ডন করে বলেন, 'বাদ্য উৎপাদন যদি শূন্যের কাছে চলে আসে, অথচ বিপদন যদি ঠিকমত হয়, তাহলেও মূল্যিক ১০ শতাংশের বেশি হবে না।' বলা হয়ে থাকে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়লে দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে। এই চিরাচরিত ধারণাকে নস্যাক করে দিয়ে ডঃ মেব বলেন, 'উৎপাদিত প্রতি গ্রাম উদ্ভূত খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যের অপর্যাপ্ত ও মই হয়ে যাওয়ার প্রকণতাকে বাড়িয়ে দেয়।' তাই সম্প্রতি উদ্ভূত খাদ্যশস্যের উৎপাদন হলেও দেশের অগণিত অনাহারে থাকা মানুষের মধ্যে বণিত না হয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। তিনি আরও বলেন, একসময়ে ভারতে ৫৬০০ প্রজাতির ধান ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত নিরীক্ষায় বর্তমানে ৫৪০ রকমের ধানের প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

অন্তত ৪৭ রকমের ধান যেমন— কবিরাজসাল, পাঞ্জাব সাল, তুলসীমুকুল, বহরানী প্রভৃতি অন্য যে কোনো সংকর প্রজাতির সাথে লড়াই করতে পারে। সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারতে খাদ্য আমদানি বন্ধ হয়েছে বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, ১৩ লক্ষ টন ভোজ্য তেলের চাহিদা মেটাতে ৩০ লক্ষ টন সোয়ায়ড তেল আমদানি করা হচ্ছে প্রতি বছরে। ভারতে ১৮ রকমের তৈলবীজজাত তেল পাওয়া যায়। তবুও এত তেল বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে সবুজ বিপ্লবের নামে।

ডঃ কে. ঘোষাল বলেন, হাইব্রিড ধানের ব্যবহার কর্তমানে এক প্রতিষ্ঠিত তথ্য। তিনি বলেন, যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, তা সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা দেখা প্রয়োজন।

ডঃ মৃণালকান্তি বোস বলেন, ক্রমাগত রাসায়নিক সারের ব্যবহার বাড়লেও অপরদিকে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে ভীষণভাবে। বায়োফার্টাইলিজার ব্যবহারের দশক ও রাসায়নিক ফার্টাইলিজার ব্যবহারের বিরুদ্ধে জেদ ধারণা করেন তিনি।

প্রতিবেদক : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

এবছর ২০০১ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে (৭ এপ্রিল) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO ঘোষণা করেছে এ বছরের বিশ্বব্যাপী জনচেতনতা বিস্তারের বিষয়—‘মানসিক স্বাস্থ্য’। মূল স্লোগান —
Stop exclusion, Dare to care.

বিষম্বাতা যখন অসুখ

সত্যজিৎ আশ* ও মোহিত রণদীপ

দৃশ্য এক

আপাতদৃষ্টিতে সবরকম সুখ এক স্বাস্থ্যশেখর মধ্যে থাকা মালবিকা সপ্তাহ তিনেক ধরে তীব্র বিষম্বাতায় আক্রান্ত। হঠাৎ করেই যেন প্রাণচঞ্চল মালবিকা সবার সঙ্গে যেলামেশা বন্ধ করে একা ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে কিংবা শুয়ে থাকতে শুরু করলেন। কোনো কিছুই তাঁর করতে ইচ্ছে করছে না। অসম্ভব এক ক্লান্তি তাঁকে যেন পেয়ে বাসেছে। খেতেও ইচ্ছে করছে না। অনেকবার প্রণয় করলে দু’এক কথায় হয় তো উত্তর দিচ্ছেন। কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না। কথা বলতে শুরু করলে প্রবল হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে, বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না আর। কিন্তু, আত্মহত্যা করতে গেলে যে উদাম ও পরিকল্পনা লাগে তাও এই মুহূর্তে তাঁর নেই। বেশ কয়েকদিন ধরেই ঘুমহীন সোপে, ভাবলেশহীন হবিরতা নিয়ে দিন কাটেছে বিয়াক্তিগত বছরের নিঃসন্তান মালবিকার।

দৃশ্য দুই

অনুপকে এখন নার্সিংহোমে রেখে চিকিৎসা করতে হচ্ছে। ইক্সমিক্স নিয়ে মাস্টার ডিগ্রির পর অনুপ কার্যত বেকার-ই। কয়েকটি টিউশন করত কিন্তু তৃপ্তি ছিল না তাকে, একসময় পড়ানো ছেড়ে দেয়।

আঠাল বছরের অনুপ সিন দুয়েক আগে অনেকগুলি ঘূমের ওষুধ একসঙ্গে খেয়ে ফেলেছিল। তার পরেই নার্সিংহোমে।

বেশ কিছুদিন ধরেই তার মন ভালো নেই। তারই সঙ্গে মনে প্রবল রাগ ও বিরক্তিও ছিল। বাবা তাকে কম্পিউটার পরীক্ষাগুলোতে করার কথা বললেই তার প্রবল রাগ হয়ে যেতো। এমনটিতে খুব ছোট কারণে বিরক্ত হওয়ারও

তার স্বভাবে পাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝেই নিজেকে তার অপসার্য মনে হত। তীব্র হতাশাও প্রকাশ পেতো কথাবার্তার।

কিছুদিন আগেই মাকে বলেছিল, ‘দেখো, একদিন সব ছেড়েছুড়ে কোথাও চলে যাবো’।

দৃশ্য তিন

মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহস্থ অনুপমা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বাড়িতে বছর তিনেকের মূটমূটে মেয়ে অদ্বিতি আর মেয়ের বাবা সুমত—এই নিয়ে অনুপমার ছোট সংসার।

সুমত বেসরকারি একটি নামী প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-প্রতিনিধি। কাজের ব্যস্ততায় অধিকাংশ দিনই বাড়ি ফেরে বেশ রাতের। মেয়ে অদ্বিতি ততক্ষণে গভীর ঘুমে। সকাল হতেই আবার তাঁর বেরিয়ে যাওয়া। দুপুরে মেয়ে অদ্বিতি আর ঘর গেরস্থলির সিংহভাগটিই সামলাতে হয় অনুপমাকে। সন্ধ্যার পর তিনি আর পারেন না। ক্লান্তি তাঁর শরীর আর মনে। এই ক্লান্তি ইদানীং অনুপমার প্রায় সারাদিনেরই সঙ্গী। তার সঙ্গে রয়েছে প্রায় স্নেহভর মাথা ধরার সমস্যা। তীব্রতা খুব বেশি না থাকলেও এই একঘেরে, চাপ ধরা, বিরক্তিকর মাথা ধরা—বাথার ওষুধও কমে না তেমন। এছাড়া রয়েছে তাঁর পেটেরও সমস্যা। কিছু খেলেই মনে হয় ‘আসিড’ হবে। মাঝরাতে প্রায়ই ঘুম ভেঙে যায়। গ্যাসট্রোএন্টারোলজি ও মেডিসিনের বেশ কয়েকজন ডাক্তারকে দেখিয়েও তেমন ফল হয় নি।

মন ভালো থাকে না অনুপমার। একটা অসুখী ভাব সর্বক্ষণ মনটাকে ঘিরে থাকে। একটুতেই কান্না পায়, মেজাজ হারিয়ে ফেলেন। একা চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে। গল্পের বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা—কিছুই তাঁর ভালো লাগে না। যদিও আগে বেশ ভালো লাগত এসব।

* মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক

ইনসীং অনুপমা একটুতেই উদ্ভিন্নও হয়ে পড়েন। মাঝে-মাঝেই বুঝ গড়কড় করে, একটা অজানা ভয় ঘিরে ধরে উঠে। মাঝে মাঝেই মনে হয় এভাবে আর বীড়া যায় না। কিন্তু, পরের মুহূর্তেই আবার ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটার কথা মনে পড়ে যায়।

এখানে যে তিনজনের কথা আলোচনা করা হল, সেই মালবিকা, অনুপ ও অনুপমা — তিনজনই বিষন্নতা অসুখে আক্রান্ত। এই বিষন্নতা সাধারণ মন ধারণার থেকে আলাদা।

মন ধারণা আমাদের সবারই হয়। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই তা সাময়িক হয়। তার তীব্রতা এবং গভীরতাও কম থাকে। আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্মে, সামাজিক মেলামেশায় তার খুব একটা প্রভাব পড়ে না। নিজের থেকেই আবার তা চলেও যায়।

কিন্তু, কারও কারও ক্ষেত্রে কখনও এই মন ধারণাই এক তীব্র এবং গভীর রূপ নেয়। বিষন্নতাবোধ খুব তীব্র হয়ে ওঠে। কিছুই ভালো লাগে না। কারও সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। একটুতেই পুচোষ ভলে ভরে আসে। অসুখী আর হতাশার হাপ কিংবা দুচোখের দৃষ্টিতে উদাসীনতা— একটু মন ঘিরে লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে। ভালো লাগে না কোনো কাজ, পড়াশোনা, আড্ডা, খেলাধুলা, টি.বি. বা সিনেমা, সংসার বা কর্মক্ষেত্রের কোনো কাজই। কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে বা concentrate করতেও অসুবিধে হয়। বিপত্তির কোনো কিছুর জন্য নিজেই দায়ী বলে মনে হয় (বেশিরভাগ সময় অযৌক্তিকভাবেই)। নিজেই অপদার্থ বলে মনে হয়। ভালো কথা বললেও যেন গায়ে লাগে— অতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে মন। চিন্তাভাবনা, কথাবার্তা আর কাজকর্মের গতি অনেকটাই ধীর (slow) হয়ে যায়। সাধারণত চুপচাপ আর একা থাকতে চায় মন। অন্যদের এড়িয়ে চলতে ইচ্ছে করে। খুব অল্পেই হতাশা আসে। মন চায় সব ছেড়েছড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে। এমন কি আত্মহত্যার চিন্তাও উঁকি দেখে মনের মধ্যে।

মন ধারণার এই তীব্র এবং গভীর রূপ যদি কারো মনে দীর্ঘদিন ধরে বজায় থাকে তখন আমরা এই মনধারাপকে বিষন্নতা অসুখ (Depressive disorder) হিসাবে দেখেছি। বিষন্নতা শুধু মন নয়, প্রভাব ফেলে ঘুম, খাওয়া প্রভৃতির উপরেও। বিষন্নতার আক্রান্ত মানুষের ঘুম এবং খিদে স্বাভাবিক থাকে না; হয় তা কমে যায় কিংবা বেড়ে যায়। বিশেষ কমা-বাড়ার সঙ্গে ভাল মিলিয়ে ওঠেনেও তাস্ততম। ঘটে। যৌন আকর্ষণ কমে যায়। অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। অনেক শারীরিক উপসর্গ দেখা যায় শারীরবৃত্তির কারণ ছাড়াই।

অনেক সময় বিষন্নতার সঙ্গে বেশ কিছু উবেগ-উৎকর্ষার লক্ষণও দেখা যায়। যেমন, ভয় ও আতঙ্কের অনুভূতি, অস্বস্তিবোধ, অতিরিক্ত সতর্কতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব প্রভৃতির সঙ্গে উবেগ-উৎকর্ষার শারীরিক লক্ষণও দেখা যায়। যেমন, হাত পা কাঁপা, কাঁকুনি, মাথা পিঠে ঘুরা, শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, বুকে গড়গড় করা, হাত ও পায়ের পাতা যেমন যাওয়া, বুকে ওকিয়ে আসা, কথা অটকে যাওয়া প্রভৃতি।

লেখার শুরুতে যে তিনজনের কথা কথা হয়েছে তাদের প্রত্যেকের বিষন্নতার মাত্রা বা তীব্রতা একসরকম নয়। তীব্রতা অনুযায়ী এখানে আমরা তিন ধরনে ভাগ করতে পারি বিষন্নতাকে —

- i) Severe depression
- ii) Moderate depression
- iii) Mild depression

Severe depression (তীব্র)

লেখার শুরুতেই মালবিকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মালবিকা severe depression-এ আক্রান্ত। বিষন্নতার তীব্রতা এখানেই খুব বেশি। একরাস ত্রাণি গ্রাস করে শরীর ও মনের ক্ষুধিতিকে; সেখা দেয় জবুজবু ডাব, হুবিয়াতা। অনেক সময় অত্যধিক; রাগ কিংবা বিরক্তিও দেখা দিতে পারে। অন্তত পচিশ শতাংশ ক্ষেত্রে, কোনো দুঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র বিষন্নতা দেখা মিলেও মূলত জৈব-রাসায়নিক ভারসাম্যের অভাবই তীব্র বিষন্নতা বা severe depression-এর কারণ।

বিগত তিন দশকে বিষন্নতার চিকিৎসায় তুলনামূলকভাবে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (side effect) থেকে অনেকটাই মুক্ত বেশ কিছু ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে। severe depression-এ ওষুধের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছুক্ষেত্রে ওষুধ দিয়েও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে Electroconvulsive therapy (E.C.T.) বা শক থেরাপির প্রয়োজন হয়।

তীব্র বিষন্নতা চিকিৎসার ফলে সেয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। তবে অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ওষুধ রোগীকে খাওয়ানোর দায়িত্ব অন্য কোনো পরিদর্শনীয় ব্যক্তির হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়, রোগীর কাছে সব ওষুধ দিয়ে দেওয়া অনেক সময় যথেষ্ট ঝুঁকির। কারণ, সেয়ে ওঠার পর্বে বিষন্নতা-আক্রান্ত ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতা ধীরে ধীরে ফিরে পেতে থাকে। এইসময় আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দিতে পারে রোগীর মধ্যে। এবং অনেকে আত্মহত্যার সক্ষমও হয়। সুঁতরাং, এবিষয়ে সচেতন থাকা খুব জরুরি এই সেয়ে ওঠার সময়ে।

Moderate depression (মাঝারি)

এক্রেডে বিষমতার মাত্রা Moderate depression-এর থেকে কম থাকে। তাই বলে তা কম বিপজ্জনক এমন ভাবা ঠিক হবে না। এক্রেডেও আত্মহত্যার প্রবণতা খুব বেশি পরিমাণেই দেখা যায়। ক্রমশঃ হ্রাসের ভাব Moderate depression-এ থাকে না। এছাড়া বিষমতার বেশিরভাগ লক্ষণই পণ্ডা যায় রোগীর মধ্যে। ২য় দৃশ্যে আলোচিত অনুপ Moderate depression-এ আক্রান্ত।

Moderate depression-এও ওষুধের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তার সঙ্গে সাইকোথেরাপি (Psychotherapy)/ কাউন্সেলিং (counselling)-এর ভূমিকাও একটা পর্যায়ে খুব জরুরি। তবে প্রথমে অবশ্যই কোনো মনোরোগ চিকিৎসকের (Psychiatrist) কাছে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

Mild depression (নিম্নমাত্রার)

এক্রেডে বিষমতার মাত্রা Moderate depression-এর তুলনায় কম থাকে। তবে মনধারণের অনুভূতি বেশ কিছু দিন ধরেই চলেতে থাকে এবং তা বিষমতা-আক্রান্ত ব্যক্তির মনে শুধু নেতিবাচক অনুভূতিরই জন্ম দেয় না সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত করে তার সৈনসিন সাংসারিক এবং পেশাগত কাজকর্মকে ও অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ককেও। বিষমতার বেশ কিছু লক্ষণের সঙ্গে উত্তেজিত-উৎকর্ষারও কিছু কিছু লক্ষণ Mild depression-এ দেখা যায়। এক্রেডেও জীবন সম্পর্কে অনীহা মনের মধ্যে

কী কী কারণে বিষমতা অসুখে আক্রান্ত হয় মানুষ?

বিষমতার একাধিক কারণ থাকে। আমরা এখানে সংক্ষেপে সেই কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করবো :

জৈবরাসায়নিক কারণ

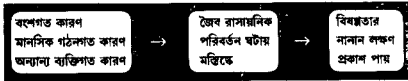
মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মস্তিষ্কের মধ্যকার বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক পদার্থের ভারসাম্যহীনতা বিষমতার কারণ। সেরোটোনিন (serotonin), নরএপিনেফ্রিন (Norepinephrine) এবং ডোপামিন (Dopamine) — এই তিন ধরনের নিউরোট্রান্সমিটারের ভারসাম্যের সমস্যা বিষমতা সৃষ্টি করে।

বংশগত কারণ

সাধারণভাবে দেখা গেছে কোনো ব্যক্তির পারিবারিক ক্ষেত্রে বক্তের সম্পর্কযুক্ত কোনো নিউরোট্রান্সমিটারের ঘনি বিষমতা থাকে, তবে তার এই অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তুলনামূলকভাবে বেশি সেই ব্যক্তির তুলনায়, যার এরকম কোনো পারিবারিক ইতিহাস নেই। তবে পারিবারিক ইতিহাস থাকলেই যে কেউ বিষমতায় আক্রান্ত হবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সূত্রান্ত অথবা আত্মক ঠিক নয়।

মানসিক বৈশিষ্ট্যগত কারণ

কোনো ব্যক্তির নিজস্ব মানসিকতার বৈশিষ্ট্য অনেক সময় তার বিষমতাপ্রবণতা নির্ধারণ করে। যেমন — ১) অত্যধিক প্রত্যাশা থাকা, এমন প্রত্যাশা যেখানে বাস্তবে পৌছানো দুরূহ।



উপরে আলোচিত কারণগুলি ছাড়াও কিছু বিশেষ ধরনের ওষুধ (যেমন— গর্ভনিরোধক বড়ি), অ্যালকোহল, কিছু বিশেষ অসুখ (যেমন— হাইপোথাইরয়েডিজম, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, ক্যান্সার, সেরিব্রাল স্ট্রোক, অ্যালঝাইমার্স, পার্কিনসন প্রভৃতি)-এর সঙ্গে বিষমতার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

থাকে। অনুপমার মধ্যে আমরা এই লক্ষণগুলি দেখছি আশেই। Mild depression-এ কিছু ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজন হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাইকোথেরাপি ও কাউন্সেলিং-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ প্রত্যাশা থাকতে পারে পরিবারের সদস্য, বন্ধু, সহকর্মী আত্মীয়-স্বজনের কাছে। থাকতে পারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রেও। ২) অল্পেতেই হতাশ হয়ে পড়া। ৩) জেঞ্জি, একগুয়ে এবং অনুদার মনোবৃত্তি থাকা। ৪) অন্যদের সঙ্গে

সম্পর্ক বজায় রাখার অক্ষমতা। ৫) অব্যাহত নেতিবাচক আবেগ-অনুভূতি মনের ভেতর চেপে রাখার অভ্যাস। ৬) অন্যদের দ্রুতি খুঁজে বেড়ানো। ৭) নিজেকে ছোট করে দেখা। অন্যান্য ব্যক্তিগত কারণ বা ঘটনা

বিষয়তা আসতে পারে □ কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুতে, কোনো গভীর সম্পর্কে ভাঙন আসলে □ দাম্পত্য কলহ, সাময়িক অবাধি থেকে, কোনো কারণে কখনো নিজেকে অবহেলিত এবং অশ্রোদ্ধজনীয় মনে হলে, □ কোনো মানসিক চাপ বা চাপ সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়লে, এবং □ দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক কষ্ট বা অসুস্থতা অথবা প্রতিবন্ধকতা।

উপরে আলোচিত বিষয়তার কারণগুলি যেভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে তার একটি ধারণা পাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এরকম — (আগের পৃষ্ঠায় দেখুন)।

আপনি নিজে কী করতে পারেন?

বিষয়তার লক্ষণ নিজের শরীর-মনে টের গেলে আপনার প্রথম কর্তব্য, কোনো মনোরোগ চিকিৎসক (সাইকিয়াট্রিস্ট) — না পাওয়া গেলে একজন জেনারেল প্র্যাকটিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করা।

চিকিৎসা শুরু পর

নিয়মিত নির্ভুলভাবে ডাক্তারের সংস্পর্শে থাকুন। ওষুধ বা নিদানে কখনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনুভব করলে অবশ্যই ডাক্তারকে জানান, ভয় পেয়ে বা নিজ সিদ্ধান্তে চিকিৎসা বন্ধ করবেন না। অল্পত ৪ সপ্তাহ ওষুধের ফল পেতে সময় লাগে, ধৈর্য ধরতে হবে, ওষুধ বন্ধ হবে না। কিছুদিন সূচিক্রিয়ার পর আপাতভাবে সুস্থ বোধ করলেও, তারপর বেশ কিছু দিন ধরে ওষুধ থেকে-খাওয়ার দরকার হতে পারে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসরণ করুন নিষ্ঠার সঙ্গে। ... নিজের অনুভূতির কথা এমন কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে বলার চেষ্টা করুন, যিনি গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারেন। মদ বা মাদক জাতীয় দ্রব্য অবশ্যই পরিচ্যাগ করুন; মদ বা আলকোহল মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিশনে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে বিষয়তা তৈরি হয়, থাকলে আরো বেড়ে যায়।

আপনার পরিচিত কেউ বিষয়তার আক্রান্ত হলে

বিষয় ব্যক্তির কথা সমানুভূতির সঙ্গে শুনুন। তার অনুভূতিকে বোঝার চেষ্টা করুন। আপনি যে তার অনুভূতিকে বুঝতে পারছেন তা আপনার হৃদয়বাহের মাধ্যমে প্রকাশ করুন। কতক সাহচর্য দিন।

: চিকিৎসকের কাছে যাবার পরামর্শ দিন। সঙ্গে অবশ্যই

পরিকারের কার্যকর কিংবা ঘনিষ্ঠজনকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে বলুন।

অনেক সময় বিষয়তাকে মনের দুর্বলতা বলে থাকেন অনেকে এবং সেখানে পরামর্শ যেন মনের জোর বাড়িয়ে বিষয়তা কাটিয়ে উঠতে। এই ধারণা এবং বিশদ্রষ্টক হয়ে উঠতে পারে। Severe কিংবা moderate level এর Depressive Disorder-এ জৈবরাসায়নিকগতরে ডারসাম্যের অভাব যেখানে উপস্থিত, সেখানে ‘মনের জোর’ বাড়িয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চিন্তা অব্যাহত। কেউ যদি এরকম পরামর্শ যেন, তাহলে তাঁকে বিষয়তা কেন হয় তা বুঝিয়ে বলুন।

পরিসংখ্যানে বিষয়তা

জসময়ে দুদ্বা (আত্মহত্যা), অনুৎপাদনশীলতা, চিকিৎসা ব্যয়, ইত্যাদি বিষয়তার প্রত্যক্ষ ফল। এইসব কারণে সারা বিশ্বের উপর যে আর্থিক বোঝা চাপে, তার নিরিখে আগামী ২০০২ সালের মধ্যে বিষয়তা দ্বিতীয়স্থানে চলে আসবে। ২০২০ সালের মধ্যে চলে আসবে তা প্রথম স্থানে।

পরিসংখ্যানে বলছে সারা বিশ্বের শতকরা তিন থেকে পাঁচ ভাগ মানুষ Major Depressive Disorder-এ আক্রান্ত। শতকরা এক ভাগ পুরুষ এবং শতকরা তিন ভাগ নারী বিষয়তায় আক্রান্ত।

ভারতের একশ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে পাঁচ কোটি মানুষ Major Depressive Disorder-এ ভুগছেন আর এর প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় দশ কোটি মানুষ Dysthymia-তে আক্রান্ত।

আত্মহত্যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিষয়তাটি দায়ী। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ থেকে দশভাগ মানুষ বিষয়তায় আক্রান্ত। শতকরা পনেরো থেকে সাতেরো ভাগ মহিলা জীবনের কোনো না কোনো সময়ে বিষয়তায় ভুগছেন।

প্রতি বছরে সারা পৃথিবীতে দশ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করে, তার মধ্যে এগারো শতাংশ মানুষ ভারতের। ভারতে ১৯৯৭-৯৮ সালে একলক্ষ চার হাজার জন আত্মহত্যা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি—প্রায় শতকরা তেরো ভাগ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারত এবং শ্রীলঙ্কার আত্মহত্যার প্রকোণ বেশি।

সূত্র : WHO

লাঠি বনাম স্টেথো

শ্যামল চক্রবর্তী

বাঁশ দিন স্নরে ভুগে মারা গিয়েছিল আঠারো বছরের ডাক্তার ছেলোটো। আর কলকাতার পাঁচতারি মার্চ এক বেসরকারি হাসপাতালে ছেলোটো মারা যেতেই কিন্তু হয়ে উঠেছিল একদল মানুষ। বেহালার যে চিকিৎসক প্রথম কয়েকদিন দেখেছিলেন ছেলোটাকে, হাসপাতালের বদলে জনতার রোধ ধেয়ে এল সেই ডাক্তারবাবুর দিকে। গাড়ি পুড়লো ডাক্তারবাবুর, ডাক্তার হল বাড়ি। শুধু চিকিৎসক নয়, মার খেতে হল তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েকেও। এখানেই থামে নি উত্তেজিত জনতা, ডাক্তারকে পাড়াছড়ি করে ছেড়েছে। সপরিবারে কোথায় চলে গেছেন সেই চিকিৎসক, এখনও জানা নেই।

দু'হাজার সালের ভিসম্বরের, এই ঘটনার পরপরই 'ভুল চিকিৎসা'র দায়ে ঘর ছাড়তে হয়েছে উক্তর কলকাতার এক চিকিৎসককে। মার্চ মাসে চিকিৎসককে 'ঘরে ফেরাতে' উদ্যোগ নেন চিকিৎসকদের সংস্থা আই. এম. এ.। সংগঠনের অন্য চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ঐ চিকিৎসক তাঁর পুরনো আত্মীয় ফেরায় 'সামাজিক পুনর্বাসনের' এই নতুনতর ও নজিরবিহীন নৃশাস্তি মিডিয়াকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। রাক্ষসেতিক দলের ঘরছাড়া সমর্থক বা সদস্যদের ঘরে ফেরার মত এই চিকিৎসকের পুরনো এলাকায় প্রত্যাবর্তনের খবর বেশিরভাগ সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে যথেষ্ট ওজুদ দিয়ে।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এই বসে গত দু'শকে রোগীর মৃত্যুর পর সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসকদের হেনস্থা, নিগ্রহ বা গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটেছে যখন তখন। যত দিন যাচ্ছে চিকিৎসকদের প্রতি সমাজের অসহিষ্ণুতা তত বাড়ছে। চিকিৎসা করাটা চিকিৎসকের পেশা। পেশাগত কাজে ভুলত্রুটি ঘটান সম্ভাবনা থাকবেই। চিকিৎসকের ভুলে বা ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু ঘটা তাই অসম্ভব নয়। এই পর্যন্ত ঠিকই আছে। প্রকটা উত্তে আসে ঠিক এই জায়গাতেই। যে মানুষটা মারা যাচ্ছেন চিকিৎসা চলতে চলতে, তার মৃত্যুর জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বা চিকিৎসায় অবহেলা কতটা দায়ী তা স্থির করবেন কে? 'অ' সাইন্স'র নিয়ম যেনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর পর উদ্ভাট, উত্তেজিত একদল মানুষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে কেলেঙ্কেন যে মৃত্যুটির জন্য দায়ী চিকিৎসকের

ভুল চিকিৎসা বা অবহেলা। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে আড়াই-খোলসি দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, সিদ্ধান্ত কার্যকর হচ্ছে অবিলম্বে।

রোগীর মৃত্যুর জন্য ডাক্তার দায়ী হলেও হতে পারেন। নাও পারেন। ডাক্তারের দায় কড়টুকু বা কোথায় তা স্থির করার জন্য আইন-আদালত বা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল নামের স্বতঃস্ফাপিত সংস্থা রয়েছে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ এসে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা চিকিৎসকদের শাস্তি চাওয়া যায় আদালত বা কাউন্সিলের কাছে। যেমনটা চেয়েছেন বিশেষ থেকে কলকাতায় এসে চিকিৎসা করাতে গিয়ে আকস্মিকভাবে মৃত সেই ভদ্রমহিলার আমেরিকা-প্রবাসী স্বামী কৃষ্ণাল সাহা। এক্ষেত্রে সময় লাগে অনেক। দরকার হয় অনেক টাকাপয়সার। বিস্তারিত মার্কিনবাসী যা পারেন, সবার পক্ষে তা পারা সম্ভব নয়। তাই বলে রোগী মারা গেলে সেই মৃত্যুর জন্য ডাক্তারই দায়ী — এটা স্থির করবেন উত্তেজিত একদল 'পাবলিক', এটা দুর্ভাগ্যজনক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও পশ্চিমবঙ্গে ঠিক এই ঘটনাই ঘটছে। ডাক্তারগোলাই আর ডাক্তারগোলাইয়ের খবর আসছে পাশাপাশি। জনতার হাতে ডাক্তাররা মার বেলে বৃশি হন সাধারণ মানুষ। গলারোষে ডাক্তার নিপুণীত বা প্রহৃত হলেও আত্মপক্ষিত হচ্ছেন একশ্রেণীর মানুষ। ঠিক হয়েছে। বম্ব বাড বেড়েছে বাটার।

চিকিৎসকদের এই 'বড্ড বেড়ে যাওয়া'র পর্জীরে গেলে রোগীর মৃত্যুর জেরে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনাগুলোকে জেনেবুকে নেওয়া যায় নান্দিক থেকে। যে পেশা মানুষের জীবনমৃত্যুর সঙ্গে আছে জড়িয়ে, সেই পেশার মানুষের নিগ্রহ বা হেনস্থা আর যাই হোক সামাজিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে আসৌ সুখকর নয়। যে সমাজ ডাক্তারদের যখন তখন চিকিৎসা করছে 'গণশত্রু' হিসেবে, — সেই সমাজের চিকিৎসা আর চিকিৎসক-সংক্রান্ত যনতুড় কোন বিবর্তনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে? এই প্রশ্নের পর্জীরে না গেলে ডাক্তার-রোগী বা ডাক্তার-সাধারণ মানুষ সম্পর্কের ধারাবাহিক অবনতির মূল সূত্রগুলো ধরা যাবে না।

ডাক্তাররা সব পারেন, যে কোনও অসুস্থ মানুষকে ইচ্ছে করলেই সুস্থ করে দিতে পারেন এরকম অবৈজ্ঞানিক

ভাষ্যনিষ্ঠার সাধারণ মানুষ আশ্চর্য্য আত্ম থেকে নন, অনেক অনেককাল আগে থেকে। কবিরাজের বটিকা বা পাচনের যুগ থেকে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলো যেদিন থেকে একটু একটু করে ঢুকতে শুরু করেছে এদেশে, সেদিন থেকেই ডাক্তাররা 'ভগবান'। 'ভগবান ডাক্তার' মানবিক হবেন, হবেন দয়ালু সন্তান — সুভর, তাঁর ব্যবহার হবে মধুর। তাঁর মুখের মিষ্টি হাসিতে (অথবা হাতের বরাদ্দ মুদ্রায়) সেসে যাবে অর্ধেক রোগ। ডাক্তার চরিত্রটির এই যে ছবি এদেশের মানুষের মনে গেঁথে আছে বীর্ঘকাল ধরে, গরিব দেশের গরিব মানুষের এটাই ইচ্ছাটা স্বাভাবিক। শিক্ষিত চিকিৎসকদের চূড়ান্ত অগ্রদূতগণও এই মানসিকতার অনেক কারণের একটা। গরিব মানুষের পক্ষে 'ভগবান' নামের ঝুটিকে মনের মধ্যে আশ্রয় খাঁড়তে ধরে কীবদনধাপনের রানি বা যন্ত্রণাকে ভুলে থাকা সহজতর হয় অবশ্যই। এদেশে অনেক 'দাঁর' অনেক 'বাবা' (এমনকি আধুনিক কালের ধর্ম ব্যবসায়ীরাও) রমরম করে পসার বাড়িয়েছেন সাধারণের এই মানসিক আচ্ছন্নতাকে পুঁজি করে। যদি বলি এতকালের সুটেড ব্যুটেড, কোট টাই পরা, গাড়িচড়া, গ্রামাদের মালিক ডাক্তারবাণে সাধারণের 'ভগবান' বনে গেছেন এমনই এক মোহের বশে, এতটুকু ভুল বলা হবে না। 'কবাব' বা 'ওক' বের মত এর জন্য ডাক্তার 'বাবু' মের হুজুতে তেমন পবিত্রতা করতে হয় নি, কবাব হই নি ক্রমাগত কৌশলী ছক।

'ডাক্তাররা হচ্ছে করলেই রোগীকে বাঁচাতে পারেন না।' চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু অশ্রুত উন্নতির সিনেও সব রোগে আক্রান্ত সব মানুষকে পুরোপুরি সারিয়ে তোলা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বা ডাক্তারের হাতের বাইরে। এর পাশাপাশি তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশের অপরিস্রুত পানীয় জল, অস্বাস্থ্যকর বসবাসের ও কাছের পরিবেশ, খাবারদাবার নিয়ে হাজারটা ভ্রান্ত ধারণা — এগুলোকেও মাথায় রাখতে হয়। নতুন স্বাস্থ্যে যে 'কমপিউটার-শাসিত আধুনিক' ভারতবর্ষে পা রাখতে চাইছে চরক সূত্রের (দেশ, সেখানেও নিম্নবিশিষ্ট বা মধ্যবিশিষ্ট একটা বড় অংশ মানুসম বাহ্যাক্রমের বৃত্ত থেকে অনেক অনেক দূরে দাঁড়িয়ে। একদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিকতম সবারকম সরঞ্জাম, অন্যদিকে জড়িঝুটি, তাবিল, বড়জোর কোম্বাকের 'জাদু-টনিক', এই চূড়ান্ত বৈপরীত্য নিরৈই আপনাতর আমার ভারতবর্ষ চাইছে 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য'!

এদেশে ডাক্তারদের সামাজিক অবস্থান আত্ম বেশ জটিল। শিক্ষিত চিকিৎসকদের একাংশ পেশাগত দিক থেকে 'সকল', কেমনা রোগীর চিকিৎসাকে পেশা বনিয়ে এঁরা দ্রুতলয়ে টাকা-

গাড়ি-বাড়ির মালিক হচ্ছেন। সমাজ এঁদের সামলো হতটা নজরদার, ভদ্রটাই বিরক্ত, বিশেষ করে শহরবাসের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। প্রতিবেশীর পুত্র ডাক্তার হয়ে কয়েক বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে, বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতা এটাকে মেনে নিতে পারে না। কোনও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনাই বাঙালি মধ্যবিত্তের সেক্ষেত্রে ভুলে মনে করার চেটা করেন তাঁর কোন পুত্র-সম্পর্কের পিসতুতো দিগির মাসতুতো ভাইও যেন ডাক্তার। সাতশো টাকার ভিজিটের ডাক্তারকে বাঙালি মনে মনে শ্রদ্ধা করে, সন্তানের সঙ্গে উচ্চারণ করে হেতিওয়েট এ ডাক্তারের নাম। আবার এই বাঙালি ডাক্তারের বাড়ির কাছের লোককে বাচ্চের দুগ্ধে টাকা কেঁচি ধরে পাবনা মাহ কিনতে সেখানে আশি টাকা কেঁজির মাহ কিনতে কিনতে মনে মনে ডাক্তারের মুণ্ডপাত করে। ডাক্তারের গাড়ি, বাড়ি, সুট, টাই, জুতা — সবই যে সাধারণ মানুষের কড়িতে কেনা। সরাসরি হাত পেতে টাকা নিতে হয় বেশরকারি ডাক্তারদের। তাই ডাক্তারের অর্থনৈতিক সামলার একটা অংশ যে তারই গাড়ির কড়ির বিনিময়ে — বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে এই তথ্য সঁধিয়ে গেছে অনেক গভীরে। মজা হল এটা মেনে নিতে না পারলেও বাঙালি মানসিকতায় কিন্তু উল্লেখ্য নেই যুগ্মশিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, বাজারীতিবির, অমলগ-এরকম পেশাদারদের অর্থনৈতিক উপায়ে বিপুল বৈভব ও 'সামল্য' স্বর্জন নিয়ে। মানুষ তেমন আক্রমণাত্মক দ্রোহ প্রকাশ করে না এঁদের প্রতি। যত আক্রোশ যেন ডাক্তারদের প্রতি।

এই বিশ্বদান ডাক্তাররা এই মুহুর্তে ডাক্তার সনাক্তের এক প্রতি সামান্য অংশ। সরকারি চিকিৎসকদের একটা বড় অংশের অবস্থান এখনও মধ্য বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্তরে। একজন ব্যাঙ্কের অফিসারের চাইতে সরকারি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অর্থনীতি উঁচু তারে বোধ নয়, যদি না সেই বিশেষজ্ঞ সরকারি চাকরির পাশাপাশি প্রাকটিস করেন। গত পাঁচ সাত বছরে পাশ করেছেন এমন চিকিৎসকদের বেশিরভাগের অর্থনৈতিক অবস্থান যেক্টো অসম্ভব। সরকারি চাকরিতে চোকোর পথ প্রায় বন্ধ কেন না সরকার (নীতিব, সাধারণের চোখের আড়ালে) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ডাক্তার - নিয়োগ করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। এদের কেউ ছ'হাজার টাকা মাইনের নার্সিং হোমের ক্রীতদাস, কেউ বা আর কিছু না ছোটগোটে শেষে সরকারের 'টিকা-দাস'। 'টিকা-ডাক্তাররা' মাস গেলে থোক টাকা পান কয়েক হাজার। এ ছাড়া আর কোনও সরকারি সুযোগসুবিধা এঁদের জন্য নেই।

হাজার হাজার 'অসমল', মধ্যবিত্ত চিকিৎসক যে সমাজে

ঘুরে বেড়াচ্ছেন চোখের সামনে, সেই সমাজ কেন যে আচ্ছন্ন ভক্তার আর বিজ্ঞকে সমর্থক মনে করে, সে এক আশ্চর্য সমীকরণ। কোনও ডাক্তারবাবুর গ্রাসাদ বা চকচকে গাড়ি না থাকলে সাধারণ মানুষ তাকে 'বাতিফরী' ছাপ মেরে খেন। বলেন, 'একমাত্র এই লোকটারই কিস্যু হল না।' ৭শ হাজার ডাক্তারের মধ্যে পাঁচশো বিজ্ঞবান চিকিৎসকই সাধারণের চোখে 'ডাক্তার সমাজ' এর প্রতিনিধি। মধ্যবিত্ত বা অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা ডাক্তারকে দিয়ে 'চিকিৎসক শ্রেণীকে' বিচার করেন না কেউই।

ডাক্তারদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ শ্রেণী বৈষম্য ঝড়টা প্রকট, ততটাই প্রকট এই পেশার পেশাদারদের বিভ্রাসনা। আর এই একটা ব্যাপারে সদ্য পাশ করা ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত নামঘণওয়াল্লা ডাক্তারের মানসিকতার ফারাক বড় কম। বনামখন এইসব চিকিৎসকদের অনুকরণ করতে চাইবে তাঁদের ছাত্ররা, এটা অস্বাভাবিক নয়। মনে পড়ে দুশশকেরও বেশি সময় আগে 'ডাক্তারি ছাত্রদের নৈতিকতা' নিয়ে শ্রদ্ধাভ পিঙ্ক-চিকিৎসক ও ডাক্তারি ছাত্র — শিকানবিশের এক বিতর্ক সভার কথা। এক স্পষ্টভাষী ছাত্রনেতা বলে ফেলেছিলেন কথাগুলো। 'ডাঃ 'ক'র অনেক পয়সা, তাই সব ছাত্রই চায় ভবিষ্যতে 'ডাঃ ক' হতে। টাকাপয়সা কম এমন লো-ব্রোফাইল অথচ মানবদরদী শিককদের কেউ অনুকরণ করতে চায় না।' মৌচাকে ঢিল পড়েছিল যেন, গুরু হয়েছিল উত্তপ্ত বাকযুদ্ধ। এই ট্র্যাডিশান আজকের নয় বৎসালের। ডাক্তারি শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষাদানের পাশাপাশি এটা শেখায় না যে পেশাগত সাফল্যই শেষ কথা নয়, শেষ কথা মানবিকতা। পেশাগত দক্ষতা আর মানবিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটাতে পারলে ডাক্তারি পেশার পাঠশালা অনেক কটীবান্ধিত, আদর্শবান, সহ চিকিৎসকের জন্ম দিতে পারতো। তা হয় নি। বাতিফরীরা আছেন, সব পেশাতেই থাকেন। তবে সাধারণভাবে ডাক্তারি পেশার আদর্শবান অথচ দক্ষ চিকিৎসকরা চিরকালই সংখ্যালঘু।

বাচার অর্থনীতি চালু হবার অনেক আগে থেকেই 'বাক্তার' এর গাডায় পা ঢুকিয়েছে যেসব পেশা, ডাক্তারি তার মধ্যে অন্যতম। টাকা চাই, আরও টাকা। নামঘণ চাই, কতটা জানা নেই। রোগীকে 'সাবভেজ্ট' নয় 'অবভেজ্ট' হিসেবে দেখার যে মানসিকতা তা আর যাই হোক পেশাদারিত্ব নয়। অন্য পেশার তুলনায় ডাক্তারিতে সফল হওয়া যায় তুলনামূলকভাবে কম সময়ে। আর এই সময়টাকে আরও কমিয়ে আনতে চেষ্টার

শেষ নেই এক শ্রেণীর চিকিৎসকের। চিকিৎসাবিজ্ঞানের হই নহ, জার্নালও নয়, লেখাপড়া দেখানোর ভার এরা তুলে দিয়েছেন বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার মেডিকেল প্রতিনিধিদের হাতে। এইসব ওষুধ কোম্পানির পরিবেশিত অর্থদত্ত বা বিকৃত সত্যকে অধিকাংশ ডাক্তারবাবু মেনে নেন অবশীল্য। সংস্থার পরিবেশিত তথ্যকে মগজে পুরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক তথ্য বা তত্ত্বগুলোতে রপ্ত হবার অভাবমীম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ডাক্তারবাবুদের রপ্ত করতে কোটি কোটি টাকা খরচা করে ওষুধ প্রস্তুতকারকরা। লক্ষ্য আরও বেশি ওষুধ বিক্রি ও মুনাফা বাড়ানো।

ওষুধ প্রস্তুতকারকদের পেওয়া নানা উপহারসামগ্রী শোভা পায় ডাক্তারবাবুদের বাড়িতে, চেয়ারে— এই তথ্য আজ জানেন প্রায় সকলেই। যা জানেন না তা হল একডাকে চেনা যায় এমন অনেক পেশাদার ডাক্তার দুখরতা চকচকে গাড়ি বা বিশেষ ভ্রমণের খরচের বিনিময়ে নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছিলেন অনেক অনেককাল আগেই। তখন পাহাড়ের চূড়ার দিকেই নজর পিত ওষুধের বেনেরা। ডাক্তারদের সংখ্যা বাড়তে থাকায় ওষুধ পর্বত শিখর নয়, পর্বগাত্রের সর্বত্র সন্ধানী দৃষ্টি ফেলাতে শুরু করে এরা। চিকিৎসকদের সংগঠনগুলো প্রতিরোধ করতে পারতো এদের অবাধ মুণ্ডা। করে নি। মাসে মাসে ফাইন্ডারি হোটেলের কনকারেলের নামে ঢালাও পান ভোজন, যখন তখন উপহার, 'সায়ংটিফিক সেমিনার'—এ লাঞ্চ বা ডিনার ষাওয়াতে ওষুধ ব্যবসায়ীদের এক ডাকে বা বিনা ডাকে এগিয়ে আসা— বেনেদের ফাঁদ এড়িয়ে চলা যে বড়ই কঠিন।

ডাক্তারি পেশায় সবাই না হলেও কেউ কেউ পা সেবেন এদের ফাঁদে এটাই স্বাভাবিক। বাস্তবে এই পেশাতে মুক্ত পেশাদারদের ছোট একটা অংশই নৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এদের সঙ্গে। আর এইসব 'কালে জেডাডের সঙ্গে যখন টুকে পড়েন এককালের 'বিশ্রুটি' ছাত্রনেতা অথবা 'আদর্শের বুলি কপটানো 'তরুণ তুর্কী' তখন ভয় লাগে, যন্ত্রণা হয়।

এইসব চিকিৎসক অবশ্যই এই পেশার কুলাসার। 'ডাক্তারদের বাড়ি বাড়ি' বলতে সাধারণ মানুষ যা বোঝেন তাতে এইসব কুলাসার পেশাদাররা ইচ্ছন ভূগিয়েছেন অনেকটাই। এইসব চক্ষুলক্ষ্যহীন, মোটা চামড়ার কিছু ডাক্তারের জন্য আজ ভূগতে হচ্ছে চিকিৎসকদের প্রায় সবাইকেই। স্টেথোর দিকে যখন তখন তেড়ে আসছে লাঠি।

| আগামী সংখ্যায় কাকি অংশ |

কালাপাহাড়ি তালিবান : ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া

অমিতান্ত ডক্টার্স

ক্রিয়া

তালিবানরা আবার শব্বের পিরোনামে। এবার ফতোয়া জারি হয়েছিল কামিয়ানে পৃথিবীর সবথেকে উঁচু বুদ্ধমূর্তিটির উপর। ইসলাম ধর্মে মূর্তি পূজার নিষেধ করা হয়েছে, আর ইসলাম ধর্মের 'শীঠস্থান' আফগানিস্তানেই নাকি রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তিটি। অতএব পরিমিত বেড়িও থেকে ঘোষণা করা হল : বিশ্বমীমের ওই মূর্তি ওড়িয়ে দাও। মহা উৎসাহে তালিবানরা নেমে পড়ল সেই কাজে। ওই মূর্তিটি যখন তৈরি হয়েছিল তখন ইসলাম নামের কোনো ধর্মের অস্তিত্বই ছিল না, তাই ওই মূর্তি কখনোই ইসলামের অবমাননা নয়। তাছাড়া তার একটা ঐতিহাসিক আর শিল্পমূল্যও আছে। এসব মুক্তি তালিবানরা বোঝেনি। অবশ্য তাদের তা বোঝার কথাও নয়।

তালিব শব্বের অর্থ ইসলামের ছাত্র। তালিবান হল তার কবচন। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে তালিবান আর বর্বরতা — এদুটি শব্দ সমার্থক। পেপালার সন্ত্রাসবাদী সংগঠক ওসমা বিন লাদেনকে জামাই আদরে আলোয় নিয়ে, লেখাপড়ার মতো পাপকাজ থেকে মেয়েদের দূরে সরিয়ে রেখে, মেয়েদের মাথায় বোরখা আর ছেলের মুখে দাড়ি রাখবার ফতোয়া জারি করে, এবং গোটা পৃথিবীতে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে নিয়ে, আফগানিস্তান এর মতোই পৃথিবীর 'একক নিতিহীন রাষ্ট্র'-গুলির তালিকায় বেশ উঁচুতেই জায়গা করে নিয়েছে। ইতিহাসের চাকাতে তালিবানরা যেভাবে পেছন দিকে ধোরাবার চেষ্টা করছে তাতে তাদের জন্য মতামত, বর্বর ছাড়া আর কোনো বিশেষণ বরাদ্দ করা যায় না।

তবে এখানে একথা মনে রাখা ভালো যে তালিবানদের এসব কাজকে মৌলিক কিছু নয়। মধ্যযুগের গোল্ডা ভ্যান্ডাল (vandal) নামে জার্মান উপজাতির লোকেরা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার সময় শেষ করে দিয়েছিল সভ্যতা সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন। প্রায় সেড় হাজার বছর পরে তালিবানরা কেবল সেই কাজেরই পুনরাবৃত্তি ঘটালে।

গোটা পৃথিবী ছিঃ ছিঃ করে উঠেছে। তাদের বুদ্ধমূর্তি ভাঙার বিরোধিতা করতে সমস্ত দেশ এককটা হয়েছিল। ইউ এন ও আর ইউনেস্কোর দূতেরা ছুটে গেলেন, ঘন ঘন আলোচনা হয়েছে, কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এ বেন পাগলকে ডাঙা সাঁকো নাড়াতে মানা করার মতো ব্যাপার।

গোটা পৃথিবী যত অর্ধি জানিয়েছে মূর্তি না ভাঙতে, তালিবানরা তত বেশি উৎসাহে মূর্তি ওড়িয়ে দিতে নেমে পড়েছে।

প্রতিক্রিয়া

তালিবানি কাণ্ডকারখানার পক্ষ নিয়ে কিছু কলার নেই কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তা নিয়ে অনেক কিছু কলার আছে।

প্রথমেই জাপা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা। কতগুলি মার্কিন যাদুঘর মূর্তিগুলো নিজেদের কাছে রাখবার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃতির চিহ্নগুলি যাদুঘরে থেকে সেখানকার শোভাবুদ্ধি করুক—এমন ভাবনা মার্কিনীদের পক্ষেই স্বাভাবিক। কারণ তাদের দাদাগিরি শুরু হওয়ার আগে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা আর সংস্কৃতিই তাদের কাছে নেহাউই সেকলে জিনিস। আজকের পৃথিবী যে কালকের থেকে "কতটা ভালো" তার প্রমাণ দেয় যাদুঘরে যত্ন করে রাখা নিদর্শনগুলো।

তালিবানদের ধ্বংসাত্মক কাজ নিঃসন্দেহে মধ্যযুগীয়। এ হল মনুষ্যদের অপমান, এই ছিল তীব্র মার্কিন প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যখন ডবলিউ টি ও, আই এম এফ আর বিশ্ব ব্যাংকে কাজে লাগিয়ে মার্কিনরা পৃথিবীর বাকি দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে, তখন তা হয় আধুনিকতার চরম রূপ, মনুষ্যের মূর্তি! তালিবানরা এক ইসলামি পৃথিবী তৈরি করতে সন্ত্রাসবাসে মদত দিচ্ছে—ডারা ইতিহাসের কলম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা পৃথিবীকে পেপসি আর ম্যাকডাওয়েলের মৃগশাস্ত্রের বানতে চাইছে কারণ আদতে তা নাকি ইতিহাসের পরিসমাপ্তি (End of history) ঘটাবে! তালিবানরা অসহিবু, প্রমাণ বুদ্ধমূর্তি ওড়িয়ে দেওয়া। মার্কিনীরা উদার, প্রমাণ ইমাক আর মুগোস্ত্রিয়ায় হস্তক্ষেপ ও যথেষ্ট বোমাবাজি।

ইউরোপের সংস্কৃতিমন্ত্রীরা কড়া ভাষায় তালিবানদের 'বিরোধিতা করলেও তাদের মুখেও এসব মানায় না। গত পাঁচ বছর ধরে ইউরোপ সংস্কৃতির ওপর যে কালাপাহাড়ীগিরি চালিয়েছে সে তুলনায় তালিবানদের মূর্তি ভাঙা নেহাউই মামুলি কাজ। মূর্তি তো কেবলই মূর্তি। কিন্তু ইউরোপ তার অপরাধ ধ্বংসের শিল্পে সভ্যতার পর সভ্যতা শেষ করে দিয়েছে।

ও শু নিম্নের নিম্নশক্তিতে নয়, যে সব রক্তমাংসের শরীর ওগুলি তৈরি করতো তাদের নিষ্কাশ করার খামতায় ইউরোপের জোনা জড়ি ছিল না। প্রাচীন পৃথিবীর উপর পড়া জনগণকে জাটগা নিতে অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার আদিবাসীদের দৌড় করা হয়েছিল, বিবীর্ণ অঞ্চল থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল প্রাচীন সভ্যতার সব চিহ্নকে।

ভারতের কথাই ধরা যাক। ব্রিটিশরা ভারতকে দখলে রাখার সময় ধ্বংস করেছিল ভারতের শিল্প, কারিগরি পটতা, কৃষি আর বনজ সংস্কৃতিকে। দুর্ভিক্ষকে কাজে লাগিয়েছিল শাসন চালাবার হাতিয়ার হিসেবে। এসব ঘটনা কখনোই প্রমাণ করে না যে ইউরোপীয়রাই সংস্কৃতির নিরাপদ জিহাদার। তাদের কাছে সংস্কৃতির সংরক্ষণ মানে বিভিন্ন যাদুঘরে নকরকাটা প্রদর্শনী। যেমন ব্রিটিশ মিউজিয়াম — যা হোসো পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বড় চোরাই মালের গুদাম ঘর।

ভারতও ১৮৫৭ হওয়ার পরোয়া পাওয়া মূর্তিগুলিকে নিষেধ করে রাখতে চেয়ে পিঠ চাপড়ানি পেয়েছে। ভারত সরকার তালিবানদের কাজকর্মের বিরোধিতা করেছে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। ১৯৯২-তে যে দল ধ্বংস করেছিল বাবর মসজিদ, তারাই আজ সরকারে, তাই বাবর মসজিদ ধ্বংস আচর আর ভারতের লজ্জা নয় বরং 'ভাতীয় ভাবাবেগের' প্রকাশ। হিন্দুরা তাদের হিন্দুত্বের শুদ্ধতা প্রমাণ করতে চড়াও হয়েছিল 'করকেশ' বছরের পুরনো মসজিদের ওপর। তাকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে যারা মফ থেকে গোপন তুলেছিল তাহাই আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী — খিদাইম ভাসায় নিষেধ করছেন তালিবানদের। হিন্দু-তালিবান লক্ষ্য বোধ আগে থেকেই তাদের সম্মুখে বাধার করা হয়।

বুদ্ধদের মূর্তি ভাঙায় আজ যে সরকার চোখের জল ফেলছে তারাই ১৯৯৮ সালে পোখরানে মারাত্মক পরমাণু বোমার পরীক্ষা চালিয়েছিল। আর সেই পরীক্ষার সফলতার গোপন সামরিকতক ভাষা ছিল — বুদ্ধ আবার বেহেশতেন। যে অস্ত্র মুহুর্তে লাশে জীবন কেড়ে নিতে পারে তার পরীক্ষার শক্তির প্রতীক বুদ্ধের নাম জড়িয়ে দেওয়া কি বুদ্ধমূর্তি ভাঙার চেয়ে কম অপরাধ?

ভারতে যারা ধর্ম আর জ্ঞাপাতের লড়াইকে পুজি করে রাজনীতি করে তাদের মুখেই আজ তালিবানদের নিষেধ। কংগ্রেস — যা আগতে নরমপন্থী হিন্দু দল, তারাও তালিবানদের বিরোধিতা করেছে অথচ যখন বাবর মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল তখন কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার কেবল দলকণ্ঠে ভূমিকাই পালন করেছিল। এমনকি যারা তিন দশক আগে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে বিদ্রো করত পেরিছিল তারাও ভোর পলায় বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অবশ্য তাদের কাজকর্মকে

রাজনীতি না বলে রাজনৈতিক উদ্ভাসতা বলাই ভালো। ধর্ম অথবা রাজনীতি, উদ্ভাসতা উদ্ভাসতা — সমান কড়িকারক।

পূর্বসো শিল্প নিম্নশক্তির মতোই আচার-বিধাস-ঐতিহ্য — এগুলিও সংস্কৃতির মূল উপাদান। কিন্তু আজকের ভারতে এসবের প্রতি সম্মান দেখানোর ঘটনা বিশেষ চোখে পড়ে না। এদেশের চৌহদ্দিতে বসবাসকারী মানুষদের স্বাভাবিকতাসনও একটা সাংস্কৃতিক বিষয়। কিন্তু আজ ভারতে যখন ভেঙে সাংস্কৃতিক বনসেন, স্বাধীনতা অথবা স্বদেশী ধোঁচে আত্মনির্ভরতার কথা বলে তখন তার গায়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিস্ময়ী তখন মেরে দেওয়া হয়।

ব্রিটিশরা যেভাবে ভারতের সংস্কৃতির প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখিয়েছিল আর ভারতে প্রধান বিদ্ভাবকারী ব্রিটিশ-হিন্দু সংস্কৃতি বা কি ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর তেমনই অবদমন চালাচ্ছে।

এসব ঘটনার উল্লেখ তালিবানদের হান-সাক্ষা মনোভাবকে ছোট করে দেখানোর জন্য নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে পশ্চিমী দুনিয়াই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল: সোভিয়েত যুদ্ধরাষ্ট্রকে আফগানিস্তান থেকে হঠাৎ করে জম্মো মার্কিন যুদ্ধরাষ্ট্রই *এলিবানদ*। দুনিয়ায় ছিল স্বতন্ত্রবাদী প্রদর্শন। তখন কমিউনিস্ট সরকারের তুলনায় তাদের কাছে ইসলামি মৌলবাদ ছিল কম ভয়ের কারণ। তাই তারা তৈরি করেছিল তালিবান নামের দানব। যে দানবকে অস্ত্র দিয়ে তামা কমিউনিস্টদের হারাতে চেয়েছিল সেই তালিবানরাই এখন সব পাটে পশ্চিমী দুনিয়াকে ভয় দেখাচ্ছে।

গোটা পৃথিবী জুড়ে মানুষের সংস্কৃতি আর ভাষাগুলির অস্তিত্ব আর বিপর। দুনিয়াজোড়া ব্যাংকোরে নামে খেঁচিয়ে বিদেয় করা হচ্ছে ঐতিহ্য আর সাংস্কৃতিক প্রথাগুলিকে। পৃথিবীর সব বিশ্বায়কর সৃষ্টিগুলিকে, সভ্যতার সমস্ত ধন সম্পদকে বাজারি করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাই গৃহপালিত জন্তু, হাতখড়ি কিংবা প্রাস্টিকের বালতিই মতোই মানবজাতির উত্তরাধিকারও পণ্যে পরিণত হয়েছে।

তাই তালিবানরা যখন বামিয়ানে বেলে পাথরের বুদ্ধমূর্তির দিকে গোলা-বন্দুক তাক করে, তখন আমরা অবশ্যই একে মনুষ্যের উত্তরাধিকারের ওপর আক্রমণ বলে চিহ্নিত করব। কিন্তু মার্কিন যুদ্ধরাষ্ট্র আর তার সাপেরেরা — যা'র ওপরে কানাই সেজে সংস্কৃতির শৃঙ্গপোষক হওয়ার ভান করে ছলে-বলে-কৌশলে সংস্কৃতির ধ্বংস ঘটানো, তাদের আমরা যেন না ছাড়ি।

[পেছাটি ১১ মার্চ ২০০১ তারিখে The Sunday Statesman পত্রিকায় প্রকাশিত Jeremy Seabrook-এর Taliban and the Art of Destruction-এর ভিত্তিতে তৈরি]

বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলন

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

‘উৎস মানুষ’-এর একুশে পা সেওয়ার সময় শুরু হয় বিজ্ঞান আন্দোলন সম্পর্কিত একটি ইতিহাস ও তথ্যনিষ্ঠ ধারাবাহিক পর্যালোচনা। ২০০০ এর পাঁচটি সংখ্যায় (১-২, ৩-৪, ৫-৬, ৮ এবং ১১-১২ তম) এবং ২০০১ এর ১-২ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে গণবিজ্ঞানের ধারণা, বিজ্ঞান আন্দোলনের ধরন, বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের মতামতগত অবস্থান। বর্ণিত হয়েছে স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান আন্দোলন, হিন্দু রাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলনের কথা। এবারে সপ্তম কিত্তির আলোচনার বিষয়: ‘বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলন’। এক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে গত তিন দশকে প্রকাশিত এই বিষয়ক নানান বইপত্র। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে এরাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে তুলনায়। গবেষণামূলক এই ধারাবাহিক পর্যালোচনার আপাতত দাঁড়ি টানতে হবে পরবর্তী পর্বে — ‘পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের সাম্প্রতিক অবস্থার হাল-হকিকত’ কর্ণায়। এই পর্বটিকে সাধামত তথ্যসমৃদ্ধ করতে লেখক তথ্যভিজ্ঞ মহলের সাহায্যপ্রত্যাশী।

ঠিক

এক যুগ আগে ১৯৮৯ এর ছুন সংখ্যায় এই ‘উৎস মানুষ’-এর পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল ‘বাংলাদেশে গণবিজ্ঞান চর্চা : একটি প্রাথমিক ধারণা’ শীর্ষক নিবন্ধ। ‘কয়েকদিনের জন্য আচমকা বাংলাদেশে যাওয়ার সুযোগ’ পেয়ে ভবানীপ্রসাদ সাহা বাংলাদেশে বিজ্ঞান আন্দোলনের একটি প্রাথমিক ধারণা সেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ নিবন্ধে সংগঠন হিসেবে মূলত আলোচনা করা হয়েছিল ‘গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র’ সম্বন্ধে। এছাড়াও কুসংস্কার-বিরোধিতা এবং বিজ্ঞানের কিছু বইপত্রের কথা বলা হয়েছিল। আমাদের এখনকার আলোচনার লক্ষ্য হবে ঐ লেখার পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশে বিজ্ঞান আন্দোলনের পরিচয় তুলে ধরা।

আলোচনার শুরুতেই বলে নেওয়া আবশ্যিক, ‘বিজ্ঞান আন্দোলন’ সম্পর্কিত পর্যালোচনা তিনটি ধারাকে নির্দেশ করবে— বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার বা বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, জনগণের বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করা। এই তিনটি ধারা আবার পরস্পর সম্পর্কিত। বিজ্ঞান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মাধ্যম হিসেবে সাধারণত আমরা ব্যক্তি, সংগঠন এবং পত্র-পত্রিকার ভূমিকা আলোচনা করে

যাকি; এগুলোও অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কিত, যেমন পত্রিকা-সম্পাদক ব্যক্তি বা সাংগঠনিক পত্রিকা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মেলনের কথাও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা দরকার। আর এ লেখার উপাদান বিজ্ঞান আন্দোলন সম্পর্কিত বইপত্র। গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে বিজ্ঞান আন্দোলন সম্পর্কিত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর তাত্ত্বিক দিক যেমন আলোচিত হয়েছে, তেমনিই উঠে এসেছে বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি লেখা থেকে জানা যায়, ১৯২০র দশকে, ১৯২৪ সাল নাগাদ, তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ‘বারোজননা’ নামে একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ছিলেন অগ্রদূতদের রায়, ঢাকা কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক পূর্ণেন্দু মজুমদার, কাজী মোতাহার হোসেন, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ। ‘বারোজননা’র আড্ডায় নানান বিষয় আলোচনা হত। শেষ অবধি ‘বিজ্ঞান পরিচয়’ নামে একটি বাংলা মাসিকপত্র বের হয়, দেশভাগের পরও কিছুদিন সে কাগজ চলেছিল। (সত্যেন বোসের চিঠি, [যে চিঠি আমরা বিলম্বে পেলাম], বিজ্ঞান সাময়িকী, জুন ১৯৭৪)

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে বের হয় ‘বিজ্ঞানের বিষয়ে’ শরৎকরে সুন্দর রচনা ‘সমৃদ্ধ পত্রিকা ‘বিজ্ঞান সাময়িকী’। এর

প্রথম সম্পাদকীয়তে কলা হয় : 'মিসেসেই যে যুগে আমরা বাস করছি তা বিজ্ঞানের যুগ। উঠতে বসতে বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের একশও চলারও উপায় নেই। কিন্তু যে-বিজ্ঞান আমাদের চলমান জীবনের নিত্যসঙ্গী তাকে আমরা আপন করে নিতে পেরেছি কি? বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও বিজ্ঞান সখ্যে যতটুকু সাধারণ জ্ঞান না থাকলেই নয় সেটুকুও আমাদের নেই। আমরা বিজ্ঞানকে মনে করছি ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় বিজ্ঞানীদের গড়া ভিনিস যাতে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনো দরকারই নেই। একথা বুঝতে চাই না যে, শুধু বিজ্ঞানে মাস্টার, ডিগ্রি পেয়েই আমরা বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের আগ্রহ দেখাতে পারি না। যুগের সাথে ভাল মিলিয়ে চলাতে হলে ছোটবেলা থেকেই আমাদেরকে বিজ্ঞানের ভাষা শেখা হতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে গড়া বিজ্ঞানের সাথে-সাথে আমাদের বিজ্ঞানের সৈন্যদল অগ্রগতির সাথে ঝরকেফলাহ হতে পারে।...

আমরা, বিজ্ঞান-জগতে যাদের প্রথম প্রবেশ ঘটছে, তারা যাতে পাঠ্য-পুস্তকের আওতার বাইরেও বিজ্ঞানের সম্পর্কে থাকতে পারি তারই জন্য 'বিজ্ঞান সাময়িকী'-র আদ্যপ্রকাশ।'

এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ ইব্রাহিম, যিনি চট্টগ্রাম কলেজে 'বিজ্ঞান সাময়িকী'-র আদ্যপ্রকাশের পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে— '... নানা কিছু করার, নানা আসর ভ্রমার ধুম পড়ে যেত স্বাধীন ছাত্রদের প্রথম হাদ পেতে না পেতেই। দৈনিক বিজ্ঞান সাময়িকীর আদ্যপ্রকাশও এমনি আরবের মধ্যে।' কিন্তু শুধু স্বাধীন ছাত্র জীবনই নয়, এর পটভূমির ব্যাপ্তি ছিল আরো বিস্তৃত : 'সেটি ছিল স্পুটনিকের সময়, গ্যাগারিন আর গেনের মহাশুভো উৎসব'-এর কাল। ১৯৬০-৬১ সাল তাই বাংলাদেশের বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়।

সব্বরের দশকে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের পাশাপাশি হাতে-কলমে বিজ্ঞানচর্চারও একটা জোয়ার আসে, চেষ্টা হয় এই ধরনের কাজকর্মের সমন্বয়ওলা বুকে নেওয়ার। তখন চক্রবর্তী লেখেন 'বাংলা ভাষার বিজ্ঞানচর্চা ও পরিভাষা সমস্যা'; ১৯৭৬-এ বেব হয় তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন 'মানুষের জন্য বিজ্ঞান'। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এইসময় বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদানের চেষ্টা শুরু হয়েছিল। সংকলিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে অবশ্য বিজ্ঞানের তথ্য জ্ঞানানোর প্রবণতাই বেশি লক্ষণীয়। তবে তা যে কিছুটা 'জনপ্রিয়' হয়েছিল তার প্রমাণ বারো বছরে তিনটি সংস্করণের প্রকাশ।

১৯৭৫এ বিজ্ঞান সাময়িকীর উদ্যোগে 'বিজ্ঞান ক্লাব' বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলস্বরূপে পত্রিকা তার বিজ্ঞান ক্লাব সমন্বয়ের কার্যক্রম ঘোষণা করে আন্দোলনের

একটি রূপরেখা দিয়ে। পত্রিকার আরও প্রত্যক্ষ অবদান ঘটে যখন বিজ্ঞান সাময়িকীর সাহুত বিজ্ঞান ক্লাব হিসেবে 'অনুসন্ধানী' শেপের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত বিকাশ লাভ করে। ইতিমধ্যে 'বিজ্ঞান সাময়িকী'-র চরিত্রগত একটা বল ঘটে। আগে, প্রথম মিকে, বিজ্ঞান সাময়িকীর মাধ্যম উপর লেখা থাকত 'কুদে বিজ্ঞানী সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত বিজ্ঞান কার্যবাহ'। পরে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যখন 'নিজস্বেরকে রীতিমত একটা আন্দোলনের অংশ' হিসেবে ভাবতে শুরু করেন তখন বিজ্ঞান সাময়িকীর মাধ্যম উপর লেখা শুরু হয় 'বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ'। সত্যিই, বিজ্ঞান সাময়িকী বিজ্ঞান আন্দোলনের পুরোহা হয়ে ওঠে।

১৯৭৬-এর ২০ ডিসেম্বর কার্জন হলে বিজ্ঞান সাময়িকীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ ইব্রাহিম পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছিলেন : 'আজ বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলনের অধিকতর বিস্তৃতিতে এই পত্রিকা যানিকটা গর্ব করতে পারে বৈকি।' (বিজ্ঞান লেখক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ঢাকা, ২৮ এপ্রিল ১৯৮৫)

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ক্লাবের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গেলে অবশ্য আমাদের আর একটু পেছিয়ে যেতে হবে। সেটা হল পূর্ব পাকিস্তানের আমল। ১৯৬০ সালে বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রকাশ এবং তারপর তার পরিচালনায় 'কুদে বিজ্ঞানীর আসর' জন্মে উঠেছিল। ১৯৬১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলন'। ঐ সম্মেলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আব্দুস সালাম দারিসের বিকল্পে সংগ্রামে বিজ্ঞানের ভূমিকার কথা বলেন। সম্মেলনে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রতি বছর বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতি (PASSP) কার্জন হলে বিজ্ঞান মেলায় আয়োজন করতে শুরু করে। কুদে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এইসব বিজ্ঞান মেলায় যোগাযোগ ঘটত বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের। ১৯৬৪ সালে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানজীবী সমিতির জাতীয় প্রদর্শনীর আহ্বায়ক এ. এইচ. চৌটারী সিংহেছেন, দু'বছর আগে থেকে ঢাকায় যেসব বিজ্ঞান প্রদর্শনী হচ্ছে সেগুলো এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে নগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে তা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়ে গেছে। তাঁর মতে, করাচী, লাহোর বা শেখোয়ারে সে উৎসবের তুলনা মেলে নি।

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মুহাম্মদ ইব্রাহিম মন্তব্য করেছেন, আসল কাজটুকু হত 'বিশেষ কোনো শিক্ষকের বা বিশেষ কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে একান্তে, এমনকি মূল-কলেজের বাইরে।' ঠিক যেমন পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষকদের এবং ছাত্রদের উদ্যোগে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছিল (১৯৫৭-৫৮)

কটিন চার্চ স্কুল, ১৯৬০-র দশকে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। বিশদ আলোচনার জন্য প্রার্থনা : উৎস মানুষ জন্মায় ২০০০ এ প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান চেতনা, বিজ্ঞান আন্দোলন', পৃষ্ঠা ১৩) তেমনই একটা চিত্র দেখা গেল বাংলাদেশেও। ১৯৬২ সাল নাগাদ ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড হাইস্কুলে একজন শিক্ষক এবং কয়েকজন ছাত্রের উদ্যোগে তৈরি হয় 'অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘ'। এদের উদ্যোগে বের হত কিশোরদের বিজ্ঞান পত্রিকা : 'টবে-টকা'। এ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যেত ঐ স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক আর অভিভাবকদের কাছ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লিখিতব্যায় অধ্যাপক মরহুম বেলায়েত হোসেন চৌধুরী ছিলেন এই ধরনের বিভিন্ন ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর বাড়ির ঠিকানা ছিল এরকম বেশ কয়েকটা গোষ্ঠীর ঠিকানা, তাঁর টেলিফোন ছিল গোষ্ঠীর টেলিফোন। অর্থ আর যন্ত্রের সাহায্যও তিনি নিতেন। এই কৃষি বিজ্ঞানীদের জন্য তিনি নিজের টাকার বের করতেন 'বিজ্ঞান সমাচার' নামে পত্রিকা। এই ব্যক্তির কথা পড়তে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান আন্দোলনের তথ্যভিত্তক মানুষের নিচুই মনে পড়ছে এ রাজ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক মীনাক্ষর বায়ের কথা। তিনিও তাঁর আত্মরিকতা, বিশেষজ্ঞতা আর অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে বিজ্ঞান আন্দোলনের এই ধারাতিকে পুষ্ট করে চলেছেন। মুহাম্মদ ইব্রাহিমের ভাষা ধরা করে বলি, 'দুষ্টির আড়ালে এরকম ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা করবার কাজ করেছে এবং করেছে : যে কোন মহৎ আন্দোলনের তারা প্রাণ-শক্তি'। ('বাংলাদেশে বিজ্ঞান ক্লাব'; মুহাম্মদ ইব্রাহিম সম্পাদিত 'বিজ্ঞান ক্লাব'-এ সংকলিত, বাংলাদেশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকীর্তী সমিতি, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৩)

স্কুলের আনুষ্ঠানিক কাজের পরিপূরক হিসেবে বিজ্ঞান ক্লাব যে একটা নিয়মিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হতে পারে সেটাও কেউ ভেঙে ভাবছিলেন। তার প্রমাণ বেলে ১৯৬৪তে প্রকাশিত 'Science Clubs in Schools' লিখক একটি লেখায়। এ. এম. শরফুদ্দিনের এই লেখাটি বেরিয়েছিল ইস্ট পাকিস্তান এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টারের বুলেটিনে, ১৯৬৪ জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা।

১৯৭১-এ স্বাধীনতার পর বিজ্ঞান আন্দোলনের ব্যাপ্তিও বাড়ল। এখন আর শুধু স্কুলকেন্দ্রিক নয়, বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠতে লাগল বিভিন্ন পাড়ার, দেশের নানান ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার দু-এক বছরের মধ্যে বেশ নাম করল 'দ্য ইন্ডাস্ট্রীস অ্যাসোসিয়েশন'। পাশাপাশি গড়ে উঠল ঢাকার স্মিটনিক, অনুসন্ধিৎসু চক্র, জুভেনাইল সারেল পারগোনিয়ার্স, সন্ধানী।

চট্টগ্রামে বাউজানের গ্রামে কলকর্ত; সুলনার গ্রামে বেতাগা বিজ্ঞান সমিতি প্রভৃতি বিজ্ঞান ক্লাব। আবার 'বেলাঘরের' মত শিশু সংগঠন বিজ্ঞান ক্লাবধর্মী কর্মসূচিও গ্রহণ করল।

বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মসূচির মধ্যে চিরচরিত মডেল তৈরি প্রক্রমণী, নানান প্রকল্প ইত্যাদি তো ছিল। পাশাপাশি ভোর সেওয়া হত স্থানীয় ভিত্তিতে প্রকৃতি ও পরিবেশকে জানার কাজকে। এটি সুবই ভাণ্ড্যর্পণ। এর ফলে উত্তর মনে প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা জন্মাত। আলোপাশের পরিবেশ সযত্নে একটা ধারণা তৈরি হত। আর এর ফলে দেশের নানান সম্পদের একটা প্রাথমিক সমীক্ষার কাজও হয়ে যেত। সামগ্রিকভাবে, সমীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে, বৈজ্ঞানিক যেকাজের বিকাশ ঘটত। ১৯৭৮ সালে বিজ্ঞান ক্লাবের সংখ্যা একটা বিরট পরিকর্তন আসে। এর কারণ ঐ বছরে পরপর দু'বার জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ পালিত হয়। বিজ্ঞান ক্লাবগুলো, এই বিশেষ সপ্তাহ পালনের ফলে চলে এল আলোকবর্তের মাঝখানে। অর্থ বরাদ্দ করা হল। নতুন বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠল। বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন সমৃদ্ধ হল।

এই সমৃদ্ধির ব্যাপ্তি মাপতে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিশু মানুষ প্রয়াসী হলেন। তাদের এই প্রয়াসের ফলে ১৯৭৯তে প্রকাশিত হল ২৪৮ পাতার বোর্ড বীথই সুবহৎ বই 'বিজ্ঞান ক্লাব'। দুই বাংলা মিলিয়ে, 'বিজ্ঞান ক্লাব' সম্বন্ধে একমত তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ সম্বলিত বই এর আগে বা পরে কখনোই বের হয় নি। এই বইটি প্রকাশ করেছিল 'বাংলাদেশ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকীর্তী সমিতি'। পরিকল্পনা এক জগৎয়ে সহযোগিতা করেছিল 'বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্দ্র'। বইটির সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ ইব্রাহিম। সম্পাদনা পরিষদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, আলী আসগর, তমাল কান্তি হত। এই বইতে আলোচনার বিষয়ের মধ্যে ছিল বিজ্ঞান সন্ধানীর ভূমিকা, বাংলাদেশে বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাবের বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম, বিজ্ঞান ক্লাব প্রকাশনা, বিশেষের দৃষ্টান্ত, প্রাসঙ্গিক বইপত্রের তালিকা ইত্যাদি। আর ছিল বাংলাদেশের বিজ্ঞান ক্লাবের একটি বিবৃত ডাইরেক্টরী। কুড়ি পাড়া ব্যাপী এই 'বিজ্ঞান ক্লাব নির্দেশিকা'তে জেলা ধরে ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের নাম-ঠিকানা তুলে ধরা হয়েছিল। সম্প্রতি, 'চেতনা' পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যার 'দুই বাংলায় এন জি ও' সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে 'বিশ্বদী দাগাল না বৃশদী সেবক—এন জি ও আসলে কী?'। এই বইতে বাংলাদেশের ৩০৫টি এন জি ও-র বিবৃত তালিকা সেওয়া হয়েছে; নাম ঠিকানা ছাড়াও কাজের ক্ষেত্র, অর্থায়নের উপায় প্রভৃতিও তাতে উল্লেখিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলিই বিজ্ঞান সংগঠন। এদের কাজের কেন্দ্রর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি।

‘বিজ্ঞান আন্দোলন’ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা যে সংহত হচ্ছিল তার প্রমাণ আশির দশকে প্রকাশিত হই পড়ে। ১৯৮১তে প্রকাশিত আবদুসসাদ আল-মুতীর ‘এ যুগের বিজ্ঞান’ বইটির একটি অংশের নাম : বিজ্ঞান আন্দোলন। এর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞান সন্ধানীর ভূমিকা, বুনিন্দী বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানী সমাজ এবং বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ : সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক চারটি নিবন্ধ। এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : ‘... বিজ্ঞানীদের আবিস্কৃত তথ্যাবলী বিজ্ঞানের একটা অংশ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, বিজ্ঞান হল বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব-সম্মেলন, গবেষণার এক বিশেষ পদ্ধতি। ... এই পদ্ধতির অসীমত্ব হল এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। তাকে বলতে পারি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। ...’ (পৃষ্ঠা ১৩৯) তাঁর মতে, বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছানোর উপায় হল : বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পত্র-পত্রিকা, বই, পাঠাগার, রেডিও, টেলিভিশন এবং বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান সমিতি ইত্যাদি (পৃষ্ঠা-১৬৩)। তিনি লিখেছেন, বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলার একটি উপায় হল সেশময় বিজ্ঞান ক্লাব সংগঠন, যার উদ্দেশ্যের মধ্যে আসতে পারে : সৈন্যবিন ভীতনে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা গবেষণামূলক কাজের অভিজ্ঞতা, যুক্তিবাদী চিন্তাপদ্ধতি অভ্যাস করা, বিজ্ঞানভিত্তিক শৈশব কার্যকলাপ এবং প্রতিভাবান ছেলেমেয়েদের প্রতিভার বিকাশে সহায়তা।

এই লক্ষ্য সাধন করার জন্য কাজ করতে গেলে সচেতন হতে হবে দেশের বিজ্ঞানচর্চার বন্ধগত প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে। আর সেই লক্ষ্যেই ১৯৮৩তে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে বের হয় ‘বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা’ বিষয়ক একটি সংকলন। এতে আলোচিত হয় বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা, ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োগ পরিধি, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও বিজ্ঞানচর্চা, বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কাজের ভাষা রূপে বাংলা প্রকৃতি বিভিন্ন বিষয়। বইটিতে বিজ্ঞান আন্দোলনের মূর প্রত্যাক করা যায় বহন পড়ি : ‘বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন আমাদের অবিবেচন, উন্নয়নের জন্য এবং জীবনের জন্য। বিজ্ঞানচর্চার বৃহত্তর প্রেক্ষিতটিও তাই বিবেচনা করতে হবে সামগ্রিক জীবনমুখী দৃষ্টিকোণ থেকেই। অন্যথায় তথাকথিত বিজ্ঞানচর্চা নেহাৎ প্রান্তিকানিক কার্যকলাপ কিংবা ব্যক্তিক উচ্চাভিলাষের সামগ্রী হয়েই থাকবে — উদ্ভাবন, অবিচার ও প্রায়োগিক পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে নয়।’ (সূত্রত বহুত্ব, ‘বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা’, পৃষ্ঠা-১৬)।

বিজ্ঞানের জন্মদিনের কথা শুনেছেন? এ রাজ্যে ‘সৌকবিজ্ঞান’ সংস্থা ২৮ মে তারিখটিকে বিজ্ঞানের জন্মদিন

হিসেবে পালন করে থাকেন। কেন এই তারিখটা বিজ্ঞান জন্মদিন তা কনি করেছেন সূত্রত চন্দ্র তাঁর ‘বিজ্ঞানের ইতিকথা’ সন্ধানী মানুষ’ বইতে (১৯৮৪)। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালের ২৮ মে তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে, এমনটা আগাম জানিয়েছিলেন গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানী থ্যালিস। মিলেটাসের এই জ্যোতির্বিদ সূর্য গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও প্রদান করেন। এর আগে মনে করা হত, এটা অলৌকিক ঘটনা, অমঙ্গলের চিহ্ন। কিন্তু থ্যালিসই প্রথম প্রাকৃতিক এই ঘটনাকে বিচারবুদ্ধি আর বাস্তবতা দিয়ে বিবেচনা করেন। একেই কেউ কেউ বলেন ‘বিজ্ঞানের জন্ম’ আর তার সঙ্গে কড়িয়ে রয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী থ্যালিস। এই ধরনের জন্মদিন নির্ধারণ ও পালন কতটা বিজ্ঞানসম্মত, কতটা উচিত বা অনুচিত সে প্রশ্ন মূলত্বি বাক। তবে সন্ধানী মানুষের জয়যাত্রার এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। বাংলাদেশে বিজ্ঞানের জন্মদিন পালিত হয় কিনা তা অবশ্য জানা যায় নি। তবে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বইতে এই ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান এটা কুণিয়ে দেয়, বিষয়টি সম্পর্কে ওখানেও সচেতনতা রয়েছে।

১৯৮৪তেই বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত আর একটা বইয়ের উল্লেখ করতে চাই— এ. এম. হাফিজ, আর. রবীন্দ্রের ‘বিশ্ব শতাব্দীর বিজ্ঞান’। এটি আসলে ঐ বছর ২৯ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রস্তুত ‘বাংলা একাডেমি বক্তৃতামালা’র সংকলন। এর মধ্যে বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় ছিল : বিজ্ঞানের সামাজিক পটভূমি ও উৎস, বিশ্বে শতাব্দীর বিজ্ঞানের দার্শনিক পটভূমি এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞান চর্চা। এছাড়া আলোচিত হয় বিজ্ঞানের ইতিহাস : বিশ্ব শতাব্দীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান।

বিজ্ঞান ক্লাবের কথা বলা হয়েছে, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতামালার কথাও বলা হল। এবার আসে বিজ্ঞান লেখক সম্মেলনের কথা। বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম বিজ্ঞান-লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ‘বিজ্ঞান সংস্কৃতি পরিষদ’ এবং ‘বাংলা একাডেমি’র যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সংগঠকদের দাবি : ‘তার আগে ঢাকায় বা এ দেশের অন্য কোথাও বিজ্ঞান-লেখকদের কোনো সম্মেলন হয়নি’। তবে বিজ্ঞান সাহিত্য সম্মেলনের একটা ইতিহাস কিন্তু বাংলায় ছিল। ১৯১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) কাশিমবাজারে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর পরের বছর রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে, রামেশ্বরসুন্দর গ্রিফিথের পরামর্শে এবং শশধর রায়ের উদ্যোগে সম্মেলনের একটি বৃত্তে বিজ্ঞান শাখার আয়োজন করা হয় যার সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ১৯১৫ বঙ্গাব্দের সেই সভাপতির অভিভাষণে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন ‘বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান’ সম্পর্কে। দু’বছর পরে ময়মনসিংহ অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র বসুর সভাপতির অভিভাষণের বিষয় ছিল ‘বিজ্ঞানে

স্মৃতি' তা'। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে চট্টগ্রাম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ফের প্রমুখ চন্দ্র বাবু। ১৩২০ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে) কলকাতা অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে সভাপতিত্ব অভিভাষণ দেন তা 'বিজ্ঞানপন্থী জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী বিজ্ঞানপন্থার একটি বিশিষ্ট ঘোষণা' রূপে চিহ্নিত। (অপরাজিত বসু সম্পাদিত 'ভারত ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' গ্রন্থে বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯৭)। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন স্বাধীনতার পরে হয়েছে। বিভলা বিজ্ঞান ও চিকিৎসার সংগ্রহশালায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮২-র ৯ মে। মুখ্য আয়োজক ছিল 'গোবরদাস বেনেশীস ইনস্টিটিউট'। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই সম্মেলনে উপলক্ষে একটি 'স্মারক সংকলন' প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বাংলাদেশের আবদুল্লাহ আল মুতী, তপন চক্রবর্তী, শাহজাহান তপন প্রমুখ। একটি অভিনব মুখোমুখি আলোচনার আয়োজন করা হয় বাংলাদেশের চার বিজ্ঞান লেখক আবদুল্লাহ আল মুতী, ভক্তুল হক, তপন চক্রবর্তী এবং আলি আসগরকে নিয়ে, এই আলোচনার ত্যাগে গ্রহিত করেন মূল্যবান বেতাপ বিজ্ঞান সমিতির সম্পাদক হুশনুজ্জামান দাস।

কার্জেই ঢাকায় ১৯৮৫ তে বাংলা বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন আকস্মিক বা পবিত্র কোনও ঘটনা ছিল না। দিনদিনের (২৭-২৮শে এপ্রিল) এই সম্মেলনে আয়োজনের বিষয়ের মধ্যে ছিল : জনপ্রিয় বিজ্ঞান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিজ্ঞানের বই, গণমাধ্যমে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সাময়িকী, উচ্চ শিক্ষার বিজ্ঞান বই, বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশনা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য এবং স্বাধীনতা ও বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশনা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য এবং স্বাধীনতা ও বিজ্ঞান চর্চা। এছাড়া ছিল মুক্ত অধিবেশন। পরে বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৬ সালে এই সম্মেলনের কার্যবিবরণী প্রকাশ করে। এই বইয়ের ডুমিয়াক বলা হয় : 'এই সব বিবরণ স্বাধীনভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হলো, শুধু বর্তমানের সকল অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্ট বা এ বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তিদের সুবিধার জন্যে নয়, ভবিষ্যৎ কালেও, আমাদের দেশের মানসিক জগতে ভীতাবে এবং কোন দিকে বিবর্তন ঘটছিল, সে বিষয়ে কৌতূহলী ব্যক্তিও এ সংকলন থেকে জানতে পারবেন।'

বাংলাদেশের মানসিক জগতের পরিবর্তনের ধারা বৃদ্ধিতে আর একটি বই অত্যন্ত সহায়ক। আবদুল্লাহ আল মুতী সম্পাদিত এই বইটির নাম : 'বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা' (১৯৮৮)। এই বইয়ের পাঁচটি ভাগ হল : কিশলোক (যাতে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে জ্যোতিষ বনাম জ্যোতির্বিদ্যা), বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ (রয়েছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ক প্রবন্ধগুচ্ছ), জীবন ও বিজ্ঞান (জনস্বাস্থ্য বিষয়ক লেখা এতে রয়েছে), বিজ্ঞানের পটভূমি (যাতে রয়েছে

বিজ্ঞানের পদ্ধতি, বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখা) এবং প্রয়োগ-প্রসঙ্গ (এর মধ্যে রয়েছে 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জনঘনিষ্ঠতা'র মত জনবিজ্ঞান ডাবনাসমূহ প্রবন্ধ) রয়েছে 'বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা' ও কুমারাত-এ-মুদার মত প্রবন্ধ (যাতে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস অনুসন্ধান করা হয়েছে)। এই বইয়ে 'পরিশিষ্ট' হিসেবে উপরি পাওনা 'লেখক ও রচনা পরিচিতি'। এ থেকে লেখকদের সামাজিক অবস্থান এবং তাদের অবদান সম্বন্ধে জানা যায়। এই বইতে সংকলিত নিবন্ধের একশতজন প্রবন্ধকারই প্রত্যাকভাবে উচ্চশিক্ষার বিজ্ঞানের ছাত্র। দু'জন চিকিৎসক আর ব্যক্তি সকলেই কমপক্ষে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত। তবে কি বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার পাঠ না নিলে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজ করা যায় না?

আলী আসগর কিন্তু তা মনে করেন না। তাঁর বই 'বিজ্ঞান আন্দোলন'-এ (১৯৯১) তিনি মন্তব্য করেছেন : 'এ দেশে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কাজে একসময় বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক উভয়কেই সচেতন হতে দেখেছি আমরা'। এই 'বিজ্ঞান আন্দোলন' বইটি আন্দোলনের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ বোঝার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞান প্রচারণার নানান মাধ্যম সবই উঠে এসেছে এই বইতে। আলী আসগরের মতে, 'আমরা যদি আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই, বিজ্ঞানের যথার্থ চর্চা ও প্রয়োগের ডেতর দিয়ে, তা হলে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীর চোঁটা নয় মাত্র, সমগ্র জাতিতে সচেতনভাবে অনুধাবন করতে হবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব। সেই সামগ্রিক চেতনা সৃষ্টিতে বিজ্ঞান পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।'

সেই অবদান রেখেওছে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা। 'বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা', বেতাপা বিজ্ঞান সমিতির মুখপত্র 'বিজ্ঞান পরিভ্রমণ', কলকট গ্রামীণ বিজ্ঞান ক্লাবের মুখপত্র 'বিজ্ঞান বার্তা', মোহাম্মদ গাজীউর রহমান প্রকাশিত 'বিজ্ঞান চর্চা', ফকরুর রহমানের কাগজ 'বিজ্ঞান সমাজ পত্রিকা', অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান ক্লাবের প্রকাশনা 'অণু', কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের বিজ্ঞান মুখপত্র 'বিজ্ঞান খেলাঘর', সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত 'পুরোগামী বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' প্রভৃতি পত্রিকার পরিচয় পেয়েছি। এছাড়াও উল্লেখ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের 'শিক্ষা ও বিজ্ঞান', চট্টগ্রাম বিজ্ঞান পরিষদের 'সন্ধান' প্রভৃতি। এতগুলোর মধ্যে কোনটা এখনও বেয়ে আর কোনটা আর বেয়ে না তা জানা নেই। তবে 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র'-র 'গণস্বাস্থ্য' পত্রিকা নিয়মিত বের হয় এবং এরাতে পাওয়া যায়। তবে নিয়মিত বের হওয়ায় নিরিখে এক নবর হ'ল বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র প্রকাশিত 'মানিক বিজ্ঞান সাময়িকী'। বিগত চল্লিশ বছর ধরে বের হয়ে চলেছে এই পত্রিকা। সম্প্রতি ২০০০এর ২৫ নভেম্বর নভেরা মিলনায়তন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে

অনুষ্ঠিত হল বিজ্ঞান সাময়িকীর চতুর্থ বছর পূর্তি উৎসব। এই উপলক্ষে বেরিয়েছে মুহাম্মদ ইব্রাহিম সম্পাদিত সুবহুং সুদৃশ্য 'মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর নির্বাচিত রচনার সংকলন' (ঢাকা, ২০০০)। এতে রয়েছে ২৬০টি নির্বাচিত রচনার সংকলন যাতে আছে এ বাংলায় লেখকদের লেখাও। আর রয়েছে বিজ্ঞান সাময়িকীর চতুর্থ বছরের প্রায় সম্পূর্ণ (কিছু সংখ্যা দুর্বৃত্ত তাহি তালিকা কিছুটা অসম্পূর্ণ) তালিকা।

তাহলে সব মিলে কী মনে হচ্ছে? সমকালীন বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার, বিজ্ঞান আন্দোলনের খাওয়া কেমন? তা নিয়ে ওদেশের মানুষরাও ভেবেছেন। এই উদ্দেশ্যে মাসিক শিক্ষাবর্তীর উদ্যোগে ২৬-২৭ অক্টোবর ১৯৯৫ তে আয়োজিত হয়েছে 'বিজ্ঞানচর্চা : সমকালীন বাংলাদেশ' শীর্ষক জাতীয় সেমিনার। যেখানে প্রারম্ভিক শব্দে আলোচিত হয়েছে শিক্ষানীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচিত হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা, দারিদ্রের বহুমুখী বাস্তবতা পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি: আর পঞ্চম অধিবেশনে আলোচনা হয় বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা সম্পর্কে। বলা হয় শ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান শিক্ষার কথা, বিজ্ঞান শিক্ষায় বিজ্ঞান দ্রাবের ভূমিকার কথাও। এদেশে এই ধারার সূচনা ১৯৫৫ সালে, যে বছর ১৮ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান : 'নটরডেম বিজ্ঞান দ্রাব'। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা কি সবসময় বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটায় পারে?

ভারতে ১৯৯৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গণেশের তথাকথিত দুধপানের ববর রাটে গিয়েছিল সারা বিশ্বে। এই বিষয়টি নিয়ে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিদ্যা বিভাগের দুই ছাত্রী মুম্বাইয়ের ৫০০০ জনের ওপর সন্ধ্যা চলিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে আসেন— 'ক্যালিফোর্নিয়ায় আকশন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা বিজ্ঞানমনস্কতার পরিপূর্ণ উদ্ভবের শর্ত বলে প্রতীয়মান হয়নি।' অপেক্ষ বন্ধোপাধ্যায় 'দুধপানের ববরপূর্তি' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন : 'বিজ্ঞান শিক্ষা আর বিজ্ঞানমনস্কতার ফারাকটাকে বোঝা যায় একমুখ ঘটনার মধ্যে দিয়েই' (মুখপত্র গণনগণ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৬)।

এই একই কথা প্রযোজ্য আর এক উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশের সংজ্ঞাও। 'বিজ্ঞান চর্চা : সমকালীন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনার-কার্যবিবরণীর সংকলনগ্রন্থে (ঢাকা, ১৯৯৭) ক. ব. আল সিদ্দিকিও একই কথা লিখেছেন : 'আমাদের দেশের সেরা বাণী ও প্রতিভাশা বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ তাদের দল আঙ্গুলের মধ্যে আট আঙ্গুলে আটটি তথাকথিত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন রত্ন বা পাথর পরিধান করেন।' ... তাঁর ভাষায় —

... যে সকল ছাত্রছাত্রীর যুক্তিবাদিতার প্রতি স্বাভাবিক গ্রহণতা রয়েছে, তারা হয়তো শ্রেণীকক্ষ বা পাঠ্যপুস্তক থেকে পাওয়া জ্ঞানের সাহায্যেই আমাদের সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলি থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু যাদের মনে চিরায়ত ধারণার প্রতি পারিবারিক বা সামাজিক প্রভাবে অন্ধ আনুগত্য, দর্বাভ, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অহঙ্কার, পরকালের প্রাণোদন ইত্যাদি ভীষণভাবে ক্রিয়ানীল, তারা হয়তো তাদের বিচারবুদ্ধির উপর অতটা আস্থা রাখতে পারে না, কিংবা যুক্তির কথা মনে নিতে ভয় পায়। এর ফলে তারা বিজ্ঞান-শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে তাদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে না।' (ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণে বিজ্ঞান শিক্ষা, পৃষ্ঠা - ১৬৯-১৭০) আর তাই 'তুখোড় পদার্থ বিজ্ঞানীকে সেখানে পাই কীবনের সাম্যপেশ সন্ধানে প্রতি বছরই হাতের আঙ্গুলে বাড়তি একটি করে বন্ধধারণ করছেন, ...' (শফি আহমেদ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান শিক্ষা, পৃষ্ঠা-১৮০)।

কিন্তু কুসংস্কার তো আর শেষ কথা বলে না। তাই যেখি বাংলাদেশে জনপ্রিয় জাদুশিল্পী ভূয়েল আইচ কুসংস্কার-বিরোধী গ্রন্থনীতে সামিল। বাংলাদেশে লেখক শিবিরও একাধি মুক্ত। বিভিন্ন পরিকাতেও অলৌকিকতা বিরোধী লেখা থের হয়। বাধীনতার আগে দুই বাংলা এক ছিল। তখন যেমন ছিল অজ্ঞতা ও অশুভির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ঐতিহ্য সেই ধারা আজও স্রান হয়ে যায় নি। দুই বাংলার মানুষই এই বিজ্ঞানচেতনার লড়াইয়ে সামিল। আর সেক্ষেত্রেই বেগমর তপন চন্দ্রবর্তী আর ডুবাইপ্রশাস সাহ সম্পাদনা করেছেন 'দুই বাংলার কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞানচিন্তা' শীর্ষক একটি সংকলন গ্রন্থ (কলকাতা, ১৯৯০)। এই বইতে সংকলিত ৪৭টি প্রবন্ধের মধ্যে ১৯টি বাংলাদেশের।

দুই বাংলায় অনেক মিল। পরিবেশে, কৃষিতে, রুটিতে, সংস্কৃতিতে। বিজ্ঞান আন্দোলনের যে ছবি তুলে ধরা হল তাতেও যেন একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়। বৈচিত্র্য-বিত্তরতা থাকলেও বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারার মূল সুর বোধহয় একই। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর কবিতা ধার করে বলতে পারি—

'ওপারে যে বাংলাদেশ

এপারেও সেই বাংলা' (পারাপার)

কৃতজ্ঞতা। এই লেখার ব্যবস্কাতে বিভিন্ন বই এসেছে দুলভ নয়। বহুলই যে বইয়ের সন্ধান পেয়েছি তা বাংলাদেশ থেকে আমাদের তেঁতা করেছি। সন্ধান ঘর (টোল) আর গোপা মনোপাধ্যায় হয়ে বহর ওদেশ থেকে বইতোলা না জানলে এ লেখা হয়তো সম্পূর্ণ হত না। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অর্থ নেই। দীপক কুমার দাঁএর প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। তিনি বেশ কিছু বই ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

[চলবে]

মনের দর্শন, জ্ঞানের বিজ্ঞান

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

মনেবিজ্ঞানে, ইদানীংকালে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ অনুভূতিসমূহ (পারসেপশন) ও তার থেকে তৈরি হওয়া জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার বিষয়টি আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে। কেননা এটা আমাদের জ্ঞানতেই হবে যে, প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে যে অসংখ্য অনুভূতি আমরা পাই তাদের কীভাবে সংগ্ৰহিত করে তাকে জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে থাকি। ক্রমশ এইসব বিষয়ে বেশ কিছু বিশ্বাসযোগ্য জ্ঞান আমরা লাভ করেছি এবং এই মতামতে আমরা নিশ্চিত হচ্ছি যে মনের এইসব জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানজাতের ক্ষেত্রে আর আশ্চর্য্যাকার কোনো সুযোগ নেই। যদিও এইসব নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হলেছিল উত্তরগতন্তরে, তা আমরা আগেই বলেছি, কিন্তু তার গভীর প্রভাব পড়েছে নর্শনের জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়ে ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে, এই কথাটাও খেয়াল করতে হবে। এই আলোচনার পরিধিতে বহু বিজ্ঞানী, দার্শনিক, পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁদের মতামত দিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন বোঝা যাচ্ছে যে এই বিষয়ে বহু প্রাথমিক প্রশ্নের সমাধান করা এখনও বাকি থেকে গেছে। এই প্রসঙ্গ ধরেই আমরা জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করতে পারি। কিন্তু এ ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে এই প্রক্রিয়া দ্বানোবিজ্ঞানের ভূটিলতম প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি এক এর সমগ্র কর্মপ্রক্রিয়ার খুব সামান্যই ঠিকমত অনুধাবন করা গেছে।

জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া

সাধারণ মনোবিজ্ঞানে থাকে জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া (কগ্নিশন — কেউ কেউ অবগতিমূলক প্রক্রিয়াও বলে থাকেন) বলা হয় তাকে অধিকাংশক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়না। এই প্রক্রিয়া ঠিক কীভাবে ঘটে তা বুঝতে ও বোঝাতে গিয়ে সাধারণভাবে আমরা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানকেই প্রাধান্য দিই। অথচ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের আর পাঁচটা উন্নততর ক্রিয়াকলাপের (বুদ্ধি, স্মৃতি, বিচার, প্রকোভ) মত, গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাল কর্টেক্স)

নিয়ে আমরা এই জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার কাজকর্ম করে থাকি। ফলে আমাদের জ্ঞানতে হয় যে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ বিশেষভাবে ঐ কাজের জন্য সক্রিয় হয় বা প্রয়োজনমত বুদ্ধি-বিকাশপ্রাপ্ত হয়। দেখা যাচ্ছে এ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের বেড়েছে। বিশেষত এখন আমরা মস্তিষ্কের কোনো অসুবিধা বা ক্ষতি না করে তার সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ জ্ঞানার জন্য অনেক প্রযুক্তিগত সাফল্য অর্জন করেছি, যা প্রয়োগ করে আমরা মস্তিষ্কের বহু ভটিগ বিধয় সম্পর্কে জ্ঞানতে সমর্থ হয়েছি।

ভাষার সঙ্গে জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে একথা বলার প্রয়োজন হয়না। কিন্তু ভাষার ব্যবহার ও জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার আন্তঃসম্পর্কের ব্যাপারটি একইরকমভাবে ঘটেনা। ভাষার একথাও ঠিক যে জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ায় আমরা যথেষ্ট ও যুদ্ধভাবে ভাষার সংকেত ব্যবহার করি। কিন্তু ভাষার মধ্যে দিয়ে ভাবনাতুলি যেন পুনর্গঠিত (রিসেপ্ত) হয়, কতকগুলি সাংকেতিক ধর্মির মাধ্যমে। এই বিচারে কলা উচিত ভাষা, জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, এতে কীচামাস সর্ববরাহ করে এবং তা একে অপরকে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে প্রভাবিত করে এরা একে অপরের বিকাশে অপরিহার্য হয়ে পড়ায়। অর্থাৎ শিশুর ভাষার বিকাশ প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ হলে তার জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ারও গুণগত পরিবর্তন হয়। যেমন আমরা বুঝতে পারি ভাষার অর্থহীন ধর্মিসংকেতগুলি ক্রমাগতভাবে বস্তুজগতের বিষয় ও ঘটনাতুলির সঙ্গে অনুবসিত হয়ে মিছুরি দানার মত জঘটি বীঘতে থাকে যার মধ্যে থেকে গড়ে ওঠে শিশুর মনের ভগত, কল্পনার ভগত, স্মৃতি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়াকে উপদ্রুত ও যথায়ভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা, বিনুর্ভাষনের ক্ষমতা ইত্যাদি। এই গুণের জন্য পাতলভ ভাষাকে বলতেন ‘সংকেতের সংকেত’ বা ‘দ্বিতীয় সংকেতভব’। যেখানে ‘প্রথম সংকেতভব’ হল আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যক সমগ্র অনুভূতিসমূহ।

জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ায় সার্ববিক ক্রিয়াকলাপ ভিভাবে কাজ করে এই বিষয়টি আমরা দু’ভাবে জ্ঞানতে পারি। প্রথমত শিশুর

কৃষ্টি ও বিকাশের কালের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে একই শিওর ও অপর শিওরের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে। আর জনগণে পারি স্বাধীন সামাজিক নিক থেকে অসুস্থতার কারণে ওকর্মহিতের এমন কিছু গোলযোগ ঘটে যে বিশেষ কিছু কিছু কর্ম-সম্পাদনে ঘাটতি দেখা যায়। এর থেকে বিশেষভাবে আমরা অনুমান করতে পারি মস্তিষ্কের কোন অংশটি কোন কাজে ক্রিয়ামূলক হয়। আমাদের এই আলোচনায় আমরা জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ায়, ওকর্মহিতের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ভূমিকাকেই ওকর্ম দেব।

ওকর্মহিতের প্রাথমিক সংবেদন অকালে (সেনসারি কন্টেক্স) প্রাথমিকভাবে সমস্ত সংবেদন সজ্ঞান দ্বারা অনুভূত হয়। অন্যভাবে চেষ্টায় অকালের (মটর কন্টেক্স) সাহায্যেই আমরা যাকর্ডী বৈজ্ঞানিক (ভালানটরি) চেষ্টায় ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করি। কিন্তু এসবের জন্য সমস্ত মস্তিষ্কের মাত্র দশ শতাংশ ব্যবহৃত হয়। ওকর্মহিতের বাকি অংশটুকু নাকই শতাংশ এবং তাকে অনুবস অকাল (আসোসিয়েশন কন্টেক্স) বলা হয়। এইরা মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের বোধ, বুদ্ধি, চিন্তা, ভাবনা ইত্যাদি জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়া গঠনের কর্মণ। যোহেব মস্তিষ্কের বিস্তৃত অংশ ছুড়ে এই কাজকর্ম চলতে থাকে, তাই এইসব উচ্চকর্মতাসম্পন্ন শারীরবৃত্তিক সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে পৃথক পৃথকভাবে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন কাজ। তাছাড়া এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য পর্বসম্পদের মধ্যে যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা এতই জটিল ও দুর্বোধ্য যে কীভাবে এইসব ক্রিয়াকলাপ এত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় তা অনুমান করাও সম্ভব হয় না।

মাদুবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী বলা যায় যে জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার আচরণগুলি সুসমর্থিতভাবে সম্পন্ন করার জন্য ওকর্মহিত ও লঘুমস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগকারী অসংখ্য নেটওয়ার্ক আছে। এরা একে অপরকে আড়াআড়ি ও পারস্পরিকভাবে জেদ করে রয়েছে। এই নেটওয়ার্কগুলিকে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। এদের চার ধরনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১. স্নায়ুর এই নেটওয়ার্কের বিস্তৃত পাথর মধ্যে ক্রমশঃ কীথা যে কোনো কৃত্র অংশ আঘাতগ্রস্ত হলে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সমগ্র ব্যবস্থাটির বড় অংশ কতিগ্রস্ত হয়। শ্রুতি ও শিক্ষণকর্মতার ক্ষেত্রে এই ঘটনাটিই ঘটে। ২. যেখানে অনেকগুলি স্নায়ুর সংযোগ একটি অংশে রয়েছে সেই কৃত্র অংশটি বা কতিগ্রস্ত হলে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ক্রটি বিঘটিত দেখা যায়। ৩. কোনো নেটওয়ার্কের একটি অংশ কতিগ্রস্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্য অংশটি পুনর্গঠিত হয়ে তার কতিগ্রস্ত করে দেয়। ফলে কতি

হলেও তা হয় সাময়িক বা স্থায়িক। অনেকক্ষেত্রে তা নির্দিষ্টভাবে বোঝাও যায় না। ৪. এই নেটওয়ার্কের বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য এক ধরনের আনুপাতিক বিশিষ্টতা অর্জন করে।

ভ্রম সংশোধন

উৎস মানুষ-এর সাম্প্রতিকতম প্রকাশন 'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?' (লেখক - অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) বইটিতে একটি ভুল তথ্য ছাপা হয়ে গেছে। ১৯ পৃষ্ঠায় বক্তিমচন্দ্রের হস্তলিপির নীচে 'পূত্রকে' ছাপা হয়েছে, ওটি হবে 'জাতপুত্র'। ভাইপো জ্যোতিষচন্দ্রকে বক্তিমচন্দ্র ওই পত্র লিখেছিলেন। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা লজিত।

সম্পাদক, ড. মা.



পাওয়া যাচ্ছে জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

২০ টাকা

এবং

উৎসমানুষ বিশেষ সংখ্যা

নন্দী বন্দর বন্যা

সংকট আর সমাধান ভাবনা ১০ টাকা

আগামী বন্যা প্রতিরোধ ৮ টাকা

মালগু ৫০ গোং, বৃকমর্ক ট. মা. কার্যালয়



যতবার আলো জ্বালাতে চাই ...

এই মালা, রিমার ববর কী রে?

— ও তো এক টাকার নোট হয়ে গেছে!

এক টাকার নোট হয়ে গেছে মানে?

— দুই তো একেবারে টিউব লাইট হয়ে গেছিল। এক টাকার নোট মানে বেপাক্ত। বাচায়ে এখন যার সেবা/চিকিৎসা নেই।

বাসে দুটো মেয়ের এই কথোপকথন কানে আসতে প্রায় শ্রম করে বসেছিলাম, টিউবলাইট হয়ে যাওয়া মানে? খুব জোর বেঁচে গেছি। পরে একজনের কাছে জানলাম, টিউবলাইট জ্বলতে মেরি হয়। তাই যে মেরিতে বোঝে তাকে টিউবলাইট বলা হয়।

এ থেকেই একটা প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গত পথে মাথায় এসে গেল, সবাই তো: টিউবলাইট জ্বলতে এত মেরি হয় কেন? আগে বাড়িতে ডি সি (ডিরেক্ট কারেন্ট) লাইন ছিল। প্রচলিতভাবে থাকে সবাই ডিসি কারেন্ট বলে থাকি। সুইচ অন করার পর পূর্ণ সুইচ টিপে ধরে থাকতে হত। টিউবের দু প্রান্ত লাল হয়ে উঠলে পূর্ণ সুইচ ছোঁতে নিজে টিউব জ্বলে উঠত। একটু পুরনো হয়ে গেলে বা সন্ধ্যার দিকে ভোল্টেজ কম থাকলে সে টিউব জ্বালে কার সাধা। পূর্ণ সুইচ টিপে টিপে আদমুস বাধা হয়ে উঠত। দু দিক লাল দেখে ছাড়ছি, লাল রঙ মিলিয়ে যাচ্ছে, আলো আর জ্বলে না। এরকম ব্যাপার স্যাপার সেন্সেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বার বার'।

ইলেকট্রিক বাত্বের ক্ষেত্রে এত হ্যাণ্ডা পোয়াতে হয় না। সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলো জ্বলে ওঠে। যত গেলমালা টিউব লাইটের ক্ষেত্রে? কেন এই বৈশ্বাতিক কৈবধ্য?

বাত্বের মধ্যে ট্যাংস্টেন নামক এক ধরনের সস্তর ধাতুতে তৈরি তারের কুণ্ডলী থাকে, থাকে বলে ফিলামেন্ট। ওই ফিলামেন্টের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাওয়ার সময় বাধা পায়, ফলে তা গরম হয়ে ওঠে, আলো ছড়াতে থাকে। ব্যাপারটা এত স্পষ্ট ঘটে যে মনে হয় সঙ্গে সঙ্গেই হল। টিউব লাইটের কার্যপ্রণালী এর থেকে আলাদা। টিউবের ক্ষেত্রে আলো বিচ্ছুরণ নির্ভর করে গ্যাস ডিসচার্জের ওপর। এই গ্যাস ডিসচার্জ নামক প্রক্রিয়া ঘটানোর জন্য উচ্চ বিভব বিদ্যুৎ (হাই ভোল্টেজ) পাঠিয়ে গ্যাসকে আয়নিত (আয়োনাইজড) করতে হয়। প্রদত্ত উত্তেজনা, গ্যাসকে আয়নিত সহজে করা যায় না। কারণ সাধারণ চাপে গ্যাস বিদ্যুতের কুপরিবাহী। কিন্তু নিম্নচাপে থাকা গ্যাসের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন কণা সৌভাগ্যবশত করলে বা গ্যাসকে

উত্তপ্ত করলে তবেই তা পরিবাহী হয়ে ওঠে। এই হাই ভোল্টেজ তৈরি করার জন্য স্টার্টার এবং চোক নামক দুটি জিনিসের মিলিত উদ্ভোগের প্রয়োজন। টিউবের কাঠামোর সঙ্গে একটু পুকুই সাবানের মত চেহারার যে জিনিসটি আঁকড়ে থাকে তার নাম চোক (Choke)। ওটানো লুজের প্রাসের মত নেশতে যেটা, সেটা স্টার্টার। এই জবরজং পদ্ধতি কাল করতে এক সেকেন্ডের কয়েকগুণা ভাগের এক ভাগ থেকে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে। তাই নিম্নপ্রভা টিউবদেবীর আলো দানও বিলম্ব হয়।

ফ্লুরোসেন্ট টিউবের মধ্যে অল্প পরিমাণে পারদ (মার্ক্যুরি) থাকে আর্গন গ্যাসের সঙ্গে। এরাই তড়িৎ মোক্ষণ বা ইলেকট্রিক ডিসচার্জ শুরু করতে সাহায্য করে। টিউবের দু প্রান্তে ফিলামেন্ট থাকে। ফিলামেন্টের কাছেই থাকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণকারী (electron-emitting) পার্শ্ব মাধ্যমে ইলেকট্রোড।

সুইচ অন করা হলে বিদ্যুৎ প্রবাহে ফিলামেন্ট তেজে ওঠে (glow) এবং ইলেকট্রোডকে উত্তপ্ত করতে শুরু করে। ইলেকট্রোড গরম হয়ে উঠলেই শুরু করে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণ। আগেই বলা হয়েছে যে, এই বিচ্ছুরণ বা ডিসচার্জ শুরু করানোর জন্য উচ্চতম বিভব পার্থক্য প্রয়োজন। উচ্চ বিভব পার্থক্যের ফলে উত্তপ্ত ইলেকট্রোডগুলো আর্গনের মধ্যে ডিসচার্জ শুরু করে সেয় এবং টিউব গরম হয়ে উঠে মার্ক্যুরিকে বাষ্প (ভেপার) পরিত্যক্ত করে। উপস্থিত ইলেকট্রনগুলোর গতি ক্রমেই বাড়তে থাকে (একসিলেরেটেড) এবং পারদ বাষ্পকে আয়নিত করে। পারদের মধ্যে দিয়ে ডিসচার্জ চলতে থাকে। টিউব জ্বলতে থাকে। সন্ধ্যার রঙের বালো লাল, সবুজ ইত্যাদি রং চাইলে তা-ও মিলবে। সেক্ষেত্রে টিউবের মধ্যে আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন ইত্যাদি গ্যাস ভরতে হবে। মার্ক্যুরি ভেপার ল্যাম্প, সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প বা ফ্লুরোসেন্ট লাইট নামে যে কাঁচগুলো কপমলে আলোর কন্যা চারিদিক ভাসায় সেগুলোও এই পদ্ধতিতে জ্বলে। আলো দেওয়া শুরু করতে সময় নেয় আরও বেশি।

যতবার টিউব লাইট জ্বালান হবে ততবারই এই ডকুমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু হবে, চলতে থাকবে। ফিলামেন্টগুলো এবং ইলেকট্রোডগুলোর ওপর অক্সাইডের এক আবরণ থাকে। এই আবরণ (কোটিং) ক্রমশ কয়েক ঘণ্টা থাকে। কারবার জ্বালানো নেভানো করলে ফিলামেন্টগুলো কয়েক তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। টিউবের আয়ুও যাবে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে।

সমীরকুমার ঘোষ



প্রসঙ্গ : পরীক্ষার ফল ও আত্মহত্যা

প্রতিবছরই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক এবং জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই কিছু ছাত্র-ছাত্রীর পূর্তাগ্যজনক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। আত্মহনকারীর সংখ্যা চিপুল একথা বলা যায় না এবং এ জাতীয় আত্মহত্যার ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমন সিদ্ধান্ত করাও বোধহয় সমস্ত হবে না। কিন্তু তবুও সম্ভাবনাময় স্বকথকে গ্রাহ্যবস্ত কিছু কিশোর-কিশোরীরা এভাবে আত্মহনন, শুধু যে তাদের পরিবারের কাছে দুঃখ ও বেদনার তাই নয়, বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে এ হল মানব সম্পদের এক নিসর্গণ অপচয়।

এ জাতীয় আত্মহত্যার মূল কারণ নিহিত রয়েছে আত্মহনকারীর বিশেষ মানসিকতায় যাকে ইংরিজিতে বলা যেতে পারে alienation from himself। নিজের কাছ থেকে নিজের বিচ্ছিন্নতা। একজন শিক্ষার্থী যখন সমগ্র সমাজ থেকে, পরিবার থেকে, এমন কি নিজের কাছ থেকেও নিজেকে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন বলে ভাবতে শুরু করে, তখনই তার মধ্যে আত্মহননের ইচ্ছা জাগে। কারণ সমগ্র বিশেষ কোনো কিছুর প্রতি আর তার বিপুল আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে না, বরং থাকার প্রতিও ন্যূনতম আগ্রহ থাকে না। জীবনের প্রতি এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তির কারণ নিহিত রয়েছে মুখ্যত পরিবার এবং শৈশব বৃহত্তর সামাজিক প্রভাবের মিথস্রিয়ার। শৈশব থেকে যদি একটি ছেলে/মেয়ের কাননের কাছে প্রতিদিন এই মন্ত্র জপ করা হয় যে পরীক্ষায় ভালো ফল করাটাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, যার ওপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ জীবনে সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠা, তাহলে তার মানসিক গঠন এক বিশেষ দিকে ঝাঁক নিতে বাধ্য। অবিকল্প যদি তাকে বারবার এভাবে শেখানো হয় যে তার পরীক্ষায় ভালো ফলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বাবা-মার সামাজিক সম্মান, তাহলে সে তার পরীক্ষার ফলাফলাকেই জীবনের একমাত্র মোক্ষ রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে জীবনের অর্থমূল্য এবং তাৎপর্য হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র এবং কেবলমাত্রই পরীক্ষার ফলাফল অর্থাৎ মার্কশিট। এই লক্ষ্য থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি অর্থাৎ কামিষ্ঠ ফল লাভ না ঘটী, তার কাছে পরাজয় এবং ব্যর্থতা

রূপে পরিগণিত হয়। 'কি করে মুখ সেখানে বাবা-মার কাছে, বাবা-মাই বা কিভাবে মুখ সেখানে আত্মীয় পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে' — এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে সে একান্ত অসহায় বোধ করে। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। একদিকে লক্ষ্যে পৌছানোর স্বপ্ন এবং সেকাগ্রে প্রচণ্ড পরিশ্রম, অন্যদিকে সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় ও অনিশ্চয়তার সোলাচল। আসলে ওরা একান্তভাবেই অসহায়, নিজের কাছেও। স্বপ্নভঙ্গ যদি ঘটে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটে, কখনই না লক্ষ্যে পৌছাতে পারে — তাকে মনে নিতে মন পারে না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। স্বপ্নভঙ্গের বেদনা প্রকটিত করে পূর্তাগ্যজনক আত্মহননে। কারণ সেটাই হল মৃত্যু, ছাড়পত্র, উত্তরণ — অসহনীয় পরিকল্প থেকে (যে পরিকল্পাকে নিজের অনুকূলে পরিবর্তিত করার শক্তি ও সামর্থ্য তার নেই) এবং একই সঙ্গে নিজের কাছ থেকেও।

একথা বুঝি সত্যি যে বর্তমান কালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের মূখ্য নির্ধারিত হয় তার কোনো বিশেষ বিষয়ে সাফল্যের মানকায়িত। বিশ্বাস্য এবং উন্নয়ন অর্থনীতির প্রেক্ষিতে মানুষ আর শ্রমের পণ্য। সমস্তভাবেই ব্যক্তিগত দক্ষতা এবং যোগ্যতা নির্ধারণে অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তার পরীক্ষার মার্কশিট। তাই সেনার হরিণের পেছনে জীবন পণ করে একটানা ইদুর সৌড়। ইটপির গেলে চলবে না, খামলে চলবে না, একটানা একসালাগড়ে সৌড়ত হবেই। সৌড় থেকে ছিটকে গেলেই ব্যক্তিগত। তখনই সে চিহ্নিত হয়ে যায় স্বার্থ, পরাজিত, অযোগ্য এবং অপদার্থ রূপে। তার আর কল্যাণকর ও মূল্য নেই সমাজের কাছে। সৌড়তে হবে, জিততে হবে, অন্যদের হারাতে হবে। তাই এরা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। এদের কোনো বন্ধু নেই। সহপাঠীদের এরা বিশ্বাস করে না, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী তথা বিপর্যয় বস্তু গণ্য করে। এদের দোষী করে লাভ নেই। এভাবেই এদের শেখানো হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে, উপলব্ধি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। সবচেয়ে দুঃখের কথা এদের সামনে কোন অনুকরণীয় সামাজিক রাজনৈতিক চরিত্র নেই। গোটা দেশ ছুড়ে দুর্নীতি, অর্থিক কলোকারী। সুশ্রবতার চলাহে সবকিছু। মোটা মোটা পাঠ্যপুস্তকে ঠাসা ভারি ব্যাং নীচে ঈশ্বর ক্রান্ত মুখের অসহায় দৃষ্টির ছাত্র-ছাত্রীদের কথা সমাজ কি প্রকৃতই ভাবে, ভেবেছে? যারা আত্মহত্যা করল, তাদের হোঁ সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের বেদনা বুক নিয়ে যারা টিকে রইল, আত্মহত্যা করার সাহস তাদের হলনা, তারা বরং থাকবে জীবন্তই হয়েই। সমাজের প্রতি ইঁদুর খুণ, কর্মজীবনে বিরক্তি, দাম্পত্য জীবনে অধিবেশন ও ফোড, সর্বোপরি নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা। alienation — গোটা জীবন ছুড়ে।

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়
মধ্যমগ্রাম



শিক্ষিতগণও ষে-শিক্ষায় অশিক্ষিত

ইংরাজী 'taboo' লব্ধটির যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে? অক্সফোর্ড ইন্ডিনাভার্সিটি প্রেসের অভিধানে লব্ধটির সরলার্থ হল 'general agreement not to discuss something.' তৃতীয় সংস্ক্রমে উপনীত আমরা ভারতীয় সমাজের সদস্যরা কোনো কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে হিরস্বত নীরবতাকেই প্রিয় বলে গণ্য করি। এমনই একটি বিষয় হল যৌনতা। প্রতিটি পরিণত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অথবা নারীর জীবনে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই যৌনতা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রকৃতি সত্ত্বেও আলোচনা তো দূরের কথা, নানাতম কৌতূহল বা স্ক্রিজাসা প্রকাশও আমাদের সমাজে অপরাধ। একদিকে যৌনতা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে চলে আসা অশংখ্য ব্রাহ্ম ধার্ম্য ও কুমসংস্কার সমাজের যুকের ওপর অগণল পাথরের মতো চেল বসে আছে। অন্যদিকে গন্দ্যামাখতলিতে, বিশেষ করে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে, পল্ডিম্বী যৌন উচ্ছ্বলতার প্রদর্শন ও এঙ্গেলে নির্মিত তার ততোধিক বিকৃত অনুকরণ সমাজের, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের ওপর এক সর্বনাশা প্রভাব বিস্তার করছে। এর ফলে জন্ম নিচ্ছে নানাবিধ যৌন সমস্যা, বেড়ে চলেছে যৌন অপরাধের সংখ্যা, ভ্রুত প্রসারণলত করছে নানা যৌনরোগ। কখনো কখনো 'general agreement' যে কণ্ডবানি ক্ষতিকর হতে পারে, এ ভারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অথচ প্রাচীন ভারতে যৌনতা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট উদার। যৌনবিদ্যা সত্ত্বেও বহু উদ্বোধনীয় গ্রন্থই তার প্রমাণ। বৈদিক সমাজে নারীর আসন ছিল পুরুষের সঙ্গে সমমর্যাদার। কিন্তু উত্তর-বৈদিক যুগে ধর্মীয় আদ্য সামাজিক অনুশাসনের নামে নানা বিধিনিষেধ চাপিয়ে নারীর স্বাধীন সন্তোকে তিলে তিলে হত্যা করা হল। আর তখন থেকেই শুরু হল যৌনতার অবদমন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিস্তৃতি চূড়ামণিদের হাতে তখন থেকেই নারীকে সহ্য করতে হয়েছে যৌন নির্যাতন।

একবিংশ শতকের সূচনাতেও এই অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ষোলুতা সঠিক প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এখনো নারী পুরুষের

ভোগের সামগ্রী এক-বাংশরক্ষার মাধ্যম। আদর্শ পুরুষ থাকে বলে তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আদর্শ নারীর সংজ্ঞা নিরূপণে আমাদের প্রচেষ্টা সবেবার মতো। পুরুষের অসামাজিক যৌন সম্পর্ক সত্ত্বেই 'কম্বার যোগ্য, কিন্তু নারীর 'পদস্থলন' এক যুগ সামাজিক অপরাধ।

এই বৈষম্য ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমাজে যৌন সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এই সমস্যা সমাধানে যথার্থ বিজ্ঞানমূলক যৌনশিক্ষা এক অন্যতম অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। প্রচলিত ব্রাহ্ম ধার্ম্য আর সংস্কারের বাধা কাটিয়ে আমাদের সেনেও এই কাজ অতি সম্ভবিত শুরু হয়েছে।

ডা. শ্যামল চক্রবর্তীর লেখা 'যৌনশিক্ষার অ-আ-ক-ব' দীর্ঘকালী গ্রন্থটি এই ক্ষেত্রে এক অত্যাশ্চর্য সাংযোজন। বস্তুত, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত যৌনশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ রূপে এই বইটি পরিগণিত হবার দাবি জানাতে পারে। সহজ সরল ভাষায় একটি দুর্লভ বিষয়কে কীভাবে সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রহণীয় করে তোলা যায়, এই বইটি তাই এক সার্থক দৃষ্টান্ত। ছোট ছোট দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীর অবতারণা করে লেখক একদিকে যেমন বিভিন্ন যৌন সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন, অপরদিকে যৌনতার ক্ষেত্রে মানবসমূহের জটিল শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপকেও প্রাঞ্জল ভাষায় বুদ্ধিতে দিয়েছেন। স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে মূলত লেখা হয়েছে তাদের অভিভাবকরাও যে এই বইটি পাঠ করে প্রকৃত উপকৃত হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বিবাহোত্তর কাল — মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যৌনতা যেহে ও মনে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটায়, তার ফলে কোন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে এবং তা সমাধানের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ই বা কী, এই বইটিতে তার বিশদ আলোচনা রয়েছে। যৌনতা সম্পর্কে বহু দৃষ্টিভঙ্গি শোষণ করার সপক্ষে যুক্তি বিস্তার করতে গিয়ে লেখক বারে বারেই অভিযোজনতা ও যৌন উচ্ছ্বলতার বিপদ সত্ত্বেও পাঠককে সচেতন করে দিয়েছেন। এখানেই বইটির বিশেষ সার্থকতা।

বইটির সুপ্রণ ও প্রচ্ছদ যথাক্রমে বন্ধককে ও বহাঘব। এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশনা সংস্থা মহল বুক হাউসকে অভিনন্দন। বইটির কল প্রচার সেক্ষেত্রে পরিচয় ও সার্থক প্রয়াসকে সফল করে তুলবে সন্দেহ নেই।

পৃষ্ঠীয় বন্দ্যোপাধ্যায়

'যৌনশিক্ষার অ-আ-ক-ব'

ডা. শ্যামল চক্রবর্তী

মণ্ডল বুক হাউস/জানুয়ারি ২০০০

দাম - ৮০ টাকা



হয়েছে

□ পরমা বৈশাখ, ১৪ এপ্রিল 'গোবরভাঙ্গা গৌরবী' ইনস্টিটিউটের নিজস্ব ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হল। প্রায় ১০ বছর আগে প্রধাবিনুত এক বিজ্ঞান ক্লাস হিসেবে যার ভাড়া, প্রধানত মণি দাশগুপ্তের পরিচালনায়, সেই সংস্থা এদিন এক পরিপূর্ণ পরিকাঠামোয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় কুমারেশ দাশ সংকলিত 'পূর্বাতন' গবেষণাস্থান ইতিহাস' গ্রন্থ এবং 'আমাদের দাদা মণি দাশগুপ্ত 'স্মরণে' শ্রাবকগ্রন্থটি।

□ ডি. আই. পি. রোড, কইবাগির 'মন ফাউন্ডেশন' গত একবছর ধরে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে যে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলো তারই সমাপ্তি অনুষ্ঠান হল ৯ এপ্রিল বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর চলে। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় 'ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যসমন্বয়' শীর্ষক বইটি। প্রধান আলোচক বিষয় ছিল বিষমতা ও আবহতা। আলোচক ছিলেন ডঃ সত্যজিৎ আশ ও ডাঃ জ্যোতির্ময় সমাজদার।

□ ৩১ মার্চ, ননিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে 'হরণে রেখে 'বিধায়ন ও নারী' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে 'ভারতের মানবতাবাদী সমিতি' মৌলসিরি কাছে ভক্ত-ভবনে। প্রধান আলোচকরা ছিলেন — কুলা ভদ্র, শাখরী ঘোষ, দেবপ্রত পাতা।

□ ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে মর্জিত ব্যবস্থাপনায় দিবসটি উদ্‌যাপন করে বিধাননগরের 'প্রান্তিক' চিকিৎসা গবেষণা কেন্দ্র, সহযোগিতায় লকস্তুদ সংকদ পরিকা। এবারের WHO নির্ধারিত কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল 'মানসিক স্বাস্থ্য'। সকাল সাড়ে সাড়টায় পদযাত্রায় অংশ নেন অনেক নবীন-প্রবীণ নাগরিক। যাত্রা শেষে আলোচনাসভা মি. বি. ত্রৈকর সভাপণ্ডে। ডাঃ সুবীর কল, ডাঃ অশোক চৌধুরী, বিচারপতি গণেন্দ্র নায়াগে স্বায় ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি। এছাড়া মনোজ বক্তব্য করেন ডাঃ অসীম চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্র অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ। প্রধান আলোচক ছিলেন ডাঃ সত্যজিৎ আশ, বিষয় ছিল — বিষমতা একটি অসুখ। দর্শকদের থেকে সাগ্রহ প্রশ্ন সভাপণ্ডে জীবন্ত করে তোলে। সামগ্রিকভাবে যে কথা বেরিয়ে আসে তার মর্মার্থ দাঁড়ায় — মানসিক অসুখ বা বৈকল্য অনেক বেড়েছে, জটিলতর হয়েছে। একই ধরন, একই সমস্যাযুক্তির বাড়িয়ে দেওয়া হাত, অসহায় রোগীর উপশম ঘটায়।

□ ২১ এপ্রিল চন্দননগর বাগবাাজারের নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে ব্লাইড প্রদর্শন সহযোগে 'আলোচনা' হল

'অবধিবেশের বদস্য এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে। আলোচক — অধ্যাপক অরুণেন্দ্র কল্যাণাশায় : উদ্যোক্তা ছিল বিবর্তন বিজ্ঞান সংস্থা ও ভারতের মানবতাবাদী সমিতি।

□ মাতৃভাষা আন্দোলনের দীর্ঘ নদীমতের স্মরণ 'একুশের মেলা' অনুষ্ঠিত হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাদু মদনেশ্বরপুরে। দুদিন ব্যাপী এই মেলায় উদ্যোক্তা ছিল 'একুশে উদযাপন কমিটি'। পরযাত্রা এবং শহীদ শ্রাবক স্মৃতিতে পূর্ণার্থ্য নিবেদন করে মেলায় সূচনা হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ১০ টায়। এই মেলা উপলক্ষে কবি সম্মেলন, মানবাধিকার বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও ছিল শিশু কর্মশালা, নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রশিল্পী প্রকাশ কর্মদার, সঙ্গীত শিল্পী অনুশ্রী-বিপুল, কল্যাণ দাশগুপ্ত, গণসঙ্গীত সোণাম 'বায়োমাসা' ছিল শিল্পী মেলায় বিশেষ আকর্ষণ। জনসংগঠিত কেন্দ্র, প্রমতাচী হাসপাতাল, মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ, সর্বোচ্চভিত্তি কৃষি চক্র, মনোবৈজ্ঞানিক ট্রেনিং কেন্দ্র, মনোবৈজ্ঞানিক মিশন এবং বেঙ্গল সূচনা সংঘ এই মেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

□ ১লা এপ্রিল (রবিবার) হাসিনার বিজ্ঞান পরিষদের আয়োজনে হাসিনার স্থানীয় সভ্য মঞ্চে একটি প্রতিবাদী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি হাতিবানগাঁও কর্তৃত আত্মগোপনস্থানে বৃদ্ধমুখিত ধ্বংস সহ সমগ্র বিশ্বব্যাপী মৌলসংগঠিত তাওবের বিরুদ্ধে সভায় ভাষণ দেন জ্যোতির্ময় ঘোষ, আব্দুর রউফ প্রমুখ।

□ ৭ ও ৮ই এপ্রিল, গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের যুক্তি দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কাঁচড়াপাড়া। পরিসংখ্যানিক হাইড্রোলজি। সম্মেলনে প্রথম দিনে ছিল মতবিনিময়মূলক সভা। বিষয় : গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সম্ভাবনা, সমস্যা ও সমস্যা উদ্ভবের উপায়। উপস্থিত ছিলেন গণবিজ্ঞান আন্দোলনে বৃদ্ধ একাধিক জেলার বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য ও কয়েতজন চিত্রাঙ্গীল ব্যক্তি। দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি ছিল, সম্পাদনাকারী প্রতিবেদনময় উপর আলোচনা, কর্মসূচি প্রণয়ন, হিসাব পেশ ও নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠন।

ঘর চাই

উৎস মানুষের কার্যপথ ৯৮ নম্বর মহাস্থা গাছী রোডে আর সেই। কলেক্ট স্ট্রিট সংলগ্ন অঞ্চলে আমরা ঘর চাই। পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী পাঠক-বন্ধু ও অনুসঙ্গীদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি।



রেজিঃ অফিস — বিডি ৪৯৪, সন্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪
ফোনে যোগাযোগ : ৪৬৬-২৪৩৭/৩৪৩-৪১২৫/৩৫৪-০২০৪/৩৫৮-৬৩৯১

পুস্তক তালিকা

খাবার নিয়ে ভাবার আছে	২৫.০০	ইতিহাসের দিকে দিক্রে : ছেচমিশের পদ্মা	২৫.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)	৬০.০০	সাপ নিয়ে কিংবদন্তী	২০.০০
চলতে ফিরতে	১০.০০	বিবেকানন্দ অনা চোখে	২৫.০০
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়	২০.০০	প্রমিথিউসের পাখ	১২.০০
অতীন্দ্রিয় আলোকিকের অন্তরালে	৩০.০০	তিন অবহেলিত জ্যোতিষ	১৮.০০
শেক্সপীয়ার সংস্কৃতি	২৫.০০	কি আর কেন	২০.০০
যে গানের শেষ নেই	৩০.০০	চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	১৫.০০
ঐতিহ্য : অজ্ঞতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	২৫.০০	লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি	৩০.০০

নতুন বই

জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় / ২০.০০

প্রধান প্রাপ্তিস্থান : ১) দাণ্ডাওল্ড এণ্ড কোং, কলকাতা স্ট্রিট : ২) ইন্ডিয়ান বুক ডিসট্রিবিউটিং কোং,
৬৫/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা

এছাড়া

পতিরাম / বুক মার্ক / জনবাহ্য গ্রন্থালয় (১০, হিদারাম ব্যানার্জী সেন, কলকাতা)। ফোন : ৩২১-৭৩৮১
শ্রাবণী আবাসন (এস ৬/২, সন্ট লেক) এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি — ১০ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা
(আমহাস্ট স্ট্রিট ডাকঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে বেলা ১২টা — ২টা। নিবারণ সাহায়র ঘর)

পরবর্তী সংখ্যা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে

'উৎস মানুষ' সোসাইটি'র পক্ষে বঙ্গ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সন্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত
এবং শৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত



Cur
As 11/07/01

১২.২০

- ভূমি সংস্কার ও সমাজ গঠন ●
- মালদহে ডাঙন, তীব্রতর জনরোষ
- জ্যোতিষ, যোশী, ইউ জি সি ●
- তেল পড়া বৈদ্যরাজ হেমব্রমের সাক্ষাতে
- বনের খবর ●

তবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাছে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও বনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং কন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাছে ত্রুটি হতে হবে আমাদের সকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী পড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

॥পশ্চিমবঙ্গ সরকার॥

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

স্মারক নং ২৪৫৭/২০০১/তথ্য ও সংস্কৃতি

সূচিপত্র

মালদহে ভাঙন	তরুণ কুমার চৌধুরী	১১০
জ্যোতিষ ... মুরলী ঘোষী	ভবানীপ্রসাদ সান্না	১১২
লাঠি বনাম স্টেথো (শেবাশে) শ্যামল চক্রবর্তী		১১৫
বৈদ্যনাথের তৈল দাওয়াই	রাজেশ দত্ত	১১৮
সাবিত্রী ব্রত	সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়	১২২
বর্তমান বিজ্ঞান আন্দোলন	সবাসাচী চট্টোপাধ্যায়	১২৩
পশ্চিম বাংলা : কুনি সংস্কার	অজিতনারায়ণ বসু	১২৬
পাকিস্তানে পরমাণু বিদ্যুৎ	(অনু.) নাজমু মুস্তাক	১৩৪
পুস্তক পরিচিতি		১৩৫
বনের ববর (২)	বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী	১৩৮
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	সমীরকুমার ঘোষ	১৪০
চিঠিপত্র		১৪১
সংগঠন সংবাদ		১৪২
নীরবে চলে যান সুখময়না	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৩

সম্পাদকীয়

‘আবার এসেছে আশা’ আকাশ ছেয়ে।

আসে বৃষ্টির সুবাস

একথা সুখিঠাকুর একানকুই বছর আগে না লিখে এখন লিখতে বসলে (ভীর অস্থিরের বাজনাটুকু ধরে নিতে হবে) দুবার নিশ্চই ভাবতেন; জলদস্যুর কণ্ঠে এগান গাইবার আগে দেবদত্ত বিদ্যাসও বিচলিত বোধ না করে পারতেন না। কারণ, কে না জানে, বাংলার মানুষ এখন আর আশা-প্রাকণের বৃষ্টিতে সুবাস বুঁজে পায় না, কোনো রোমাঞ্চ আসে না। আসে আতঙ্ক। ঘর ভাঙা, বানভাসা ধ্বংস আর মৃত্যুর আতঙ্ক।

বছর ঘুরে আবার এলো ‘বর্ষা’। আর এই দ্বিআকরিক লম্বটাই এখন পাণ্টে হয়ে গেছে ‘বন্যা’। ভয়াবহ বন্যার ভীতস্ত ছবি আমরা প্রতিবার দেখছি। এবারে হয়তো আরো মারাত্মক, আরো প্রাণঘাতী হবে। কারণ ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যন্ত বর্ষ কোভ, দুঃখ, আবেগন, আর্তি, তপস্বী, কঠোর, সমালোচনা, পরামর্শ, প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারি প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের নতুন উদ্যোগ কিছুই চোখে পড়ে নি আমাদের। বিকৃতি, প্রতিশ্রুতি, নির্দেশ সবই নতুন ভাবে, নতুন ঢঙে প্রচারিত হলেও কার্যত বাস্তবক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন দেখছে না উত্তর-মধ্য-দক্ষিণ বঙ্গের বৃষ্টির-আওয়াছে-আতঙ্কিত দরিদ্র নিম্নবিত্ত চিরবঞ্চিত মানুষ। একটু দরদ দিয়ে, বিবেক দিয়ে কি ভাবা যায় না জনসাধারণের কথা? বোম্ভা, স্পার বীধ, বিটার্ড বীধ দিয়ে কোটি কোটি টাকার বেলা চলে এখন সবাই জানে। সবচেয়ে বেশি জানে স্থানীয় পীড়িত মানুষ। কিন্তু কোনো ক্ষমতাই যে ওদের নেই। কত প্রাণ চলে যায় বানের স্রোতে। একটি ঘাণের দামও কি টাকায় মেটানো যায়?

সামগ্রিক নদী-পরিষ্করনা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে এক-দু বছরেই হয়তো সমাধান এনে দেওয়া হবে না। ঠিকই। কিন্তু বন্যার প্রকোপ ক্রিমিত করা এবং বানভাসী মানুষদের পরিচ্ছন্নতা সহায়ী বন্দোবস্ত করা, সে কাজগুলো তো আগায় করা যায়। কেন করা হয় না? গত ২/৩ বছরে বেসরকারি বিশেষজ্ঞরা অনেকগুলি সম্ভাব্য সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন। এখনো সিলেছেন। কিন্তু কানে ঢুকছে কই? তবে কি সরকারি কর্তৃপক্ষের সবিস্মটাই নেই? তাই কি বুকে নিতে হবে?

উৎস মানুষ

ISSN 0971 - 5800

বি ডি ৪৯৪, সন্টলেক, কলকাতা ৬৪
BD 494, Salt Lake, Calcutta 64

মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি / ১২টা - ৪টা.

১০, কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা (নিবারণ সাহার ঘর)

অস্থায়ী কার্যালয় : প্রাক্তী আবাসন,
এস ৬/২ সন্ট লেক, কলকাতা ৯১
ফোন : ৩৩৪-০২০৪, ৩৫৮-৬৩৯১
(সকালে ও সন্ধ্যার পর)

মালদহে ভাঙনরোধে ব্যর্থতা ও প্রতিক্রিয়া

ডরুণ কুমার চৌধুরী

খবরে প্রকাশ মালদহে বন্যা রোধের জন্য পরিকল্পিত আট নং রিটার্ডার্ড বাঁধটির নির্মাণ-স্থান স্থানীয় চাপে পরিবর্তন করা হচ্ছে। পরিবর্তিত স্থানটিতে কোটি কোটি টাকার এই রক্ষা বাঁধটির স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তায় প্রযুক্তিবিদরা উদ্ভিগ্ন। অনুরূপ ঘটনা গত বছর অর্থাৎ ২০০০ সালে সাত নং রিটার্ডার্ড রক্ষা বাঁধটির ক্ষেত্রেও হয়েছিল। সেমিন জনতা ও রাজনৈতিক চাপে বাঁধটিকে স্থানান্তরিত করে এক দুর্বল স্থানে সরকারের ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করতে বাধ্য হন। ফলে বিপুল অর্থে নির্মিত মাটির ঐ বাঁধের রক্ষা ক্ষমতা বছর না ঘুরতেই শেষ হয়ে গেল। তাই আবার প্রয়োজন হল এ বছর নতুন এক রক্ষা বাঁধের, যার সরকারি নাম আট নং রিটার্ডার্ড বাঁধ, আর এ বিপুল ব্যয়ের এই বাঁধের নির্মাণ-স্থান নদীবিজ্ঞান শাস্ত্র মতে হচ্ছে না, হচ্ছে সুবিধাবাদীদের সুপারিশ মত। প্রশাসনের দুর্ভার অভাবে স্বার্থের চাপের কাছে ইঞ্জিনিয়ারদের অসহায় আত্মসমর্পণ, বন্যারোধী প্রকল্পের সাফল্যের পক্ষে বিরটি অন্তরায়।

নির্দীড়িতের প্রতিক্রিয়া

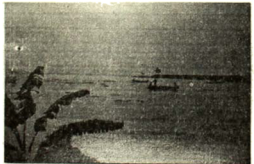
এ কথা অনস্বীকার্য যে বিগত বন্যারোধী প্রকল্পগুলি স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। ১৯৯৬ সাল থেকে যে প্রবল বন্যা ও ভাঙনের গুরু, আজও তা অব্যাহতই শুধু নয়, বরং আরো বেশি করে মালদহের পাড়কে ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক আক্রমণ করে চলেছে। বছর বছর একটির পর একটি রিটার্ডার্ড বাঁধ নাম নিয়ে পাড় রক্ষার যে প্রহসন চলছে, নির্দীড়িত অধিবাসীদের মনে তা আর কোনো দাগ কাটে না। সরকারের কারিগরী দক্ষতা তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞানকে তারা কোনো মূল্য দিতেই রাজী নয়। অথচ বাঁধটি তৈরি হবে বহুকোটি টাকায়। স্থানীয় প্রতিক্রিয়া হল পরিকল্পিত প্রকল্পগুলি যখন সত্যিকারের রক্ষা পরিকল্পনা নয় তখন তাদের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নাই। বরং প্রকল্পের ব্যয় থেকে যতটুকু নিজেদের জন্য তুলে নিতে পারা যায় ততটুকুই লাভ। এধরনের মনসিকতা বাড়তে থাকলে কোনো প্রকল্পই সাফল্য পেতে পারে না।

বন্যার্তদের জিজ্ঞাসা

ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ও দক্ষতার উপর জনসাধারণের আহ্বাই প্রযুক্তিবিদকে স্বাধ্যবিশ্বাসী করে। পরিভাপের বিষয়

মালদহে বন্যা ও ভাঙনরোধী প্রকল্পগুলিতে প্রযুক্তিবিদদের আহ্বা, বিশ্বাস, উৎসাহ, আন্তরিকতা কোনোটাই বন্যাক্রান্ত মানুষজন খুঁজে পাচ্ছে না। অসহায় মানুষেরা বছরের পর বছর বন্যায়, ভাঙনে তাদের গ্রাম, জমি জায়গা, বাড়িঘর, জীবনের সমস্ত উপকরণ হারিয়ে এক শূন্য মনে হাহাকার করছে। আর যারা এখনও সব হারান নি তাঁরা দুশ্চিন্তা, উদ্ভিগ্নতা নিয়ে সবার দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যদি কেউ কোনো সুরাহা করতে পারে। বন্যার, ভাঙনের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আশ্রয় অধিবাসীরা নিজেরাই এখন বেশ ওয়াকিবহাল। তাদের মনে জিজ্ঞাসা অনেক :

- সরকারি সমস্ত প্রকল্পই ভাঙনের উজ্জনে না হয়ে ভাটিতে হচ্ছে কেন? এটা কি নদী বিজ্ঞানসম্মত?
- সরকারের রক্ষা বাঁধগুলি বছর বছর পশ্চাতে স্থানান্তরিত হতে হতে এখন আট নম্বরে এসে দাঁড়িয়েছে। ডুবু ও একটাও সঠিক পদ্ধতির রক্ষা বাঁধ তৈরি হল না কেন?
- ভাঙনের ভাটিতে বেশভারে-গড়া প্রকল্পগুলি একটার পর একটা নদী-গর্ভে চলে যাচ্ছে? এই অপব্যয়ে তবু কারো সচেতনতা নেই কেন?
- নদী প্রকল্পের সফল কার্যকাল যখন শীতকাল, তখন প্রতিবছর বন্যারোধ ভাঙন রোধের কাজগুলি বর্ষায় করা হয় কেন?
- মালদহ জেলার ভাগ্য জড়িত ধাকা সড়েও ফারাকা ব্যারেল তৈরির পরিপ্রেক্ষিতে নদীর পরিবর্তিত অবস্থায় বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশগুলি কেন অবহেলিত?



একটি গাছ এখানে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যুর শহীদ্য

প্রতিকারের পথ

নদী শাসনে ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার উপর এই যে অবিশ্বাসের কারণে ছদ্মতা জনমানসে প্রসারিত হচ্ছে একে আও মোচন করতে না পারলে অবিশ্বাস থেকেই আসবে জনসাধারণের ক্রমাগত হতক্ষেপের মানসিকতা। ফল হবে পরিকল্পনার স্বর্কতা ও প্রকল্পে অপ্রচুর। যেমন ঘটেছিল ২০০০ সালে সাত মন্ডর রিটার্গার্ট বীধের ক্ষেত্রে। যেমন ঘটতে চলেছে আবারও আট নম্বর রিটার্গার্ট বীধের বেলায়। বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াররা অসহায়, কারণ ভাঙনবোধে সাফল্যই

পূর্বকার সেরাপথ অপরিমর ভাবে হলেও গম্বাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে নদী নিজেই আপন পথ করে নেবে তার নিজের গতিতে। সংক্ষেপে নেই এটি একটি দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ কাজ। কিন্তু জনমানসে আরা ফেরাতে পরিকল্পনা ওঠ হওয়া প্রয়োজন সত্বর। বহুর গড়াচ্ছে তবু কোনো বড় পরিকল্পনা-রই ওঠ আমাদের দেখছি না।

অবশ্য সমাধানের প্রাথমিক পদক্ষেপ অতি অল্প খরচে এগনি নেওয়া সম্ভব। সেটি হল, ব্যারেজের মালমহ পাড়ের দিকের বহু বৎসর ধরে পলিতে বদ্ধ ৫২/৫৩টি গেট খুলে

সমস্ত সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছে মানুষ। চাবিটি তার হাতে। পদাধিকার বলে ক্ষমতাসীনরা যদি কাজে দায়বদ্ধতা মেনে নিয়ে বন্যাপীড়িত অসহায় জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য আন্তরিক তগিদ অনুভব করেন, তবে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়। সমাধানের জন্য কারিগরি জ্ঞান, দক্ষতা, মালমসলা, পরিকাঠামো কিছুই অভাব নেই। দারিদ্বে দায়বদ্ধ পদাধিকারি কর্তাদের ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, সততা ই সাফল্যের শেষ কথা।

মালমহ/মুর্শিদাবাদ রক্ষার সম্ভাব্য সূত্র

ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনিত উদ্ভূত মালমহে ভাঙন সমস্যা সমাধানের সূত্র ভাবত সরকারের পূর্ণা বিভার রিসার্চ স্টেশন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ৮০-র দশকেই জানিয়েছিল। সুপরিষদ ছিল, ভাঙনের উজ্জানে ব্যবোল থেকে ২৮ কিমি ও ২৯ কিমি দূরে রাজমহলের বিপরীতে দুটি সোত নিয়ন্ত্রণী দীর্ঘ দীর্ঘ নদী বীধ (স্পার) নির্মাণ। নদী তখন আয়ত্তে ছিল। স্পারদুটি অল্প খরচেই হয়ে যেত। আজকের এই ভাঙন, এত কম কতি, লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ দুর্দশা সীমাবদ্ধ থাকত। নদীর গতিপথে এত বড় বড় চড়ার সৃষ্টি হত না। ... তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক অনেক জল বয়ে গেছে। নদী এখন মালমহের অস্তিত্বের দীর্ঘ দীর্ঘ সন্ধান আনছে। পদক্ষেপ সত্বর নেওয়া প্রয়োজন। নদীর পরিবর্তিত অর্কৃতিতে পুণার রিসার্চ স্টেশন থেকে মডেল পরীক্ষা মাধ্যমে আবারও নতুন করে স্পারের সংখ্যা, স্থান, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা নির্ণয় করা সরকার। সঙ্গে নদীতে জমা পলি কেটে রাজমহলের উজান থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত

নেওয়ার ব্যবস্থা করা। এই গেটগুলি কেন অকাজে করে রাখা হয়েছে তা অজানা। অথচ ব্যারেজের নিম্নমালদী অনুসারে বর্ষায় প্রবল স্রোতবিনী গঙ্গার সমস্ত গেট খুলে প্রবাহিত হওয়ার কথা। তবে কেন নদী ব্যারেজে এসে এক স্তব্ধ পথে প্রবল খরসোতা হয়ে থাকে? ব্যারেজের ও ব্যারেজের উজানের পলি সরিয়ে সমস্ত গেট খুলবার বনোবস্ত করে এই আবস্থা থেকে গম্বাকে মুক্ত করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে মালমহ পাড়ের ভাঙনের উপর অনেকটাই চাপ কমে যাবে। একই সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার ১০০ কিমি পাড়ের ভাঙনও বহুলাংশে হ্রাস পাবে, নদীশাসন-প্রকল্পগুলি ড্রাস বায়ে

বেশি কার্যকরী হবে। আজ ফারাক্কা ব্যারেজের নড়বড়ে অবস্থা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনা চলেছে। এই অবস্থার অন্যতম মূল কারণও ওই বন্ধ গেটগুলি। নদী স্তব্ধপথে প্রবাহকালে বিধ্বংসী স্রোত ব্যারেজের ভিত্তির উপর আঘাত হেনে চলেছে। ক্রমাগত সৃষ্টি হচ্ছে আরো বিপজ্জনক অবস্থা।

সাফল্যের শেষ কথা

সমস্ত সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছে মানুষ। চাবিটি তার হাতে। পদাধিকার বলে ক্ষমতাসীনরা যদি কাজে দায়বদ্ধতা মেনে নিয়ে বন্যাপীড়িত অসহায় জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য আন্তরিক তগিদ অনুভব করেন, তবে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়। সমাধানের জন্য কারিগরি জ্ঞান, দক্ষতা, মালমসলা, পরিকাঠামো কিছুই অভাব নেই। দারিদ্বে দায়বদ্ধ পদাধিকারি কর্তাদের ঐকান্তিকতা, নিষ্ঠা, সততা ই সাফল্যের শেষ কথা।

(লেখক একটি জনকল্যাণমূলক জোয়ারেই সংস্থা 'Elders' PRAYAS'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সেক্রেটারি এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত নদী ইঞ্জিনিয়ার)

জ্যোতিষ, সংস্কৃত, বটের রস ও মুরলী যোশী

ডাবানীশ্রদাম সাহু

কোনো গর্ভবতী মহিলা যদি পুরসত্তান পেতে চান, তবে ঠাট পাতার রস দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ডানদিকের নাক দিয়ে ঢানলেই তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

না, এটি কোনো গ্রাম্য ওকা-গুলিনের নিদান কিংবা পাগল-ছাগলের প্রলাপ নয়। ভারতবর্ষের মাননীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন যোশী স্বয়ং এই নিদান হেঁকেছেন। তাও কোনো হেলা-ফেলা সমাবেশে নয়। গত ১১ই মে প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষে নত্যাভিগিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রক আয়োজিত এক প্রদর্শনীতে মন্ত্রীমহোদয় এই মূল্যবান পরামর্শটি কোটি কোটি জনগণকে কিনামুখে বিতরণ করেছেন। ফলকাতা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় ১২ই মে, ২০০১ তারিখে ‘পুরসাত্তে যোশীর সূত্র’ শিরোনাম দিয়ে সংবাদটি পরিবেশিত হয়।

তিনি আরো জানিয়েছিলেন যে, পুরদারী এই দারুণ নিদানটি নাকি সূত্রতঃ সংহিতায় লেখা আছে। এই সংহিতা বুঁজে বেখে তাঁর বক্তব্যের সভ্যতা ঘাটাই করা সম্ভব হয় নি। তবে এটি ঘটনা যে, সূত্রতঃ সংহিতা প্রাচীন ভারতে বস্ত্রবন্দী বিজ্ঞানচর্চারই অন্যতম একটি ফসল। কিন্তু চারদিকের প্রবল আগ্রাসী ব্রাহ্মণশক্তির চোরে ও চাপে তার মধ্যেও কিছু অধিতাত্ত্বিক ভাববাকী ভাবনা ঢোকানো হয়েছিল বা বাধ্য হয়ে ঢোকাতে হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সূত্রতঃ সংহিতার বিজ্ঞানসম্মত নানা চিকিৎসাপদ্ধতির পাশাপাশি এ ধরনের চরম হাস্যকর অপবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা তার মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে।

থাকলেও ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তার সবচেয়ে বড় কারণ, কোনো মহিলা গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায়। এটি এখন সবারই জ্ঞান যে, পুরুষের শুক্রকোষ ও নারীর ডিম্বকোষের মিলনের পর নারীর জরায়ুতে নিষিক্ত হয়ে নিষুর প্রাথমিক জগৎকোষ তৈরি করে। নারীর ডিম্বকোষে থাকে শুধুমাত্র এক্স-সেল্স ক্রোমোসোম আর পুরুষের শুক্রকোষের কোনোটিতে থাকে এক্স, কোনোটিতে বা ওয়াই-সেল্স ক্রোমোসোম। এক্স-সেল্স ক্রোমোসোম যুক্ত শুক্রকোষের সঙ্গে ডিম্বকোষের নিষেক ঘটলে ঐ শিশু হবে

কন্যা সন্তান, এবং ওয়াই-সেল্স ক্রোমোসোম যুক্ত শুক্রকোষের সঙ্গে ডিম্বকোষের নিষেক ঘটলে জন্মাবে পুত্র সন্তান। তাই সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যার ডিম্বকোষ-শুক্রকোষের নিষেধকের মুহূর্তেই।

স্পষ্টতই একবার গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার পর, নাক দিয়ে বটের রস আর দুধের ককটেলই হোক বা অন্য কোনো দাওয়াই-ই হোক, কোনোকিছু টেনে কিংবা অন্য কোনো কিছু করেও গর্ভস্থ সন্তান যদি মেয়ে হয়ে থাকে তবে তাকে ছেলে করে দেওয়া যাবে না। সুদূরতে লেখা থাকলেও না, যোশীর মত লোকেরা বলেও না। ব্যাপারটি এখন কুলের ছাত্রছাত্রীরাও জানে।

অথচ মুরলীমোহন যোশী কোনো নিরক্ষর বা অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি নন। তিনি পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট পেয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও করেছেন। প্রযুক্তি শিবসের ঐ অনুষ্ঠানে শ্রী যোশী আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন। এটি শুক হয়েছিল গণেশ কন্দা দিয়ে আর শেষ হয়েছিল সংকুত শেখার মাস্টারমিডিয়া সিডি-র উন্মোচনে। গণেশ নামক কবিত্ত একটি তজাকবিত্ত দেবতার কন্দা করে যে বাস্তবে কোনো কিছুই ঘটে না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ বা মানবসম্পদের কোনো ধরনের উন্নয়নও ঘটে না — এ ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ নেই। তবু পদার্থবিজ্ঞানের এক ডক্টরেট মন্ত্রী বিজ্ঞানের সমস্ত পদ্ধতিকে নস্যাত্ত্ব করে, পরিপূর্ণভাবে অবিজ্ঞানের চাব করা শুরু করেছেন। সামান্যতম লজ্জা, ঘিষা বা সংকোচের কোনো কাঙ্গাইও এই পদার্থবিজ্ঞানী (!)-র মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি।

এই অসংকোচ নির্লজ্জতার আরেক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্যোতিষবিদ্যার বি এস সি ও এম এস সি পাঠ্যক্রম চালু করার ব্যাপারে শ্রী যোশীর উদ্যোগের মধ্যেও। শোনা যাচ্ছিল কিছুদিন থেকেই। অবশেষে এ বছরের ৩০ ও ৩১শে মার্চ ভারতের প্রায় সব বড় বড় সংবাদপত্রেই এ ব্যাপারে শ্রী যোশীর সুদৃঢ় ইচ্ছার কথা প্রকাশিত হয়। সেপের ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় নাকি জ্যোতিষবিদ্যার উপর এ ধরনের পাঠ্যক্রম চালানোর জন্য আগ্রহী হয়েছে বলেও শ্রী যোশী জানিয়েছিলেন।

সেপের মানুষকে অবিজ্ঞানের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার জন্য শ্রী যোশীসের চক্রান্তের এ আরেক বীভৎস রূপ। জ্যোতিষবিদ্যা মূল যে ধারণার উপর ভিত্তি করে বিকশিত

হয়েছিল — মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্র মানুষের সমগ্র জীবন তথা ভাবিতবা নির্ধারণ করে বা তার আভাস দেয়, — এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফলস্বরূপ জ্যোতিষবিদ্যার সবটুকুই ঠাঁধি। যমী বিবেকানন্দের মত যে ব্যক্তিকে শ্রী যোশী-রা শ্রদ্ধা করেন এবং সুযোগমত ব্যবহার করেন, তিনিও জ্যোতিষের উপর আত্মকে সঠিকভাবেই হিন্দুদের অত্যন্ত কৃতিকারক কুসংস্কারের অন্যতম হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। শ্রী যোশী ও তাঁর হিন্দুধর্মী সঙ্গসাধার এই কুসংস্কারকে 'বিজ্ঞান' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন জ্যোতিষবিদ্যার ওপর সরাসরি বি এস সি-এম এস সি পড়ানোর সুপারিশ করে। মানবসম্পদ উন্নয়ন তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী শ্রী যোশীর অধীনস্থ ইউনিভার্সিটি মন্ত্রীর কমিশন এই প্রস্তাবই করেছে। মার্চ মাসে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পাঠানো সার্কুলারে ইউ জি সি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'ভারতে বৈদিক জ্যোতিষের চর্চাকে শক্তিশালী করার জরুরি প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সমাজে ব্যাপকভাবে পৌঁছে দেওয়ার এবং এমনকি এই গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানকে সারা বিশ্বে রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টি করারও।' ইউ জি সি-র পঠানো 'গাইডলাইনস ফর সেটিং আপ ডিপার্টমেন্টস অব ডেনিক অ্যাস্ট্রোলজি ইন ইউনিভার্সিটিজ'-এ আরো বলা হয়েছে—

'এটি একটি সাধারণ ঘটনা যে, ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জ্ঞানার জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি অধ্যয়ন করেও সেগুলি অন্যভাবেই ঘটে যায় এবং জীবনে দৃষ্টান্ত, উৎসেপ ও হতাশার জন্ম দেয়। বৈদিক জ্যোতিষ কাল (time) নিয়ে কাজ করে, তাই একনো অসেনা অজানা ঘটনাকে দেখতে ও জানতে এটি সাহায্য করতে পারে।'

'বৈদিক জ্যোতিষ শুধু আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত ও সনাতন জ্ঞানের প্রধান বিষয়গুলির অন্যতম নয়, এটি কালের মানদণ্ডে মানবজীবনের ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলীকে জানতেও সাহায্য করে।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারত সরকারের এডুকেশন সেক্রেটারি শ্রী মহারাজ কৃষ্ণ কীও (Kaw) বলেছেন, 'ভবিষ্যৎবলী করার ব্যাপারটা জ্যোতিষবিদ্যার একটি ব্যবহার মাত্র। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বকে বোঝার চেষ্টা করা। জ্যোতিষ আপনার সবল দিক ও দুর্বল দিক সম্পর্কে ও ব্রাহ্মিবহাল করার চেষ্টা করে এবং চরিত্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি জাগায়।'

আর এসব কারণে ইউ জি সি-র পক্ষ থেকে আগ্রহী বিশ্ববিদ্যালয়কে লাইসেন্স, অবজার্ভেটরি, কমপিউটার কেনা ইত্যাদি খরচ ১৪ লক্ষ টাকা করে প্রাথমিকভাবে দেওয়া হবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী মুরলীমোহনর যোশীর নেতৃত্বে এইভাবে দেশ জুড়ে এ বছরের

জুলাই মাস থেকে শুরু হতে চলেছে 'জ্যোতিষ বিজ্ঞানের' বি এস সি, এম এস সি পাঠ্যক্রম। এতদিন মানুষের কামরাজ বিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতিষের উপর ভিত্তিমা ও কামরাজকে কোর্সে ঢালাতো, এবার শুরু হবে সরকারি উদ্যোগে তার দেশব্যাপী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা।

কথ বিজ্ঞানীই শ্রী যোশীর এই উদ্যোগের প্রতিবাদ করেছেন ও করছেন। অবশ্য বাসালোরের জওহরলাল নেহরু সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড সায়েন্টিফিক রিসার্চের ডঃ কে এন গনেশাইয়া যেমন বলেছেন 'দীর্ঘদিন যে জ্ঞানের চর্চার সুযোগ ছাত্রদের ছিল না এইবার তারা তা পাবে, তেমনই বিরল দু'একজন 'বিজ্ঞানী' ইউ জি সি-র জ্যোতিষবিদ্যা পড়ানোর পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন, — তা যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন। তবে আশার কথা পশ্চিমবঙ্গের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈদিক জ্যোতিষ (জ্যোতির্বিজ্ঞান) ও পৌরাহিত্য (কর্ককণ্ড) পড়ানোর জন্য ইউ জি সি-র প্রণয়নের বিরুদ্ধে এককট্টা, কিন্তু ইউ জি সি-র কুনজের পড়ার (ব্র্যাকলিমেটেড ইওয়ার) ভয়ে সরব হতে পারছেন না (দি স্টেটসম্যান; ২৪শ মে, ২০০১)।

পদার্থবিদ্যার ডক্টরেট অধ্যাপক মুরলীমোহনর যোশী আচ্ছ হিন্দুধর্মীদের অন্যতম মুখপাত্র। আসলে ভারতের বর্তমান হিন্দু মৌলবাদী পন্থিত শ্রী যোশী-র মত একজন 'বিজ্ঞানী' কে সূচনুভাবে দেশে অবজ্ঞানের চাব কড়ার কাজে লাগালে— পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টরেট খনন বলছেন যে জ্যোতিষবিদ্যার সাহায্যে অসেনা অজানা ঘটনাবলীকে জানা যেতে পারে, অর্থাৎ ভাগ্য জ্ঞান যাবে, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে এ জাতীয় কুসংস্কার আরো শক্তিশালী হতে বাধ্য; সম্ভব বয়স্কনও মোদুল্যমান অবস্থার পড়বেন। জ্যোতিষবিদ্যার মৌলিক মিথ্যাটি যদি মানুষের মধ্যে আরো শক্তিশালী করা যায় তবে তা সামগ্রিক অবজ্ঞানকে মানসিকতাকেই সূদূর করবে। এই মানসিকতা থাকলেই বয় মানুষকে কর্মজ্ঞ করে তোলা যায়, তাবের দিয়ে বারমি মসজিদ ভাঙ্গিয়ে মকে দাঁড়িয়ে উল্লাস করা যায়, উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দেওয়া যায়, সমস্ত মানবিক ঔদার্য ও সহনশীলতাকে বিনষ্ট করে ভিন্ন ধর্মের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি করা যায় এবং এইভাবে সম্ভব হয় ধর্মকে ব্যবহার করে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা দখল করা।

জ্যোতিষবিদ্যার মত একটি অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়ে ও কথার মারপাতা আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মূল লক্ষ্য আসলে এটিই।

সত্যি কথা বলতে কি বৈদিক সময়েও এই জ্যোতিষবিদ্যা বা অ্যাস্ট্রোলজি প্রচলিত ছিল না। ছিল তৎকালীন কিছু মানুষের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি অনুশঙ্কিৎসা বার অন্যতম ফলশ্রুতি

জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা এবং যার পুনর্মুদ্রায়ন ও গবেষণার স্বার্থে সাম্প্রতিক সময়েও সেতুলি সম্পর্কে তথাকথিত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন এবং অবৈজ্ঞানিক অংশগুলিকে মোহমুক্ত ও বিধাবীনভাবে অবৈজ্ঞানিক হিসেবেই ঘোষণা করা।

কিন্তু এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে ঈড়িয়ে শ্রী যোশীর মত সামাজিক অপশক্তিগুলি এই ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানবিরোধী প্রক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। এর আরেকটি দিক হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্যোতিষবিদ্যার মত পুরোহিততন্ত্র বা পৌরোহিত্য পদ্ধতিও পড়ানোর প্রস্তাব। অবশ্যই পেশার 'মহৎ' উদ্দেশ্য হচ্ছে পূজা, স্বস্ত্যান, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির মত হিন্দুদের যে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্ম ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সম্পন্ন করেন ঐ সব অনুষ্ঠান যাতে সঠিক পাত্রবিধি মেনে হয়। ধর্মীয় কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠা করার এ আরেক নির্লজ্জ বাহ্যমৈত্রিক প্রদান।

হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বাড়াতে পৌরোহিত্য পড়ানো বা ইসলামের মাহাত্ম্য বাড়াতে মাদ্রাসা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামি শিক্ষা — সবাব ক্ষেত্রেই এটি প্রয়োজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানে পৌরোহিত্য পড়ানোর অপচেষ্টাটি একই সঙ্গে মানবতাবিরোধীও বটে, কারণ তা হিন্দুধর্মের অস্বামী অংশ চতুর্দশ তথা ঋতপাত প্রত্যেকেও অজ্ঞানের দিনে স্বীকৃতি দিচ্ছে। যদি অজ্ঞানত্বের পৌরোহিত্য পাঠক্রম পড়ানো হয়, তাহলেও পুরোহিত তন্ত্র ও ব্রাহ্মণতন্ত্রের মূল ভিত্তিটি কিন্তু শুধু সুবক্ষিতই রাখা হয় না, তাকে আরো গ্রহণযোগ্য করা হয়। আমেরিকায় বা আরো কিছু দেশেও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় চার্ট বা এই ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। এগুলিও অর্থহীন, অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু ভারতে যেভাবে সরকারিভাবে উচ্চশিক্ষার অংশ হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে জ্যোতিষ ও পৌরোহিত্য পড়ানোর কর্মকাণ্ড শুরু হতে চলেছে তা ধর্মীয় ব্যক্তিদের সচেতন অপকীর্তি ছাড়া কিছু নয়।

পাশাপাশি সংস্কৃতভাষাকে বিদ্যালয়ে ছাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবশ্যপাঠ্য একটি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করারও প্রস্তাব রেখেছেন শ্রী মুরলীমোহনর যোশী ও তার অনুগত শিক্ষাপরিচালন সংস্থা। সংস্কৃতের উপর এমন অস্বাভাবিক জোর দেওয়ার পেছনে হিন্দুধর্মপ্রান সম্পর্কে সেলের মনুষ্যকে 'শিক্ষিত' করে তোলায় হিন্দুধর্মবাসী অপচেষ্টার ছায়াই লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে সাম্প্রতিক প্রচলিত ভাষার সম্যক বিকাশ ও প্রসারের উপর আরো গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে তাদের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়ে, সংস্কৃতের মত একটি প্রাচীন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, অপ্রচলিত ভাষার চর্চাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে তাদের গুরুত্ব নেওয়া বাস্তবসম্মত ও জনস্বার্থবাহী

আসেই নয়। সংস্কৃতের উপর কিছুজন গবেষণা করতে পারেন, আগ্রহী জন তা শিখতে পারেন, কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে বিদ্যালয়ে তা অবশ্যপাঠ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ছাত্রছাত্রীদের উপর অনাবশ্যক একটি বোকা মাত্র। সংস্কৃতকে তার প্রাণা ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়েও বলা যায়, মুরলীমোহনহরের মত ব্যক্তিদের দ্বারা হঠাৎ তাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসের মধ্যে নিছক ভাষাতাত্ত্বিক নয়, অন্য গুঢ় দ্বন্দ্বই আছে — যা হিন্দুত্বকে প্রতিষ্ঠা করা, এবং ঐতিহ্যের নাম করে দেশবাসীর চিন্তাভাবনাকে শিথিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ যেন অতি বৃদ্ধা প্রলিভামহীকে সম্মান দেওয়ার নাম করে তার শিক্ষা-রুচি-মত-নোলক-পোশাক-আসাক ও ভাবনা-চিন্তাকে এখনকার দিনেও অনুসরণ করার মানসিকতা।

'পদার্থবিজ্ঞানী' অধ্যাপক মুরলীমোহনর যোশী ব্যক্তিগতভাবে আরো নানা রাজনৈতিক নেতার মত ওপাশ্রয়িত নানা বাবাজি গুরুজি অবতারের ভক্ত। গত ৬ই এপ্রিলের দি টেলিগ্রাফে একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল যাতে সেসা যাচ্ছে মাতা অমৃতনন্দময়ী নামে এক মাতাজি ঝালার উপর ঈড়িয়ে আছেন এবং মুরলীমোহনর যোশী ভক্তি ভরে তাঁর পা ধুয়ে দিচ্ছেন। পদার্থবিজ্ঞানে কোণাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার কথা বলা হয় নি, অলীক ঈশ্বর বিশ্বাসের মাহাত্ম্যও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। তবু এই মিথ্যা বিশ্বাসের ফেরিওয়ালার এবং সরল বিশ্বাসী অজ্ঞ মানুষের প্রভা অর্জন করা এই সব বাবাজি-মাতাজির প্রতি যদি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রী নিজে 'পদার্থবিদ' হতোও এমন উদ্ভট প্রভা প্রকাশ করেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই অন্য বহুজনই আরো বেশি করে ঐ ধরনের কায়িকপ্রম বিমুখ, ভক্তের মাথায় হাত বুলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা, আধ্যাত্মিকতার ফেরিওয়ালাদের শিকার হতে থাকবেন। □

ইউ. জি. সি, ইউ জি. সি
হাত দেখায় ডিগ্রি দেয়
ইউ. জি. সি, ইউ. জি. সি
গাট-কাটার দীক্ষা দেয়।
বুধ বুলি ইউ. জি. সি
দেশজোড়া গণংকার
পাশ-করা ঠকবাজি
বা: বা: ভাই চমৎকার।

অমিতাভ ভট্টাচার্য

লাঠি বনাম স্টেথো

শ্যামল চক্রবর্তী

[পেশাগত]

ডাক্তারদের ওপর সাধারণ মানুষের এত যে ক্ষোভ, তার পেছনে ডাক্তারবাবুদের অবদানও কম নয়! ডাক্তারি পেশায় অনৈতিক ও অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতা আঙ্গকের নয়। ডাক্তারের সংখ্যা বাড়তে থাকায়, শহরকালে যা প্রায় 'চিকিৎসক-বিদ্বেষেরগের তরে পৌছে' গেছে, ডাক্তারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা গত দু'তিন দশক ধরে এমনভাবেই বেশি। এই প্রতিযোগিতা হতে পারতো দক্ষতার, হতে পারতো পেশাগত মানবিকতার। হয় নি। এক ডাক্তার অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থাপন দেখে নাক ঝাঁকান, এক ডাক্তারের নাম শুনেই অন্য ডাক্তার তেড়ে ওঠেন। একজন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থেকেও ক'দিন ছর না কমলে রোগী ছুটছেন অন্য ডাক্তারের কাছে। দ্বিতীয় ডাক্তারবাবু প্রথমেই জ্ঞানিয়ে দিয়েছেন, 'আগের চিকিৎসাটা ভুল'। 'আগে যাকে দেখিয়েছেন তিনি এটাও ধরতে পারলেন না!' বা 'এ তো একেবারে শেষ করে নিয়ে এসেছেন'?—এসব জো আছেই। আছে 'কেন যে এরা ডাক্তারি করে'। 'কিন্তু জানে না' বা 'পাশ করা ডাক্তার তো'। এরকম মন্তব্য রোগী বা তার বাড়ির লোককে আগের চিকিৎসকের ওপর গায়ের কাল মেটানোর প্রাথমিক জমিটুকু তৈরি করে দেয়। এ ব্যাপারে শুণু ব্রাইডেট শ্রাকটিনমারকা নন, সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা কম যান না। হাসপাতাল বা চেম্বারে রোগী নিয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের এরকম চরম বিস্তৃতিকর মন্তব্যের পিছনে কারণ থাকে অনেক। অনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে শুরু করে পেশাগত হতাশা, দায় এড়ানো থেকে শুরু করে পরচর্চার অকারণ অভ্যাস। কারণ ঘাই হোক, এক ডাক্তারবাবু সম্পর্কে অন্য ডাক্তারবাবুর এরকম মন্তব্য কেউ তোলে না। রোগী ব্যাধি হলে বা মারা গেলে ঐ মন্তব্যকে সূফে নিয়ে সুপেনেরা নেমে পড়ে স্বস্তির। ডাক্তার হয় ডাক্তারের বাড়ি, চেম্বার, গাড়ি। মাগুনীর হাতে প্রহৃত হয়ে ডাক্তারবাবুকে করুণ মুখে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ডাক্তারদের এরকম ব্যবহার 'ডাক্তারি-নৈতিকতা' বা 'মেডিক্যাল এথিক্স' এর মধ্যে পড়ে না। ডজন ডজন এরকম ঘটনা বর্তমান লেখকের চিকিৎসক জীবনের স্মৃতিতে ছাপ ফেলে গেছে বারবার। ডাক্তারদের সংগঠনগুলো ডাক্তারদের

এরকম অনৈতিকতা আটকাতে কার্যকরী কোনও সূত্র বার করতে পারি হয়নি। একেবারে হালে বেশ জুড়ে ডাক্তারদের মধ্যে এই বিপজ্জনক প্রকণ্ডা বাড়তে থাকায় নড়েচড়ে বসেছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল। এই স্বশাসিত সংস্থা ডাক্তারবাবুদের এরকম বিপজ্জনক মন্তব্য সম্পর্কে ফতোয়া জারি করতে চলেছে। এতে কাজ কঠিনকূ হবে এখনই বলা কঠিন। তবে মেডিক্যাল কাউন্সিল এ ব্যাপারে কঠোর হবার সাহস দেখাতে পারলে ডাক্তার নিগ্রহের মারাত্মক ঘটনাগুলো কমবে। কমবে এরকম মন্তব্য থেকে রোগীর বা তাঁর বাড়ির লোকদের বিব্রাতি অথবা চিকিৎসা বিব্রাটের ক্রমবর্ধমান প্রকণ্ডা।

এতকালের 'ডগবান' ডাক্তারকে সিংহাসন থেকে মাটিতে পেড়ে ফেলার সামান্যতম সুযোগের সম্ভাবনার ব্যতালি মধ্যবর্তির মনে একধরনের 'প্রতিক্রিয়াজনিত সুখবোধ' (reactive pleasure) এনে দেয়। অণৈতিকভাবে যত কোণঠাসা হচ্ছে মধ্যবর্তি, যত প্রকট হচ্ছে তার পীড়নের হাড়তলো, 'সফল' মানুষকে হেনস্বয় তত দক্ষ হচ্ছে একশ্রেণীর মানুষ। ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের সুখ, সুন্দর দিনগুলো হারিয়ে গেছে কবে। পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সার্বিক দুরবস্থা চাকতে এ ব্যাঙের এককালের এক পক্ষপেপ স্বাস্থ্যমন্ত্রী 'ডাক্তারদের মত সুবিধাভোগী শ্রেণী'র বিরুদ্ধে জনমতকে ঘুরিয়ে দিতে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ঠাকফেকর ঢেকে রাখার সম্ভা রাজনীতি করেছেন। আঙ্গকের অবিরত ডাক্তার নিগ্রহের অবশ্যই সেটা অন্যতম একটা কারণ।

সুখের কথা, পরবর্তী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমল থেকে এই প্রকণ্ডা কমেছে। হাসপাতালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী যে লোকগুলো, যে সমাজবিরোধীরা হাসপাতালে ডাক্তার থেকে ডাক্তার-পেনিনোর মুখে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার কথা বারবার বলা হলেও আঙ্গও সেরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। ব্যতবে ব্যাপারটা সহজও নয়। হাসপাতালে রোগী মারা গেলে তাতব চালার যারা, যারা হাসপাতালে 'ওয়েদেরের বোয়াল' বা 'মদের ঠেক'-এর মুখে আর দ্বারা হাসপাতালে গ্রুপ অর্থের বিনিময়ে রোগী ভর্তি করায় — এই তিন শ্রেণীর

পারম্পরিক বোকাপড়ায় খাদ নেই এটুকু। এই 'মাসাল' শ্রেণীর লোকগুলোকে পুলিশ দিয়ে সাময়িকভাবে চেকানো যায় মাত্র, চেকানো যায় না। এই চক্রান্ত ভাঙতে পারলে অস্বস্তি হাসপাতালে চিকিৎসার পরিবেশ কিছু ফিরবে, কমবে কিছু। নিগ্রহের ঘটনা কমলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলে, সরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসাবিভাগটি কমতে বাধ্য। কমতে বাধ্য রোগীর বা তার বাড়ির লোকদের হয়রানি।

এ রাস্তার মোট রোগীর আশি থেকে পঁচাত্তি শতাংশ এখনও চিকিৎসা করান সরকারি ব্যবস্থায়। স্টেথোস্কপ দিকে ধরে আসা লাঠিকে ডাই শুধু আটকে দেওয়া নয়, দরকার ভেঙে মুচড়ে দেওয়া। সিঙ্গাপুরিয়ান অপ্রোপচারের কটিলতায় রোগীর মৃত্যু হতেই পারে। গর্তবর্তীর এরকম মৃত্যু মর্মান্তিক হলেও হাজারে বা দশ হাজারে দু একটা ক্ষেত্রে এরকম পরিণতি আটকানো যায় না হাজার চেষ্টা করলেও। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অবহেলা বা গাফিলতির অভিযোগ উঠতেই পারে। এরকম অভিযোগ নিয়ে তদন্তের ব্যবস্থাও রয়েছে। তা না করে রোগী মারা যাওয়া মাত্র সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের জন্য 'সম্মান' দাওয়াই'এর ব্যবস্থায় ক্ষতি হয় সাধারণ মানুষেরই। এটুকু অবহেলা ছিল না চিকিৎসকের, রোগী মারা গেল অপ্রোপচারের বিরল এক কটিলতায়, তবু মার

বেগেন ডাক্তার এমন ঘটনার অভাব নেই। এরকম অবস্থায় প্রকৃত চিকিৎসক মনোবল হারিয়ে অপ্রোপচার-বিমুখ হয়ে সব রোগীকেই মক্কা বা জেলা হাসপাতাল থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কলকাতার বড় হাসপাতালে — এরকম বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে গত কয়েক বছরে। ডাক্তারকে 'শিকা' দিতে গিয়ে এক্ষেত্রে ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই।

সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার মোট বাজেটের দুই থেকে তিন শতাংশ দিয়ে এতবড় একটা ব্যবস্থাকে ঠিক ঠিকভাবে চালানো অসম্ভব। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কেন বাড়ি না, কেন মোট বরাদ্দের সিংহভাগ খরচ হয়ে যায় মাইনে দিতে, বাড়ি বনানিতে বা বাড়ির সংস্কার করতে — এ প্রশ্ন আজকের নয়, কলকাতার। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকে বেশ বানিকটা বাড়াতে পারলে রোগীর

ওষুধ, পঞ্চা, পরীক্ষা নিরীক্ষার চাপ সামলানো সহজ হয়, ফ্রি-বেডে ভর্তি হয়েও বাইরে থেকে গাঙ্গাওজের ওষুধ কিনতে কিনতে ডাক্তারদের মৃত্যুপাত করার অভ্যাস থেকে মুক্তি পান সাধারণ মানুষ। পঞ্চের মান ও পরিমাণে ঘটানো যায় উন্নতি। এখানে অবশ্য স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতির জটিল ব্যাপারটাকেও মাথায় রাখতে হয়। কঠিন হলেও, সমিদ্ধা থাকলে স্বাস্থ্যক্ষেত্র থেকে শুক করে শহরের বড় হাসপাতালে চুরি বন্ধ হয়তো করা যায় না, কিন্তু কমানো যায়। এটা হয়তো স্বপ্ন। তবু স্বপ্নপূরণ একেবারে অসম্ভব নয়। এতে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর মানুষের ক্ষেত্রে কমবে, কমবে হাসপাতালে বিশুদ্ধতা, চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের কাজের শাসনব্যবস্থাও ফিরবে। স্টেথোস্কপ দিকে ধরে আসার আগে লাঠিকে ভাবতে হবে দশবার।

সরকারি হাসপাতালগুলোর মলিনতা মোচনো যতটা কঠিন তার চাইতে দশগুণ কঠিন সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে মিডিয়ায় একাংশের দারিদ্রজানহীন প্রচারকে গঠনমূলক সমালোচনায় বদলে দেওয়া। অপারেশনের পর রোগীর মৃত্যু হলে খবরের কাগজের সাংবাদিকের খবরের হেডিং আগে থাকতেই ঠিক করা থাকে। 'ডাক্তারদের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু, বিকোড, ভাঙচুর ...' ইত্যাদি। এরকম ঘটনার পর এরকম খবরের ডুমিকা একটাই, প্রবোচনা সৃষ্টির। কাগজের সাংবাদিক রোগীর মৃত্যুর কারণ

জেনে যান অবলীলায়! এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বক্তব্য শোনার রেওয়াজ প্রায় নেই, বক্তব্য শুনলেও তা খবরের শেখদিকে দু'চার কথায় ছাপা হয় ওরুদুহীনভাবে। অনেকসময় ডাক্তারের বক্তব্য বদলে যায় কলমের জাদুতে!

সঙ্গীর্ণ দলীয় রাজনীতি সমাজের আর পাঁচটা পেশার মানুষের মত 'সফল' ডাক্তারদেরও দলের কড়ায় আনতে অবিরত সক্রিয়। গত দু'দশকে এই প্রবণতা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর। ডাক্তারবাবু হাই কনন, দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকলে তার সাতখুন মাগ। পাশাপাশি দলের প্রতি আনুগত্য (নাকি সমর্পণ) নিরঙ্কুশ নয়, দলীয় রাজনীতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নিজেদের বাঁচাতে চান না (বা জানেন না), এমন ডাক্তারদের 'কিঞ্চিৎ শিকা' দেবার পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বহাল।

গ্রাম, শহর, মধ্যস্থলের সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর 'ডাক্তারবাবুরা' দলীয় নেতা অথবা মোড়লসহর তৈলমর্দন করবেন, নাচবেন তাদের কথায়, চলবেন তাদের ফরমান অনুযায়ী — আজ এটা গ্রাম নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই নিয়ম মানতে চান না যাঁরা, জটিল সমীকরণে 'জনগণের কোভ' তাঁদের দিকে ঘাবতি করতে দলতন্ত্র বিশেষভাবে দক্ষ। গত দু'শতকে সরকারি ব্যবস্থায় লাহিত বা নিগৃহীত হয়েছেন যেসব ডাক্তার, তাঁরা অনেকেই দলের প্রতি নির্বোধ অথবা নিরুপায় আত্মসমর্পণ করতে চান নি। তাঁদের ভাষা 'কিরম ভাঙার' জন্য দলের হতে 'জনগণ' শাস্তি দিয়েছে এইসব ডাক্তারবাবুদের।

বেসরকারি চিকিৎসকদের ব্যাপারে দলতন্ত্রের এই খেলার ছক আরও জটিল: 'হয় এসো, নয় সামলাও।' 'আমাদের খাতায় নাম লেখাও, আমাদের 'জনস্বাস্থ্য' কর্মসূচিতে অংশ নাও। আমরাও তোমার বিশদে আপদে তোমাকে দেখব।' এখানেই শেষ নয়, আরও একটা দলের নাম করে 'ওড়িয়ে নেওয়া' নেতাদের একাংশের সঙ্গে ডাক্তারবাবুদের সুসম্পর্ক অনেক সময় সুস্থভাবে দাঁড়িয়ে থাকছে 'সিলভার-টনিক' এর জাদুর সুতোয়। সুসম্পর্ক রাখতে অপারগ বা অনিচ্ছুক যারা মাঝে মধ্যে মার তো তাদের পিঠে পড়বেই। দলতন্ত্র 'তুট' থাকলে কোনও ঘটনায় ডাক্তারবাবুর ওপর ক্ষুব্ধ মানুষ চাপ করে যায় কয়েক ঘণ্টায়। দল 'কুট' হলে নীরবতার বদলে কোভ খেয়ে আসে লাঠি হয়ে, কালশিটে পড়ে ডাক্তারবাবুর গালে।

আজকের অবস্থায়, আজকের প্রেক্ষিতে, শিক্ষক অধ্যাপকদের মত ডাক্তারদের ওপর দলের কর্তৃত্ব কায়দে করার এই প্রক্রিয়া থামিয়ে দেওয়া অসম্ভব। একদমলাকে বেগ দিতে অন্যদলের কাছে 'বিক্রি' হয়ে যাবেন ডাক্তারবাবুরা, এমনকি তাঁদের সংগঠনও। স্টেথোর দিকে লাঠির খেয়ে আসার 'রাজনৈতিক' সমীকরণও দিনদিন আরও জটিল হবে। এই সমস্যাকে উদ্ভোদিত করে দেবার কোনও 'জাদুমন্ত্র' জানা নেই।

মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারলে, মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গী হতে পারলে, মানবিকভাবে পেশার মূলমন্ত্র বলে মেনে নিলে ডাক্তার-রোগীর ভেতরকার দূরত্ব কমে। অবশ্য যে মারক 'রাজনীতি' সবকিছুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায় তার 'মোড়লগিরি' কতটা অগ্রাঘ্র্য করতে পারবেন সাধারণ মানুষ বা ডাক্তার — সম্পর্কটা নির্ভর করছে তার ওপরও। একত্রেশীর অর্ধশিখা, কুলামার চিকিৎসক নামধারীর জন্য সাধারণ মানুষ 'শত্রু' বানিয়ে ফেলছেন গ্রাম সব

ডাক্তারদের। এই বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সং, নির্ভীক, মানবিক ডাক্তারদের কপে পাঁড়তে দেখা যাচ্ছে না আজও। মুখ খুলতে চান না কেউই, চান না সরব হতে। মানবিক ডাক্তারদের এই নির্লিপ্ততা আর কতদিন? যে পেশাকে অবিরাম কালি মাখাচ্ছে একত্রেশীর মানুষের অর্ধসোপানতা, সেই পেশার মহান ঐতিহ্যকে বর্ধিয়ে রাখতে এগিয়ে আসা সরকার সং ডাক্তারবাবুদের। দুর্ভাগ্য, এমন কোনও উদ্বোধনযোগ্য চেষ্টা এখনও চোখে পড়ছে না।

শহরাকালে 'ফ্রপ-প্রাকটিশ' চালু করা যায়, যায় এক অনোর বিরুদ্ধে মন্তব্য করার প্রবণতাকে কমিয়ে আনা। তাতেও কিন্তু ডাক্তারদের একাংশের ওষুধ কোম্পানি, ল্যাবরেটরি আর নার্সিং হোমের সঙ্গে অন্তত গাঁতছড়াক আর আড়াল করা থাকে না। সাধারণ মানুষ দিন দিন এগুলো হত চানবেন সভ্যমিথ্যার মিশেলে, তত বেশি করে ঘটতে থাকবে চিকিৎসক-নিগ্রহের ঘটনা। বাজার অর্থনীতি অথবা ডাক্তার আবেগের ভাঁটাকলে হত থাকবে ওষুধের দাম, মধ্যবিত্তের নাগাল থেকে হত দূরে সরে যেতে থাকবে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা, ডাক্তারদের তত বেশি করে 'গলশত্রু' বানানো হবে। এই ব্যবস্থার এ এক অসিয়ার পঙ্কিভাঙা। আটকে নেওয়া যেত এই পরিণতিক। যদি ডাক্তারি পেশায় নৈতিকতা ফিরিয়ে আনতে, মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে একজোটে হতেন, সরব হতেন, সং মানবিকতার দীক্ষায় বিশ্বাসী ডাক্তারবাবুরা। 'পেশাদারিত্ব'র জোকার আড়ালে যাঁরা 'বাবসা' করে যাচ্ছেন সিনরাত, কানমারের মত কোণ নিয়েও ব্যবসা করতে হাত কাঁপে না যাঁদের — তাঁদের বিরুদ্ধে দায়িত্বশীল চিকিৎসকরা মুখ খুলছেন, এদের মুখোশ খুলে দিতে শুরু করছেন এমন আশা করা যায়, দেখা যায় এমন স্বপ্নও। প্রশ্ন হল, বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা প্রথম বাঁধবে কে? ১২

ডা. শ্যামল চক্রবর্তী

হাতের মুঠোয় ডায়াবেটিস ৯০

ওষু ডায়াবেটিসের রোগীদের নয়, স্বাস্থ্য সচেতন প্রত্যেক মানুষের অবশ্যগাটা।

আনন্দ পারলিয়ার্সের বই

কলেজ স্ট্রীটের সর্বত্র পাওয়া যায়

বৈদ্যনাথের তৈল দাওয়াই

রাজেশ দত্ত

আমেরিকা-ইয়োরোপের তাড়ড় তাড়ড় ডাক্তার-বিজ্ঞানীরা হেসিয়ে গেল, আর শেষেযে কি না ক্যান্সার-এর আনসার মিলল এই ডেড-সিটিতে।' পাশ থেকে মন্তব্য করলেন আমার সহযাত্রী-কম্বু। ওঁর চেহেরামুখে বিষম আর কৌতুকর বিলিক।

রোগাকর মত অফিসে যাওয়ার জন্য সাতটা বিয়াল্লিশের ডাউন বর্মান লোকালের অপেক্ষায় ট্রাটিকর্মে রীড়িয়ে থেকে দৈনিক কাগজের পাতায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। বহুটির কথায় খবরের শিরোনামটা নজরে পড়ল।

'ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কারের দাবি জানালেন কলকাতার গবেষক দল।' দেশের একদল ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক দাবি করেছেন, ক্যান্সার নিরাময়ের ওষুধ তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এই ওষুধ ক্যান্সার আক্রান্ত কোষগুলির ওপরই শুধু কাজ করে বলে, এর পর্শ প্রতিক্রিয়াও নেই। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন কলকাতারই কয়েকজন গবেষক। প্রায় এক দশক ধরে নিবিষ্ট গবেষণায় এই ওষুধ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে বলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ক্যান্সারিভেশন অফ সায়েন্স-এর ওই গবেষকরা জানিয়েছেন।

এক মধ্যবয়সী খর্বকায় হুটপুট ভ্রমলোক আমার ডান কনুইয়ের পাশ নিয়ে বিরলকেশ মাথাটি গলিয়ে আমার হাতে ধরা কাগজটা নিবিড় মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন। নিত্যযাত্রী বহুটির কথা শুনে মুখ তুলে তাকালেন হসি হেসে বললেন — 'এ আর নতুন কথা কী? ক্যান্সারের ওষুধ তো বহু আগেই এ দেশে আবিষ্কার হয়ে গেছে।' এবার আমার চমকে ওঠার পালা। অবাক হয়ে শুধোলাম— 'বলেন কী! কবে? কোথায়? কই এ ধর তো কোথাও পড়ি নি।' ভ্রমলোকের চার আনার হসি বোলো আনা হয়ে কান পর্বত ছড়িয়ে পড়ল। রহস্যঘন বরে বললেন— "আরে মশাই সব ধর কী আর নিউজ পেপারে ছাপা হয়? শহরে ডাক্তারকাবুদের কীর্তিকলাপের কথাই শুধু পেশারওয়ালারা লেখে। ওতো সব বিলিতি বিজ্ঞানের কেতাবি তত্ত্বের হাফিয়াবি কথা। কিন্তু আমাদের প্রাচীন মুনিবিসের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের কথা ক'জনই বা জানে আর ক'জনই বা বোঝে। বললে হয়তো কান্সার করবেন না, এই গ্রাম-বাংলাতেই এক ধরতরী ডাক্তর বৈদ্য

আছেন। ক্যান্সার থেকে শুক করে যাবতীয় অধি-বাধির তিনি নিদান সেন। নিদান বলতে মানুষি আর মন্ত্রপুত শিকড়-বাকড়। শয়ে শয়ে মানুষ প্রতিদিন ভিড় জমায় তাঁর কাছে। অব্যর্থ তাঁর ওষুধ। কত ক্যান্সার রোগীকে যে তিনি সুস্থ করে তুলেছেন তার হিসাব নেই। কত লেখাপড়া জানা শহরে মানুষ তাঁর কাছে রোগ সারাতে ছুটে যান। এই তো সেদিন উত্তর কলকাতার এক নানী কলেজের অধ্যাপকের কাছেও শুনলুম তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা। দু'পাতার বিজ্ঞান পড়ে তো আর এসব ঠাকুর দেবতার মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যা সেওয়া যায় না ... আসল হল বিশ্বাস ... বিশ্বাসে মিলায় বস্ত তর্কে বহদুর। কিন্তু কথায় বলে না 'গৈয়ো যোগী তিথ পায় না'। আমরা তো সব বিলিতি ওষুধের নাম মুখস্থ করে ফেলেছি। বীকুড়ার ময়রাগ্রামের বৈদ্যনাথ কবিরাজের দেবওষুধের খবর শহরের কটা লোক শুনেছে?... ... আগে পাশে কৌতুহলী নিত্যযাত্রীদের ভিড় করতে দেখে ভ্রমলোক বলেই চলেছিলেন। ট্রাটিকর্মে ট্রেন টুকে পড়তে সভাক্স হল। বগলের তলায় পোর্টফোলিওটাকে চেপে ধরে বৈটখাটো মানুষটি শশকগতিতে ভিড় ঠেলে সৌড়লেন।

ট্রেনে উঠে মনে পড়ল বীকুড়ার ময়রাগ্রামের বৈদ্যনাথ কবিরাজের কথা শুনেছিলাম বছর তিনেক আগে। বীকুড়া থেকে প্রকাশিত 'আলোর দিশারী' নামে একটা বিজ্ঞান পত্রিকায়। সম্ভার নিউজট্রাটে পেলার প্রেসে ছাপানো কীণ কলেবরের এই পত্রিকাটার পাতায় পাতায় বিজ্ঞানকর্মীদের গভীর মমতা, অবিচল নিষ্ঠা ও অদম্য প্রত্যয়। ময়রা গ্রামের ডাক্তর বৈদ্যর সৈব চিকিৎসার সত্যানুসন্ধানের খবর পড়েছিলাম এই 'আলোর দিশারী'-তেই।

বৈদ্যনাথ হেমব্রম। বদিনাথ কোবরেন্ন নামেই বেশি পরিচিত। বীকুড়ার ভালডারো থানার অন্তর্গত ময়রা গ্রামে বদিনাথের বসত ভিটে। গৌর-নিতাই-এর হথাদেশ পেয়ে বছর বারো আগে শুক করেন এই সৈব চিকিৎসা। এই ভ্রমপট বৈদ্যনাথকে চেনেন না এমন লোক মেলা দায়। সমগ্রই পাঁচদিন চিকিৎসা করেন তিনি। দু-তিন দিন আগে নাম না লেবালে তাঁর 'দর্শন' মেলে না। হীপানি, গ্যাষ্ট্রিক আলসার থেকে ক্যান্সার,

ব্লাড ক্যান্সার— যে কোনও রোগ সারিয়ে দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর ভিটায় সপ্তাহের প্রতিদিনই ভিড় উপড়ে পড়ে। দূরদূরান্ত থেকে ডক্টরা আসেন রোগমুক্তির আশায়। কবিরাজের এমন আশ্চর্য সৈব ওষুধের কথা রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামের চৌহদ্দি পেরিয়ে বাঁকুড়ার লালমাটির প্রতিটি জনপদের মানুষের মুখে মুখে।

খবর এসে পৌঁছেছিল ‘আলোর বিন্দু’ পত্রিকা দপ্তরেও। ‘৯৭-এর ২৫ অক্টোবর। কবিরাজের সৈব ওষুধের ক্ষমতা কতদূর তা একবার হাতে-কলমে যাচাই করতে পাঁচজন বিজ্ঞানকর্মী রওনা হলেন ময়রা গ্রামের উদ্দেশ্যে। বৈদ্যনাথের ডেরায় যখন ওঁরা এসে পৌঁছলেন তখন বেলা প্রায় বারোটো।

পূর্বপরিকল্পনা মতো বিবড়দার বিজ্ঞানকর্মী নারান ভূই রোগী সেক্রে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে অভিভাবক সেক্রে চললেন

ঘোষ। উনিই সাংবাদিক দুজনকে বৌদ্ধধর্ম দিয়ে নিয়ে এসেছেন। ঠিক হল, নারানরা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে সেবালিসরা হাকির হবেন।

বৈদ্যনাথ কবিরাজের বাড়িতে ঢোকায় মুখে সেবা গেল, একটি মাটির বাড়ির দাওয়ায় ছোট ছোট পলিথিনের প্যাকেটে সরষের তেল বিক্রি হচ্ছে। প্যাকেট প্রতি দাম এক টাকা। এই তেল দিয়েই ‘তেল পড়া’ করে বৈদ্যনাথ রোগের নিদান সেন। বাড়ির ভিতরে ঢুকে নারানরা দেখলেন শতাধিক দর্শনার্থী ভিড় করে রয়েছে। জানা গেল, এইসব রোগীদের মধ্যে যাঁরা আগাম নাম লিখিয়ে রেখেছেন, তাঁরাই আজ শুধু সেবাতে পারবেন। এই বিশাল ভিড় এড়িয়ে কবিরাজের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব বুঝে নারানরা গ্রামাদ গনলেন। বাকি তিন সঙ্গী ভন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই।



বৈদ্যনাথ হেমব্রহ্মের (খালি পায়ে) সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন সেবালিস গোহাামী ও সনাতন মণ্ডল।

যখন মওল। দুজনেই পরিচয় গোপন রেখে বাঁকুড়ার কাটজুড়িডাসার বাসিন্দা হয়ে গেলেন। পদার্থী পাশেই হলেন ‘দুলে’। নারান দুলে মাসখানেক যাবৎ কথা কলতে পারছেন না। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও গলার খর ফেরে নি। তাই রোগ সারাতে কবিরাজের সৈব ওষুধের শরণাপন্ন হয়েছেন।

ওঁদের পেছনে সাংবাদিক পরিচয়ে চললেন সেবালিস গোহাামী ও সনাতন মণ্ডল। দুজনেই নামধাম বদলিয়ে পরিচয় লিলেন সেবালিস মাইতি ও সনাতন চেল বলে। এসেছেন ‘হিন্দু জাগরণ’ পত্রিকা থেকে। ওঁদের সঙ্গী হলেন নন্দদুলাল

একটু বাসে সাংবাদিক সেক্রে সেবালিসরা উপস্থিত হলে নারান সুযোগ বুঝে ওঁদের আড়ালে ডেকে নিয়ে ওঁকে দেখার জন্য বৈদ্যনাথকে একটু সুপারিশ করতে বলে এলেন। বেলা যত বাড়ছে ভক্তদের আনাগোনা ততই বাড়ছে। ঘড়ির কাঁটা যখন সাড়ে বারোটোর ঘর ছুঁই ছুঁই করছে তখন বৈদ্যনাথ ঘর থেকে বেরোলেন। খবরের কাগজের লোক এসেছে ওঁনে রোগী দেখতে দেখতেই বেরিয়ে এসেছেন। সোহারা চোহারা। মাঝারি উচ্চতা। বয়সের ছাপ থাকলেও শরীরে বাঁধুনি এখনও বেশ শক্তপোক্ত। মাথার চুলে ও পুঁকুই গোঁফে পাক ধরেছে। খালি

গা। হাঁটুর ওপর সাদা সূতি কোমরে লুমির মত করে জড়ানো। বৈদ্যনাথ তাঁর 'সমাজসেবা'র খবর সংবাদপত্রে ছাপা হবে জেনে সানন্দে সাক্ষাৎকার দিতে ব্যক্তি হয়ে গেলেন। আলাপ পরিচয় পর্ব শেষ হলে সেবাশিস ও সনাতন টেন বেকার্ডার চাপু করে কথা বলা শুরু করলেন। তাঁদের কাছে বদ্যিনাথ দাবি করলেন, 'ভগবান যে সব রোগ সৃষ্টি করেছে সে সবই আমি সরাতে পারি।' গাণ্ডিক আলসার, হাঁপানি তাঁর মতো কোনও রোগই নয়। আসল রোগ হল কালসার। 'হাজার হাজার ব্রাদ ক্যালারের রোগী আমি সারিয়েছি',— বললেন বদ্যিনাথ। এইডস? এইডস রোগী এখনও পান নি। তবে গেলে সরাতে পারবেন বলে আশা করছেন। মেনিনজাইটিস, এনকেফেলাইটিস রোগীও তাঁর দৈব চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। তিনি ভদ্রমতে চিকিৎসা করেন। সব রোগীর জন্যই শুধু হল গায়ের শিকড়-ঝাড়। শুধু ফিটের রোগীদের তিনি মানুষি ধারণ করতে সেন।

'কীভাবে রোগ নির্ণয় করেন?' জানতে চাওয়ায় একটা ডাক্তারি স্টেথোস্কোপ বের করে দেখালেন। জটিল বর্পন ডাক্তারের কাছ থেকে সেটি পেয়েছেন। তবে স্টেথোস্কোপের চেয়েও যে বস্তুটি তাঁর কাছে হাজার গুণ দামি সেটি হল একটা ছোট পিতলের বাটির মত ভিনিস। বললেন, এটা আমার টেলিস্কোপ, যার ভেতর কী আছে কড়কে দেখানো যাবে না। মাটির নিচে রোগী থাকলেও এই মোক্কা 'যন্ত্র' দিয়ে তিনি তার সব কিছু জানতে পারেন। এক হাতে 'ডাক্তারদের টেলিস্কোপ' অন্যহাতে তাঁর আবিষ্কৃত 'টেলিস্কোপ' (সুকুমার রায়ের 'ফুটস্কোপ'-এর আধুনিকতম সংস্করণ) ধরা ছবি ক্যামেরাবাধি করা হল।

বদ্যিনাথবাবুর দশা ও ভাইপো বারান্দায় বসে বাতা দেখে নাম ধরে ধরে রোগীদের ডাকছিলেন। রোগীর কাছে তাঁর অসুখের ব্যাঘাত জেনে নিয়ে বদ্যিনাথ মন্ত্র পড়ে তাঁকে নিয়ে বারান্দায় পালন একটা ঘরে ঢুকে পড়ছিলেন। ঘরের ভেতরেই তিনি একান্তে রোগীকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা মানে শরীরের যে জায়গায় নীড়া, সে জায়গাগুলো হাত দিয়ে টিপে টুপে দেখেন।

সনাতন প্রহ্ম করলেন, 'রোগীকে একলা আলাদা ঘরে নিয়ে যান কেন?' বদ্যিনাথ চটজলদি জবাব দিলেন, 'মেয়ে রোগীদের সরকার হলে উলঙ্গ করে দেখতে হয়, বেটা বহিরে সজাব নয়।' রোগীশীদের পরীক্ষা করার অভ্যুহাতে বৈদ্যনাথ তাঁদের সর্বনাশ করেন কি না তা কে বলতে পারে? হলেও অপার 'অলৌকিক' ক্ষমতাব্যর এই তাত্ত্বিকের বিরুদ্ধে যুখ খোলার সাহস কে জোগাবে গরিব ঘরের মা-বোনদের?

কোড়ালপুরের গৌর কলোনি থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর বৃদ্ধা মায়ের চিকিৎসার জন্য। বছর তিনেক হল তাঁর মা প্রচণ্ড কশিহতে ভুগছেন। ভদ্রলোক বদ্যিনাথের হাতে প্যাঁকেট ভর্তি সরবের তেল দিলেন। রোগীদের আনা তেল থেকে এক কৌটী তেল একটা পাতায় মাখিয়ে পাতটা মুড়ে মন্ত্র পড়ে তিনি রোগের নিদান সেন। পাতায় তেলের ছাপ দেখে রোগের উপসর্গ বুঝে রোগীর সমস্যার সাথে মিলিয়ে এমনভাবে বলতে থাকেন যেন মনে হয় পাতায় রোগের নিদান সব ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোকের মায়ের নাম জেনে নিয়ে বদ্যিনাথ পাতায় তেলের মাণ কেটে মন্ত্র পড়ে বললেন, 'বুকের ভিতরে অনেক কথ জামে আছে।' (ভদ্রলোকের মা প্রখন কোড়ালপুরের বাড়িতে।)

এক রোগিনী প্রস্রাব জনিত সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন। একটা ভাতা ইঁড়ির টুকরোয় তাঁর প্রস্রাব নিয়ে বৈদ্যনাথ তার মধ্য দু'কৌটী সরবের তেল ফেলে দিলেন। তারপর গম্বীর মুখে কিছুক্ষণ প্রস্রাবের দিকে গম্বীর মনোনিবেশপশি চেয়ে থেকে বলে উঠলেন— 'এর কিডনিগুলো সেরে গেছে কিন্তু এখন ডিম্বাশয়ে যা।' বৈদ্যনাথের আন্যাত্মিকের জ্ঞান যে কত প্রখর তা বোকা গেল যখন তিনি রোগিনীর কিডনিগুলো তাঁর দুই বগলের কাছে হাত নিয়ে দেখাতে লাগলেন।

সাংবাদিক সের অনুরোধে বৈদ্যনাথ নারানকে দেখতে সম্মত হলেন। ডাক পড়তেই বর্পন নারানকে নিয়ে সটান তাঁর কাছে হাজির হলেন। অন্য রোগীদের মতই পাতায় তেলপড়া করে মন্ত্র পড়ে পাতা দেখে কলেন, 'দেখ এর গলায় বা, যাকে বলে 'গলাগণ্ড' এটা ক্যানসার হয়ে যেতে পারে, যা বেড়ে গেলে ডেড হয়ে যেতে পারে।' তবে তিনি ভরসা দিলেন মাস দু'আড়াই চিকিৎসা করলে সম্পূর্ণ সেরে যাবে।

বদ্যিনাথ হেমরমের প্যাঁদের একটি কপি

কবিরাজ শ্রী বৈদ্যনাথ হেমরম

মররা ঠাকুর বাড়ী, পোঃ দৌলী (বাঁড়ুড়া)

রবিবার ও বুধ্পতিবার বন্ধ থাকে

১। হিজো পতা ২। গোলমোরিচ টি ৩। আদ্রাশি শিকড় ৪। কাঁচা হলুদ ৫। নিমপাতা ৬। টুমুর পাতা ৭। অনন্ত হলুদ ৮। পঞ্চমুখী জবামূল টি ৯। পিণুল টি ১০। তুড়ি কপূর চটসা ১১। আতব চাল—২৫ গ্রাম ১২। সিঁকড়া—১টি

৬৩ টি বড়ি ২১ দিনের, সকালে—দুপুরে—সন্ধ্যায়

ও বার করে খালি পেটে

নিষেধ :- পাতাভাত, উঁটুল টক, শর্করা লাফ, চিড়ি মাছ।

গলায় যন্ত্রণায় নারানের মুখ নিয়ে শুধু 'উ' 'উ' আওয়াজ বেরোতে লাগল। কষ্ট লাগবের জন্য কবিরাজ তাঁকে এক পুটিশ শেখড়-বাড় দিলেন। পরম ভক্তিতে নারান সেই 'সৈব শুধু' কপাল টেকালেন। 'সাক্ষরিকদের সুপারিশের জোরে প্রণামীতে 'ডিসকন্টিউ'ও হিলে গেল। 'ডিক্টি'ও 'ওষুধ' ব্যবদ দশ টাকার বদলে মাত্র একটাকা নিলেন। সেবাশিস ও সনাতন তাঁর ছাপানে 'প্রেসক্রিপশন'-এর প্যাডের একটা পাতা চেয়ে নিলেন। প্যাডে কারোটি ব্রব্যের নাম লেখা আছে। এই কারোটি 'সর্বরোগহর' ওষুধের ব্রব্যওগেই নাকি তাঁর বারোয়ারি চিকিৎসার এত বাড়বাড়ন্ত।

রোগী শিছু নগদ ১০ টাকা ফি। দিন প্রতি গড়পড়তা একশ রোগী এলে সৈনিক আয় হাজার টাকা। সম্ভ্রমে পাঁচদিনে প্রায় হাজার পাঁচকে টাকা পকেট পোরান। এর ওপর আছে মাদুলির দাম, বহিরে রোগী দেখার 'প্রণামী'ব্যবদ ২০০/২৫০ টাকা, কমসম করে ২০/২২ কেজি সরষের তেল। সব মিলিয়ে মাস গেলে তাঁর আনুমানিক আয় হাজার পঁচিশ। গ্রামের গরিব মানুষের অন্ধকিম্বাসকে পুঁজি করে রমরমা ব্যবসা। ময়রাতে একটি মাঝারি মাপের একতলা বসতবাড়ি আছে। একটা রাজস্ব মোটর সাইকেল আছে। হালে নাকি একটা ট্রাকারও কিনেছেন। জমজন্টি, লাখ বানেক টাকা খরচ করে বিষ্ণুপুরে তাঁর আর একটি নতুন বাড়ি তৈরির কাজ চলেছে।

ওষু ময়রা গ্রামেই নয়, আমাদের দেশে এমন অসংখ্য বৈদ্যনাথ কবিরাজ প্রভাষণ করে চলেছে গ্রামে-গঞ্জে-নহর-মফসলে সর্বত্র। মানুষের কুসংস্কার, অশিক্ষা, দুর্বলতা ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এই বুদ্ধজেকরা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনমিছিন বেলে চলেছে। কী অন্ধত বৈবম্ব! এ সমাজ জুড়ে। মন্ত্রী-সাদ্রীদের চিকিৎসার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, আর 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে জনগণ রোগ নিরাময়ের জন্য হাড়ড়ে ও সৈব চিকিৎসার শরণ নেন।

অথচ অলৌকিক উপায়ে রোগ নিরাময়ের বিজ্ঞান কেওরাচিই বেবেহিনি। 'শা ড্রান্স অ্যান্ড মাজিক রিমিডিজ (অবলেক্সনেবল অয়ডভার্টিজকেশন)' 'আইডি, ১৯৫৪' অনুসারে সৈবশক্তিতে রোগ সারাবার দাবিদারদের বিচারে সৌদী সাব্যস্ত হলে স্ক্রিমানা এবং ছয় মাস থেকে এক বছরের জেল হতে পারে। কিন্তু এই আইনের ডোয়াফা না করে ওকা-ওপিন-দীর-ফকির-জ্যোতিষীদের কারবার ক্রমশ হুলে ফেঁপে উঠছে। আশোলনের অভিজ্ঞতা থেকে সেবেছি, আইন ব্যবস্থা তো দূর অতঃ, অনেক কেহেই পুশিন-প্রশাসন প্রভাক বা পরোক্ষভাবে এই সব বুদ্ধজেকি ব্যবসায় মদত দিয়ে চলেছে।

'৯৭-এর ১৯ নভেম্বর 'আলোর শিল্পী'র বিজ্ঞান কর্মীরা বসিনাথ হেমব্রমের বিরুদ্ধে প্রভাষণের অভিযোগ এনে তালভাঙ্গার খানার ডায়েরি (ডায়েরি নং ৪৪৯, তারিখ

১৯/১১/৯৭) করেন। কিন্তু দীর্ঘ চার মাসেরও বেশি সময়ের মধ্যে পুশিন বৈদ্যনাথের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ায় ২৬ মার্চ '৯৮ আবার তাঁরা লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। ওই অভিযোগপত্রে যোগ্য করা হয় যে, দুই সপ্তাহের মধ্যে বৈদ্যনাথ হেমব্রমের প্রভাষণের ব্যবসা বন্ধ না করলে প্রশাসনের উচ্চ পদাধিকারীদের জানাতে এবং প্রয়োজনে বৃহত্তর আশোলনে নামতে বিজ্ঞানকর্মীরা বাধ্য হবেন। ওইদিন তালভাঙ্গার খানার ওসি বলেন, বসিনাথ তো আর কাউকে বাড়ি থেকে ভেঙে ভেঙে তার চেয়ারে নিয়ে যাচ্ছে না; লোকেরা সেধে গেলে পুশিন কী-ই বা আদ্য করতে পারে। তিনি স্পষ্টত জানান যে তাঁরা বসিনাথের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নিতে পারবেন না। ধন্য। গণতান্ত্রিক স্বাক্ষর! এ যেন, চোর তো চুরি করবেই, গৃহস্থকেই সজাগ থাকিতে ইহবে।

তবুও ছাড়াছেন নি বিজ্ঞানকর্মীরা। প্রশাসনের উচ্চতর মহলের কাছেও তাঁরা অভিযোগ দায়ের করেন। যে মাসে ঝকুড়ার পুশিন-সুশারের সঙ্গে দেখা করে লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। 'আলোর শিল্পী' পত্রিকায় বৈদ্যনাথের তওমির মুখোশ হুলে দিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে লাগাতার প্রচার চালাতে থাকেন। গ্রামে গ্রামে পথসভা, সেমিনার করে জনমত সংগঠিত করেন। সচেতন মানুষেরা প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের প্রতিবাদপত্রও পাঠান। ঝকুড়ার বিজ্ঞানকর্মীদের দারাবাহিক আশোলনের জোরে হানীয় মানুষ সোকার হয়েছিলেন বৈদ্যনাথের জলিয়াতির বিরুদ্ধে। তাঁরা পড়েছিল দর্শনার্থীদের আনাগোনা। ওষু ঘুম ভাঙেনি পুশিন ও প্রশাসনের। আভও বৈদ্যনাথ ব্যবসা চালাচ্ছেন নিষ্ক্রিয়ত্বে।

অপরূপবোধে থেকেই হুড়ত বৈদ্যনাথ সহস্রাশে সেবাশিসদের বলেছিলেন, 'আমার কাজ আপনরা বন্ধ করে দেবেন না তো?' না, বৈদ্যনাথ জানেন যে তাঁর ব্যবসা বন্ধের কোনও আশঙ্কা নেই। যে রাজ্যে একটি 'মার্কসবাদী' দলের মন্ত্রী-নেতারা ধর্মীয় মঠ-মিশনের বাকজি-মাতাজি মহারাজদের সাথে গা ঘষাবি করেন, জ্যোতিষ সম্মেলনে শুভেচ্ছা বাণী পাঠান, জ্যোতিষীদের অনুষ্ঠানে সরকারি মঞ্চ জেড়ে নেওয়া হয়, ১৪৪ ধারা জারি করে বিজ্ঞানকর্মীদের চেকাতে পুশিন প্রতিবোধ গড়া হয়, খোদ রাজধানী শহরের বুকে প্রশাসনের মদতে বুদ্ধজেক 'খেইথ হিলার' পি পি জোব হাজার হাজার মানুষকে ধর্মের নামে প্রভাষণ করেও রেহাই পেয়ে যায়, 'মাতৃদ্রাঘ' না করার অপরাধে আদর্শনিষ্ঠ পাটিকর্মীর ওপর 'কম্যুনিষ্ট ব্রাশবাদী'রা বড়গহস্ত হন — সেখানে বৈদ্যনাথ হেমব্রমের সৈব চিকিৎসার ব্যবসার যে উজ্জ্বলন্তর শ্রীবৃদ্ধি হবে তাতে আর আশ্চর্য কী।

ধবি : 'নব আলোর শিল্পী'র সৌভাগ্য

সাবিত্রী ব্রত

সূতপা বন্দ্যোপাধ্যায়

দিসি, একটিকার গুনহেন— আর্তকণ্ঠে ডাক দিলেন বাড়িওয়ালা গিন্নি। একবকম সৌভেই গেলাম। বছর দুহুতে চলল আমার বাড়িওয়ালা পয়াপাখী। কার্যকরনিত নানা উপসর্গ। ডাক্তারও জ্ঞাবহ দিয়েছেন। গিন্নি এখন মাড়-সেতরো দেবতার কাছে মানত রাখছেন। পনির খানে গিন্নি ছড়াচ্ছেন। ডেলপড়া-কলপড়া— যে যা পরামর্শ দিচ্ছে সবই করছেন। গত তিনদিন ঘটা করে সাবিত্রী ব্রতও পালন করলেন। কিন্তু গতিক সুবিধের নয়। গতকাল রাতেও বাড়াবড়ি হয়েছিল। হীপরের মতো বুক ওঠানামা করছিল। কোন করে অরুণ-ডাক্তারকে খবর দিতে হয়েছিল আমাকেই। আসলে বুড়ো-বুড়ির তিন কুলে কেউ নেই। সম্প্রতি বলতে এই নোতাল বাড়ি আর পুরনো দিনের কিছু আসবাববস্তু। বাড়িটির মীঠের তলায় আমি ভাড়া থাকি। মাস গেলে পেনশন ও ডাক্তার টাকাতেই তাঁদের সংসার চলে। যে কোনও কার্যেই হোক পাড়া-পড়শির সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই। তাই আমি না থাকলে এই বাড়িটিতে ওঁরা সতিই বড় একা। বড় অসহায়।

সিঁড়ির দরজাটা ভেজানো ছিল। একটু ঠেলা দিতেই আওড়াক করে খুলে গেল। গিন্নি বেরিয়ে এলেন অশর থেকে। তিনদিনের উপশেষী মুখে রাতজাগা জ্বাতি ও একরূপ উয়েগ। হাত ধরে শোবার ঘরে গেলেন। ঘরের একপাশে সাবিকি আমলের বিশাল পালাছ। কামকাজ করা। মোটা গমির ওপর সাদা ধবধবে চানর। তার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ। বরসের ভার ও দীর্ঘ রোগযন্ত্রণা তাঁর স্বল্প সেহটাকে এখনও কাবু করতে পারে নি। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। কিছুটা মলিন। হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করা। চোখ বন্ধ। সিলিং ক্যানের মৃদু হাওয়াতেও কয়েকগাছি চুল উড়ে এসে সমানে মুখে পড়ছে। একটা মাছি ওড়াউড়ি করছে মুখের চারপাশে। বৃকটা কেন জানি না হ্যাং করে উঠল। এগিয়ে গেলাম বিছানার কাছে। একটা হাত তুলে নিলাম। ঠাণ্ডা। নাকী সেখলাম। বন্ধ। গলার হাত ঠোঁড়ালাম। প্রাণের স্পন্দন আছে বলে মনে হল না। দুপাশে মাথা নেড়ে জানিয়ে নিলাম খালি খবরটা। গিন্নি কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধের মাথার কাছটিতে। তারপর নিজের কাছেই বেন নিজে প্রশ্ন করলেন, 'আমি এখন কী করব?' আমি বললাম, 'ডাক্তার না আসা অবধি তো নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আপনি বরং ততক্ষণে একটু কিছু মুখে দিত্রে নিন। আমি দাদার কাছে বসছি।'

মীর পায়ে গিন্নি চলে গেলেন। আমি বসে রইলাম বৃদ্ধের পাশে। একা নিঃশব্দে। ভাবছি শুধু গিন্নির কথা। সতিই তো এখন তিনি কী করবেন? হামীর আবেগ্য কামনায় কত কিছুই না করলেন। সেবাযত্নের কোনও ত্রুটি ছিল না। ইটুতে বাতের কথা নিয়েও রাত ভেগে দিনের পর দিন হামীর গুরুত্ব করেছেন। খড়ি ধরে ওষুধ দেওয়া, পথের ব্যবস্থা করা, পেছাপা-পায়খানা পরিষ্কার করা, — সবই একার হাতে করেছেন। এই বয়সে এত দিক সামলে সাবিত্রী ব্রতের মতো কঠোর ব্রতপালন কি চাট্টিখানি কথা! এই তিনদিন তো একবেলা মাত্র খেয়েছেন। তাও শুধু সামান্য ফল আর দুধ। সেই সঙ্গে হামীর পা ধোওয়া জল। ঘরের এককোণে সমস্তে মাটি গিয়ে বেদি তৈরি করেছেন। তাতে আলপনা একেছেন। মাঝখানে বাসি কুলে বোকাই সিঁদুর লেপা ঘট। বেদির চারকোণে সুতো জড়ানো কড়ি বাশের বুটি। বেদির একপাশে কালো রঙের ওঁড়ো দিয়ে যমের চিত্র। আরেক পাশে পিটুপি দিয়ে বটগাছ ও গাছের তলায় মৃত হামী কোলে সতী সাবিত্রীর চিত্র আঁকা। কতকণ এই ছবির দিকে ডাকিয়ে ছিলাম জানি না। বড় বেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে দুটো বাজার শেষ ঝং হল। শব্দটা খেমে যেতেই একটা অদ্বুত রকম নিস্তব্ধতা আবার সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। আধঘন্টার ওপর হুতে চলল। গিন্নি এখনও রান্নাঘর থেকে বেরোলেন না। কিছুটা চিন্তিত হয়ে আমি সেমে এলাম সেবতে। রান্নাঘরের দরজা ভেজানো। সামান্য গলা বঁকানি দিয়ে দরজায় ঠেলা দিলাম। গিন্নি দরজার দিকে পেন্ধন ফিরে বসে থাকছিলেন। আমার গলার আওড়াকে ও দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠে মুখ ঘোরালেন। ডান হাতে ধরা একটা বড় কাভলা মাহের মাথা। সবে মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন। পারলেন না। মেঝেতে পড়ে গেল মাহের মাথাটা। জড়সড় ভাবে উঠে দাঁড়ালেন গিন্নি। লজ্জা-ভয়-সকেচ-সব যেন এসে জড়ো হল ছোট্ট ঘরটিতে। অপরাধীর মতো মুখ করে কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'আজ ব্রতের উপোষ ভাঙার দিন। নিজের হাতে মাছটা রেখেছি। ভাঙাছা বামুনের ঘরের বউ। ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়ে থাকলে আর তো আল হুতে ...'

কথা শেষ হল না তাঁর। একটা বড় থলো বেড়াল জানলা দিয়ে এক লাঞ্চে রান্নাঘরে ঢুকলো। মাহের মাথাটা মুখে নিয়ে আবার একলাফে বেরিয়ে গেল। কুল-কালি মাঝা রান্নাঘরের আলো-ঐলার রিতে বেড়ালটাকে কেমন ফেন সাদা উদ্ভীর গায়ে জড়ানো এপাড়ার ভট্ট-বামুনের মতো দেখাচ্ছিল।

বর্তমান বিজ্ঞান আন্দোলনের হাল-হকিকত

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান আন্দোলন নিয়ে এই ধারাবাহিক পর্যালোচনায় প্রথমে আমরা বিজ্ঞান আন্দোলনের তিনটে ধারা চিহ্নিত করেছি : বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ এবং জনবিজ্ঞান/জনপ্রযুক্তির প্রসার। এর পরে এই তিনটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি, পত্র-পত্রিকা এবং সংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংগঠন বলতে একদিকে যেমন সরকারের কথা আলোচনা করেছি তেমনিই বিরাট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের কার্যক্রম। মেরকম মূল থেকে মালা গণা হয়, তেমনি বিজ্ঞান সংগঠনগুলির সমন্বয় প্রদানের চিত্রও আমরা উদঘাটিত করেছি এই ধারাবাহিকে ‘উৎস মানুষ’-এ প্রকাশিত ধারাবাহিকের এই শেষ পর্যায়ে, পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের সাম্প্রতিক হাল-হকিকত তুলে ধরার ক্ষেত্রেও আমরা কম-বেশি একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাইছি। কিন্তু যেহেতু এটি সাম্প্রতিক ইতিহাস বা এক অর্থে ঘটমান বর্তমানেরই কথন, তাই এখানে ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিকতা সন্ধান করা কঠিন। ফলে এবারের আলোচনায় এই পদ্ধতি থেকে কখনও কখনও সরেও আসবে। সত্যি কথা বলতে কি, এবারের পর্যালোচনায় গবেষকের অনুসন্ধান অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিকের অবলোকনের পরিপূরক হয়ে থাকবে।

গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। ইতিহাসের কোনো কিছুকে বোধহয় দেশ-ভাগ নির্বিশেষভাবে এক ছাঁচে ফেলে সম্পূর্ণ ‘মডেল’ নির্মাণ করা যায় না। যেমন, সামন্ততন্ত্রের সময়কাল এবং বৈশিষ্ট্য মেলভেনে ডি। তেমনিই বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সত্যি। কাজেই, এক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তি সংগঠন নির্বিশেষভাবে বিজ্ঞান আন্দোলনের বর্তমান কালের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করব।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আন্দোলনের পরিকা একটি বিষয় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ডাবছেন। তা হলে কী প্রচার করবেন — বিজ্ঞানের তত্ত্ব না তথ্য? এর আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে কেবল তত্ত্ব জানা, বিজ্ঞান-মনস্তত্ত্ব উত্তরণের পথ দিয়ে উঠতে পারেনি। (ক্যাপিলারি অ্যাকশনের বিজ্ঞান জানা সত্ত্বেও বহু লোক

১৯২৫-এর ২১ সেপ্টেম্বর গণেশকে দুধ খাওয়ানো মুটে গিয়েছিল।) আর তথ্য জানা? তাহলেও বে বিজ্ঞানবনততার খুব বিকাশ ঘটে এমনও নয়। উন্নত বিজ্ঞানের প্রযুক্তিপনত যন্ত্রপাতির বনর এদেশের সাধারণ মানুষের কাছে একটা ‘বিষয়’ হিসেবেই প্রতিজ্ঞা হয়ে থাকে। এগুলি তার সমাসনি কাকে আসবে না আর বিজ্ঞানমনস্তত্ত্বের বিকাশও ঘটবে না। তবু বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের নামে জনপ্রিয় পত্র-পত্রিকার এই প্রামাণিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির খবরই বের হয়। আর একই পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানকর্মীরা প্রশ্ন তোলেন — ‘ক’ জন লোক বলছেন যে এদেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ হুড়াত্ত বৈষম্য মূলক? বিজ্ঞানের প্রসার মুঠিমেয় সমস্তিসম্পন্ন মানুষের ভোলে যায়, ব্যাপক মধ্য-নিম্নবিত্ত মানুষ খাদ্যনতার আটকিল বছর পরেও একই অনটন অসন্তোষের অক্ষকারে থেকে যায়, কেন? লক লক টাকার চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতির সুযোগ বড়লোকেরা পায়, অথচ কৃষ্ণ, বক্ষা, কালান্দ্র, সাপ-কাটা গোণের ওষুধ মেলে না, কেন? অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় অনাচার, নারী অসমানতা — এইসব সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্যোগুলি নিয়ে ক’জন লোক মোচার?’ (অশোক বসোপাধ্যায়, বাংলায় বিজ্ঞান লেখা ও লেখক, ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’, বিজ্ঞান সাহিত্য সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯৮৫)।

আর এই অভাব পূরণ করার জন্যই বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন নিজেরা বিজ্ঞান পত্রিকা বের করে থাকেন। তার মধ্যে কয়েকটা নিম্নমিত। কয়েকটা অনিয়মিত। পত্র-পত্রিকার ভগ্নতে প্রথমেই উল্লেখ ‘উৎস মানুষ’-এর নাম। ১৯৮০ থেকে কৃষ্ণ বছর মাসিক বেরোনোর পর একশতম বছর (২০০০) থেকে ‘উৎস মানুষ’ ত্রিমাসিক হয়ে গেছে। ‘উৎস মানুষ’-এর মাসিক থেকে ত্রিমাসিক হয়ে যাওয়াটা কি বিজ্ঞান আন্দোলনের একটা ধারার মধ্যকে নির্দেশ করে না? কেউ কেউ আবার তা মানতে নারাজ। তাঁদের মত হল, ‘উৎস মানুষ’ এক আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছিল, এর প্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার নানান সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সেগুলো পুরোখমেই চলছে। উৎস মানুষ-এর প্রকাশকালের অন্তর কৃষ্ণ মাসের সূচক নয়। কর্মীর অভাবে এটি ঘটলেও আন্দোলনকে ব্যাপ্ত সমায় এই পত্রিকার ইতিহাসিক ভূমিকা মোটেই ত্রান হত না।

মনে রাখতে হবে, ১৯৭০ সাল থেকে নিয়মিত বের হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পত্রিকা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকা কখনও কখনও যে যুগসংখ্যা বের করেনি তা নয় তবু বিজ্ঞানকে সমাজসুখী আর সমাজকে বিজ্ঞানসুখী করার আদর্শে এই পত্রিকা নিয়মিত বের হয়ে চলেছে। নিয়মিত বের হচ্ছে ত্রৈমাসিক 'স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' (প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৮), মাসিক 'যুগপত্র গণনগর' (১৯৮৮), ত্রৈমাসিক 'মানবমন' (১৯৬১), বর্ষীয় বিজ্ঞান পরিষদের মাসিক পত্রিকা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' (১৯৪৮); আন্দোলনের অংশ হিসেবে একটি চমৎকার পত্রিকা নিয়মিত বের হচ্ছে মেদিনীপুরের কোয়ার্ট সায়েন্স সেন্টার থেকে। বিজ্ঞান যত্নসী সম্পাদিত এই 'টপ কোয়ার্ট' (ত্রৈমাসিক/১৯৯২) পত্রিকার বিশেষত্ব হল বিশ্ব ভাবনার সঙ্গে স্থানীয় বিশ্বয়ের সমন্বয়। গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গও ১৯৯৬ সাল থেকে টোলারেন্সে আন্দোলনের একটি মাসিক পত্রিকা বের করে চলেছে, নাম — 'গণবিজ্ঞান বার্তা' (গোড়ার দিকে এটি সমন্বয়ের অঙ্গভূক্ত অন্য এক সংগঠন দ্বারা প্রকাশিত হ'ত, এখন 'সমন্বয়'-এর পত্রিকা)।

১৯৮০র দশকে সাড়া জাগিয়ে শুরু হয়েছিল কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান মেলা নামে দুটি পত্রিকা। দুটোর কোনোটিই কোনো বিজ্ঞান সংগঠনের পত্রিকা ছিল না। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান এখনও প্রতি মাসে বের হয় শৈব্যা প্রকাশন থেকে। রবীন্দ্র বল সম্পাদিত এই পত্রিকার নির্দিষ্ট একটা প্রচার সংখ্যাও আছে। তবে বাজারের প্রয়োজন এখানেও এখন পাঠ্যবিষয়ের প্রশ্ন-উত্তর ছাপতে হয়। অন্যদিকে ১৯৮১তে যে চরিত্র নিয়ে মাসিক 'বিজ্ঞান মেলা'-র আদ্যপ্রকাশ ঘটেছিল, ছোটদের জন্য বিজ্ঞানের সরজা খোলা ও বিজ্ঞান মানসিকতা গড়া, সে পত্রিকা আজ আর নেই। দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল এর প্রকাশনা ডার গ্রহণ করেছে যাতে এখন প্রকাশিত হয় বিবিধ বিষয়ের নিবন্ধ আর প্রতিবেদন।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ বড় সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও তার পত্রিকা 'এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী' নিয়মিত বের হয় না। শারীরীয়া সংখ্যা অকণ্য খুব বড় করে বের করা হয়। যুক্তিবাদী সমিতির পত্রিকাও নিয়মিত নয়। এছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠনের পত্রিকা মাঝে মাঝে বের হয়ে থাকে। তুলনায় ব্রেক থ্রু সায়েন্স সোসাইটির পত্রিকা 'প্রকৃতি' কিছুটা নিয়মিত।

বিজ্ঞানের জনপ্রিয় বই প্রকাশের সংখ্যা অনেক বাড়লেও জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকার সংখ্যা কিন্তু তেমন বাড়ছে নি। বাজারের চাহিদা মেটাতে কিছু স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং কম্পিউটার ও প্রযুক্তি-সংক্রান্ত পত্রিকা গত দশক থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যে কিছুটা অন্য ধরনের একটি মাসিক বের হয় 'প্রযুক্তি' নামে যাতে জনপ্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৬

থেকে বের হওয়া এই পত্রিকার প্রকাশক বেঙ্গল মঠের 'সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অব কুরাল টেকনোলজি'।

পত্রিকা নয়, তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা গত দু'দশকে বেরিয়েছে, এখনও বেরোচ্ছে বিভিন্ন বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সংগঠন থেকে। প্রকাশকের মধ্যে রয়েছে — ড্রাগ আকশন ফোরাম, নরমিা বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান সরকার, হাসিসহর বিজ্ঞান পরিষদ, বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম (এদের 'চেতনা' পত্রিকাও বের হয়), প্রমুখ।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই তো অল্প বের হচ্ছে। তার মধ্যে কিছু বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের লক্ষে, আর কিছু বিজ্ঞান মানসিকতা বিকাশের উদ্দেশে প্রকাশিত। বাণিজ্যিক সংস্থার পাল্পাপাশি সরকারি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্বে এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি বিভিন্ন বিজ্ঞান পুস্তিকা বের করে চলেছে। বিজ্ঞানের বইয়ের জন্য রাজ্য সরকার রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করেন। ১৯৯৪ সাল থেকে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং অগ্রাধিকারিত শক্তি বিভাগ প্রদান করছে, ফুল-ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলা ভাষায় লেখা জনপ্রিয় কোনো বিজ্ঞানের বইকে, সত্যেন্দ্র পুরস্কার।

প্রথমপত্রিকা-বইয়ের পর আসা যাক সংগঠনের কার্যকর্মের দিকে। সরকারি সংগঠনের প্রসঙ্গে বলা যায় যে সরকারের সঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের সম্পর্কের ইতিহাস একমাত্রিক নয়। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক সহযোগিতামূলক হলেও সরকারি নীতি প্রশংসা এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ও বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারে সংঘাতের দৃষ্টান্ত নেহাৎ কম নয়। সরকারি প্রদ্যাদের প্রসঙ্গে আপাতত তথ্য হিসেবে বলা যেতে পারে ১৯৮৮র মার্চে রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং ১৯৯৩-এর অক্টোবরে রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমন্বয় গঠিত হওয়ার পর থেকে সরকারি তরফ থেকে বিজ্ঞান প্রচারের কাজে জোয়ার আসে। ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু হয় রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস। এর দুটো দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য — বাংলা ভাষার মাধ্যমে গবেষণামূলক ফল উপস্থাপন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাল্পাপাশি বিজ্ঞান সংগঠনের গবেষকদেরও গবেষণানিবন্ধ পোশের সুযোগ করে দেওয়া।

বেসরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন কাজ করে চলেছে। সবাই সমান সক্রিয় নয়। তবে প্রায় প্রত্যেকেই নিজের নিজের অঞ্চলে বিজ্ঞান প্রচার, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার এবং জনপ্রযুক্তি প্রয়োগের কাজ করছে। তথ্য হিসেবে জানানো যায়, ১৯৯৫ সালে থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান বিভাগ, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজে বিভিন্ন জনসুখী বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান সংগঠনের ত্রিমুখকে স্বীকৃতি জানানোর উদ্দেশে চালু করেছে 'মৈত্রীনা পুরস্কার'। এই পুরস্কার প্রদান করা হয় পূর্ববর্তী বছরের কাজের নিরিখে।

এ রাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাসে আমরা সবেকি করবার বিভিন্ন সংগঠন কাজকর্মের সুবিধার্থে সমন্বয় ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছে। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সমন্বয়কারী সংগঠন। চোখ বোলানো যাক সেই সমন্বয় সংগঠনের সাম্প্রতিক হাল-চলিত্বের দিকে। এ ধারার অগ্রদূত 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সোসাইটি' আর 'আসোসিয়েশন' (ইসকা) আর আগের মত সক্রিয় নয়, তবে ২০০০ সাল থেকে চেষ্টা হচ্ছে পুনরুজ্জীবনের। এদের সম্মেলনও নিয়মিত হয়ে চলছে। সম্মেলন হয়েছে 'আসোসিয়েশন অব সায়েন্স লার্ভার্স'-এরও। আর বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন নিয়ে গড়ে ওঠা 'গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ'-র ছ'টি বিবার্ষিক সম্মেলন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত; এই সমন্বয় সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য নিবন্ধের শেষে সারণী ১ ও ২ প্রত্যা।

রাজ্যস্থরের সংগঠনের মধ্যে রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ব্রেক থ্রু সোসাইটি, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মঞ্চ কাজ করছে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সাম্প্রতিক কালে ভাঙাভাঙির মধ্যে দিয়ে গেছে। এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু একনিষ্ঠ বিজ্ঞানকর্মী নিজস্বের মত করে কাজ করছেন, তবে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে পারস্পরিক আক্রমণও। অন্যদিকে আর একটি রাজ্য সংগঠন 'দ্য সায়েন্স আসোসিয়েশন অব বেঙ্গল' কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের স্বার্থে প্রকরের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করছে।

১৯৯১ সালেই 'আজকাল' পত্রিকার অনুলিপ্ত 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' পাতায় যুগলকান্তি রায় লিখেছিলেন 'এখন বিজ্ঞান চেতনার প্রসারের নামে টাকা আসছে, পুরস্কার আসছে, আসছে লাক্ষের প্যাকেটও' (১৩ মে, ১৯৯১)। ২০০১-এ এই ব্যাপারটা পরিমাণে আরও বেড়েছে। নানান সরকারি প্রকল্পে টাকার অভাব নেই। এইভাবে প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য চরিতার্থ হয় কিনা, সে বিষয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে, কিন্তু বর্তমান লেখকের আলোচ্যপাত অন্য প্রসঙ্গে। বরূপা এইভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করছেন তাঁরা কি সত্যি সত্যি দায়িত্বের সঙ্গে 'কাজ' করছেন? একেবারে টাটকা অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবছর জুন মাসের গোড়ায়, ২০০০-২০০১ আর্থিক বর্ষের 'জাতীয় পরিবেশ সচেতনতা কার্যক্রম'-এর মূল্যায়নের অনুষ্ঠান 'হ'ল কলকাতায়। আঞ্চলিক পরিচালকরা জানালেন, একবছর ২৮৫টা সংস্থা এই কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। ২৫৫টি আবেদন মঞ্জুর হয়। অর্ধ অংশ নেয় ১৯৯টি সংস্থা আর তার মধ্যে বছর শেষে প্রতিবেদন জমা দেয় ১৫৬টা সংস্থা। পরিদর্শকরা জানালেন, অনেক জায়গাতে গিরে তাঁরা দেখেছেন, নির্ধারিত দিনে নিশ্চিত অনুষ্ঠান আসেই হচ্ছে না। এই প্রকল্পে খুব যে টাকা বরাদ্দ ছিল তা ঘর, কাপোই এখনো দুর্নীতি বা অসততা ঘৃণা নয়; লক্ষ্যীয় 'হ'ল আর্থিকতার অভাব, নিষ্ঠার অভাব। আর

বিজ্ঞান সংগঠনের যে কোনো অনুষ্ঠানই নির্দিষ্ট সময়ের একটি পরে শুরু হওয়াটা তো নিয়মে পরিণত; এতখা অবশ্য শুধু বিজ্ঞান সংগঠন নয়, যে কোনো জন সংগঠনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এখনকার বিজ্ঞান আন্দোলনেও কিছু অনুষ্ঠান হয়। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি বা কোনো বেসরকারি কোম্পানির অর্থানুকূলে (কারণ বেসরকারি কোম্পানিকে পরিবেশ খাতে খরচ করতে হয়) সেমিনার, কর্মশালা, কুইজ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে অধিকাংশই হয় পরিবেশ বিষয়ক। আগেকার মডেল প্রশ্নানী, আকাশ সেবার মত কার্যক্রম বেশ কমে গেছে। কিছু বিজ্ঞান সংগঠন নিয়মিত বিজ্ঞান মেলা করে থাকে (যেমন — হুতিবাগানের চেমনা)। মফস্বলে কৃষি ও গ্রামীণ মেলাতেও জোর পড়ে বিজ্ঞানে। স্কুলের সব্বাঙ্গী পুঞ্জের অনুষ্ঠানেও আরোহিত হয় বিজ্ঞান প্রশ্নানী। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এটা মানতেই হবে, বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজকর্মের ধারা গত কুড়ি বছরে অনেকটাই বদলেছে। মডেল তৈরি চতুরে আর সীমান্বয় নয় বিজ্ঞান-কর্মকর্তা। মানুষের বার্ষে, হাসপাতালে সাপে কাটার ওষুধ এ. ভি. এস আনার দাবিতে বা শুকুর বোজানোর বিরুদ্ধে সরব হাচ্ছেন আজকের বিজ্ঞানকর্মীরা। কাজের এই ব্যাপ্তি খটার ফলে কম মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আবার পুরনো দিনের বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মীদের কেউ কেউ 'বসে'ও গেছেন। 'আসোসিয়েশন অব সায়েন্স লার্ভার্স'-এর সম্পাদক জয়ন্ত সেন যেমন মনে করেন, আগে মডেল তৈরি করে যে আনন্দ পাওয়া যেত এখন তার সুযোগ না থাকায় আনন্দ মেলেনা, আর তাই বিজ্ঞান ক্লাবের কাজকর্ম মন্দা। পুণর বোজানোর বিরোধিতা করার মত 'রাজনৈতিক' আন্দোলনে অনেক বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মীই নাকি আগ্রহী নন (সাক্ষাৎকার, ০৫/০৬ ২০০১)। এ প্রসঙ্গে আমরা অভিজ্ঞ বিজ্ঞানকর্মী, গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ-র সম্পাদক বঙ্কিম দত্তর বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি: 'বিজ্ঞান ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ককে পুনর্গঠিত করার আন্দোলনে সামিল হতে চান বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীরা। কাছটা রাজনৈতিক, আন্দোলনেও তাই রাজনৈতিক — এক বৃহত্তর অর্থে।' (বঙ্কিম দত্ত, বিজ্ঞান আন্দোলনে রাজনীতি, মানবজমিন, জানুয়ারি ২০০১)।

তাহলে কোনটা ওকালপূর্ণ? ভাল লাগার জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন, সমাজ সংস্কারের জন্য আন্দোলন, নাকি সমাজ কাঠামো বদলানোর জন্য আন্দোলনে সামিল হওয়া? যে ছোট সংগঠন (যেমন, বিজ্ঞান ভাবনা) প্রতি বছর কচি-কাঁচাদের নিয়ে কাছে-দূরে তিন দিনের জন্য 'প্রকৃতি শিবির' করতে বেশিরে পড়ে, তাদের কাছে ভাল লাগটা খুব ওকালপূর্ণ। তিনদিন একসাথে থেকে, কাজ করে, বেলে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে

ওঠার কিছু শিক্ষালাভও মিস্টারই হয় সেখানে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা হল সমাজ সংস্কার। আর সমাজ কাঠামো বদলের জন্য বিজ্ঞান আশ্বোলন? কেউ কেউ মনে করেন আজ বাট-সস্তর দশকের মত সমাজ কাঠামো বদলের রাজনৈতিক আশ্বোলনের সম্ভাবনা বা বাস্তবতা নেই বলেই বিজ্ঞান আশ্বোলনের মত আশ্বোলনের বিকাশ ঘটছে। বিজ্ঞান আশ্বোলন সমাজ কাঠামো বদলের কথা ততটা স্পষ্ট করে বলে না। প্রচলিত ব্যবহার মধ্যেই কিছু পরিবর্তনের কাজ করায় প্রসারী হয়। এই লক্ষের প্রমাণ, এই যে এত পরিবেশ বিষয়ক কাজকর্ম হচ্ছে তার মধ্যে কতজন বলছেন যে পৃথিবীকে বিকাশের ফলেই আজকের এই পরিবেশ বিপর্যয়? (সবুজ যুগোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৩/০৪/২০০১)। তবু, বিজ্ঞানকর্মীরা বলেন— 'যে ব্যবস্থা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ, যা আত্ম মনুষ্যের মানকটিতে লক্ষ-কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে, পরিবেশকে বিপজ্জনক পরিবর্তনের মধ্যে নিয়ে এগোতে চায়, তাকে চালেচল করেই এগোতে হয় বিজ্ঞান আশ্বোলনকে।' (বঙ্কিম লস্ক, পূর্বোদ্ধিবিভিত)

সে পথে কতটা ক্রিডাবে এগোচ্ছে বিজ্ঞান আশ্বোলন, তা আমরা বিচার করতে পারি সাম্প্রতিক কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে।

এতে কোনো সংশয়ই নেই, পরিবেশের প্রথমটা সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান আশ্বোলনে কাজের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে একমিকে চলছে প্রকৃতি পাঠ, পৃথক পরিবেশ বিষয় অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে পরিবেশের উপাদান চিহ্নিতকরণের কাজ; পরিবেশ নিয়ে বই-শব্দ-প্রতিকা ছেঁতেছে; আলোচনা এবং প্রয়োজ্ঞর ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আসরও বসছে। এটা এক দিকের কাজ, অন্যদিকে পরিকল্পিতবিরোধী উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সামিল হয় বিজ্ঞান আশ্বোলন। এ প্রসঙ্গে আমরা সুন্দরবনে রাসায়নিক সার কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে সকল আশ্বোলনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। শুধুমাত্র পরিবেশের প্রদে উন্নয়নের বিষয়টি সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গেই আসে উদ্ভেদের প্রদ, জীবিকার প্রদ। জন্ম মিত্র উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'জীবিকা বিহীন জীবন' (উৎস মানুষ, জানুয়ারি ২০০১)। কাজেই পরিবেশ-বন্ধ উন্নয়নের স্বার্থে বিজ্ঞান আশ্বোলনকে কাজ করতে হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে, সাম্প্রতিক জড়ীতে মৌড়িগ্রামে বিপজ্জনক ও পরিবেশ দুর্বলকারী মাসে প্রক্সি-রাসায়নিক সিল সক্রোড কসাইখানা তৈরির উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে 'মৌড়িগ্রাম পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি'-র নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের লক্ষে দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ করা যায়।

পরিবেশের আর এক প্রাসঙ্গিক সমস্যা নদী-ভাঙন-বন্যা বিষয়ক। নদী হারিয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে জলাভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের ধাক্কা নদী যাচ্ছে মজে। নষ্ট হচ্ছে নিকালী ব্যবস্থা। নদী জলপরিবাহী ক্ষমতা আর নাথাকছে হারিয়ে ফেলার দেখা দিচ্ছে বন্যা। কন্যাত্রাণ শুণু নয়, বন্যাপ্রতিরোধেও সামিল হয়েছে বিজ্ঞান আশ্বোলন। ১৯৯৮-এর বন্যার পরে গড়ে উঠেছে 'বন্যা ত্রাণ ও প্রতিরোধ সমন্বয় মঞ্চ'। আঞ্চলিক স্তরেও কাজ হচ্ছে। যেমন মালদা, মুর্শিগাবাদে বন্যা-প্রতিরোধ আশ্বোলন এবং প্রতিবৃষ্টিতায় প্রতিবাদ তুলছে; সোদপুর পানিহাটি অফলে লুপ্ত নদী সোনাইকে পুনরুদ্ধারের জন্য অহিমি লড়াই চালাচ্ছেন পরিবেশপ্রেমী মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে আইনের সাহায্যে পুকুর বোজানোর বিরুদ্ধে আশ্বোলনে সামিল হয়েছেন বিজ্ঞানকর্মীরা (যেমন — যাদবপুরে, কাঁচড়াপাড়ায়)।

সাম্প্রতিক কালের বৃহত্তর বিজ্ঞান আশ্বোলনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্রে হল পারমাণবিক অস্ত্র/শক্তি বিরোধিতা। বিগত কয়েক বছরে, বিশেষত ১৯৯৮-এর ১১মে ভারতের পাশ্চাত্তান বিস্ফোরণের পর, পারমাণবিক অস্ত্র বিরোধী আশ্বোলন দানা বেঁধে উঠেছে। এরাজে, আগির দশকের পর আবার গত বছরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানকর্মীরা এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লক্ষে দাঁড়িয়েছেন; আগতত মূলত্ববি হয়েছে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা। তবে এরই সুবাদে পরমাণু শক্তি-প্রযুক্তি বিরোধী আশ্বোলন দানা বেঁধেছে টুকরো টুকরো অঞ্চলে। অবশ্য বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও মতের বিভিন্নতা রয়েছে। পরমাণু অস্ত্র বিরোধী সবাই যে পরমাণু শক্তি-বিরোধী, তা নয়। পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু অস্ত্র/শক্তি বিরোধী আশ্বোলনের বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য প্রক্সি: বর্তমান লেখকের 'পরমাণু দৈত্য — প্রতিবাদে পথ খোঁজা', উৎস মানুষ, মে ১৯৯৯।

বাস্তব, জনবিজ্ঞান আশ্বোলনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এরাজে জনবাস্থ্য আশ্বোলনের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। প্রচুর জনবাস্থ্য পুষ্টিকাণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি বাস্থ্য পরিবেশার মানোন্নয়ন, সাপের কামড়- জলাতন্ত প্রকৃতি প্রতিরোধের জন্য সচেতনতাবৃদ্ধি এবং প্রতিবেশক পাণ্ডার দাবি, বিত্বদ পানীয় জলের দাবিতে সোজার বিজ্ঞান আশ্বোলন। বস্তুত বাস্থ্য মানে যে প্রতিরোধ আর নিরাময় কেন্দ্রিক চিকিৎসা নয়, বরং সামগ্রিক সুস্থতা — এই বোধ নিয়েই কাজ করেন বিজ্ঞানকর্মীরা।

বিত্বদ পানীয় জলের ক্ষেত্রে এরাজে একটা বড় সমস্যা আর্সেনিক। সরকারও স্বীকার করেছে এ রাসায়নিক বেশ কয়েকটি

জেন্সি আর্সেনিক কবলিত। জেন্সি আর্সেনিকের মাত্রা নির্ধারণের ব্যবস্থা করে বিতুষ্ট শাসীরা জেন্সির দাবিতে কাজ করেছে বিজ্ঞান মরবার, ব্রেক থ্রু-র মতো বিজ্ঞান সংগঠন।

কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার আর কীটনাশকের দুধের পাশাপাশি সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জিন প্রযুক্তিজাত টার্মিনেটর বীজের সমস্যা। বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থে বসি হচ্ছে এনেলের গরিব মানুষের স্বার্থ। কাজেই এখানেও লড়াইতে সমিল বিজ্ঞান কর্মীরা। সরবেড়িয়ার কৃষিচক্র, ক্যানিং-এর যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের সীমিত লক্ষ্য-সামর্থ্য নিয়ে কাজ করছে।

অলৌকিকতা আর অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াইও পুরোদমে চলছে। একদিকে তথ্যকথিত 'অলৌকিকতা'র যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভণ্ডামি উন্মোচন আর অন্যদিকে রয়েছে আইনি লড়াই। বিজ্ঞানকর্মীদের কাছে রয়েছে আইনি হাতিয়ার : ১৯৫৪ সালের 'ড্রাগ আন্ড ম্যাজিক রেমিডিস (অবজেকশনাবল্ অ্যান্ডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট'। (বিশদ বিবরণের জন্য ব্রিটান, এই থারাবাহিকের চতুর্থ পর্ব, উৎস মানুষ, আগস্ট ২০০০)। আর এই আইনকে হাতিয়ার করে সত্যিই মামলা করছেন বিজ্ঞানকর্মীরা। বীজপুর থানায়, জমেক অলৌকিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে করা একটি ডায়েরিকে তদন্ত করে ১৯৯৭ সাল থেকে ব্যাকপূর্ব মহকুমা আদালতে চলছে এই মামলা। আর প্রভারণা ফাঁদের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে বড় সাফল্য খিদিরপুরে ২০০০ সালে জমেক স্বঘোষিত 'অলৌকিক চিকিৎসক'-এর প্রভারণা ফাঁস করার ক্ষেত্রে সংগঠিত বিজ্ঞানকর্মীদের সাহসী পদক্ষেপ, যেখানে তাদের থানায় পর্যন্ত যেতে হয়েছে। আসলে লড়াইটা তো কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, প্রতিক্রিয়াশীল হিত স্বার্থের বিরুদ্ধে। এরই বিজ্ঞানকর্মীদের কলপ্রয়োগ করে থানায় নিয়ে যায়, এরাই অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষশাস্ত্রকে পাঠ্য করার চেষ্টা করে। সম্প্রতি 'কিশ্বিবিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন', জ্যোতিষশাস্ত্রকে কিশ্বিবিদ্যালয় দ্বারে বিজ্ঞান শাখার পাঠ্যবিষয়ভূক্ত করার যে অপচেষ্টা শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকর্মীদের নতুন করে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে; সেই চাহিদা পূরণও করেছে আজকের বিজ্ঞান আন্দোলন।

আসলে কাজটা দীর্ঘমেয়াদী। এর ফলাফলও হয়তো তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু একেবারেই যে যায় না তাই বা বলি কী করে। ১৯৮০-র পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ আর ১৯৯৫-এর পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে জনচেতনতার আকাশ-পাতাল পার্থক্য আমাদের নিজের চোখে দেখা। আর এই পরিবর্তন আপনা-আপনি ঘটে নি; এর পেছনে রয়েছে বিজ্ঞান কর্মীদের বিরল প্রয়াস। সামগ্রিক ভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও

উৎসাহ বেড়েছে। এতে উদ্বীণনা যোগান ড. অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মানুষ যিনি গ্রান মফঃস্বল ঘুরে ঘুরে স্রাইড শো দেখিয়ে যেতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এত জ্যোতিষের রমরমা কেন?

এর বড় কারণ নিরাপত্তাহীন, নিশ্চিততাহীন জীবনে সাফল্যের চট্টজলদি শর্ট-কাট পথ খোঁজা।

আসলে প্রথাগত শিক্ষা এ কাজে ততটা সফল নয়। চাই অন্য পথ। আর সে পথের সন্ধানে প্রয়াসী বিজ্ঞানকর্মীরা। তাই তাঁরা কখনও হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, আয়োজন করেন গ্রীষ্মকালীন বিজ্ঞান শিলা শিবিরের, আবার বসান প্রকৃতি পাঠের আসন। চলে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের জন্য তথ্য প্রয়োগ করা আর বিজ্ঞান মানসিকতা বিকাশের কাজ।

অন্তর্দৃষ্টি, বিবাস, তা থেকে ভাঙন, আবার মেলবন্ধনের বিচ্ছিন্ন প্রয়াস; সমর্থনের চেষ্টা, এক ছাত্রের তলায় আনার নামে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রকৃতি বিচিত্র-বহুভাষ্য সংকীর্ণতা, আবার সদিচ্ছার মিশ্র-বন্ধুর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান আন্দোলন এতটা পথ চলেছে। সেই পথে বন্ধুত্ব ছিল আবার কখনও পথ চলার এ-সেই মঙ্গল গতি। আপাতত একমাত্রিক 'ভাল' বা 'মন্দ' অভিধায় বিবেচিত করা নয়; আমরা ভাবতে পারি অন্যভাবে। দু'টো কবিতার এক ছত্র করে উল্লেখ করে এ সেখানে আপাতত দাঁড়ি টানা যেতে পারে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এ পৃথিবীকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার জঙ্গীকার করেছিলেন। বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজকর্মও এ বিশ্বকে নবজাতকের বাসযোগ্য করে যাওয়ার লক্ষ্যে। আর কবি গেল্যাম মোস্তাফা লিখেছিলেন, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর শিতা সব শিশুরই অন্তরে'। সেজন্যই শিশুমনে চেতনা সঞ্চারের কাজে প্রয়াসী বিজ্ঞান আন্দোলন। তাই এত গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালিত হয় ছোটদের জন্য বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা মূল্যায়ন, প্রকৃতি পাঠের আসন প্রকৃতি।

তবে আগেই বলেছি, এ সব কর্মেয়োগের ফল একদিনে মেলে না। যদি হতাল হয়ে বিজ্ঞানকর্মীরা পাণ্ডে সেবার বয়টাকে হারিয়ে ফেলেন তবে কাজ যাবে খেমে। সাম্প্রতিক কালেও হতাশা আছে, নৈরাশ্য আছে, নৈরাজ্যও আছে। তবু আছে এক স্বপ্ন। যে স্বপ্ন থেকে বিজ্ঞান আন্দোলনের সেনানীরা (কবি অমিত্যভ দাশগুপ্তের মতো) ভাবেন—

'অজ্ঞে নর। কালও নয়।

একদিন হবে।

সেলিন তুমি বা আমি কেউ থাকব না।

তবু হবে।'

পরিষিষ্ট

সারস্বী - ১

ইন্টার্ন ইন্টিগ্রেড সার্কেল ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন'-এর পরিচালনার
পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলনের তালিকা

ক্রম	সাল	সহযোগী/স্থান
প্রথম	১৯৭৯	গোববডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট, উত্তর ২৪ পরগনা
দ্বিতীয়	১৯৮০	পায়োনিয়ার গ্রুপ, নবগ্রাম, কোচগার, হুগলী

(এই দুটো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় E. I. S. C. A-র ক্ষেত্রে আছে)

তৃতীয়	১৯৮১	কাতোয়া বিজ্ঞান পরিষদ, বর্ধমান
চতুর্থ	১৯৮২	নদীয়া জেলা সার্কেল ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন, কুজন্দগর, নদীয়া
পঞ্চম	১৯৮৩	ব্রু স্টার (বাগানার) এবং হাওড়া বিজ্ঞান ক্লাব, হাওড়া
ষষ্ঠ	১৯৮৪	টান এক্সারস সার্কেল ক্লাব, গিরমিট কেলিয়ায়ি, আসামসোল, বর্ধমান
সপ্তম	১৯৮৫	মহেশতলা বিজ্ঞান সাংস্কৃতিক পরিষদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অষ্টম	১৯৮৬	মেগাল বিধানচল বিদ্যামন্দির, দীঘা, মেদিনীপুর
নবম	১৯৮৭	জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সার্কেল ক্লাব, জলপাইগুড়ি
দশম	১৯৮৮	চন্দননগর সার্কেল ক্লাব, হুগলী
একাদশ	১৯৮৯	ঠাকুরনগর সার্কেল ক্লাব, উত্তর ২৪ পরগনা
দ্বাদশ	১৯৯০	গড়িয়া সার্কেল ক্লাব, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
ত্রয়োদশ	১৯৯১	কাকদ্বীপ সার্কেল ক্লাব, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
চতুর্দশ	১৯৯২	নেতাজী সংঘ, নেতাজী নগর, কলকাতা
পঞ্চদশ	১৯৯৩	যুক্তি মন কলা ও বিজ্ঞান কেন্দ্র, হুগলী
ষষ্ঠদশ	১৯৯৪	বামনগাছি বিজ্ঞান সংস্থা, উত্তর ২৪ পরগনা
সপ্তদশ	১৯৯৫	দ্য সার্কেল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (স্যাব) বেহালা, কলকাতা

অষ্টাদশ ১৯৯৬

উনবিংশ ১৯৯৭

বিংশ ১৯৯৮

একবিংশ ১৯৯৯

দ্বিবিংশ ২০০০

ত্রিবিংশ ২০০১

স্যাব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলকাতা

গোববডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট,
উত্তর ২৪ পরগনা

গ্রামীণ বিজ্ঞান কেন্দ্র, খামারগাছি,
হুগলী

ম্যাং, নরসিংদহ কলেজ, হাওড়া

স্যাব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলকাতা

স্যাব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
কলকাতা

সারস্বী - ২

গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের সম্মেলন

প্রথম	কল্যাণী, নদীয়া,	২২-২৩ জুলাই ১৯৮৯
দ্বিতীয়	শ্রীরামপুর, হুগলী,	৬-৭ অক্টোবর ১৯৯১
তৃতীয়	হুতিবাগান, কলকাতা	২-৩ অক্টোবর ১৯৯৩
চতুর্থ	ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা	১৪-১৫ অক্টোবর ১৯৯৫
পঞ্চম	সোদপুর, উঃ ২৪ পরগনা	৭-৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮
ষষ্ঠ	কাঁচরাপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা	৭-৮ এপ্রিল ২০০১

বাসের তথ্য-সহযোগিতা এবং অকৃত্রিম উৎসাহ ছাড়া এই
ধারাবাহিক রচনা অসম্ভব হত না— জয়সেন মে, দীপকর
বায়, দীপক কুমার দী, কুবজোতি মে, সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়,
সবুজ মুখোপাধ্যায়, রাজেশ দত্ত, রবীন মজুমদার, সুজন সেন,
বঙ্কিম দত্ত, জয়ন্ত দাস, সোমা বসু, অপেক্ষা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং
আমার গবেষণা-নির্দেশক ড. মহম্মদ সরকার। —লেখক

গ্রাহক টীমা

২০০১ থেকে উৎস মানুষের দাম হয়েছে প্রতি সংখ্যা ৮
টাকা। বার্ষিক গ্রাহক টীমা ৫০ টাকা। ডাক স্বরূপ যথাস্থিতি
আমাদেরই থাকছে। ডাকযোগে গ্রাহক টীমা পাঠানোর
ঠিকানা :

বি ডি ৪৯৪

স্ট্রিট লেক

কলকাতা ৭০০ ০৬৪

চেক বা ড্রাফট টীমা পাঠালে UTSA MANUSH
নামেই দিতে হবে। M.O. কৃপণের মীচে নিজের নাম
ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা চাই। বাইরের চেক-এ
অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হবে।

পশ্চিম বাংলা : ভূমি সংস্কার ও সমাজ পুনর্গঠন

অজিতনারায়ণ বসু

ভূমি সংস্কার মানে ভূমির মালিকানা ব্যবস্থার পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো মৌলিক পরিবর্তন হলে। একই সঙ্গে তখন দরকার হয় উৎপাদনের উদ্দেশ্যেরও পরিবর্তন হবার।

গত ২৫০ বছরের মধ্যে এই ধরনের দুটি মৌলিক পরিবর্তন আমাদের দেশে হয়েছে। এর প্রথমটি হল মোগল আমল থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রবেশের সময়। দ্বিতীয়টি হল ঔপনিবেশিক আমল থেকে বর্তমান স্বাধীনতার আমল গুলির সময়। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই বর্তমান আমলের দুটি অংশ : প্রথমটি ১৯৪৭-১৯৭৭। দ্বিতীয়টি চলতি কামগ্রাণ্ট সরকারের আমল — ১৯৭৭ থেকে এখনও চলছে।

ভূমি সংস্কারের ইতিহাস

আমাদের রাজ্যে ঔপনিবেশিক আমলের আগে অর্থাৎ ভারতের মোগল আমলে কৃষক ছিল জমির মালিক। বছরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেশের রাজাকে দিতে হত। তাছাড়া কৃষকের আর কিছু নেই ছিল না। নবাবী রাজত্বের শেষ বছরে বাংলার ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮.১৭ লক্ষ পাউন্ড। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রথম বছরেই এই রাজস্ব থেকে তাদের আর বেড়ে হল ১৪.৭০ লক্ষ পাউন্ড। তারপর ধাপে ধাপে বেড়ে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' সময় এই রাজস্ব স্থির হল ৩৪.০০ লক্ষ পাউন্ড বা মোগল আমলের তুলনায় ৪ গুণেরও বেশি। তা ছাড়া কোম্পানি যে উটে-ভূমি-সংস্কার করল তার ফলে কৃষকের বদলে জমিদাররা জমির মালিক হল এবং তাদের নীচে কৃষকের তলুকদার ইত্যাদি মাধ্যমহযোগীর সৃষ্টি হল। এরা শেষ পর্যন্ত প্রায় ইচ্ছামত রাজস্ব বাড়িয়ে, কোম্পানিকে ৩৪.০০ লক্ষ পাউন্ড দিয়ে বাকিটা ঐ নিজেরা আয়সাং করত। ফলে একদিকে মূর্খিক এবং অন্যদিকে কৃষক বিস্রোহ। তা ছাড়া প্রধানত ঠিক সময়ে খাদ্যের ভোগানের জন্য সৃষ্টি হোল দেশীয় সুদখোর মহাজনী প্রভাব। তারও প্রায় ১০০ বছর পরে যখন পাট ইত্যাদি শিল্পে ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োগ হতে শুরু করল তখন থেকে শুরু হল 'ফটকাবাড় ব্যবসায়ী'। এরা কৃষকদের কাছ থেকে সস্তায় পাট কিনে চটকলের বিদেশী

মালিককে বিক্রি করত। ফলে, পাট ইত্যাদি তথাকথিত 'ব্যবসায়িক' বা অর্থকরী ফসলের কিছুটা উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ল না, বরং কমল। ক্রমে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাদুদ্ধের সময় থেকে ধান-গম এবং অন্যান্য শস্য নিয়েও ফটকাবাড় শুরু হল। প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ১৯৪৫ সালের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে এদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই তিন অশুভ শক্তি জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ার এবং এদের সরকারের উপরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, এই ছিল বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার মূল কথা।

উৎপাদনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এবং শহরে, কলকাতায় বাস করা প্রধানত উচ্চ বর্ণের ঐ জমিদার এবং মধ্য স্বভাবোপাধিকারের প্রত্যক্ষ বংশধর হচ্ছে বাংলার শিক্তিত 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়। আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ থেকে এখন পর্যন্ত এই 'ভদ্রলোক'দের হাতেই।

অর্থাৎ সামান্য ২/১ জন ব্যতিক্রমী ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে, এই 'ভদ্রলোক' নেতারা ব্রিটিশ আমলে আইনসভার সভা হিসাবে বা বাইরে প্রায় নিয়মিত ভাবে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের তাগিদে এবং গরিব রায়ত ভাগচাষীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। ঐ আমলেই ভাগচাষীদের রায়ত বা tenant হিসাবে স্বীকৃতি দানের বিরুদ্ধে এরা যদি না থাকতেন, তবে তখনই ভাগচাষীরা রায়ত হিসাবে আইনত স্বীকৃতি পেত। ফলে স্বাধীনতার পরে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে তাদের খুব সম্ভবত প্রত্যক্ষভাবে পরে জমির মালিক হবার আইনসম্মত ব্যবস্থা হয়ে যেত। সেই ব্যবস্থা কিন্তু এই গত ২৪ বছরেও হয়নি। 'ভদ্রলোক'দের আধিপত্য এখনও কতটা, এটা তার একটা নিদর্শন।

স্বাধীনতার পরে ১৯৫৩ সালে জমিদারি অধিগ্রহণ আইন এবং ১৯৫৪ সালে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হল। এই আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্তগণসহ জমিদারি ও মাধ্যমহযোগী প্রচার অবসান হল। রায়তরা জমির মালিক হল এবং তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে ২৫ একর পর্যন্ত চাষের জমি, ১৫ একর পর্যন্ত অকৃষি জমি, এবং অনির্দিষ্ট পরিমাণ বগান ও মাছ চাষের ভেড়ি প্রভৃতি নিজ দখলে রাখতে পারবে বলে ঠিক হল। এই

উৎসর্গীমার বাইরে যে জমি উৎসর্গ হলে তা সরকারের ন্যস্ত হয়ে এবং ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি হবে। ভাগ্যচাষীরা রায়ত বলে আইনে স্বীকৃত না হবার ফলে, তারা ভূমির মালিকানা পেলনা, কিন্তু আইনে তাদের ফসলের ভাগ ৫০% থেকে বাড়িয়ে ৬০% করা হোল। এটা ভে-ভাগা আন্দোলনের দাবি ৬৬% থেকে কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিশ শতাব্দীর বাংলার সর্ববৃহৎ কৃষক আন্দোলন—ঐ ভে-ভাগার জন্য কৃষক আন্দোলনের সমন্বয় তখন কলকাতা শহরে বামপন্থীদের উদ্বোধনযোগ্য উপস্থিতি সত্ত্বেও এখানে কোনো আন্দোলনে অমরতা সমিলি হয়েছিল। বলে ‘স্বরণে আসে না।

এই ভূমি সংস্কারের ফলে প্রত্যাকভাবে ভূমিদার-মধ্যবর্গ ভোগীরা যেটা মুক্তি পেল। রায়তরা ভূমির মালিকানা পেল। কিন্তু পুরনো অনেক মালিক কৃষক রায়ত হিসাবে রয়ে গেল। বনম্বে-বেনায়ে অনেক সময় কয়েক শত একর ভূমির মালিক হয়ে বসল। ফলে খুব অল্প ভূমিই ‘উৎসর্গীমার’ থেকে বাড়তি হিসাবে সরকারের হাতে এল। তারও খুব সামান্য অংশই গরিব কৃষক বা ভূমিহীনরা পেল। ভাগ্যচাষীরা শুধু যে ‘রায়ত’ নয় বলে তাদের চাষ করা বর্ণা ভূমির মালিক হল না তাই নয়। এই সময় হাজারে হাজারে ভাগ্যচাষীকে উচ্ছেদ করে মালিকরা বর্ণা ফেরা ভূমি নিজ দখলে নিয়ে এল। এইভাবে ভূমিদারি প্রথা এবং তার মাধ্যমে কৃষিক আয়ের একটা বড় অংশকে আত্মসাৎ করে ভোগ বিলাসে ব্যয় করা আইনত বন্ধ হলে বটে, কিন্তু সৃষ্টি হল একদিকে বড় ভোগদার ও ধনী কৃষক, এবং অন্যদিকে দরিদ্র কৃষক, ভাগ্যচাষী ও সর্বোপরি ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন ক্ষেত্র মজুরদের। শোষকদের অবস্থার ভালর দিকে, কোনো পরিবর্তন হল না। বরং অবস্থা খারাপই হল, অত্যন্ত আপেক্ষিকভাবে নিম্নতরই।

বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা এবং ভূমি সংস্কার

১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ এই ৩০ বছরের মধ্যে ২৮ বছরের মত সময় আমাদের রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ছিল। ঐ সময়ে ১৯৫০এর দশকের ‘ভূমিদারি অধিগ্রহণ আইন’ এবং ‘ভূমি-সংস্কার আইন’ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলেও এর বিশেষ কোনো উপকার গরিব কৃষকরা পান নি। সে সময়ে যেসকলও বা বাক্তি ভূমি আইনত বিলি হয়েছিল তারও একটা বড় অংশ ছিল শুধুই কলকাতা-কলমে অথবা যাদের ভূমি পাবার কথা নয় তাদের হাতে ভূমি চলে যাওয়া।

এই অবস্থার একটা বড় পরিবর্তন হয় প্রথমে ১৯৬৭ এবং পরে ১৯৬৯-৭০ সালে সব মিলিয়ে, ২ বছরেরও কম সময়, বখন ‘বুদ্ধভ্রষ্ট’ মন্ত্রিসভা পশ্চিম বাংলায় ছিল। এই পরিবর্তনের একটা দিক হল চলতি আইনের কাঠামোর মধ্যে: কিন্তু অনেকখানি পরিমাণে প্রযুক্তি কৃষকের উদ্যোগকে ব্যবহার করে বে-আইনি ভাবে দখলে রাধা ভূমি মালিকদের

কাছ থেকে উদ্ধার করে ভূমিহীন বা অন্যান্য গরিব কৃষককে ভূমি বন্টন করা। অন্য একটা উদ্যোগ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল চলতি আইনের বাইরে গিয়ে, আমূল ভূমি সংস্কারের; ভূমি কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে পাঠা কমডাকেশন স্থাপন করে। এই চেষ্টাটিই ‘অকশ্যাসবার্ভ’র আন্দোলন নামে খ্যাত। এই সময়ের স্থায়ী কল্যাণ উপকার গরিব কৃষকদের যা হয়েছিল তা হচ্ছে ৩/৪ লক্ষ একর ভূমি তারা নিজ দখলে আনতে পেরেছিল। এর অনেকটাই আইনগত স্বীকৃতি পেরেছে। বাকি অনেকখানি আনুষ্ঠানিক আইনগত স্বীকৃতি না পেলেও বাড়তে যা গরিব কৃষকদের দখলে এখনও রয়েছে। এ ছাড়া আইন সংশোধন করে ভূমির উৎসর্গীমা কমিয়ে ১৭.৫ একর এবং ভাগ্যচাষীর অংশ ৭৬%, এর পরেই চালু করা হয়।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট আইনসভায় অনেকখানি বেশি পণ্ডি নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। তখন বেশ দৃঢ় ভাবে তারা যে কাজগুলি শুরু করার চেষ্টা করলেন তা হচ্ছে রাজ্য সরকারের পুরো নেতৃত্বে ভূমি সংস্কারের চলতি আইনকে ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে তার সংশোধন করে (ক) যত বেশি সম্ভব ভূমি গরিবদের বিলি করা; (খ) যত বেশি সম্ভব ভাগ্যচাষীকে নথিভুক্ত করে তাদের উচ্ছেদের হাত থেকে বাঁচানো এবং যাতে তারা ফসলের আইনসমত ভাগ (৭৫%) পায় তার ব্যবস্থা করা; (গ) সকলকেই যাতে নিজস্ব কৃষি ভূমি থাকে তার চলতি আইনকে বাড়িয়ে চালু করা, এবং (ঘ) নিষিদ্ধিত ভাবে ক্রিয়ার পদ্ধতিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে, নতুন পদ্ধতিতে ভূমি-সংস্কারের সব কাজের সঙ্গে যুক্ত করা।

১৯৭৭-এর আগে ভূমি-সংস্কারের ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগ ছিলনা। ৭৭এর পর মূল ঠোঁটটা পড়ে পঞ্চায়েত সহ সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করেই যাতে আইন মাত্তিক ভূমি সংস্কারের সব কাজগুলি করে ফেলা যায়, যাতে কৃষকদের আগ বাড়িয়ে আন্দোলন করার প্রয়োজনই না হয়, যাতে তারা সরকারকেই তাদের নির্ভর করার মত একটা সংগঠন হিসাবে ভাঙতে পারেন, তার ওপর।

ভূমি বন্টন

এই পদ্ধতিতে গত ২৩ বছরে সরকার যা করেছেন তা আগের যুগের ২৮ বছরের তুলনায় নিম্নলিখিত কথন বেশি। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার মধ্যে ৩.৬৯ লক্ষ একর ভূমি গরিবদের বিলি করা হয়েছে। এর অন্তর্গত দুই-তৃতীয়াংশ বুদ্ধভ্রষ্ট মন্ত্রিসভার আমলে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯-৭০ সালের দুই বছরের কম সময়। অর্থাৎ বাকি ২৮ বছরে বিলি হয়েছে বড় জোর ১.২৫ লক্ষ একর।

১৯৭৭-এর পরের ২৩ বছরে (২০০০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) বিলি হয়েছে এর ৫ গুণের থেকে বেশ বেশি বা ৬.৮৪

লক্ষ একর। অর্থাৎ ২০০০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার গরিব কৃষক, মালিকদের কাছ থেকে নেওয়া ১০.৫২ লক্ষ একর জমি আইনসম্মত ভাবে নিজ দখলে এনে নিজেরা চাষ করতে পারছেন।

এই রাজ্যেরই অতীতের তুলনায় গত ২০ বছরে বায়ফ্রন্ট আমলের সাফল্য যে কয়েক গুণ বেশিই শুধু নয়, বাকি ভারতের তুলনায়ও এই সাফল্য ৫ গুণের থেকে বেশি।

বর্ণাদার নথিভুক্ত করা

বর্ণাদারদের নথিভুক্ত করার এবং যে সমস্ত কৃষিকর্মী, জেলে এবং কুটির শিল্পের কর্মীদের নিজস্ব বাস্তুজমি সেই তাদের বাস্তুজমি দেওয়ার কাজ ১৯৭৭-এর আগে বিশেষ কিছু হয়নি।

২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪.৯৫ লক্ষ বর্ণাদারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় যত বর্ণাদার আছেন বলে অনুমান করা হয় (২০ লক্ষ) এটা হচ্ছে তার প্রায় ৭৫%। বায়ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কর্মতাসীন হবার ঠিক পরেই 'অপারেশন বর্ণা' চালু হয়। তার মাধ্যমে সরকারের বিভাগীয় কর্মীরা— কৃষকরা সন্ধ্যার পর কাছ থেকে ফিরলে তাদের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে অনেক দ্রুততার সঙ্গে এই নথিভুক্তির কাজ করেন। ১৯৭৮ সালে শুক্র সময় যে উৎসাহ নিয়ে কাজটা চালু হয়েছিল, পরবর্তী সময় সেই উৎসাহ আর দেখা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ, গত বছরে (১৯৯৯-২০০০) মাত্র ৬ হাজার বর্ণাদারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এইভাবে এগুলা যদি এখনও ৫ লক্ষ নথিভুক্ত না হওয়া বর্ণাদার থাকে, তবে তাদের নথিভুক্ত করতে আগামী ১০০ বছর লাগবে।

আমরা যে আমাদের গড়ব্যবল থেকে এখনও বেশ দূরে আছি সেই স্বাচ্ছন্দ্যে স্পষ্ট চেতনা না থাকলে আমরা আমাদের অতীত সাফল্য নিয়ে বড় বেশি আত্মসন্তুষ্ট থাকব। গত এক বছরে বর্ণা রেকর্ড হয়েছে মাত্র ৫ হাজার জনের, এবং জমি বিলি হয়েছে মাত্র ১ হাজার একর। এর তাৎপর্য আমরা পরে আলোচনা করব।

বাস্তুজমি দেওয়া

১৯৯৪ সালের মধ্যে আগে উন্নীত গ্রামীণ প্রমবীষীদের মধ্যে ২.৫৩ লক্ষ পরিবারকে বাস্তুজমির মালিকানা দেওয়া হয়েছে। এর পরে এখন মনে হয় এ সব পরিবারের পুর-কন্ডারা বড় হয়ে হঠাৎ অনেকে নতুন সংসার গাভড়ে গিয়ে কেউ কেউ নিজস্ব বাস্তুজমির অভাব অনুভব করছেন। এ ছাড়া খেলা হয় যে মোটামুটিভাবে বাস্তুজমির মালিকানাধীন পরিবার গ্রামীণ পশ্চিম বাংলার এখন নেই। বাকি মানুষ কোন সমস্যাগুলোর মধ্যে বেশি তার একটা আশ্রয় পাওয়া যায় যখন আমরা দেখি যে ঐ ভাবে বাস্তু পাওয়া পরিবারদের মধ্যে ৪২% হচ্ছে দলিত বা উপশীল জাতি, ১৯% হচ্ছে আদিবাসী বা

উপশীল উপজাতি, এবং ১৬% হচ্ছে মুসলমান। বাকি ২০% হচ্ছে অন্যান্যরা বা প্রধানত বর্ণহীন। পশ্চিম বাংলার মোট জনসংখ্যা ১৯৯১ সালে দলিতদের অনুপাত ছিল ২.৬৩% এবং আদিবাসীদের অনুপাত ছিল ৫.৬%। অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতের তুলনায় যারা বাস্তুজমির অধিকার বর্জিত ছিলেন তাঁদের অনুপাত দলিতদের ক্ষেত্রে ১.৮ গুণ এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৩.৪ গুণ বেশি।

দলিত ও আদিবাসীদের অধিকতর বঞ্চিতভাবে অবস্থানের নিষ্পন্ন একই বহুমুখভাবে আগে আলোচিত কৃষি কটন ও বর্ণাচাষী নথিকরণের তথ্য থেকেও বুঝতে পারা যায়।

কৃষি সংস্কার সংঘে তথা বলতে সাধারণত উপরে উন্নীত তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়। এই তথ্য থেকে মনে হতে পারে যে স্বাধীনতা পরবর্তী ভূমিসংস্কারের মূল কথাই হল 'গরিবদের' উপকার করা। এই উপকার কোন মন্ত্রিসভার আমলে কতটা হয়েছে এইটাই যেন মূল কথা। এই বিষয়টা আমরা বুঝবার চেষ্টা করব।

ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য

স্বাধীনতার পরে দেশের উন্নয়নের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয় তার মূল ভিত্তি ছিল একটা পুঁজিবাদি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তার জন্য প্রয়োজন ছিল ঔপনিবেশিক আমলের জমিদারি প্রথা জাতীয় ব্যবস্থা পরিবর্তিত করা যতখানি সম্ভব ঐ জমিদারদের সঙ্গে সমঝোতা করে। এই পরিবর্তন চাইবার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন অবস্থান থেকেই। শ্রমীয় পুঁজিবাদকে এগিয়ে চলতে গেলে স্কট লিডার্সন প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাবার একটা মূল দিক হচ্ছে অনেক বেশি কৃষিজ কাঁচামাল এবং বাধ্যশস্য শিল্প ও শহরের জন্য গ্রাম থেকে যোগান দেওয়া। এই যোগান দেবার ক্ষমতা তখন ভারতীয় কৃষির ছিল না। ১৯৫১ সালেও দেশে যে খাদ্য দশা উৎপাদন হত তা শুধুমাত্র গ্রামের প্রয়োজনের ৭৫%-ও মেটাতে পারত না। এই অবস্থা থেকে বেরবার তিনটি মূল দিক : (১) গ্রামের অনেক মানুষ যাতে তাদের প্রয়োজনকে চাহিদায় রূপান্তরিত করতে না পারে তার যে ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক আমলেই ছিল তাকে আরও জোরদার করা। মানে, কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদ ফসলের অনেকখানি বেয়ে না ফেলে, অর্থাৎ সুদার্ত থেকে, শহরেও ও শিল্পের জন্য পাট-তুলা এবং চাল-গম-ডাল যোগান দেয় তার ব্যবস্থা করা। (২) সুদার্ত প্রমবীষী কৃষকরা যাতে বিদ্রোহ না করে, যাতে তারা শান্ত হয়ে থাকে তার ব্যবস্থা করা। এবং (৩) কৃষি উৎপাদন যাতে বাড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, কৃষির উন্নতির জন্য যাতে বিনিয়োগ হয় তার ব্যবস্থা করা।

এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কাজগুলি করা হল তা হচ্ছে : (ক) কতিপূর্ব দিয়ে জমিদারি উচ্ছেদ করে, যারা

নিম্ন হাতে চাব করে তাদের হাতে ভূমি না দিয়ে (কারণ তা হলে সব কৃষিক উৎপাদন কৃষকরা নিজেরাই খেয়ে ফেলবে!) জোতদার ও ধর্মী কৃষকরা বা অন্য দারতরা হাতে ভূমির মালিক হয় তার ব্যবস্থা করা। ভূমির মালিকরা হাতে মজুর খাটিয়ে যথেষ্ট মুনাফা করতে পারে এবং এই মুনাফার বড় অংশ আরও মুনাফার সোতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করে তার ব্যবস্থা করা। (খ) যারা দারত ছিল না, অর্থাৎ ক্ষেত মজুর এবং ভাগচাষীরা হাতে লাভ হয়ে থাকে তার জন্য অল্প কিছু ভূমি তাদের বিলি করার এবং ভাগচাষীর প্রাণ্য অংশ হাতে কিছুটা বাড়ি তার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য 'দারিত্র্য দূরীকরণ ব্যবস্থা' নেওয়া এবং (গ) কৃষি উৎপাদন হাতে ক্রমশ বেশি বেশি শহরের শিল্প নির্ভর হয় তার ব্যবস্থা করা। এর ফলে ভূমির মালিকরা ক্রমশ বেশি বেশি কৃষিক পণ্য বাইরে বিক্রি করতে বাধ্য হতে। এইসব মিশিয়েই হচ্ছে ভূমি সংস্কার। এই সব ব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশে সব থেকে ভাল ভূমি সংস্কার হওয়া রাজ্য পশ্চিম বাংলায় কী হয়েছে তা এইবার আমরা দেখবার চেষ্টা করব।

সম্পত্তির মালিকানার কেন্দ্রীভাবন

গ্রামীণ পশ্চিম বাংলায় (এবং ভারতে) বাস্তুচিটা বাসে ব্যক্তি সমস্ত ভূমির মালিকানার ধরন নিয়ে 'জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠন' এ পর্যন্ত শেষ তথ্য সংগ্রহ করেন ১৯৯২ সালে। এই তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে কৃষিজীবীসহ সব ধরনের পরিবার মিলিয়ে ৩৮.২%-এর কোনো ভূমির মালিকানা ছিল না (পুরো গ্রামীণ ভারতের পরিবারদের মধ্যে এই বকম ভূমিহীন হচ্ছেন ৩৪.১%-) সবচেয়ে নীচে এই ভাগের পরিবার মিলে হয় মোট ৫৫.৪%-পরিবার। এরা মোট ভূমির ৩.৯% ভূমির মালিক। (গ্রামীণ ভারতের নীচের দিকের ৫৮.৩%-পরিবারের হাতে ভূমির অংশ হচ্ছে ৬%-) এরা মূলত মজুর বা ভাগচাষী, বা কৃষক, কয়েকজন অ-কৃষক।

গ্রামীণ পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে উপরে আছে ১৩.২% পরিবার, এরা ৫৮.৯% ভূমির মালিক। (ভারতের ক্ষেত্রে উপরের ১৪.২%-পরিবারের হাতে ৬৮.৫% ভূমির মালিকানা।)

ভূমির মালিকানার কেন্দ্রীভাবনের ব্যাপারে তাই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান সমগ্র গ্রামীণ ভারতের থেকে খুব আলাদা কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে বেঙ্গল রাষ্ট্র দরকার যে পরিবার পিছু ভূমির পরিমাণ পশ্চিম বাংলার তুলনায় সমগ্র ভারতে মোটামুটি দ্বিগুণ। পশ্চিম বাংলায় সবচেয়ে উপরের ১৩.২%-এর মধ্যে রয়েছে ৯.১% ছোট চাষী যারা ২.৫ থেকে ৫.০ একর ভূমির মালিক; এরা মোট ভূমির ২৯.৪% (বা সমান অনুপাতে সব ভূমি ভাগ হলে স্বতন্ত্র হত তার ৩ গুণেরও বেশি) এর

মালিক। 'ছোট চাষী' হওয়া সত্ত্বেও এরা গড়ে পরিবারের প্রমের থেকে মজুরের প্রম বেশি ব্যবহার করেন। তাই গড়ে এসে চরিচর মোটামুটি 'মালিকের' মতই। উপরের দিকের পরিবারের ব্যক্তি ৪.১%-পরিবারের হাতে ২৯.৫% ভূমি আছে; এরা ৫ একরের বেশি ভূমির মালিক। এরা মূলত মজুর খাটিয়ে চাব করান।

তাই পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ পরিবারদের মোটামুটি * ৫৫.৪%-পরিবার পুরো বা প্রায় মজুর (বা গরিব ভাগচাষী); * ১৩.২%-পরিবার পুরো বা প্রায় মালিক যারা প্রধানত মজুর বা ভাগচাষী দিয়ে ভূমি চাব করান; * ব্যক্তি ৩১.৪%-পরিবার মূলত স্ব-নির্ভর বা নিম্ন পরিবারের প্রম দিয়ে চাব করেন। এরা মোটামুটি সমপরিমাণ ভূমির (৩৮.২%-) মালিক।

এই সঙ্গে ১০ বছর পরপর যে সেল্যাস হয় তার মাধ্যমে ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১ — এই তিনটি বছরের তথ্য সৌভাগ্যক্রমে তুলনীয়। এই তিন বছর এই রাজ্যে সংখ্যার নিক থেকে ভূমিহীন কৃষি কর্মীর (অর্থাৎ পুরো ভূমিহীন কৃষি মজুরের) সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২.৭২, ৩৮.৯২, এবং ৫০.৫৪ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে, এই কৃষি মজুরদের বৃদ্ধির হিসেব করলে নতুন করা যেতে পারে, ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগ থেকে ভূমিহীনতা বৃদ্ধির উত্তরতা অনেক বেশি বর্তমান পশ্চিম বাংলায়, ভূমি সংস্কার সত্ত্বেও। ১৯৭০-এর দশকে মত ভূমিহীন বেড়েছে (৬.২০ লক্ষ), তার প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে ১৯৮০র দশকে (১১.৬৩ লক্ষ)।

পশ্চিম বাংলায় নীট চাষের ভূমি ১৪০ লক্ষ একর। সমগ্র ভারতে ১৪০ মিলিয়ন হেক্টর বা ৩৪৬০ লক্ষ একর। পশ্চিম বাংলায় ভারতের মোট জনসংখ্যার মোটামুটি ৮%-মানুষ বাস করে। কিন্তু চাষের ভূমির ক্ষেত্রে এই রাজ্যের অংশ মাত্র ৪%-। কিন্তু এই রাজ্যের ভূমির বেশির ভাগ ভারতের সবচেয়ে উর্বর জায়গা, গঙ্গা নদীর অববাহিকায়। ফলে এই ভূমিতে ফলন ১৯৫১ সালে সমগ্র ভারতের গড়ের দ্বিগুণেরও বেশি ছিল। তাই ১৯৫১ সালে মাথা পিছু খাদ্য শস্য উৎপাদন সমগ্র ভারত মিলিয়ে যখন ছিল মাথাপিছু দৈনিক ৩৩৭ গ্রাম (প্রায়োজন ছিল ৫২৩ গ্রাম), তখন আলাদা করে পশ্চিম বাংলায় এই উৎপাদন ছিল ১৩%-বেশি বা ৩৮১ গ্রাম।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই ভূমির মধ্যে পশ্চিম বাংলায় ৯.৪০ লক্ষ একর এবং ব্যক্তি ভারতে ৪১.৯ লক্ষ একর গরিবদের মধ্যে কটন করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে এই দুই এলাকার মোট ভূমির যথাক্রমে ৬.৭১% এবং ১.২৪%। পশ্চিম বাংলায় ২০০০ সালে এই বণ্ডিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০.৫২ লক্ষ একর বা মোট ভূমির ৭.৫১%। এই সময় রেজিস্ট্রি হওয়া বর্গদারদের হাতে (যুব সত্ত্বকত নিজ মালিকানার ভূমি সহ) ভূমি ছিল ১১.২৭ লক্ষ একর ভূমি। অর্থাৎ ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ভূমির মালিকানা এবং ভাগ চাষের ভূমি থেকে আটকান

উচ্ছেদ বন্ধ হওয়া জমির পরিমাণ মিলিয়ে মোট (১৩.৫২ + ১১.২৭) ২১.৭৯ লক্ষ একর বাড়তি জমির উপর পুরো বা আংশিক অধিকার গরিবদের হল। এটা রাজ্যের মোট জমির ১৫.৫৬%। বাকি ৮৪% জমি ছোট বা বড় পুরনো রায়তদের মালিকানাধীন সু-প্রতিষ্ঠিত হল। জমিদাররা আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জমির মালিকানা হারাবার ভয় থেকে মুক্ত হল। ফলে জমিদারদের কল্যাণ থেকে মুক্ত হয়ে বা পুরনো জমিদাররাই নতুন অবস্থায় জোতদার ধনী চাষী হয়ে আদায়ের তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফা করার দিকে নজর দিল। কাজেই এই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যে মোট কৃষি উৎপাদন বাড়ল, তার মধ্যে বড় জোর ১৫/২০% এর জন্য দায়ী জমি পাট্টা বা বর্ণা নথিভুক্ত হওয়া গরিব চাষীরা। আগেই আলোচনা করা, ১৯২১ সালের ভূমি বন্টন ব্যবহার কণা মনে রাখলে এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ততঃ ৬০% এর জন্য দায়ী হচ্ছে মুনাফাসম্পন্ন, মজুর খাটানো মালিকরা। জমিদারি যুগের অনেক আবর্জনা থেকে গেলেও, এখন উৎপাদনের মূল ধারাটি হচ্ছে পুঁজিবাদি উৎপাদন পদ্ধতির।

ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক-জমিদারী উৎপাদন পদ্ধতির বদলে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে যে মূল পরিবর্তনগুলি হল তা হচ্ছে :

১। প্রায় নাটকীয় ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি। স্বাধীনতার পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা 'বিক্ষেপণ' ঘট্য সম্ভেও, মাথা পিছু উৎপাদনও উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ল। পশ্চিম বাংলায় ১৯৫১ থেকে ১৯৯৯র মধ্যে বেড়েছে ২০.২%; মাথা পিছু দৈনিক ৩৮১ থেকে ৪৫৮ গ্রাম। বাকি ভারতে কৃষ্টিটা বেশি : ৪৯.৪%; মাথা পিছু দৈনিক ৩৩৪ গ্রাম থেকে ৪৯৯ গ্রাম।

২। ভূমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি। ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও, দেশের একটা বড় অংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অন্ততঃ আনুগত্যিক ভাবে বাড়ল না। ফলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বাড়ল। অথুনা 'অধিক উৎপাদনের সঙ্কট' সৃষ্টি হল; একদিকে কয়েক কোটি ক্রয়ক্ষমতাহীন অর্ধভুক্ত মানুষ এবং একই সঙ্গে অন্যদিকে কয়েক কোটি মের্কটন ব্যাপ্যসম্মত সরকারি শুদামে রেখে নষ্ট করার ব্যাধাব্যবস্থা সৃষ্টি হল। যা প্রথমে উৎপাদনী শক্তিকে বড় এগিরে নিয়ে গিয়েছিল তাই এখন টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির পথে একটা বাধা হয়ে দাঁড়াল। সমাজের হার্বের দিক থেকে এই নতুন ব্যবস্থাও ক্রমশ একটা জঞ্জালে পরিণত হয়ে উঠল।

৩। 'সবুজ বিপ্লবের' আমল থেকেই কৃষি উৎপাদনকে ক্রমশ বেশি বেশি বিদেশী উপাদান (সার ডিঙ্গেল ইত্যাদি, বা ঐ উপাদানদের কিছুটা দেশে তৈরির জন্য বিদেশী যন্ত্রপাতি এবং টেকনোলজির উপর নির্ভরতা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া। এর ফলে একই সঙ্গে আমরা দূষণ বৃদ্ধির শিকার হচ্ছি, টেকসই উৎপাদন

পদ্ধতি থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছি, এবং দ্রুতগতিতে বিদেশী শুল্কির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। চলতি উৎপাদন ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪। একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা সু-স্বাদ্যবান। এর মূল ধারক হচ্ছে ব্যবহার করে লাভ হয় না বলে ফেলে রাখা, নষ্ট করা একটা বিশাল উৎপাদনী শক্তি। এর মধ্যে একদিকে পড়ে বাধা হয়ে অসল থেকে নষ্ট করা কয়েক হাজার কোটি স্রম-দিন বা সমস্ত ভারতে গ্রাম পিছু গড়ে বছরে ৩৭,০০০ জন-দিন। এর অন্যদিকে পড়ে সমগ্র ভারতে কয়েক কোটি মডে যাওয়া পুকুর এবং খাল-বিল-নালা, সমতল না করতে পারা চাষের জমি, কয়েক কোটি একর পতিত জমি, কম্পোষ্ট ও সবুজ সার তৈরির স্বাধীন সম্পদ বা এখন ব্যবহার হয় না ইত্যাদি। এই বিশুল উৎপাদনী শক্তির এখন ব্যবহার হয় না কারণ এই সব ব্যবহার করলে মালিকদের লাভ হয় না। আর সবকিছির পরচে এর একটা ভাণ্ডার ব্যবহার করার ক্ষমতাও সবকালের নেই।

এই একবিধে শতাধীতে এখন আমাদের মূল সমস্যা হবে আর্থনির্ভরশীলতা ফিরে পাওয়া, দেশকে দূষণ মুক্ত করা ও রাখা, এবং চিরতরে দারিদ্র্য দূর করা। এই তিনটি কাজই একসঙ্গে সম্ভব যদি ঐ অসল করে ফেলে রাখা উৎপাদনী শক্তিকে তার চলতি বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া যায়, সুদৃঢ় ভাবে ব্যবহার করা যায়। এই বন্ধন হচ্ছে মুক্তির্মের হাতে অধিকাংশ জমির মালিকানা থাকা এবং মজুর খাটিয়ে মুনাফার জন্যই উৎপাদন করা।

কৃষিতে এই বন্ধন মুক্তির উপায় হচ্ছে 'যারা নিজ হাতে জমি চাষ করে একমাত্র তাদেরই জমির মালিক হওয়া', মালিক-মজুর সম্পর্ক থেকে গ্রামীণ সমাজকে মুক্তি দেওয়া; এবং এনই সঙ্গে মুনাফা সৃষ্টির ব্যাধাব্যবস্থা থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্তি দেওয়া ও সকলের প্রয়োজন মেটানো যাতে উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হয় তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ একটা ভিন্ন ভূমি সংস্কার করা।

এই ভিন্ন ভূমি-সংস্কারের স্বপ্ন আমাদের দেশের কৃষকরা স্বাধীনতার আগেই দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই পথ থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতার পরে। এখন শুধু গরিব কৃষককে নয়, দেশকে বাঁচাতে গেলেও সর্বাত্মক প্রয়োজন ঐ পুরনো স্বপ্নকে ব্যস্তব্যস্ত করা। আজকের দিনে ঐ কাজ করার মূল কথা হবে যে পুঁজিবাদি ব্যবস্থা আজ একটা জঞ্জালে পরিণত হয়েছে তা দূর করে দিয়ে দেশকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ় পথে এগোনো এবং এই পথে যেতেই পুরনো জমিদারি আমলের যে সব জঞ্জাল এখনও রয়ে গেছে তাকেও দূর করা। একটা নতুন সাম্য ভিত্তিক, দূষণ-মুক্ত এবং স্ব-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। একটা ভিন্ন ধরনের নতুন ভূমি-সংস্কার দিয়ে এই পথে যাত্রা শুরু করা।

‘শান্তির জন্য পরমাণু’র কথা এখন আর কেউ বোকার মতও বলে না। চীন জাপান লিথুয়ানিয়ার মত কয়েকটি এশির দেশ বাদ দিলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই আর নতুন করে পরমাণুকে প্রয়োগে বসাতে না, বরং বাতিল করছে এক এক করে। আমাদের ভারত কিন্তু পোষারনে দু’দুটো সফল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত গর্বিত। যদিও ভারতের মানুষ প্রতিবাসে মুখের হয়েছে, বিশেষ করে পোষারান কাণ্ডের পর। যাদের শত্রুতার অঙ্কুরাত দেবিষে ভারত এই অপশ্রমুত্তির পেছনে অর্থবরাদ্দ বাড়িয়ে, সেই প্রতিবেশী পাকিস্তানও কিন্তু বহুশত্রুসংগ্রামের জীবন-যাত্রার ভোয়ালতা না করে পালা দিতে চাইছে এই যাত্রাভঙ্গ প্রমুত্তিতে নিয়ে। কিন্তু পাকিস্তানের মানুষ কি চাইছে? তাদের বরং সহজে বোঝায় না। সেই কঠিন কাজটি করেছে প্রখ্যাত বহীরাণ সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক নিরঞ্জন হালাদার। অত্যন্ত অসুস্থ শরীর নিয়েও এই অনুবাদ-রচনাটি তিনি পাঠিয়েছেন উৎস মানুষের জন্য। স. উৎস মানুষ

পাকিস্তানে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজন নেই

গত ২৯ মার্চ চাশমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। এ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের বিখ্যাত নাজম মুস্তাক পরমাণু বিজ্ঞানীদের একজন ডঃ ইশফাক আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন যে, তাঁরা এখন সাত বছরের মধ্যে আর একটি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম। পাকিস্তানের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প কানুপের কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯৭২ সালে। ডঃ ইশফাক আহমেদ আরও বলেন, আর একটি পরমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পাকিস্তানের আর তিরিশ বছর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আমরা আশা করছি ‘অল্পদিনের মধ্যে তৃতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে পারব।’

পাকিস্তান যদি সাত বছরের মধ্যে বা তারও আগে চাশমার মতো আর একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করে, তাহলে কেউই অস্বাভাবিক হবে না। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রযুক্তির বয়স কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের মতো এবং পৃথিবীর মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১৭ শতাংশ পরমাণু-বিদ্যুৎ। পাকিস্তানের জনগণের নিকট আগতাজনক হচ্ছে, দেশের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য আমরা কি এ পথ নেকো? আমাদের কি আরও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র দরকার? পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কে সবচেয়ে কম উৎপাদন ব্যয়ের বিদ্যুৎ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু একই সঙ্গে একথা বলা যায় যে, এই গ্রহ এবং বসবাসযোগ্য পরিবেশের নিকট পারমাণবিক বিদ্যুৎ সবচেয়ে বিপজ্জনক। বিজ্ঞানের এই বিভাগে আশ্চর্যকর উন্নতি সত্ত্বেও, পারমাণবিক উৎপাদন ব্যবস্থা, বিশেষ করে পারমাণবিক আবর্জনা সম্পর্কে বিশ্ববাসী দুশ্চিন্তা রয়েছে। ‘নিরাপদ’ পারমাণবিক কর্মসূচি বলে কি কিছু আছে? থাকতে পারে? পারমাণবিক বিদ্যুৎ নিয়ে ইউরোপের অনেক দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের পাশে হয়ে পারে। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে জার্মানির মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩০ শতাংশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ, ফ্রান্সের ৭৫ শতাংশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ। (পাকিস্তানের মোট বিদ্যুতের এক শতাংশেরও কম পারমাণবিক

বিদ্যুৎ।) তাদের অনেক উন্নত ধরনের বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞতা, কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, প্রতি পদক্ষেপে গোপনীয়তাকে বিদ্যায় এবং জনগণের নিকট জবাবদিহির ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইউরোপীয়েরা এখনও পরমাণু-বিদ্যুৎ সম্পর্কে সন্তুষ্ট।

মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ফ্রান্স থেকে পারমাণবিক আবর্জনা-ভর্তি অনেকগুলি ট্রাক জার্মানির এলবে নদীর তীরে ‘অস্থায়ী মজুত রাখার কেন্দ্রে’ আসছিল। জার্মান গ্রীন পার্টির কর্মীরা গাড়ির সামনে লাইন করে দাঁড়িয়ে ট্রাকগুলির যাওয়ার পথ আটকে দিচ্ছিল। ফলে ঐ পারমাণবিক ট্রাকগুলির ২০ মাইল যেতে চার দিন লাগে। ঐ পরমাণু আবর্জনার প্যাকেটগুলি কয়েকশো বছর ধরে স্থায়ী অধিবাসীদের নানা রোগের কারণ হবে। ইউরোপের কোনো দেশে, এমনকী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে পরমাণু-আবর্জনা স্থায়ীভাবে জমা করার ব্যবস্থা নেই। আবর্জনা সংরক্ষিত স্থানে মজুত রাখার বর্তমান ব্যবস্থাকে ‘নিরাপদ’ আখ্যা দিতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মত-বিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে, পুরনো গ্রানাইট পাথর বা কয়লা বর্নি পরমাণু আবর্জনা মজুত করার সবচেয়ে নিরাপদ ভাণ্ডার। তাবার অনেকে মনে করেন, নুনের বর্নি প্রকৃতি ভাণ্ডার।

পাকিস্তানের পরমাণু আবর্জনা কোথায় স্থায়ীভাবে মজুত করা যাবে? পাকিস্তানের পরমাণু চুল্লি এবং চুল্লির ঐচ্ছামাল তৈরির ঘরপাতিগুলিতে কি কখনও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি? গোপনীয়তার পরা কি কখনও সত্যিয়ে সেওয়া হবে? এই ভীতিজনক পরমাণু-চুল্লিকে বাতিল করে আমাদের কি হাওয়া ও জল থেকে ক্ষুধ্র আকারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মসূচি নেওয়া কখনও সম্ভব হবে না? পারমাণবিক চুল্লির বরচ কত, তা এখনও রহস্যজনক এবং চুল্লির বেসামরিক ও সামরিক পরিচালকদের কখনও জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। (পাকিস্তানে ‘দি নিউজ’ দৈনিকে প্রকাশিত)

অনুবাদ : নিরঞ্জন হালাদার



মানুষ, ঈশ্বরদর্শন ও মনোবিজ্ঞান

এই পৃথিবীতে দু'ধরনের মানুষের বাস। একদিকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যুগ যুগ ধরে চলে আসা সীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি প্রমাণীত অসুখগত পোষণ করে। অন্যদিকে নিতান্তই অল্পসংখ্যক কিছু মানুষ যুক্তি আর বিশ্লেষণের নিরীখে সভ্যকে যাচাই করার স্পর্শা সেখায়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, এই শেষোক্ত মানুষদের জন্যই মানবসভ্যতার উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

সভ্যতার উদ্ভাবনে মানুষ ছিল প্রকৃতির কাছে অসহায়। কড়-বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল, অগ্ন্যুৎপাত, বজ্র-বিদ্যুৎ, মহামারী—এ সবই ছিল তার কাছে বিবীকিকা। এগুলো কেন ঘটে, তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মানুষের কাছে ছিল না। তাই সে গুহ-অগুহ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করল, সবকিছুতেই প্রাণ আরোপ করল, কল্পনা করে নিস অজানা সবকিছুর নেপথ্যে এক সর্বশক্তিমানের উপস্থিতি। এভাবেই মানুষের হাতে ভস্ম হল ঈশ্বরের। ঈশ্বরই এই সৃষ্টির সবকিছুর রচয়িতা, আবার তিনিই এর সংহারকর্তা—এই বিশ্বাস অনির্ণেয় ভয় আর অসহায়তার কেন্দ্রে মানুষের সাহুনা হয়ে উঠল।

এর বিপরীতে, বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে সেই আদিম যুগ থেকেই কিছু মানুষ প্রকৃতির অসীম রহস্য উন্মোচন করার আগ্রহ দেখিয়েছে। অনুসন্ধিৎসা, যুক্তি আর বিশ্লেষণী ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে সে আশুন ক্রমাগতে শিখেছে, নবীত বীধ দিয়েছে, কৃষিকাজ আর খাত্তর ব্যবহার জেয়েছে, শিচ্ছে চাকার ব্যবহার। এইভাবে একটু একটু করে প্রকৃতির গোপন খবর উন্মোচিত হবার সাথে সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন আর সন্দেহ দেখা দিতেও শুরু করেছে।

কিন্তু ততদিনে সমাজ শ্রেণীবিন্যস্ত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুষ্টিমেয় মানুষের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শোষণ। এই শোষণ বজায় রাখার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এল পুরোহিত আর ধর্মচক্রর দল। এরা ছিল বহোবিস্ত ঈশ্বরের দূত। এদের অনেকেই দাবি ছিল যে, তারা ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছে, ঈশ্বরের বাণী শুনেছে।

কিন্তু শুধু এরাই নয় যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত শোষণ, সামাজিক অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে যারা ধর্মকেই হাতিয়ার করে বিদ্রোহ করেছেন, তাঁদের অনেকেও ঈশ্বরকে দেখেছেন বলে খ্যাত। এরা কিন্তু ভগ্ন বা প্রত্যাহার ছিলেন না। হীরা, মহাশয়, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণসেব, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মহাপুরুষের ঈশ্বর দর্শনের ব্যাখ্যা তা হলে কী?

রাজেশ দত্ত তাঁর 'মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্বর দর্শন' গ্রন্থে এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। মানুষের চেতনা, তার বিভিন্ন অনুভূতি ও তা মানসিক গঠনের বিভিন্নতা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। মানুষের স্নাত্ত্বত্ব কীভাবে কাজ করে, কীভাবে আমাদের চেতনায় প্রত্যাক ও পরোক্ষ ধারণাগুলি জন্ম নেয়, কীভাবে মানুষের স্নাত্ত্ব অনুভূতিগুলি গড়ে ওঠে — তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে লেখক ঈশ্বর দর্শনের কলকাহিনীর মূলে কুঠারাখাত করেছেন। সহজভাবে বিভিন্ন জটিল মনোরোগের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে লেখক ঈশ্বর দর্শনের নেপথ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে তার বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন।

গ্রন্থটির প্রধান গুণ হল এই যে, একটি জটিল বিষয়কে—যার অনেকখানি ছুড়ে আছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিশ্লেষণ—লেখক সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থিত করেছেন। বহু উদাহরণ ব্যবহার করে লেখক সাধারণ পাঠকের কাছে আলোচ্য বিষয়কে চমৎকারভাবে গ্রাস্তল করে তুলতে পেরেছেন। যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীদের ও মুক্তমনের মানুষদের কাছে গ্রন্থটি প্রমাণীতভাবে সহায়ক হয়ে উঠবে।

বর্তমান সময়ের জটিল আর্থ-সামাজিক অবস্থার চাপে সাধারণ মানুষ আজ নিশাহারা। একে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে নিতা নতুন 'বাবা'র আবির্ভাব ঘটছে। জ্যোতিষী-তান্ত্রিকের দল আজ বাজার ছেয়ে ফেলেছে। এই ভণ্ডামি ও প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো সত্যিই দুঃসাহ। লেখক সেই কঠিন সংগ্রামের এক নির্ভীক সৈনিক। এই গ্রন্থটি রচনার জন্য তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

পৃথীশ বন্দ্যোপাধ্যায়

'মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্বরদর্শন'

অথ ঈশ্বর-প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা

লেখক - রাজেশ দত্ত

প্রকাশ - অক্টোবর ১৯৯৯

প্রকাশক - ব্যাডিক্যাল ইন্ড্রেশন

৪৩, বেনিয়াটোলা সেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

দাম- ৩০ টাকা

গল্প দিয়ে বিজ্ঞান

এখনকার ছোট্টা হযত তেপান্তরের মাঠে ঘোড়া ঘোড়ানো রাজপুত্র, ব্যাস্মা-ব্যাস্মি আর সাতমহলা রাজ- প্রাসাদের রাজকন্যার গল্প শোনে না, তা বলে গল্প শোনে না এটা ঠিক নয়। এখন ওদের হাতে ফ্যাটম, কমিকসের রঙিন বই। কখনো বা মাউসের ট্রিকে গোটানুয়ার জ্ঞান-সমুদ্রের অফুরান ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের চাবিকাঠির মূলেও রয়েছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান শিখতে হয় খুলে থাকতেই। তবে যে পদ্ধতিতে শেখানো হয় তাতে শিকার ও জ্ঞানার আগ্রহ যায় হারিয়ে। অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন অনেকেই, এখনও চেষ্টা চলেছে। তবুও কোথাও যেন একটা কিছু অত্যাচার। বিজ্ঞানের লেখা আজও ভেমন জনপ্রিয় নয় এখানে। এখনকার সবাই কুতূহল বা রহস্য-রোমাঞ্চের গল্প পড়তে যতটা ভালোবাসে ততটা ভালোবাসে না বিজ্ঞানকে। অথচ, বিজ্ঞানের এক-একটা আবিষ্কার — যা কিনা আমাদের এই চেনা-জানা দুনিয়াটাকে আমূল বদলে দিয়েছে, সেই আবিষ্কারের নেপথ্য কাহিনী যে কোনো রহস্য-রোমাঞ্চের গল্পের চেয়েও বেশি রহস্যময়, বেশি রোমাঞ্চকর। সেই রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলোই ডাঃ তাপস ভট্টাচার্য একেবারে সরল করে হাজির করেছেন তাঁর 'বিজ্ঞানের গল্প-গল্পের বিজ্ঞান' বইটিতে। শুধুমাত্র গল্পের ওলোই পড়ে ফেলা যার সবগুলো লেখা। লেখক বারে-বারেই চেষ্টা করেছেন গল্পের মধ্য দিয়ে যতটা পারা যায় বিজ্ঞানকে জানিয়ে দিতে, চিনিয়ে দিতে। তবে, বিজ্ঞান সেই অর্থে হাজির হয় নি কোনোবান্দেই। বইটি পড়ে ভালো লাগবে ইতিহাসপ্রেমী ছাত্র-ছাত্রীদের। সমাজের পটভূমিতে ধাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কার কী তাৎপর্য বহন করছে, তা জেনেও পাঠকদের ভালো লাগবে। যদিও লেখক বইয়ের প্রথমেই স্বীকার করেছেন কোনো লেখাই মৌলিক নয় — তবুও পুরো বইটা ছুড়েই এ কোথটা বড় নাড়া দেয় মনকে। আমাদের দেশের ইতিহাসে, সামাজিক প্রেক্ষাপটে কত বিজ্ঞানীর নানান চমকপ্রদ বিজ্ঞানের কাহিনী ছড়িয়ে আছে। তার থেকে দু-একটা যদি স্থান পেতো, তবে ভালো লাগত। সবই বিদেশী গল্প। কথবার কথিত ও লিখিত গোটানুয়ার ইতিহাস।

বিজ্ঞানের গয়ে, গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি অনেক ক্ষণপায়। অনেক সময়ই মনে হয়েছে শুধুই ইতিহাসের

গল্প এটা। এতে বিজ্ঞান কোথায়? বেশ কিছু লেখায় যেভাবে শরীর আর স্বাস্থ্য এসেছে, তা যদি আরও একটু বিজ্ঞানভিত্তিক হতো, খুব ভালো হত। শরীরের কথায় প্রোটিনের কথা এসেছে, বলা হয়েছে নুনের প্রয়োজনীয়তা। দাঁতের কথা বলতে গিয়ে দাঁতে ব্যথা, দাঁত ভাঙা নিয়ে গোটানুয়ার এককুড়ি গল্প। দাঁত চুবি, দাঁত নিয়ে ব্যবসা — সবই আছে সেখানে। সবার শেষে আছে দাঁত ভালো রাখার উপায় নির্দেশ। কিন্তু, যে দাঁতের পোকা নিয়ে এই গল্পটির শুরু হল, তা লেখক বেমানম ভুলে গেলেন। দাঁতের পোকা আসলে কী, কিভাবে দাঁতে পোকা হয় — 'আসৌ যে দাঁতে পোকা বলে কিছু হয় না' — এসব তথ্য আরো সুন্দর করে দেওয়া যেতে পারত অনায়াসেই। বইটির প্রচ্ছদটি খুবই স্বকণ্ঠক। ডেভরের ছাপাও সুন্দর — ছবিগুলোও গল্প অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক।

সোমা বসু

'বিজ্ঞানের গল্প - গল্পের বিজ্ঞান'

লেখক - ডা. তাপস ভট্টাচার্য

প্রকাশ - জ্ঞানুয়ারি, ২০০১

প্রকাশক - মর্ডান কলাম

১০/২৫ টেমার সেন, কলকাতা-৯

দাম - ৫০ টাকা

"এজেন্ট চাই"

উৎস মানুষ পত্রিকা ও গ্রন্থের পরিবেশক বা এজেন্ট চাই। সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে ২০% কমিশন দেওয়া হবে। পত্রযোগে যোগাযোগের ঠিকানা — বি ডি ৪৯৪, সেন্ট লেক, কলকাতা ৬৪।

টেলিফোনে যোগাযোগ :

২৪৪ ২১৩৬

দুপুরে

৪৬৬ ৯৪৩৫

৩৩৪ ০৯০৪

৩৪৩ ৪১২৫

সকাল ও সন্ধ্যায়

জ্যোতিষের বিপদ

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিদ্যমানকর অগ্রগতি মানুষকে যে আভ্য সত্য সত্যই 'মহাকাশ যুগে' এনে ফেলেছে। বিশ্ব-সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে আলোকপাত, উদ্ভা-ধূমকেতুর জন্মবৃত্তান্ত, শুক্র ও মঙ্গলের আবহাওয়া বিশ্লেষণ, ছায়াপথ-সীহ্রিকার গতিপ্রকৃতি, কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যুর সচিত্র বিবরণ — মহাকাশ যুগে মহাকাশ জয়ের এক একটা মাইলস্টোনের ছবি লাইভের পর লাইভে সাক্ষিয়ে সাদা পর্দার ওপর এক স্বপ্নময় বাস্তব রঙিন অগংকে উপস্থাপিত করলেন খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ড. অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকাশ চর্চার প্রাচীনতম যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ক্রমোন্নতির ইতিহাস নিবিষ্ট দর্শকবৃন্দের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের অননুক্রমীয় বিশ্লেষণধর্মী ধারাবাহ্যিক। জ্যোতির্বিজ্ঞানের হাতে-কলমে পরীক্ষিত অগুনতি সত্যের চ্যালেঞ্জের সামনে মানুষের জীবনের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের ওভাড ভ প্রভাব, গ্রহণ ও উদ্ভাপাত সম্পর্কিত সংস্কার ও প্রান্ত বিদ্যাস, রশ্মিচক্র-কোষ্ঠিচক্র-জ্যোতিষের জন্মসময় গণনা ইত্যাদির দ্বারা রচিত কিংবদন্তী ও ধূসংস্কারের মিথ্যার অগংটি অসহায়ভাবে ভেঙ্গে পড়ল তো বটেই, জ্যোতিষশাস্ত্রের কাঁচা ডিমের ইমারতটিও গেল ধ্বংসে। প্রমাণ হয়ে গেল, জ্যোতিষশাস্ত্রের পুরোটিই ভাঙতা আর বৃজকণিকা ড. বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানমঞ্চে মূচুরে জানালেন, জ্যোতিষশাস্ত্রকে একটি বিষয় হিসেবে উচ্চতর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার যে সুপারিশ সাম্প্রতিক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন করেছে, এমন ঘটনার নজির পৃথিবীর অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নেই। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তত্ত্ব ও তথ্যকে জন-সাধারণের সামনে হাজির করে এই সুপারিশ তথা সামগ্রিকভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনমত গড়ে তোলার আহ্বান আজকের সময়ের দাবি, জানালেন তিনি। লাইভ শো-এর পর প্রয়োজ্যের পর্বে গ্রহ-রত্ন দিয়ে জ্যোতিষীদের সেকটুকানো ব্যবসা এবং মহাজাগতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত দর্শকদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। ২১ এপ্রিল, ২০০১ বিকেলে চন্দ্রনগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমণির সভাপণে অনুষ্ঠিত এই সর্বাসম্মেলন অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিল চন্দ্রনগরের বিকর্তন বিজ্ঞান সঙ্ঘ ও ভারতের মানবতাবাদী সমিতি।

প্রতিবেদক — সৌমির বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাপ্তিসংবাদ

- কয়েকটি লেখা। জয়ন্ত বসু। প্রকাশ-নভেম্বর ২০০০। প্রকাশক - এন ঘোষ : ২০১ শিবপুর রোড, হাওড়া ২। দাম ৫ টাকা।
ছোট্ট চিঠি ১৪ পৃষ্ঠার বই। প্রচ্ছদ থেকে পেছনের মসৃট অর্ধদিক ফটফট সরল, অনাড়ম্বর। ইয়াতো বা লেখক নিজের পকেটে থেকেই সব ছাপাছাপির বরচ বহন করেছেন কেবল কয়েকটি পড়ার মত রচনা পাঠকদের পড়ানোর মানসিক তাগিদে। 'কয়েকটি লেখা' ৬টি মাত্র ছোট প্রবন্ধে সংকলন। লেখাগুলির কয়েকটির বিষয় পূর্ব পরিচিত। যেমন — বন্যা, মৃত্যু ব্যবসার পারমাণবিক কারবারি। কয়েকটি নতুন তথ্য ও বিশ্লেষণ উল্লেখকারী লেখাও আছে, যেমন — নেপথ্য নায়ক শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথেরা, দ্বন্দ্বতত্ত্ব বুদ্ধ ও রামকৃষ্ণ। ছোট্ট বই, কিন্তু পড়তে সময় দিতে হবে কারণ ভাবনার রসদ আছে।
- স্বপ্ন আপাতত বাতিল — মৃণাল সেন/প্রকাশ - বইমেলা ২০০১/প্রকাশক - নৈর্জতা, কলকাতা ৩৯। সম্পাদনা - সবুজ মুখোপাধ্যায়/ দাম - ৩০ টাকা (পেপার ব্যাক), ৫০ টাকা (বোর্ড বাঁধাই)।
মৃণাল সেন ছবি বানাতেন আর স্বপ্ন দেখতেন, দিন বদলের। দিন বদল অবশ্যই হয়েছে কিন্তু এই বদল তাঁর স্বপ্নের নয়, তাই এই বদলের বিরুদ্ধে তাঁর দৃষ্টি কঠোর ঘোষণা স্বপ্ন আপাতত বাতিল। তাঁর একান্ত কিছু কথা, তাঁর কিছু স্বপ্নের কথা জানা যায়। তাঁর কিছু ছবি করা বা না-করা নিয়ে অনেক কথাই জানিয়েছেন এই ইন্টারভিউ-ভিত্তিক বইতে।
ইন্টারভিউ নিয়েছেন শমিতা চট্টোপাধ্যায়। মৃণালবাবুর নিজস্ব হস্তাক্ষরে ছাপা নিজের কিছু কথা রয়েছে প্রথম ছপপাতা জুড়ে, যেমন ২০০১ পশ্চিমবাংলা এবং আমি; আমার ছেলেবেলা ১, ২ ; আমি এখন ; আগামী ছবি ; আমি ও আমার স্বপ্ন।
বইটির প্রচ্ছদে কা কভারে মৃণাল সেন-এর ছবি ও স্বাক্ষর থাকায় বইটি একটি আলাদা মাত্রা পেয়েছে।
প্রাপ্তিস্থান - বুকমার্ক (কলেজ স্ট্রীট), অহনায়ন (গড়িয়াহাট মার্কেট)।



'বনের খবর' পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর হুঙ্কা হয়ার কথা মতো আমি কিছু কিছু মিচির প্রথমেই এলেন শহরের এক চিড়িয়াখানা।

'বাপ রে', এটা এদের চিড়িয়াখানা! এ তো ছোট-খাটো একটা দেশ দেখছি! কী করেছে মানুষগুলো! পারেও ওরা। বাব্বা!।' নিজের মনেই বলতে লাগলেন কিচির মিচির।

'পত্ন্যরাজের বাঁচটা কোথায় রে বাবা! এদিকে নিশ্চয়ই নয়। কারণ এদিকে তো দেখছি হাতি আর জিরাফ। মনে হচ্ছে ও দিকটায় হবে।'

'হ্যাঁ, এখানেই হবে। ওই তো পত্ন্যরাজ! পাখচাচি করছেন। পাশাপাশি বাঁচায় ওঁরা মনে হচ্ছে প্রায় সাত-আটজন আছে।'

'মানুষবা পারেও বটে। জঙ্গল থেকে বনের রাজাকে ধরে এনে বাঁচায় পুরে রেখেছে।'

পত্ন্যরাজ লজ্জা করে একটা হাই তুলছিলেন। এমন সময় শুনেলেন, কে যেন মিহি গলায় বলছে, 'স্যার! আপনার একটা ইনটারভিউ নিতে চাই। আমি মিসু কিচির মিচির।' 'বনের খবর' পত্রিকার সাংবাদিক।

হাইটা ভাল করে তুলতে পারলেন না পত্ন্যরাজ। রেগে কঁপে। বাঁচার আড়ালাটা না থাকলে, ওই হাইতেই ট্যাবলেটের মতো গিলে ফেলতেন কিচির মিচিরকে।

বাজবেই গলায় পত্ন্যরাজ বললেন, 'গেট অউট! ভাগো হিটাসে।'

কিচির মিচিরের বুকের ভেতরটা খুঁক খুঁক করতে লাগল। জীবনে কখনও সিংহের এত কাছে আসেন নি। বনেও না। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'স্যার, বিশ্বাস করুন। আমি বন থেকে আসছি। আমি লোকালয়ের শালিক নই। আমার কথা শুনেও কি আপনি বৃথতে পারছেন না?'

পত্ন্যরাজের মন একটু যেন নরম হল। মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণা, একটা ছটফটনি। বললেন, 'যা বলার ইংরাজিতে বল। আমি বাঙালি নই। অফ্রিকান। তুই আমায় দেখে বৃথতে পারছিস না সেটা? অজ্ঞান আহায্যক তো?'

বুকে একটু বল পেলেন কিচির মিচির। বললেন, 'স্যার, আসলে আমারই ভুল হয়েছে। বাগো আপনি বুঝবেনই বা কী করে? বাংলা দেশে আর সিংহ কোথায়? যা আছে, এই চিড়িয়াখানায়, সার্কাসে আর জাদুকরদের বাঁচায়। আর আপনার প্রায় সবলেই অফ্রিকান। ভারতের গির অরণ্যে আপনার পরিবারের প্রায় দুশো জনের মত সদস্য থাকেন।

বনের পাখিকে দেখে, বৃক পত্ন্যরাজের মনটা একেবারে ও-ও করে উঠল। বললেন, 'বনের কী খবর? সবাই ভাল আছে? বনে কি আর সিংহ আছে? না কি সব কটাতেই সাবাড় করেছে এই হতভাগা মানুষগুলো?'

কিচির মিচির বেশ একটু সাহস পেয়েই বললেন, আর হ্যাঁ, চোখু ইংরাজিতেই বললেন, 'না স্যার। মানুষ এখনও সব সিংহকে মারতে পারেনি। এখনও বনে সিংহরা আছেন। তবে কিনা, আপনার ওই অফ্রিকানেই বেশি।'

'যেটো মন্দ নয়। মানুষদের গুপ্তচর-টর বলেও তো মনে হচ্ছে না।' আরও নরম হন পত্ন্যরাজ। 'তুই' থেকে একসাথে একেবারে 'আপনি'তে উঠে আসেন।

পত্ন্যরাজ বলেন, 'কিছু মনে করবেন না ম্যাডাম। আসলে এই মানুষগুলো এত জ্বালায় না, মেজাজ ঠিক বাখা যায় না। আপনাকে দেখে আমি ডেবেছিলাম মানুষগুলোই আপনাকে পাঠিয়েছে। নতুন কোনও যন্ত্রি টমি আছে ওদের।'

কিচির মিচির বললেন, 'স্যার, আমি কি শুক করব?'

পত্ন্যরাজ হাই তুলে, হাজার দিয়ে, বললেন, 'বেশি বৃথতে পারব না। যা বলার — তাড়াতাড়ি বলুন। আর ছোট করে বলুন।'

সাইড ব্যাগ থেকে প্রথমত বার করেন কিচির মিচির। লিখেই এনেছেন প্রশ্ন। যদি তুল হয়ে যায়?

'কলিলাম কি স্যার, এখন কেমন আছেন?' নতুন-কটে প্রশ্ন শুক করেন কিচির-মিচির।

পাঁও-মুখ ঝিঁচিয়ে, তেড়ে আসেন পত্ন্যরাজ। বলেন, 'দেখছেন না কেমন আছি? এটাকে ভাল খালা বলে? এটাকে বাঁচা বলে? যেটা ধরে গেল এই সিংহ-জীবনে। আর যেটা করি এই হতভাগা মানুষগুলোকে।'

'কিন্তু কেন?' ছোট করে বললেন কিচির মিচির।

পত্ন্যরাজ বললেন, 'আমরা বনের পত্ন্য। বনেই ভাল ছিলাম। আমাদেরকে বনেই মানায়। এখানে নয়। মানুষদের মধ্যেও কে একজন ভাল মানুষ সেদিন আমার বাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'বন্যরা বনেই সুন্দর। এরা বনের পত্ন্য। এসবকে এভাবে বাঁচায় আটকে রাখা অন্যায়। ভাবী অন্যায়।' মানুষদের মধ্যেও তো অনেক দরদী মানুষ আছে।'

'ঠিকই বলেছেন সেই মানুষটি।' আবার ছোট্ট মন্তব্য কিচির মিচিরের। এই ক-দিনেই একজন ভাল সাংবাদিকের গণগুলো বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছে।

পত্ন্যরাজ রাগে গরগর করতে করতে বললেন, 'জানেন,

এসের পাঞ্জায় পড়ে কোমরে বাত ধরে গেল। বনে আমি কী সৌন্দর্যই সৌভাগ্য। ঘটায় চম্পন-বিরাগিন্স কিলোমিটার সৌভাগ্যই আমার কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। মজাভানে ঘট-পয়ষষ্ঠি কিলোমিটারও সৌভাগ্যই।

যখন যেমন ইচ্ছে, শিকার ধরেছি। দল বেঁধে থাকতাম। বাঘদের সঙ্গে আমাদের ভাড়াতটা কী, তা জানেন?’

এবার সাংবাদিকের দিকেই প্রয়োগের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন পতরাজ।

কিচির মিচির সপ্রতিভ। বুঝে বললেন, ‘ভানি। বাঘ আর সিংহ — দুজনেই বিভীষণ পরিবারের প্রাণী হলেও, আপনারদের সঙ্গে ফুকুর পরিবারেরই মিল বেশি। বাঘ একা একা থাকেন। আপনারা দল বেঁধে থাকেন। পুরুষ, মহিলা আর বাচ্চা-কাচ্চা মিলে আপনারাদের এক একটা দলে দল থেকে তিরিশ জন সদস্য থাকেন। ফুকুররাও দল বেঁধে থাকেন।’

‘তবেই ফুকুর।’ পতরাজ বলেন, ‘পরিবারের সবাইকে ছেড়ে এখানে এভাবে একা একা থাক। জেলখানার কর্মসিঁদর মতো। কেন রে বাবা? আমরা ওদের কী পাকাধানে মই দিয়েছি? চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি, যে এভাবে আমাদের আটকে রেখেছে?’

‘আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।’ কিচির মিচির কলোনে।

‘এই তো দেখুন না, আপনি তো পাখি। ভগবান আপনারকে এক-কোড়া ডানা দিয়েছেন। এমনি এমনি নয়। আকাশে ওড়ার জন্য। আপনারা যদি কেউ এভাবে বাঁচার বশি করে রাখেন, তা হলে আপনার কেন লাগবে?’

‘সেই বাবা রে’ মরেই যাব তা হলে। তাহলেই পারি না এই বশি-জীবন।’ কিচির মিচির একবার এসিক ওসিক চেয়ে নেন। কেউ ধরতে আসছে না তো? মানুষগুলোকে বিশ্বাস নেই।

পতরাজ বলেন, ‘দেখুন, জঙ্গলে নানারকম বিপদ আছে — মানহি। সব সময় লড়াই। বাঁচার লড়াই। টিকে থাকার লড়াই। রোজ খাবারও জোটে না। একদিন জুটল, তো তিন দিন হরিমটর।

ভারপর অসুখ-বিসুখ আছে। গলায় হাড় বা শঙ্করুর কাটা-কাটা ফোটা-টোটার ব্যাপার আছে। বঁচে থাকটাই সেখানে একটা চ্যালেঞ্জ। মানহি।

এখানে বরং ষাণ্ডা-নাওয়ার কোনও চিন্তা নেই। ঠিক টাইমে টাইমে খাবার এসে যাচ্ছে। শিকার করার হ্যাঁপা নেই। আর মাসেও একেবারে কাড়ই বাছাই করা। রোজ দল-বারো কেজি সেক্স মাসে দিয়ে যায়। শিক হাড়গোড় বিশেষ থাকে না।

অসুখ-বিসুখ হলে, ভিকিংসা পাওয়া যায়। অসুখ না হলেও, এসের ডাক্তার এসে প্রায়ই দেখে যায় — শরীর ঠিক আছে কিনা। বনে এসব কোথায় পাব?

সেমিক থেকে এখানে দিবাি আছে। ডোস আছে। শুধু ষাও দাও আর ঘুম লাগাও। আর মাসে-মধ্যে বাঁচার দিকে

হ্যালোর মতো তাকিয়ে থাক। মানুষগুলোকে একটা-আধটা দাঁত খিচিয়ে দাও। ততই ওরা খুশি।’

‘তা হলে? তা হলে কেন এখানে থাকতে চাইছেন না?’

‘মরম করে জানতে চায় কিচির মিচির।’

‘হা কাবা, এতক্ষণ কী শুনেলেন তা হলে? পায়ে শেকল ঝাঁপা জীবন, বাঁচার বশি জীবন, চার-পেঁওয়ালের মতো আটকে থাকা জীবন — এগুলো কি একটা জীবন হল? যতই সুখ থাক সে জীবনে, শান্তি এক-ফোটাও নেই।

এই দেখুন না, সেদিন একজন মানুষ আমার বাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে হেঁড়ে গলায় গাইছিলেন — “স্বাধীনতা-হীনতার কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?” কী যে রাগ হচ্ছিল, কী বলব। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল একেবারে।

নিজেকে যে স্বাধীনতা চাইছে, অন্যকে সে স্বাধীনতা দেবে না।’

কিচির মিচির এবার উঠবেন। ব্যাগ-টাগ গোছাতে গোছাতে বললেন, ‘সার একটা ছোট প্রায়ের উত্তর দেবেন?’

‘কলুন?’

‘আপনাকে এখন যদি এঁরা বনে ছেড়ে দিয়ে আসেন, আপনি কি তাতে খুশি হবেন?’ কিচির মিচিরের চোখ চকচক করছে।

পতরাজ একটা গভীর হলেন। বললেন, ‘যখন এখানে আসি, তখন বয়স ছিল দু-বছর।’ এখন কুড়ি। বুড়ো হয়েছি। শরীরে সে জোর নেই।

বনে আমার থাকতে দেখেছি। কী করণ অবস্থা। যার ভয়ে একদিন গোটা বন কাঁপত, সেই দাদুর বার্ষিকের সিনগলোতে ব্যাঙেও টাকে লাথি মারত। আমাদের দলের নতুন বেতা দাদুকে মেরে ভাঙিয়ে দিলেন। দাদু শুখন একা। বড়ই একা।’

বলতে বলতে, কেঁদেই ফেললেন পতরাজ। কিচির মিচিরেরও চোখ জলজ্বল করে উঠল। আগুে করে বললেন, ‘মানুষরা এমন কিছু বনও কিন্তু তৈরি করেছেন স্যার, যেখানে বাঁচার বশি থাকার কোনও গল্প নেই। বন্ধাচ্ছে ঘুরে বেড়াতে পারেন সেখানে। ওঁরা নাম দিয়েছেন — “অভয়াগার্য”।’

সেখানে নিজেই শিকার ধরে থাকেন। শরীর খারাপ হলে, বা শিকার বরাদ্দ শক্তি না থাকলে ওঁরাই ভিকিংসা করবেন। খাবার জোগাযোগ। তেমন জায়গায় যেতে কি আপনার আপত্তি আছে স্যার?’

পতরাজ কীদমে কীদমেই বললেন, ‘বয়সটা যদি দশ বছর কম হত, তা হলে বলতাম — “অবশ্যই আপত্তি আছে।” কিন্তু আজ আর শরীরে সে শক্তি নেই, বনে ঘিরে গেলে না খেতে পেতেই মরতে হবে। তাই আজ আর আপত্তি করব না। বরং বলব, “ভাল।” বেশ ভাল।’

‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার। আজ তা হলে আসি?’ আসুন ভাই।’ বলে পতরাজ ডাকিয়ে রইলেন কিচির মিচিরের আকাশে উড়ে যাওয়ার দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে এল তাঁর বুক থেকে।



হলুদে কাগজ এক্স-রে ফিল্ম

কিছু কিছু জিনিসের সঙ্গে হলুদ রঙের অসাসী সম্পর্ক চোখে পড়ে। যেমন ধরা যাক আমসত্ত্বের কথা। হলুদ সেলোফেনে আমসত্ত্বের সত্ত্বগুণ ঢেকে রাখা হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে হলুদ সেলোফেনে গায়ে মুড়ি দিয়ে কেকের দল বাজার আলো করে বিরাজ করে। হলুদ সেলোফেনে মুড়ে ফুটপাথে কিছু বই বিকোতে দেখা যায়। বড়রা চিরকাল চোখ পাকিয়ে যে বইগুলো থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, আর ছেলে ছোকরা চিরকালই অত্যাংসায়ে রহস্যময় ওই হলুদ মলাটের নিচে কী আছে জানতে তৎপর। এগুলো আমসত্ত্ব-মার্কী বই বলেই পরিচিত। জিনিসকে আকর্ষণীয় করতে হলুদ সেলোফেনে কাগজের ব্যবহার না হয় বোঝা গেল, কিন্তু এক্স-রে ফিল্ম যে কেন হলুদ কাগজে মোড়া হয় তার কারণ বোঝা যায়।

ফিল্ম কাগজে মুড়ে দেওয়ার অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ ফিল্মটাকে বাঁচানো, যাতে ওর ওপর কোনও দাগ, হাতের ছাপ, আঁচড় ইত্যাদি না পড়ে। দুটো এক্স-রে জাতীয় ফিল্ম পাশাপাশি রাখা হিলি ফিল্মের কড়োরপতি বাপের একলওতি বেটি, আর দৌলতহীন ইমানদার বাপের বেটাকে পাশাপাশি রাখা — একই রকম বিপজ্জনক। দুটো ফিল্ম মনের মত দুটো ফিল্মও জুড়ে এক হয়ে যেতে চায়। আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সম্ভাবনা ঝোলা আনা। কাগজ অনেকটা ভিলেনের মত কাবাব মেঁ হাড্ডি হয়ে

বাধা দানের লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ফিল্ম বাস্তব থেকে বের করে বাইরে রেখে দিলে অনেক সময় ওর ওপর একটা ছোপ ধরে যায়। এই ছোপ-ধরা দাগকে বলে স্ট্যাটিক মার্ক। কাগজে ঢেকে রাখলে এই ছোপ ধরা দাগ সহজে পড়তে পারে না। ডার্ক রুমে ফিল্মকে তার আধারের ভেতর ভরার সময়ে হাত দিয়ে ধরার কারণে ফিল্মের ওপর হাতের আঙ্গুলের ছাপ পড়তে পারে। মোড়ক সেক্ষেত্রেও রক্ষাকর্তা।



ফিল্ম কাগজে মোড়ার উপযোগিতা বোঝা গেল। কিন্তু কেন হলুদ কাগজ তার কোনও জুতসই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এমনকি সবাই, মানে সব ফিল্ম প্রস্তুতকারীই যে হলুদ কাগজ ব্যবহার করে এমনও নয়। হিন্দুস্তান ফটো ফিল্মস লিমিটেড এবং কোডাক কোম্পানি ফিল্ম মোড়ায় এক চেটিয়া হলুদ কাগজ ব্যবহার করলেও অন্য দু-একটি কোম্পানিকে সাদা, সবুজ ইত্যাদি রঙের কাগজও ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় হলুদ রঙের এ ক্ষেত্রে অন্য কোনও মহত্ত্ব নেই। যদি থাকে তবে তা নেহাতই প্রসাধনিক বা রীতি অনুযায়ী। যেমন কেক বা আমসত্ত্বের ক্ষেত্রে হয়।

জুড়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটা কথা বলে রাখা ভাল। আধুনিক পলিয়েস্টার ফিল্মের ক্ষেত্রে কাগজ না থাকলেও দুটো ফিল্মের জুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থাকে না।

সমীরকুমার ঘোষ



প্রসঙ্গ : বাংলাদেশে বিজ্ঞান আন্দোলন

উৎস মানুষ-এর মে-জুন, ২০০১ সংখ্যায় সব্যাসাচী চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলন' পড়ে খুব ভাল লাগল। বিভিন্ন সূত্র থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যবান এই লেখাটি তৈরি করা হয়েছে।

লেখাটির শুরুতে ১৯৮৯-এর জুন সংখ্যা উৎস মানুষের প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই আমি দু'একটি সংযোজন করতে চাই। ১৯৯৩ সালে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে গিয়ে আরো কিছু বিজ্ঞান সংস্থা ও বিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, এবং কিছু জনের কথা শুনেছিলাম। (১৯৯৩-এ বাংলাদেশ থেকে ফিরে 'দুই বাংলা, হায় ধর্ম' নামে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি দুর্বল প্রচেষ্টা হলেও এতে এধরনের কিছু সংস্থা ও ব্যক্তির উল্লেখ করেছিলাম।)

যেমন, বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসঙ্গে বরিশালের আরজ আলি মাতুবর-এর কথা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত। জম্মুসূত্রে মুসলিম হয়েও তিনি যেভাবে ইসলাম সহ বাক্যভীর ধর্মের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্তত্ত্ব অজ্ঞ লোভা লিখে গেছেন তা অবশ্যই বিরল একটি দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর 'সত্যের সন্ধান', 'মুহম্মদ' ইত্যাদি বই-এর যে কোনো পাঠকই তা অনুভব করতে পারবেন। বাংলা ১৩৯২ সালে ৮৬ বছর বয়সে মারা যাওয়ার কিছু পূর্বে তিনি উইল করে মৃত্যুর পর কবর না নিয়ে তাঁর সেইটুকু বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে দান করার কথা বলে গিয়েছিলেন। অথচ তিনি মোটেই প্রথাগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। পেশায় ছিলেন আমিন। এসব কারণেই কি বর্তমানের আলোকপ্রাপ্ত, বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী দেশীয় বিজ্ঞান লেখকরা তাঁকে খুব একটা পান্ডা সেন না? হতেও পারে। (উৎস মানুষে তাঁকে নিয়ে বর্তমান পয়লেক্ষকের একটি

বিস্তারিত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৯৩। ডিসেম্বর সংখ্যাটিও রইবে।)

বাংলাদেশে গিয়ে আরজ আলি মাতুবরের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই দেখা হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে গিয়েই তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ হয়। এছাড়া আলাপ হয়েছিল ঢাকার কিছু মুহম্মদা তরুণের সঙ্গে। এদের কয়েকজন 'যুক্তি' নাম দিয়ে একটি 'কুসংস্কার বিরোধী প্রগতিশীল সংগঠন' গড়েছিলেন, ১৯৯২-এ প্রচারিত একটি প্রচার পত্রে তাঁরা ধর্মীয় কুসংস্কারসহ মত, জ্যোতিষবিদ্যা, অপচিকিৎসা, আত্মা ও পুনর্জন্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে কড়কড়ি করেছিলেন। এর বিস্তারিত উল্লেখ 'দুই বাংলা, হায় ধর্ম' বইতে করা হয়েছে। এখানে তার সুযোগ নেই।

আরো কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্গত সাহসিকতার সঙ্গে কোরানের বিরোধিতার অনেক উদাহরণ সংকলিত করেছিলেন। এরা জম্মুসূত্রে মুসলিম। নাস্তিক সংগঠন জাতীয় একটি সংস্থা গড়ার কথাও ভাবছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে বসে তার ভাবাবহ পরিণতির কথা ভেবে বিধাগ্রস্ত ছিলেন, — বিশেষত কোরান পরিফ সম্পর্কে ধর্ম তোলায় ব্যাপারে। যেমন, তাঁরা সেবির্থেছিলেন কোরানে এক স্থানে বলা আছে "আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কাহারো মৃত্যু হইতে পারে না যেহেতু ইহার নিয়ম অবধারিত" (৩ : ১৪৫)। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, "বিশ্বাসীগণ, নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের (প্রতিশোধের) বিধান দেওয়া হইয়াছে" (২ : ১৭৮)। অর্থাৎ 'বিশ্বাসীগণ' প্রতিশোধের জন্য নিজেদেরই নরহত্যা করতে পারে। তাহলে পূর্বোক্ত আয়াতটি মিথ্যা হয়ে যায়— এই ছিল তাঁদের ব্যাখ্যা।

এছাড়া 'বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ'-এর নাম না করে সব্যাসাচীর লেখায় তাদের পত্রিকা 'বিজ্ঞান চেতনা'-র উল্লেখ একস্থানে করা হয়েছে। ঢাকার 'বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র' প্রভাক্তভাবে বিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত না হলেও, তাঁদের ব্যাপক কাজকর্ম, প্রকাশনা ও চিন্তাভাবনার মধ্যে মুহম্মদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এরকমই বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলনে আরো কিছু সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকাও আছে, যা অন্যান্য পাঠকরা জানাতে পারবেন। স্বল্প পরিসরে শ্রী চট্টোপাধ্যায় বিষয়টি যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা প্রশংসার। তার সঙ্গে সামান্য কিছু সংযোজনের উদ্দেশ্যেই এই চিঠি।

ডাবানী প্রসাদ সাহ
দুর্গাপুর



হয়েছে

□ এই জুন, ২০০১ বিশ্বপরিবেশ দিবস পালিত হল। এলাকাগত একটি সমন্বিত — ভল নিকানী নালাগুলো বাড়ির তরিতরকারির খোসা থেকে গুরু করে প্রাস্টিকের প্যাকেট পর্যন্ত নালাগুলিতে

ফেলে দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। যাতে বাড়ির কোনো প্রকার বর্জ্য পদার্থ নিকানী নালায় ফেলা না হয় সে অনুরোধ রেখে এলাকায় পোস্টারিং, মিছিল, প্রচার পত্র বিলি করা হয় এ উদ্যোগে ফোনিমিস কমিটি, হরিণঘাটা; কঁচাঝাড়া বিজ্ঞান দরবার, অন্ধবিধান কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, হরিণঘাটা, বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রী এবং এলাকার কিছু লোকজন সাক্ষরিত।

□ ১০ই জুন, ২০০১, রবিবার দিবাঞ্ছিত-আচার্য প্রমুখজন রায় গ্রন্থাগার হরিণঘাটার উদ্যোগে একাদশ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ২৯ জন দুই ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে নতুন ও পুরাতন বই বিতরণ করা হল। ছাত্র-ছাত্রী-অভিভাবকদের উপস্থিতি সন্তোষজনক ছিল। গ্রন্থাগারের সীমিত সামগ্রীও মানুষের কিছু কাজে লাগছে এটা দেখে উদ্যোক্তারাও সন্তোষিত। আশার কথা — বিগত বছর দুয়েক ধরে যৌবনে পা দিয়েছে এরকম গুটিকয়েক ছেলে উৎসাহ সহকারে গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক কার্যক্রম করছে।

□ গত ২৩শে মে ২০০১ সন্ধ্যায় ভারত সভা হল-এ 'ভারতীয় উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার ক্রমবিকাশ' বিষয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয় ইতিহাস অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬)-এর পক্ষ থেকে। প্রধান আলোচকগণ ছিলেন সালাউদ্দীন আহমেদ (বাংলাদেশ), অমলেন্দু সেন, দিলীপ চক্রবর্তী ও রাধারমন চক্রবর্তী।

□ ১লা জুন ডেভিড হেয়ার-এর ... ভ্রম ভ্রমণ-নিবাসে কলেজ স্কোয়ারের (গোলসীদি) দক্ষিণদিকে হেয়ারের বিমূর্তপ্রায় আবক্ষ মূর্তিতে মালাদাস ও পূর্ণ্যার্ঘ অর্পণ করা হয়। বিশিষ্ট কয়েকজন দায়বদ্ধতা-নিষ্ঠ ব্যক্তি ও ছাত্রছাত্রীরা এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মিলিতভাবে। অন্ধকার ডেভিড হেয়ারের অসামান্য অবদান ও সমাজসংস্কারের ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখা হয়।

□ জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, বিজ্ঞানকর্মীর অধিকার আন্দোলন, প্রতিষ্ঠানিক সংস্কার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী এবং 'নরম' বেধুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন'-এর অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ডাঃ সুখম ভট্টাচার্য নীরবে চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে চিরকালের জন্য, প্রায় মাসখানেক আগে। তাঁর প্রয়াণকে শ্রদ্ধা জানাতে শ্রবণসভার আয়োজন করল বসীয়া বিজ্ঞান পরিষদ গত ২৫শে শুক্রবার বিকালে পরিষদের সভাকক্ষে।

□ ৮ এপ্রিল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের শ্রবণসভা।

বিধাননগরে। 'বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সাক্ষরকর্মের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে বলেন মানসপ্রতিম দাস। ড. জানরত শীল, দেবব্রত মণ্ডল, রণতোষ চক্রবর্তী, ড. সোমা কসু, স্বাস্থ্যসচী চক্রোপাধ্যায়, যুগলকান্তি রায় প্রমুখ গোপালচন্দ্রের জীবন ও কাজকর্ম নিয়ে দু-চার কথা শোনান।

□ বাড়িগ্রামের কাছে চৌচড়াগড়িয়া পাথরকলে কাজ করে সিলিকেনিসে মারা যান বর শ্রমিক, অনেক অসুস্থ। পেপাগড এই ব্যাধির কারণে মৃত ও অসুস্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য মামলা দায়ের করে কোয়ার্ট সার্জেস সেক্টর, নাগরিক মঞ্চ ও বেশ কিছু সমন্বিত সংগঠন। ১৯৯৩ থেকে লাগাতার চেষ্টার ফলে এ বছর সুপ্রিম কোর্ট ক্ষতিপূরণের ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। প্রকৃত মুতের সংখ্যা ২১ হলেও সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য ১৬ জনকে মৃত স্বীকার করেছে, মৃত্যুর সোরগোড়ায় ১২ জন। উল্লেখ্য, ২৬ নভেম্বর ১৯৯৬-এ সুপ্রিম কোর্ট সুরেশ খনিজ প্রা. লিমিটেডকে ১৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আবেদন দেয়। মালিকপক্ষ টাকা না দেওয়ার পুনরায় শরণাপন্ন হতে হয় সুপ্রিম কোর্টের। ফলে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এর এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায় ৩১ মার্চের মধ্যে ক্ষতিপূরণ না দিলে মালিক পক্ষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করা হবে। ব্যাঘাত মালিক টাকা দিয়ে শ্রমিকের অধিকার-আদায় আন্দোলনে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। জয় হল লাগাতার আন্দোলনের।

□ ৯ জুন সন্তোষপুরের মুক্তিযুদ্ধের আয়োজনে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটা 'জ্যোতিষ শাস্ত্র বনাম জ্যোতির্বিজ্ঞান' নিয়ে হল আলোচনা ও প্রদর্শনী। সংস্কৃতি মঞ্চে। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউ জি সি-র সিদ্ধান্তের প্রতিবাহেই এ সভার আয়োজন।

□ স্বেচ্ছাশ্রমী যতীন দাস স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব-সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হল শ্রাবণবর্ষীয় বৈশাখী মেলা। মেলায় মূল মঞ্চে ২০ মে চন্দ্রনগরের ভারতের মানবতাবাদী সমিতির 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলে। 'ভাবিক কবচ মাদুলি বাইছ্যাও কপাল ফিরল না'—জন বিজ্ঞানের এই গানের কথা ও সুরে উদ্দীপিত হন শ্রোতারা। পাশাপাশি নানারকম ডুকডাক, কাড়টুক, কাণ মারার ঘটনা সহ সাধু-সন্ন্যাসী, নীর-ফকিরদের গুণাবলিত অলৌকিক কীর্তিকলাপ হাতে-কলমে দেখিয়ে সেগুলির লৌকিক ব্যাখ্যাও হাজির করা হয়।

ঘর চাই

উৎস মানুষের সুবিধাজনক কার্যালয় নেই। কলসেজ স্ট্রাট সংলগ্ন অঞ্চলে ঘর চাই। আমাদের পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী পাঠক-বন্ধু ও অনুরাগীদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই।

দুঃখের তমসায়

নীরবে চলে যান সুখময়দা

পাশের বৃকে লিখো
না আমার নাম
আমি চলে গেলে।

ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য এমনই
একটি নাম যা পাথরের ফলকে
খোদাই করে রাখার নয়, এ নাম
সাধারণ মানুষের বৃকে অঙ্কিত
হয়ে থাকার কথা। প্রচারের
আলো থেকে সরে এসে সাধারণ
সমস্যাশ্রিষ্ট মানুষদের সঙ্গেই
মিশে থাকতে চাইতেন তিনি
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। গত
২৮ এপ্রিল শনিবার ছিল সেই
শেষ দিন। মিলদরিয়া
কৌতুকপ্রিয় সহজ মনের মানুষ
ছিলেন। চারপাশের বিখ্যাত
বিদ্বান, প্রগতিশীল, বুদ্ধিজীবীদের
এত বেশি নষ্ট হয়ে যেতে



সেখেছেন যে, 'বিখ্যাত' হওয়ার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা আর অসীহা
এসে গিয়েছিলো তাঁর— জনস্বাস্থ্য-আন্দোলনে-সমর্পিত প্রাণ এই
মানুষটির। তাই সুখময় ভট্টাচার্যের নাম অনেকেই জানেন না।
অনেকেই চেনেন না তাঁকে।

ডাবি, এই সমাজ কত নির্দয়, বিবেকহীন, কত
দায়িত্ববোধহীন! সুখময়দার মত একজন সং/নীতিনিষ্ঠ/
প্রতিবাদী/ বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন দূর্বল মানুষের মৃত্যু
সংবাদটা প্রায় কোনো প্রচারমাধ্যমেই জায়গা পায়নি। কোনো
গণসংগঠনই এই সংগ্রামী নেতৃস্থানীয় মানুষটির অন্তিম
প্রয়াণকে শ্রদ্ধা জানাতে যায় নি সেই ২৮শে এপ্রিল। সত্যিই
তো, সুখময়দা যে কোনোকালেই 'খবর' হয়ে ওঠার কৌশলটা
শিখে উঠতে পারেননি ঠিকসহ।

তাই কেমন একটা ভয় হয়। সুখময়দার মৃত্যু-উত্তর
নির্গমিত প্রতিক্রিয়া দেখে বিবাদের সঙ্গে একটা অশঙ্কও আসে।
এখনো বীরা উন্নত সুন্দর সুই একটা সমাজের স্বপ্ন ধরে রেখে
কাজ করে যাচ্ছেন আন্তরিকভাবে, এখনো বীরা অবিচার-

অমানবিকতা-অসত্যতা-নীতি-
হীনতার বিরুদ্ধে কলম ধরেন
কিংবা কণ্ঠ উন্মুক্ত করেন,
তাঁদেরও কি সমাজ এই
পুরস্কারই দেবে?— এইরকমই
অনাদর অবহেলা বিস্মৃতি! ...
জানি না।

জন্ম ১৯৪১ সালের
৩০শে সেপ্টেম্বর পূর্ব-বাংলার
ফরিদপুর জেলায়। দেশভাগের
ফলশ্রুতিতে কিশোর বয়সেই
ছিন্নমূল। পরিবারের সঙ্গে
আশ্রয় মেলে উটেডাঙার
দরিদ্র পল্লীতে। অত্যন্ত মেধাবী
ছাত্র ছিলেন সুখময়। ১৯৬৪তে
কলকাতা মেডিকেল কলেজ
থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি, ১৯৭৩-এ
'কলেরা রিসার্চ সেন্টারে'

গবেষণা থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি। কলেজ জীবন থেকেই বাম-
গণতান্ত্রিক প্রতিবাদী ভূমিকা সুখময় ভট্টাচার্যকে স্বতন্ত্র পরিচয়
দিয়েছিলো।

যেখানে অন্যায়, যেখানে দুর্নীতি, যেখানে ঘিচারিতা
সেখানেই সুখময়ের নির্ভীক দরাজ প্রতিবাদ। ১৯৬৯-এ কলেরা
রিসার্চ সেন্টারে গবেষণার কাজ করতে এসে ফ্রমশ দেবতে
পান কিভাবে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলি
বস্তির স্থলের বাসাদের গিনিপিগের মত 'এক্সপেরিমেন্টাল
আনিমেল' হিসেবে ব্যবহার করছে — আর সহায়তা দিচ্ছে
দেশি প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ এবং অধিকাংশ ধামাধরা গবেষক।
প্রতিবাদে সোচ্চার হন ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য এবং কিছু সাথী
সহকর্মী। শান্তিমূলক ব্যবস্থা আর অবস্থা ইয়রানি শুরু হয়
তাঁদের ওপর। কিন্তু দমানো যায়নি অপ-গবেষণা বন্ধের
আন্দোলনকে। পশ্চিমবঙ্গের সব স্তরের বিজ্ঞানী, গবেষক, ও
কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি 'জ্যাকারি'।
যার অন্যতম প্রধান সংগঠক ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য। আন্দোলন

ক্ৰমে জোরদার হয়ে ওঠে। আইনি লড়াই চলে। একে একে অমানবিক গবেষণার অভিযোগগুলি প্রমাণিত হতে থাকে তদন্ত কমিশনের কাছে। ফলে 'আই সি এম আর'-কর্তৃপক্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সুখময়বাবু চাকরী ছাড়তে বাধ্য হন। ১৯৮০ সালে যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে।

১৯৮৩তে জ্ঞানব্রত শীলের সঙ্গে মিলে গড়ে তোলেন তাঁরা 'মর্মান বেখুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' সংস্থা। ব্যাপক সাধারণ মানুষকে রোগ-শোকের বৈজ্ঞানিক কারণ, ওষুধ, চিকিৎসা ও মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এই কর্মপ্রিয় সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ৩৮টি সহজবোধ্য স্বল্পমূল্যের পুস্তিকা ও অতনুটি প্রচারণার প্রকাশ করেন তাঁরা। গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে আলোচনাসভা চালিয়েছেন লাগাতার, ১৯৮৪ থেকে। এছাড়া ৮০'র দশকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন সুখময় ভট্টাচার্য।

তাঁর বিশেষ অবদান ছিল মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। নিজের পুত্র ছিল মানসিক স্বাস্থ্যে আক্রান্ত। ফলে সামাজিক দায়বদ্ধতা সুখময় ভট্টাচার্যকে শ্রাণঢালা পরিকল্পনা তড়িত করে। শীরভূমের লাভপুরে এবং বর্ধমানের কাটোয়ার দুটি মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগ তিনিই নেন, কয় ক্রেশ সহ্য করে।

অত্যধিক শারীরিক-মানসিক চাপ ক্ৰমে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটায় দ্রুত। শেষ জীবনটা ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দুরারোগ্য স্নায়ুরোগে অক্রান্ত, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে প্রায়-অন্ধ, পারিবারিক সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। এই এক মর্মান্তিক জীবন-নাট্য অপেক্ষা করছিলো সুখময়দার শেষ জীবন-দৃশ্যটার জন্য। মানসিক ব্যাধিক্রান্ত পুত্রকে লাভপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখা হয়েছে। ঘরে শেষজীবনে অবলম্বন হওয়ার কথা স্বাক্ষরশীলী স্ত্রী ও কন্যার। কিন্তু হয় নি। যাবতীয় নারীঅধিকার, নারীমুক্তি আন্দোলনে জীবনভোর নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন যে মানুষটি, অস্তিম পর্বে অসহায়, অশক্ত, দৃষ্টিশক্তিহীন, অ্যাগজাইমার (সত্তবত) রোগে হাবির-মস্তিষ্ক সেই মানুষ, সাহারা পাননি নিজের ঘরেও। কার্যত ঘর ছেড়ে চলে আসতে হয় দিদির কাছে। সেখানেই শেষ নিশ্বাস।

চিত্রবসিক সঙ্গাসাময় সুখময়ের জীবনসজ্জাটাই ছিল নিদারুণ দুঃখময়। এমনকি মৃত্যুর পরেও অবহেলার দুঃখ। গণ-আন্দোলনের সহযাত্রী ও বিজ্ঞানকর্মী বন্ধুজনেরা তাঁর কাছে নানাভাবেই কণী। অথচ কোথায় তাদের কান্তিকত দায়িত্ববোধ? মৃত্যুর স্ববর না-রাখা, এক-লেড় মাস পরে সূচক 'রিচুয়ালে' হল ভাড়া করে স্মরণসভার আয়োজন — এই সুন্দর দুঃখগুলো আজ আর তাঁকে স্পর্শ করবে না, এটুকুই যা সুখময়।

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

“তোমার কাছে এ বর মাগি
ধরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে”

জনৈক শুভার্থীর সৌজন্যে



রেজিঃ অফিস — বিডি ৪৯৪, স-স্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪
ফোনে যোগাযোগ : ৪৬৬-৯৪৩৫/৩৪৩-৪১২৫/৩৪৪-০২০৪/৩৫৮-৬৩৯১

পুস্তক তালিকা

বাঁবার নিয়ে ভাবার আছে	২৫.০০	ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেতনশেখর দাস	২৫.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)	৩০.০০	মাগ নিয়ে কিংবদন্তী	২০.০০
চলতে ফিরতে	১০.০০	বিবেকানন্দ অনা চোখে	২৫.০০
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়	২০.০০	প্রমিথিউসের পথে	১২.০০
অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে	৩০.০০	তিন অবহেলিত জ্যোতিষ	১৮.০০
জ্যোতিষ কি আসী বিজ্ঞান ?	২০.০০	কি আর কেন	২০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	৩০.০০	চেনা বিষয় অচেনা ভগৎ	১৫.০০
প্রতিরোধ : অস্বাভাবিক ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	২৫.০০	লুট হয়ে যায় স্বদেশভূমি	৩০.০০

কলকাতা স্ট্রিট অফিস 'উৎস মানুষ'-এর ঘর এখনো পুরানো ঘর নি

পত্রিকা ও বই'এর প্রস্তুতি :

- ১) মাতৃগুরু এন্ড কোং, কলকাতা স্ট্রিট : ২) বুক মার্কেট : ৩) পাকিস্তান, কলকাতা স্ট্রিট মোড় :
- ৪) জনস্বাস্থ্য গ্রন্থালয়, ১০ হিদারাম ক্যানারিজ লেন, বহুবাজার

এছাড়া

নিবারণ সাহা, ১০ কার্তিক বোস স্ট্রিট (আমহার্ট স্ট্রিট কলকাতার পালের রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে) এবং
প্রাকী আবাসন, এস ৬/২, স-স্ট লেক (ফোন : ৩৩৪-০৯০৪)

আগামী অগাস্ট '০১-এর প্রথম সংস্করণে সম্ভাব্য প্রকাশনা — বিশেষ ক্রোড়পত্র 'বন্যা নিয়ে বেঁচে থাকা'

'উৎস মানুষ' পোস্টাফিসের পক্ষে করণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, স-স্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত
এবং লৈলী, ৪এ, মানিকডালা মেইন রোড, কলকাতা ৪৪ থেকে মুদ্রিত

We are thankful to CSIR, Govt. of India, for partial financial support in publishing the journal.

ISSN 0971-5800

দ্বাবিংশ বর্ষ

অগাস্ট ২০০১

বিশেষ ক্রোড়পত্র



বন্যা নিয়ে বেঁচে থাকা

সূচিপত্র

অল্প কথায় জেনে নেওয়া	১৪৬
নিয়ন্ত্রণ কি সত্যিই অসম্ভব?	শব্দর ঘোষ ১৪৭
ঘটনা প্রবাহ	প্রতিবেদক ১৫২
বন্যা থেকে কিছু পরিচয়	তরুণ কুমার চৌধুরী ১৫৩
অতিবৃষ্টির ঝাঁপ	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৪
'... আমরা কিছু করতে পারি'	কল্যাণ রুদ্র ১৫৬
বন্যাকবলিত মানুষদের জন্য	মনমোহন সাহা ১৫৮
জল সরে যাওয়ার পর	অনসূয়া মুখোপাধ্যায় ১৫৯

সম্পাদনা : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎস মানুষ

ISSN 0971 - 5800

বি ডি ৪৯৪, সেন্ট লেক, কলকাতা ৬৪
BD 494, Salt Lake, Calcutta 64

অস্থায়ী কার্যালয় : শ্রাবণী আবাসন, এস ৬/২ স-স্ট লেক,
কলকাতা ৯১

৥ নতুন বিক্রয় কেন্দ্র ॥

পত্রপুট

৩৭/৯, বেনিয়ার্টোলা লেন, কলকাতা ৯

উদ্ভৃতি

শুধু বাঁচতে চাই

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পাড় পানে পড়ছে নদীর, নদী
চওড়া হচ্ছে, দুদিকেই তার বাড়বাড়ি
খুলে-ফোঁপে জল কামড়ে ধরছে মানুষের
ধরেবাড়ি, গেরদুনি ভজনছ
জল খাচ্ছে গড়িয়ে — ভেড়ে, বান ভেঙে
ঘাই গুড়িয়ে, কাৎ হয়ে পড়ছে গার্হস্থ্যল্যা
ডাকা থেকে ভালবসনা পাখি ধারছে
অকামের দিকে লাফ, পরিগ্রহণ
চাই, বাঁচতে চাই, অস্ত্রহৃদ্ধ দুয়ার ওলোট পালোটে
ধোঁধে বেঁচে থাকতে চাই, শুধু বাঁচতে চাই ॥

'যেতে পারি কিন্তু কেন যাবে' লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৯ (১৯৮২)

উড়িষ্যার মহানদী, দেবী, ব্রাহ্মণীর তাণ্ডবে
আর হিরাকুস বীধ-ছাড়া জলে বিপন্ন ১০
লক্ষাধিক মানুষের হাহাকার আমরা শুনে
পাই। অসহায় বোধ করি। আতঙ্ক বেড়ে যায়।

উ. মা.

অল্পকথায় জেনে নেওয়া

বীধ

নদীর জলপ্রবাহকে আটকে আড়াআড়িভাবে বসানো উঁচু কংক্রিট মাটি অথবা আধা-মাটি আধা-কংক্রিটের সেতুসমূহকে বীধ বলে। এই বীধের আড়ালে অর্থাৎ নদীর ওপরের দিকে একটা বিশাল ঢাল জল ভর্তি হয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করে। বীধের ওপর নিয়ন্ত্রিত গেট বসিয়ে ইচ্ছেমত জল ছাড়ার ব্যবস্থা করা যায়। বর্ষাকালের বাড়তি জল বন্যা হয় খুব। নদীর উপরের দিকে বীধ দিয়ে জলাধার তৈরি করে বর্ষায় বাড়ন্ত জল ধরে রেখে বন্যা ঠেকানো হয়। শীতকালে সেই জল দিয়ে আবার জলসেচের কাজও করা যায়।

বীধ থেকে জলবিদ্যুৎ

ওপর থেকে নেমে আসা জলের শক্তি টারবাইনের চাকার ঘোঁরায়। তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বীধের উচ্চতা বেশি হওয়া প্রয়োজন। পাহাড়ি এলাকার গভীর বাত ওয়ালা নদীই উপযুক্ত। বীধের একপাশে সুড়ঙ্গ কেটে তার মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে জল নিয়ে গিয়ে টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

ব্যারিজ

ব্যারিজ হলো নদীর ওপর আড়াআড়িভাবে বসানো বীধ, তবে ভক্ষ্যত আছে। ব্যারিজকে নিরেট সেতুসমূহের পরিবর্তে কংক্রিটের সারি সারি স্তম্ভের বীধকে ইম্পাউন্টের নিয়ন্ত্রিত গেট বসিয়ে ইচ্ছে মতো জল ছাড়ার ব্যবস্থা থাকে। নদীর জলের উচ্চতা বাড়িয়ে পাশের খাল দিয়ে সেই জল পাঠানোর কাজেই ব্যারিজের প্রয়োজন।

জলাধার

বিভিন্ন জায়গার সুবিধে অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে জলাধার তৈরি করা হয়। নদীতে বীধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করে জলাধার সৃষ্টি করা যায়। সমতল এলাকায় মাটি খুঁড়ে চারপাশে উঁচু আল দিয়েও জলাধার তৈরি করা যায়। জলাধারগুলোর কাজ হল বর্ষাকালের বাড়তি জল ধরে রেখে শুধা মরসুমে তা থেকে চাষের ক্ষেত্রে জলসেচের সুবিধা করা। জলাধারে মাছ চাষও করা যায় সেটা বাড়তি লাভ।

স্পার বীধ

নদীর তালুক-ধরা বরাহোড়কে সামলতে একদিকের পাড় থেকে নদীর মধ্যে কোনাকুনি বা সমকোণ (right angle)

আকারে বীধ দেওয়া হয়। এতে সেতুর অভিমুখ সরে গিয়ে ডানদা বোধ হয়।

আল

বানের জলকে রোখবার জন্য আল সাধারণত নদীর সমান্তরালভাবে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। এই আলগুলো অনেক সময়ই জমির ঢাল অনুযায়ী নদীতীরের গতিপাথের অন্তরায় হয়ে পড়ায়। যার ফল বন্যা। তাই আলের নানাব্যবহারে কান্ডাট অথবা দুইসেটে তৈরি করে জল বেরোবার ব্যবস্থাও রাখতে হয়। জাতীয় সড়ক (National Highway) এবং রেলপথও এই আলের ওপর দিয়ে তৈরি হয়।

কিউসেক

কিউসেক হলো জলের প্রবাহ মাত্রার একক। ১ কিউসেকের অর্থ হলো প্রতি সেকেন্ডে ১ ঘনফুট জলের প্রবাহ। কাজেই কতক্ষণ ধরে এই জল প্রবাহিত হচ্ছে না জানলে মোট কত জল প্রবাহিত হলো তা বোঝা যায় না।

অববাহিকা

কোনো একটা নদী নিজে এবং তার উপনদী-শাখানদী মিলে মোট যতটা জায়গার জল বহন করে, সেই জায়গাকেই সেই নদীর অববাহিকা অঞ্চল বলা হয়।

উপত্যকা

দুটো পাহাড় কিংবা দুটো উঁচু জায়গার মধ্যবর্তী নীচু জমি হ'ল উপত্যকা।

এমব্যাকমেন্ট

নদীর দুইপাশের উঁচু পাড়কে এমব্যাকমেন্ট বলে। এই এমব্যাকমেন্ট নদীর জলকে উপচে পাশের জমিতে পড়তে দেয় না। মাটি দিয়ে উঁচু করা যে-কোনো বীধকেই, নদী পাড়ে, করিগরি নামে এমব্যাকমেন্ট বলা যায়।

রিটার্ডার বীধ

ডাক্তার ওপর হয়। বাড়ী সেতুসমূহের মতো বর্ষায় নদীর উপচানো জলকে প্রতিহত করা বা আটকে দেওয়ার জন্য। যেন উপচে আসা জলকে জনবসতিতে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না, অবসর দেওয়া হবে।

উঃ ২৪ পরগনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কি সত্যিই অসম্ভব?

শঙ্কর ঘোষ

হাঁ

এবারও বন্যা হবে অন্তত উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বানভাসি সাধারণ মানুষের তাই বিশ্বাস। তাঁরা চিন্তিত, উদ্বিগ্ন, আতঙ্কিত। যতই ঢাকঢোল পিটিয়ে এই জেলার নদী সংস্কারের কথা জ্ঞাপন করা হোক, সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা — এ সব সিদ্ধান্তে বিন্দু। পরিকল্পনাহীন, অবৈজ্ঞানিক, দায়সারা গোছের এই কাজ তাদের বিশ্বাসের আশ্রয় করতে পারে নি। তাদের কাছে এসব সরকারি ছেলেখেলা, বছর বছর কোটি কোটি টাকা জমলে ফেলে দেওয়ার সরকারি মহোৎসব। তাই এবারের বর্ষা মরসুম শুরু হতেই তাদের সভয় ভিজ্ঞাসা — ‘আবারও ডুবতে হবে না জো?’

গতবছরের বন্যার স্মৃতি এখনও তাজা। জেলার মানুষ তার ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেন নি। সরকারি হিসাবে গত বন্যা এই জেলাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ২১ জন, লসা ধ্বংস হয়েছিল ১ লক্ষ ৫৫ হাজার হেক্টর জমির। সাড়ে চার লক্ষ মানুষ স্ত্রী, পুত্র, বন্যার হাত ধরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন নানা জ্রাণশিবিরে। এখনও বহু পরিবারের মাথার উপর মায় একটুকরো পাতলা পলিখিন শিট। বহু পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরের ফুটপাথবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। অশা করা গিয়েছিল, সর্বনাশা এই ঘটনার পর, বন্যা নিয়ন্ত্রণে যতটা করা সম্ভব সরকার তা করবে। একটা সুসংহত পরিকল্পনা রচনা করে যুদ্ধকালীন ওরুদ্ব দিয়ে তার বাস্তবায়নে সক্রিয় হবে। কিন্তু কোথায় কি? নদী-ঝাল-বিল সংস্কারের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত — নভেম্বর থেকে মে, শুধা মরসুমের এই সাত মাস নিষ্ক্রিয় থেকে চিরাচরিতভাবে বর্ষা মরসুম শুরু হওয়ার পর দু-চারটি তেড়ি-ভাটি কাটা ও নদীর কূপ থেকে কয়েকটি পাটা তোলার কাজ করে সরকার তার দায়িত্ব শেষ করল। ফলে পরিষ্কার বোকাই যায়, দায়িত্ব পালনের এই ধরনের সরকারি কর্মোদ্যোগ সমসয়ার কোণাগ্রাও স্পর্শ করতে পারবে না। সুতরাং সামনে যে আবারও সমুহ সর্বনাশ — এ বিষয়ে বিওকোর অবকাশ কোথায়?

এ জেলার নদীগুলির চরিত্রবৈশিষ্ট্য কী তা অনুসন্ধান শুরু হয়েছে কয়েক শতাধী আগে থেকেই। নদী বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন — দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় সব নদীই গম্ভী-পদ্মা-ভাগীরথী-হুগলীর প্রবাহের সাথে যুক্ত। এরা একটা নদী পরিবারের মত।

যমুনাক্রী, অরুণ, দামোদর, রূপনারায়ণ, হুসদী প্রভৃতি নদী ছোটনাগপুর মালভূমির বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভাগীরথী-হুগলীর পশ্চিমপাড়ে বিভিন্ন ভাগ্যায় মিলিত হয়েছে। ভৈরব পদ্মার ডান পাড় থেকে বেরিয়ে নদীয়া জেলার জলসীটে মিশেছে। ‘জলসী’ নবদ্বীপের কাছে ভাগীরথীর সাথে মিলিত হয়েছে। ‘আখাভাঙ্গা’ নদীয়ার গোপালপুরের কাছে পদ্মা থেকে নির্গত হয়ে সন্ধি-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে মালভূমির কাছে দুটি শাখা বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা ‘চুর্নী’ নামে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে কাসিন্দারায়ণপুরের কাছে ভাগীরথীতে মিশেছে। অন্য শাখা ইছামতী নামে নদীয়া, বনগা, বরুপনগর, বসিরহাট, হাননালাল হয়ে প্রায় ২৪০ কিমি. পথ অতিক্রম করে রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গার মোহনা দিয়ে সাগরে মিশেছে। একসময়কার ‘বিশাল অর্ধ’ যমুনা নদী হুগলী নদীর ত্রিবেণী থেকে বেরিয়ে নদীয়া ও উঃ ২৪ পরগনা জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ইছামতীর সাথে মিলিত হয়েছে। হাটীর বলেছিলেন — ‘The Jamuna is a deep river, and navigable throughout the year by Trading boats of the largest size. At the point where it enters the district (24pgs) the stream is about a hundred and fifty yards wide, but its breadth gradually increases in its progress Southwards to from three to four hundred yards.’ (A Statistical Account of Bengal, vol. i part-i, p. 11) বর্তমানে নদীয়ার নগরউষড়ার পর থেকে এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। গাইঘাটা, গোবরভাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বর্তমানে এই নদী বরুপনগরের চারঘাট অঞ্চলের টিপির কাছে ইছামতীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই যমুনার একটা শাখা ‘পদ্মা’ নদীয়ার নগরউষড়ী থেকে বেরিয়ে গোয়ালডোব, মীধলগ্রাম, হাকড়া, পৃথীবা, চৌরশি, মগরা, চাতবা হয়ে চারঘাটের মোত্ভাভাঙ্গার কাছে আবার যমুনায়ে মিলিত হয়েছে। তাই ‘পদ্মা’ যমুনার শাখা ও উপনদী — দুইই। বর্তমানে এর অস্তিত্ব খানিকটা চৌরশি থেকে মোত্ভাভাঙ্গা পর্যন্ত টের পাওয়া যায়।

নোয়াই বা লাখণামতী আমভাঙ্গায় বরতি বিল থেকে বেরিয়ে মীলগঞ্জ, বড়লা, পানিহাটী, আপনপাড়া, মধ্যগ্রাম হয়ে রাজারহাটের কাছে মাছিভাঙ্গার হাড়োয়া গাটে পড়েছে। নদীয়া

জেলায় হরিণখাটা, উঃ ২৪ পরগনা জেলার ভাওরাগাছা, ছিলি, ওয়া, রাউডাড়া, তেলিয়া হয়ে হাওড়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত হত একসময়কার সুবিশাল বিদ্যাদহরী। হাট্টারের বিবরণীতে পাওয়া যায়— "The Bidyadhari has an average breadth of from two to three hundred yards and affords the means of navigation for shipping ..." এই বিদ্যাদহরী হাওড়ার দক্ষিণে একসময় দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সাগরে যেতে মিশত। রায়মঙ্গল ও মালদা এক সময়কার বিদ্যাদহরীই অবিস্মরণ্য অংশ।

নদীয়া জেলার হরিণখাটা থানার ডেপুটীর কাছে যমুনা থেকে বেরিয়ে সুতীর একটি শাখা আমগঙ্গার মধ্য দিয়ে বগলী নদীতে গিয়ে পড়ত। অন্য একটি শাখা হাবড়া থানার শ্রীকৃষ্ণপুর, বাতীপুর হয়ে কিতা, দণ্ডপুকুর, রামনগাছির মধ্য দিয়ে গড়িকাড়ীর কাছে হাওড়ায় গঙ্গা গিয়ে পড়ত। এইভাবে সুতী নদী একই সাথে বিদ্যাদহরী, যমুনা ও বগলী নদীর মধ্যে সংযোগরক্ষাকরী নদী হিসাবে কাজ করত। সোমাই ইছামতী থেকে বেরিয়ে প্রথমে দক্ষিণ পূর্বে ও পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাক নিয়ে স্বরূপনগর থানার কুমীর বিলে এসে পড়েছে। এছাড়াও আরও কয়েকটি ছোটখাট নদী এই জেলাতে ছিল যা বাস্তবে উপরের বিভিন্ন নদীর মধ্যে সংযোগ রক্ষায় কাজ করত। তাই সংক্ষেপে বলা যায় — এই জেলার পশ্চিমে বগলী এবং পূর্বে ইছামতী নদী — মাঝখান দিয়ে বয়ে যেত বিদ্যাদহরী, যমুনা, পদ্মা, নোয়াই, সুতি ইত্যাদির মত নদীমালা। সে সব এখন অনেকটাই অতীতের ইতিহাস। সমগ্র জেলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নদীখাত, বিল, বাগড়, জলাভূমি এই ইতিহাসেরই সাক্ষ্য বহন করেছে।

এই জেলার আর্থ সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এই নদীমালার অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হল কেন? সংক্ষেপে বলতে গেলে এই জেলার নদীগুলি গঙ্গা-পদ্মা-ভাগীরথীর শাখা প্রশাখা হওয়ার ফলে পলিজনিত ভয়ংকর সমস্যা তৈরি ছিল। — এর সাথে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন— "It appears that about 400 years ago, the Bhagirathi was the main channel; then its source near Murshidabad (Sooty) became silted and the water were diverted to the Padma". (Collected works, vol-2, p.23)। ফলে পদ্মা দিয়ে গঙ্গার মূল জলধারা প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভাগীরথী-বগলী শাখা ক্রমশই শীর্ণাকার হতে থাকে এবং পরিণামে এর বিভিন্ন শাখা নদীগুলির মুহূর্ত্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বহিঃস্থ, এটা সহজেই বোকা

যায়, নানা প্রাকৃতিক ঘটনার সঞ্চিত প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত এই জেলার নদীসমূহের অবক্ষয় শুরু হয় এবং তাইই ফলশ্রুতিতে নদীগুলি বর্তমান কল্প অবস্থা ধারণ করে।

কিন্তু প্রাকৃতিক এই কারণই সব নয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মানুষের অপরিচালিত অত্যন্ত হস্তক্ষেপ, যুক্ত হয়েছে নদী মঞ্চ, নদী চুরির সমস্যা। নদীর বুকে অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটির বাঁধ দিয়ে জলের গতিরোধ করে অবৈধ মাছচাষ, বাঁশের পাটা ফেলে মাছ চাষ, পাট পচানোর জন্য নদীর বুকে পাটের গাদা দেওয়া, রেলপথ ও সড়কপথে যোগাযোগের জন্য অবৈজ্ঞানিকভাবে ঘন ঘন পিলার গেঁথে একের পর এক সেতু নির্মাণ, ইটভাটার পলি সরবরাহের জন্য খাল কেটে নদী থেকে জল নিয়ে নেওয়া, নদীর জোণে ওঠা চার নীচতলা তৈরি, ইত্যাদি নানা কারণে নদীর অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। এই জেলার বসিরহাট মহকুমার কথাই ধরা যাক। প্রশাসন, শাসকশল, মাফিয়া ইত্যাদির মিলিত চক্রান্তে ইছামতীর দুই তীরে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য ইটভাটা ও মাছের ভেড়ি, স্বরূপনগর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত এই নদীর দুই তীরে প্রায় ১৪০টি এই ধরনের ভাটা তৈরি হয়েছে। মাছের ভেড়ির সংখ্যা ওনে শেষ করা যাবে না। আর এই ভাটা ভেড়ি নদীর প্রাকৃতিক গতিপথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেছে। প্রথম হল — এত অসংখ্য ভাটা-ভেড়ি সরকারের নাকের ডগায় দিখি পড়ে উঠতে ও কাজ চালিয়ে যেতে পারছে কেন? গত বন্যার এক মাস পরে, অক্টোবরে, অর্থমন্ত্রী ভাস্করী দাসীম দাশগুপ্ত প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন, — 'ভেড়ি ও ভাটার জন্য জল নামতে পারছে না'। তাই ঘোষণা করা হয়েছিল — 'এই সমস্ত ভেড়ি কেটে দেওয়া হবে'। কিন্তু বাস্তব হল, তখন স্বরূপনগর ব্লকের কয়েকটি ভেড়ির দু-চার হাত কাটা ছাড়া ওরা কিছুই করেন নি। আরও সর্বনাশের কথা হল — যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গে টিপির (স্বরূপনগর ব্লক) কাছে নদীর বুকে জোণে ওঠা এক চরার মধ্যে সরকার ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এক পার্ক নির্মাণ করেছে। নদীর বুকের এই পার্ক যমুনার জলকে ইছামতীর বুকে নামতে বাধা দিচ্ছে — ফলে গত বন্যায় গাইঘাটা, গোবর-ডাঙ্গা, হাবড়া ১নং ব্লক সোঙ্গা ও স্বরূপনগর ব্লকের একটা অংশ এর জন্য দীর্ঘদিন জলময় হয়ে পড়েছিল। কোনও কোনও জায়গা বন্যার তিনমাস পরেও জলময় ছিল। তাই যমুনা-পদ্মার জল যাতে সহজেই ইছামতীতে যেতে পড়তে পারে তার জন্য টিপির চরা কেটে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বন্যার পরবর্তী ৮ মাসে এ কাজ সহজেই করা যেত। কিন্তু সরকার সে দায়িত্ব পালন করেনি। টিপির চরা এবং পার্ক এখনও বহুমিমার বিরাজমান। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে এবং হবেও।

আর একটা ব্যাপারও খুব সংগোপনে পরিকল্পিতভাবে নেতা-আমলা-প্রোমোটরদের ঘোষ উদ্যোগে দীর্ঘ দিন ধরে ঘট চলেছে। একথা সবারই জানা, এই জেলায় কয়েকশত কিলোমিটার মরা নদীর বাত রয়েছে। যখন থেকে একসময়ে উৎসারিত 'পদ্মা' নদীর মরা খাতের সৈত্বি কম করে ৬০ কিলোমিটার। বর্ষাকালে এই মরা খাতগুলি কিন্তু প্রাকৃতিক প্রাকৃতিক ভঙ্গিনাকশী ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করতে পারে এবং করেও থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে উপায় এখন আর নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই সমস্ত নদীর মরা খাতের জমিতে বসবাসের জন্য সরকার মানুষকে পট্টা দিচ্ছে, আবার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসামান্য জমির মালিকেরা বি.এল. আর. ও অফিসের সাথে যোগসাজসে এই সমস্ত খাতগুলি গরিব মানুষের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। পদ্মার মরা খাতের কথাই ধরা যাক। হাওড়া ১নং ব্লকের বনবনিয়া, উঃ হাওড়া। হিঙ্গলপুকুর, বানীপুর ইত্যাদি মৌজায় এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। এখানে পদ্মার মরাখাত বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে — প্রকাশন একেবারে মীর। হাওড়া ১নং ব্লকের নালা খিল থেকে পদ্মার যে ধারা মরাখালে মেয়ে পড়ত সেই ধারা একসময় ৩৮ ফুট প্রশস্ত ছিল। বর্তমানে তা ৬-৭ ফুট। বাকিটা সরকার পট্টা বিক্রি করেছে। এই ঘটনা এ জেলার সমস্ত নদীখাত, বিল-বাওড়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফলে সরকার যখন ভক্তের ভূমিকা পালন করে তখন সর্বনাশ টেকায় কে?

এই জেলার আয়তন ৪০৯৪ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ১৫৭৯ মিলিমিটার। জেলার উত্তরতমপ্রান্ত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত নদীর ঢাল রয়েছে ৯ মিটার। অর্থাৎ প্রতি কিমিতে ৪.৫ সেমি। জোয়ারের সময় এই ঢাল কমে পাঁড়ায় ২.৫ সেমিমিটার। পাসয়ে ব-হীপের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল হওবার জন্য নদীরা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলার দ্বিগুণ জল কিছুটা পরিমাণে এই জেলার উপর দিয়েই সমুদ্রে ফেলে পড়ে। প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক এই অবস্থানের জন্য এই জেলা জলসম্পদে ভরপুর। কিন্তু যা হতে পারতো বিপুল সম্পদের প্রাকৃতিক উৎস, পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাবেই তা এখন ভরাল সমস্যায় পরিশ্রুত। বর্ষা মরসুম তাই এখন এই জেলার মানুষের কাছে কড়ুর রানী নয় — বিতীৰিকা।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা কখনই অগোঁড় বলেছিলেন—
"The Government of Bengal maintains an irrigation department, but irrigation is not the problem of Bengal, which does not suffer from shortage of water, but from excess and unequal distribution of

water. What we want in Bengal is not an irrigation department, but a river-training organisation." (Collected works, vol-II, Orient Longman) উঃ ২৪ পরগনা জেলার ক্ষেত্রে এই কথা আরও বেশি বেশি সত্য। যে বিপুল পরিমাণ জল এই জেলা প্রতিবছর পেয়ে থাকে — সেই জলকে আদম হিসাবে না লেখে কিভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণে মানুষের কাছে লাগানো যায়, সেটাই হওয়া উচিত ছিল পরিকল্পনার প্রথম কথা। তারপর বাড়তি জল নিষ্কাশন করার জন্য নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের নিকে লক্ষ্য দিলেই চলতো। কিন্তু কোনোটিই করা হল না। বর্ষার জলকে কাছে লাগানোর কোনো বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা না করে মিষ্টি জলের এই বিশাল ভাণ্ডারকে প্রতিবছর অপব্যয় করা হচ্ছে এবং নিকাশী ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমানের ফলে এই বিশাল জলের ভাণ্ডার প্রতিবছর মানুষের ভীতনে বিপর্যয় নমিয়ে আনছে।

অজ্ঞ জলের এই বিশাল ভাণ্ডারকে কাছে লাগানোর পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন কি খুব দুঃসাধ্য ছিল? যুক্তিসঙ্গত একটাই উত্তর হতে পারে — না। অগোঁড় বলেছি — জেলার বিতীর্থ অঞ্চল ছাড়ে সব মরা নদীর বাত রয়েছে। অযত্ন ও চুরি সবুও এখনও বহুটুকু খাত বর্তমান তাই কালরে এই জেলার প্রাকৃতিক নিকাশী ব্যবস্থার সিংহভাগ। একটু পরিকল্পিত বড় ও উদ্যোগ, একটু জনকল্যাণদুই দৃষ্টিভঙ্গি, একটু সততা ও দায়বদ্ধতা — এই মরানদীর বাতগুলির চোখেরা অনেকটাই পাশে দিতে পারে। শুধু যে এগুলি জেলার নিকাশী ব্যবস্থারই উন্নয়ন ঘটাতে পারে তাই নয়, এগুলিকে অনেকটা মিষ্টি জলের আধার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। আর শুধু মরা নদীখাতই নয় — জেলা ছাড়ে রয়েছে অসংখ্য বিল বাওড়। এই জেলার শুধু বরপনগর ব্লকের কথাই ধরা যাক। এই ব্লকে রয়েছে (১) বিল বরী - আয়তন ১০ বর্গমাইল (২) পাঁতভাঙ্গা বিল - আয়তন ৬ বর্গমাইল (৩) তরণীপুর বাওড় (৪) ফেলিয়া বাওড় (৫) দুর্গাপুর বাওড় এবং এই ধরনের বিল-বাওড় সমস্ত ব্লকেই কম-বেশি রয়েছে। কিন্তু দুখের হল, এই বিল-বাওড়গুলো রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সরকারি উদ্যোগ নেই। সেখা যাচ্ছে বিল-বাওড়গুলোর মধ্যে মাটির সীধ দিয়ে ছোট-বড় মাছের ডেড়ি তৈরি করা হচ্ছে এবং এসব হচ্ছে প্রকাশন—অসামান্য জমির দালাল ও রাজনৈতিক নেতা — এই ব্রীড়ের মিলিত সম্মেলোভায়। এই জেলার সব চেয়ে বড় বিল — 'বিল বরী'তে গেলেই দেখা যাবে এই ধরনের কয়েকশত মাছের ঘেরীর অস্তিত্ব রয়েছে এবং এইভাবে বিল বাওড়গুলোকে কার্যত হত্যা করা হচ্ছে।

অথচ এই বিল-বাওড়গুলিকে যদি উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করে মিষ্টি জলের আধার হিসাবে গড়ে তোলা যেত তাহলে এই জেলার কৃষিকাজ ও জনস্বাস্থ্যের চিত্র অনেকটাই পাস্টে ফেলা যেত। এই জেলার সেচসেবিত জমির প্রায় ৮০ শতাংশ চাষ হয় মাটির নীচের জল তুলে। অধিক ফলনশীল ধাতু ব্যবহার করে এই চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল অত্যধিক পরিমাণে ও অপরিকল্পিতভাবে মাটির নীচ থেকে তোলার জন্য আর্সেনিক দূষণের মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই জেলার ২২টি ব্লকের মধ্যে ২০টি ব্লকেই এই সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।



ইছামতীর উপনদী ঘনুনের হাল। সংগ্রহের পরে। দুপাই মাগে। সৌজন্য : আমদাবাদ

বৃষ্টির অতিরিক্ত জল এই সমস্ত বিল-বাওড়ে পরিকল্পিতভাবে ধরে রেখে মিষ্টি জলের সুসংহত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারলে এই জল আর্সেনিকমুক্ত পানীয়জল হিসাবে ব্যবহার করা যেত এবং কিছুটা পরিমাণে চাষের কাজে ব্যবহার করলে মাটির নীচ থেকে জল তোলার প্রয়োজনীয়তাও হ্রাস পেত। বৃষ্টির বাড়তি জল অভিশাণ নয় — আশীর্বাদ হিসাবেই কাজ করত। এছাড়াও মিষ্টি জলের মাছের চাষ বিল-বাওড়গুলির মধ্যে সংযোগ গড়ে তুলে অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বর্ষা মনুষ্যের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হ'ত, এবং বর্ষা ধরনের জনকল্যাণমুখী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেত। আমরা এখন বাস্তবেই অনুভব করতাম — ‘জলের আর এক নান প্রাচীন’।

চমি, বিল-বাওড় সংস্থার করে মিষ্টি জলের আধার গড়ে তোলার প্রথম উপাধান করলেই সরকারি মহল থেকে যে আপত্তি সবচেয়ে প্রথমে উঠবে তা হল — ‘সবই তো বুখলাম, টাকা কোথায়?’ আপাতভাবে মনে হতে পারে, ‘তাই তো, সরকার এতো টাকা পাবে কোথায়?’ কিন্তু বিচার বিবেচনা করলে এই যুক্তি যোগ্য টেকে না। গত বছরের কন্যার কথাই ধরা যাক। সরকারি হিসাবে গত বছরের কন্যা এই রাজ্যে সম্পদের হানি হয়েছে ৫৬৬০.০৫ কোটি টাকা (গণশক্তি, ৩.১১.২০০০), রেলের ক্ষতি হয়েছে ৪১ কোটি টাকা, রাজস্ব হানি হয়েছে ১১ কোটি টাকা এবং ব্রাহ্মকাজ পরিচালনা ও গৃহ অনুদান বাক বরচ হয়েছে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ সর্বমোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৬,৭১২.০৫ কোটি টাকা। গত ২৫ বছরে ৭৮ বৎসে কন্যা হয়েছে ১৮ বার। সহজেই বোঝা যায় এই সব কন্যার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি বিপুল। এর সামান্য

একটা অংশ ব্যয় করেই কি বিল-বাওড়গুলির সংস্থার ও মিষ্টি জলের বিপুল আধার সৃষ্টি করা যায় না? যায় না কি জনসাধারণের বাৎসরিক দুর্ভোগের বিশাল বোঝা খানিকটা লাঘব করা? যায় — শুধু প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, সনিষ্কণ্ড ও জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি।

দুঃখের হলেও এটা সত্য যে, বিষয়টাকে এই দৃষ্টিতে বিচার করা হয় নি। বর্ষা মরসুমের মিষ্টি জলের বিশাল ভাণ্ডারকে সম্পদ হিসাবে না দেখে সমস্যা হিসাবে দেখা হয়েছে এবং তাই পরিকল্পনা যতটুকু হয়েছে তা হল কিভাবে এই জলকে বিভিন্ন নিকাশী ব্যবস্থার মাধ্যমে সমুদ্রে নিয়ে ফেলা যায়। একথা সত্য, বাড়তি জলকে সমুদ্রে নিয়ে ফেলাতে হবেই এবং তার জন্য উন্নত নিকাশী ব্যবস্থার পরিকল্পনাও গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সেখা গেল এক্ষেত্রেও আমাদের পরিকল্পনাকারেরা চূড়ান্ত বার্ষিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা জলকে ব্যবহারের উদ্যোগ নিশেন না, জলকে সমুদ্রে নিয়ে ফেলার আয়োজনও করলেন না, প্রাকৃতিক নিকাশী ব্যবস্থার স্বাভাবিক আয়োজনকে সংস্থার করে সর্বল ও জীবন্ত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন না, বরং এগুলির মুহূর্ত্ত প্রক্রিয়াকে দ্বিগুণিত করতেই ঘুরিয়ে সাহায্য করলেন — ফলে যা হবার তাই হল। জল জীবন না হয়ে মৃত্যুর দূত হিসাবে কাজ করতে থাকলো। এবং এই প্রক্রিয়াই এখন আরও বেগবান হচ্ছে। আমরা বছর বছর জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।

১৯৬৫ সালে নদীবিজ্ঞানী কপিল ভট্টাচার্য উঃ ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট, বনগাঁ, ব্যারাসত মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে সরেজমিন অনুসন্ধান করে এই জেলার নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটা বিস্তৃত রিপোর্ট তৎকালীন রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। কিন্তু

কণিলযাবুর এই রিপোর্ট বাংলা সম্ভবত তখনই বাংলা কাগজের খুঁড়িতে নিষ্ক্ষেপ করেছিল। তারপরেও সরকার অনেক কমিটি বসিয়েছে। কমিটিও সমস্যা সমাধানে তাদের ধারণামত নানা প্রস্তাব পেশ করেছে। কিন্তু কোনো প্রস্তাবই বাস্তবায়িত হয় নি। এমনকি, যমুনা বেসিন ড্রেনেজ স্কীম, দাঁতডাঙ্গা বেসিন ড্রেনেজ স্কীম, পদ্মা বেসিন ড্রেনেজ স্কীম, বিপবলী বেসিন ড্রেনেজ স্কীম — ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও লি গুরু হয়েও মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়েছে। এদের হিমফরে পাঠিয়ে কর্তারা হাঁক ছেড়ে বেঁচেছেন। অথচ এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে দেশের ১০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মানুষ উপকৃত হতেন। ইছামতীর একটু পরিকল্পিত সংস্কার হলে এই নদী ৫০ হাজার কিউসেক ভরবন করতে পারে — এটাই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। অথচ সংস্কারের ন্যূনতম ছেলেখেলা হয়েছে। ইছামতীর জীবন প্রবাহ বেগবান হয় নি, ক্রমশ স্থিমিত হয়েছে। গতবারের ভয়াবহ বন্যার পরেও বিপবলীর সাথে ইছামতী সংযোগকারী শরৎখাল এবং দাঁতডাঙ্গা বিলের সাথে ইছামতীর সংযোগকারী পানিতর খালের ন্যূনতম সংস্কারের দায়িত্বও সরকার পালন

করেনি। ফলে উপর থেকে ভল ভ করে ঢুকাল সেই ভল বেরানোর পথ না পেয়ে আবার এই নির্দীর্ণ এলাকার মানুষকে ভুবিয় মারবে। এই ভবিষ্যতই বর্তমানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ডাই সরকারের শুকবোধ জাগ্রত হওয়ার ওভরকমের জন্য প্রতীক্ষায় কার্ণ সময় অতিবাহিত করে আর লাভ নেই। মনে রাখতে হবে — 'বহিনকে পোনাবার জনা উচ্চকস্তর প্রয়োজন।' এই 'উচ্চকস্তর' অয়োজন কানটানি সাধারণ মানুষের জীবনে এখন একান্ত ভরসী। ইতিমধ্যেই গঙ্গা ভাঙন রোধের লবি জনাতে গিয়ে জাপ দিয়েছেন দহরমপুর মুর্শিদাবাদের নহিক্কনন। তবিশাতে এই প্রথম আরও নহিক্কননের জাগবনের মধ্য দিয়েই কি এখন কর্তাদের বাধ্য করা যাবে এলিকে একটু দৃষ্টি দেওয়ায়? তার আগে বহন পহর আমাদের দেশতে হলে দুঃসহ সবকারি অপরার্থতা ও উদাসীনতা, স্পষ্টে হবে মানুষের সামগ্রীক অনগ্রহতা, কর্ণাত্রীত দুর্ভোগ, কর্ণ অর্জনন। ভাবি — এর শেষ হলে

ডাই



Attuned to
People's Aspirations



United Bank of India

Your Own Bank

visit us at: www.unitedbankofindia.com

ঘটনা প্রবাহ

□ ২০০০ সালের বন্যায় রেলব্রিজ বা রেললাইন ভেঙেছিল, এই রাস্তা, ২৯৬টি। নদী তার স্বাভাবিক বহতা পথে অজ্ঞান বাধা পায়। নদীখাত গ্রাম পারের সমান, এখানে ওখানে কানালটি, রেলব্রিজ, ছোট বাঁধ নদীর জলকে অবরুদ্ধ করেছে দিনের পর দিন। শেষে বৃষ্টি বাড়তে শুরুর নদী রেলব্রিজ, রেলপথ ভেঙে তার বয়ে যাওয়ার রাস্তা করে নিয়েছিল নিজেই। কর্তৃপক্ষ বুঝতে চায় নি — ওই ভাঙা ভায়াগাওলোই রুদ্ধ-জলের পছন্দসই সরণ পথ; নদী-প্রকৃতি সেরকম ২৯৬টা রেল অবরোধ ভেঙে অব্যাহত ইস্তিতে দেখিয়ে দিয়েছিল তাকে মুক্তি দেওয়ার সহজ ইস্তিত। [উৎস মানুষ, বন্যা প্রতিরোধ সংস্থা, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা ১২]। অজ্ঞ জগে নি। সরকারি উদ্যোগ পটাংট ভাঙা রেলপথ যেভাবে-সেভাবে ছুড়ে, মাটি ভরাট করে আগের অবস্থা ফিরিয়ে এনেছে। ছুন মাস অবদি রাষ্ট্রীয় কর্তারা বুশমানে বাহা কুড়িয়েছেন। কিন্তু ৯ দিন আর পৌঁছামিলের পক্ষটি টিকতে পারে! তাই জুলাই-এর শুরু থেকে সামান্য জলের তোড়ে আবার আগের ভঙ্গুর ভায়াগাওলো ভাঙতে শুরু করেছে। যেমন, গতবারের বিধ্বস্ত পাগলাচতী রেলব্রিজ: 'পুরোদস্তুর' সারাই হতে না হতেই পাগলাচতী ব্রিজের লাইন একদিকে বসে গেছে। প্রচণ্ড বৃষ্টি নিয়ে অতি ধীরে লাগাইন, ভাগীরথী এগ্রপ্রেস পাগলাচতী পার হচ্ছে। মাঝে মাঝেই সারাই-এর জন্য কয়েক ঘণ্টা ট্রেন বন্ধ রাখতে হচ্ছে। আবার চলছে সন্তর্পণে। যাত্রীরা ইটমাল জপছেন টলমলে ট্রেনে। জুলাই মাসের শেষে এই অবস্থা।



বৃষ্টি নামতেই বর্ধমানের মঙ্গলকোট, অডিসগ্রাম আর কাটোয়া ব্লকের পাঁচ লক্ষ মানুষ অজয়ের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে উদ্বেগে সিঁটিয়ে আছেন, কারণ অজ্ঞ জলই থেকেই পাড়ে ভাঙতে শুরু করেছে। আবেদন নিবেদন বিক্ষোভের তবাবে রাজা প্রশাসন এখন সেচ দফতরের অপসার্যতাকে দায়ী করতে শুরু করেছে।

গত ৭/৮ মাসে সরকারি বৈঠক ও প্রকল্প রচনা হয়েছে বেশ, অজ্ঞকে শাসনে রাখার জন্য। মঙ্গলকোট বি ডি ও অফিস ও পঞ্চায়ত সমিতি যৌথভাবে ১০-পয়েন্ট 'বন্যা প্রতিরোধ কর্মসূচি' তৈরি করেছে। অন্তত ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করানোর প্রস্তাব পেশ হয়েছে। স্থানীয় 'বন্যা প্রতিরোধ কমিটি'র তত্ত্বাবধানে কিছু বন্যা প্রতিরোধের কাজও হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে কাজের-কাজ কেমন হয়েছে তার একটা চিত্র পাওয়া যাচ্ছে 'না স্টেটসম্যান' পত্রিকার ১লা জুলাই-এর সংবাদ সূত্র থেকে: ● অজয়ের পাড়ে নবনির্মিত বাঁধ, পাশিগ্রামে এর মধ্যেই ভাঙতে শুরু করেছে। ● সেচদপ্তর বলছে অজয়ের দক্ষিণ পাড়ে ধান্যকুবি থেকে বেকুয়া গ্রাম পর্যন্ত বাঁধ তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু 'প্রতিরোধ কমিটি' এই দাবিকে নস্যাত করে দিয়ে দ্রুত মেরামতির কাজ ও বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির কাজ শেষ করতে বলছে। ● গত বছরের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার পর অজ্ঞ ও কুনার নদীর সংযোগস্থল কোগ্রামে একটি দুইস গেট কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল, অর্থও ব্যয়াদ হয়েছিল। যদিও সেচদপ্তর দাবি করেছে দুইস গেটের শতকরা ৭০ ভাগ কাজ হয়ে গেছে, কিন্তু স্থানীয় কমিটি সেটা স্বীকার করছে না।

লক্ষ লক্ষ মানুষকে এভাবে মিথ্যা ভ্রোক ও বিবৃতিতে প্রতারিত করার পুনরাবৃত্ত ঘটনায় স্থানীয় তিনিটি ব্লকের মানুষ এখন ক্রোধ বিষেবে ধৈর্য হারাচ্ছেন। গত ২৭ জুন কয়েক হাজার মানুষ ভোমিয়া সেচ অফিস ঘেরাও করেন; তাঁদের বক্তব্য, বাঁধ তৈরি ও মেরামতিতে চোখের সামনে নিয়মানের জোড়াতালি দেওয়া কাজ হচ্ছে সেবেও সেচ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার ও তদারকি কর্তৃপক্ষ নির্লিপ্ত। মানুষের আও গ্রাণসংশয় নিয়ে তাদের যেন কোনো ভাবনাই নেই।

□ তথ্য অবস্থার প্রকৃত চিত্র দেয়। আবার তথ্যই যখন বিকৃত ও অসত্য হয়, যখন বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মেলে না, মানুষ বিভ্রান্ত হয়। বিগত কয়েক বছরে সরকারি মুখপাত্র, মন্ত্রী,

□ উত্তর চব্বিশ পরগনায় ২০০০-এর বন্যায় ইছামতী (জীর্ণ মৃতপ্রায়) বাধায়-বাধায় জর্জরিত হয়ে বিপুল অঞ্চল জলে ডুবিতে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেচদপ্তর আর সংশ্লিষ্ট সরকারি উদ্যোগ ফাঁকা নির্দেশে বে-আইনি ভেড়ি বাঁধ কেটে দিতে বললেও কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। জনরোষ দানা বাঁধছে সেবে ইছামতী যমুনা সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলো রাজ্য সেচ দপ্তর কয়েক কোটি টাকা পকেটে নিয়ে। এবারে জুন মাসে বর্ষা শুরু হতেই 'সংস্কার' করা ইছামতী-যমুনায় জল বইছে না। স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। কিসের সংস্কার হ'ল? নদী-বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বনগা-বসিরহাট এলাকায় নদীপার্শ্বের জমা পলি কাটা হয়নি একদম, নদী বইবে কোথায়? ফলে শক্তিত চাবীরা আর সাহস করে আমন ধান বুনতে চাইছেন না, কপলে নৌকো বানাতো শুরু করেছেন। যতগুলি পারা যায়। তাঁরা সরকারি প্রশাসন ও সেচ দফতরের ওপর এককিন্দুও ভরসা রাখতে পারছেন না আর।

□ গতবছর অজ্ঞ, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকেশ্বরের ভয়াবহ বন্যার পর থেকে বাঁধ মেরামতি ও প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার যথেষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন জুন মাসের শেষ থেকে

সেচবিভাগের কঠী এবং জেলা প্রশাসকের বিবৃত তথ্যে অঙ্কিত সাত্ত্ব-বিচ্ছতি, পারস্পরিক ফারাক এবং নির্ভ্রা প্রাপ্তি।

গত ২৮ জুন ২০০১, দুহঃস্পতিবার রাতে আকাশবাণীর এফ এম প্রচার তরঙ্গে 'আও বন্যারোধের প্রকৃতি' নিয়ে একটি বৈঠার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির বৈশিষ্ট্য ছিল গত বছরের বিধ্বংসী বন্যার পর সরকার ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সেওয়া প্রতিবেদন ব্যবহার প্রতিশ্রুতিগুলিকে সরাসরি কতাবিতারের মুখ থেকে জেনে নেওয়া টেলিফোন মারফত। এবং তারপর পর্যন্ত কতাব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে নেওয়া। এই অনুষ্ঠানের প্রোতারা নিম্নকর্ণে যা ওয়েছেন—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের গ্রামমন্ত্রী হাফিজ আলম সারাদী ফোনে জানালেন, গত বছরের মত বন্যাপ্রতিভিত মানুষকে এবারেও যাতে খোলা আকাশের নীচে বৃদ্ধ-শিশুসহ পাড়ে থাকতে না হয় সেজন্য সরকার এবার বন্যাপ্রবণ প্রতিটি জেলায় নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র বা রিসিফ শেলটার তৈরি করে দিচ্ছেন সেচদপ্তরের তত্তাবধানে। যেমন, মুর্শিদাবাদে এরকম ৭টি বাড়ি বা শেলটার তৈরি হয়েছে। ... যেন গেল সেচবিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার-১ চন্দন রায়ের কাছে। চন্দনবাবু জানালেন মন্ত্রী ও সরকারের আগাম পরিকল্পনা অনুসারে ৭টি আশ্রয়গৃহের ৫টি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, ২টির অবশিষ্ট কাজ ভরা বর্ষা নামার আগেই শেষ হয়ে যাবে। ... ফোনে ধরা হল মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক বিবেক কুমার-কে। তিনি স্পষ্ট জানালেন রিসিফ শেলটারের বাড়ি পুরোপুরি তৈরি হয়েছে ২ টা (ডাডে কয়েক শ' লোক মাত্র গোলার ঠাই পাবে মাত্র—অনুষ্ঠান সঞ্চালক), বাকি ৫টির কাজ এগোচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে বন্য নামার আগে কিছু করা যাবে কারণ এই বাড়িগুলি নতুন করে ভিত থেকে তৈরি হচ্ছে না, স্থলবাড়ির ছাদের ওপর গাধনি তুলে করা হচ্ছে, তাই আর খুব সেরি হবে না। অতঃ এই কাজটিকে গভবছর (২০০০) নভেম্বর থেকে এবছর জুন-শেবের মধ্যেও হয় নি।

(খ) মন্ত্রীমশাই ফোনে সবচেয়ে ডাঙম-প্রবণ মালদার গঙ্গা, এবং নদীয়ার জলসীর নদী-পাড় সারাই-এর কাজে বিবৃত পরিকল্পনা নিয়ে নামা হয়েছে, কাজও এগিয়ে চলছে, অর্থের অভাব হবে না। ... মুখা সেচকর্তা-১ চন্দন রায় ফোনে জানালেন — এমব্যাকসেন্ট (নদীর পাড়-বাঁধ) সারাই-এর কাজ শুরু এগোচ্ছে। বর্ষায় নদী বেড়ে ওঠার আগেই মেরামতির কাজ শেষ হয়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই। ... ধরা হল ফোনে মালদা ও নদীয়ার। মালদার জেলাশাসকের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি বললেন, এই জেলায় ডাঙা পাড়-বাঁধের পের্ড বিরাট। কাজ হাত পাড়ছে, কিছু সারাই হয়েছে, অনেকটাই বাকি আছে (২৮শে জুনের কথা)। বর্ষায় জলটির অতিরিক্ত (Additional) জেলাশাসক সরাসরি জানালেন টোতার ডাঙা ও আনুষঙ্গিক কাজ হয়েছে বাঁধ-মেরামতি ও রিসিফের জন্য (সেটা ২৮শে জুন)। কাজ শুরু হবে।

উৎস মানুষ প্রতিবেদক

প্রবীণ প্রযুক্তিবিদের পরামর্শ বন্যা থেকে কিছু পরিত্রাণ

দক্ষিণবঙ্গ বন্যা বোধহয় মানুষের নিত্যসঙ্গী হবে। বর্ষা শুরু ময়ম নিশীড়িত মানুষের শঙ্কাও ওত হয়ে গেছে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ বন্যার পরও সম্ভবপর হল না নভেম্বর মাসের অনুকূল সময় থেকেই বন্যা প্রতিরোধের কাজ শুরু করা। ২০০১ বন্যার জ্ঞান নিয়ে এখন আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ সরকার বন্যার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছেন। অতঃ বন্যার আগে সরকার ছিল গরিব মানুষদের গ্রাণ ও সামান্য অসুস্থতার সম্পত্তি রক্ষার একটা ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা। অতঃ, এখন বিপদসংকুল এলাকার হাট মানুষজনকেই স্বাবগসী হতে হবে আশ্রয়কার্থে। কিন্তু কীভাবে?

বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রচুর কলাগাছ সাগালে ভবিষ্যতে কলাগাছের জেলা অনেক মানুষজনকে ও তাদের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারবে। এছাড়া পাঁচ/ছয়টি করে পরিবার একত্রিত হয়ে তাদের বাড়ির আশেপাশে মোটামুটি উঁচু ভূমিতে মাটির বেশ খানিকটা উঁচু ভূমি বানিয়ে রাখতে পারেন হঠাৎ বন্যা এসে অস্ত্রদের জন্য। এই উঁচু ভূমিটির চারদিকের ঢাল ঠিক করে করতে হবে; প্রতি এক হাত উঁচু করতে তিন হাত দূর থেকে ঢাল করে আসতে হবে। ঐ ঢাল চটজটাই কিছু বা মাটি-ভর্তি বস্তা দিয়ে ঢেকে নিলে বন্যার চল মাটি ধুয়ে ধস নামাতে পারবে না। বন্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে আভ প্রয়োজন দাবলী মানসিকতার, বনির্ভরতার। সরকারি প্রশাসন বা অন্য কোনো পক্ষায়েত পরিষদের তরসার বসে থেকে কতি ছাড়া লাভ নেই মনে হয়।

ভরুণ কুমার চৌধুরী

সন্ট লেক / পোর্ট ট্রাস্টের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার



নতুন বিক্রয়কেন্দ্র ও পরিবেশনা

পত্রপুট

৩৭/২, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

(হারিসন রোডের উত্তর দিকে গলিতে)

ফোনে যোগাযোগ : ২৪১-৯৭২৭ এবং ৩৫৮-৬৩৯১

(রায়ে) - ৩৩৪-০৯০৪, ৩৩৪-৪১২৫, ৪৬৬-৯৪৩৫

নজিরবিহীন 'অতিবৃষ্টি'র খাঁখা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

গতবছর (২০০০) সেপ্টেম্বরের অকস্মিক বন্যার কারণ জনসমক্ষে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দ্রাক্ষতই মুশকিলে পড়েছিলো রাজ্য-সরকার, বিশেষত রাজ্য সেচদপ্তর। বন্যা নিয়ন্ত্রণে বার্ষিকতার মোহতর অভিযোগকে এড়াতে গত বছরে যাত্রোত্তিরিক্ত বৃষ্টির (রেকর্ড) কথা— যা নাকি গত ১০০ বছরেও এ বৈশ্ব হয়নি— বারবার প্রচার করা হয়েছে প্রশাসনিক ও সেচ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, এখনো হচ্ছে। এরকম অকস্মিক বৃষ্টি হলে সরকারও অসহায়, মানুষের কিছু করারই থাকে না (অর্থাৎ লায়ও থাকে না)।

এমনিতে এই সরকারি প্রচার, বারবার শুনে, মানুষের সহজ মনে বিশ্বাস না করে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে যেখানে মননীয় মন্ত্রী, প্রশাসক, সেচ ও জলপথ দপ্তরের মুখ্য বাস্তবকার, এমনকি সদ্য-গৌরব-গড়ানো বামবর্গী ছাত্রনেতা পর্যন্ত (যদিও অধিক উদ্বেজনায় ক্রমে নেতৃগণিত বারবারই বৃষ্টিপাতের একক সেন্সিটিভার, সেন্সিটিভার ... বলে যাচ্ছিল) সবাই একই কথা বলছেন। সত্যিই তো, প্রকৃতি যদি বেমত্বা এই ২০০০ সালেই ১০০ বছরের রেকর্ড ভাঙার মারপ-বেলায় মারে, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ কতটাই বা সামলাবেন! ... কিন্তু মুশকিল হল সংসারে কিছু সত্য-তথ্য-সম্প্রদায়ী (ওরফে ছিত্রসম্প্রদায়ী?) মানুষ থাকেনই যারা সরকারি তথ্য ও কাণ্ডাখণ্ডা ভাঙা করে বুঝে নিতে চান, বিশেষত যেখানে ১৬৫৮টি নিরীহ গ্রাম, ২২ লক্ষ বসতগৃহ, ৮৮ হাজার গবাদি পশু বন্যার ফুলে চলে যায় চিরতরে (এসবই আন্তর্জাতিক এ এফ পি'র [AFP] তথ্য, সরকার সমর্থিত)। আর বুঝতে শিরে ঝটকা লাগে। প্রথম ঝটকা প্রচারিত পরিসংখ্যানের উৎস দেখে। লক্ষ্য করবেন, রাজ্য সরকারের দায়িত্বর তথ্য ও ১০০ বছরের রেকর্ড বৃষ্টির কথা সেচ দপ্তরের নিজস্ব পরিমাপক যন্ত্রের গণনার ওপর দাঁড়িয়ে। অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথ্য তাঁরা মানে না, প্রচারও করেন না (অবশ্য সামান্য কিছু ব্যাংক ও অর্থবহিকা অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রম আয়োগ বা Central Water Commission সূত্রে সেচ-বিভাগের মুখপত্রে জায়গা পেয়েছে। সেখা যাচ্ছে সেই কয়েকটি সংখ্যা রাজ্য সেচদপ্তরের তথ্যের সঙ্গে মেলে)।

অথচ আমরা ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত জেনে-ওনে-নেখে আসছি ঝড় বাদল উল্ফচাপ নিরুচাপ আর্দ্রতা বৃষ্টিপাতের

পরিমাণ সব সময় কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দপ্তর থেকে প্রচার করা হয়। তাদের যন্ত্রপাতিও ক্রমাগত আধুনিকতম হচ্ছে, ফলে নির্ভর করার মত তথ্য আমরা পাই (বিচিত্র প্রকৃতির দৈনন্দিন সামান্য স্বাভাবিক বিচলন বা deviation তো থাকবেই)। এবং আবহাওয়া দপ্তরের (Indian Meteorological Department বা IMD) সরকারি প্রচার করা তথ্যই প্রতিদিন কাগজে, রেডিওতে, টিভিতে নিয়ম করে প্রচার করা হচ্ছে। এটাই ছিল দাখারগের কাছে পরিচিত তথ্যসূত্র। এই ২০০০ সেপ্টেম্বরের বন্যাত্রেই হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তরকে দেখা গেল তাদের বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্রকেই ভরসা করছে তারা পুরোপুরি এবং ১০০ বছরের রোমাঞ্চকর দৃষ্টিভঙ্গা প্রচার করছে ক্রমাগত। বলতে নেই, প্রাক্কালের সাধের পাঠ্যকে 'ককুর' 'ককুর' বলতে বলতে প্রাক্কালেরও শেষ অবধি বিশ্বাস করতে হয়েছিলো— তাহলে ওটা পাঠ্য নয়, ককুরই।

আসলে, মিলছে না। মধ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত প্রায় সব জেলাতেই রাজ্য সেচদপ্তরের বৃষ্টির পরিমাণ অলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বৃষ্টির চাইতে অনেক অনেক বেশি নেখা যাচ্ছে। তাফব কি বাতঃ একই রাজ্যে একই আকাশের একই মেঘের ভল দুই দপ্তরে দু'রকম বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লিচ্ছে! কেন্দ্রীয় IMD'র অধিকর্তা রাজেন গোপনার গণমাধ্যমে অনেকবার বলেছেন রাজ্যের IMD'র মুখ্য বাস্তবকার (১) চন্দন রায় বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আমলাদের নেওয়া বৃষ্টিপাতের তথ্য গোপমাল আছে, ওদের পরিমাপে সঠিক চিত্র আসছে না। 'ধর্মের কাহিনী' কে শোনে। সেচকর্তাদের ১০০ বছরের নজির ভাঙার দাবি একচুলও নড়াছ না; এমনকি ইউনেসফে ইউনিসেফ (UNICEF) যখন জানাচ্ছে ২০০০ সেপ্টেম্বরের বৃষ্টি গত ২০ বছরের রেকর্ড, তখনও রাজ্য-বিভাগের অবস্থান বিচ্যুতি নেই।

১০০ বছরের আবহাওয়ার নথি ঐটা স্বাভাবিক অসম্ভব। তবে সচেতন মানুষ দুই দপ্তরের প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখতেই পারেন, এবং দেখলেই ধাঁধার স্বভাৱ গোরাটা বুজে যাবে। উদাহরণ নেওয়া যাক। গত বন্যার পরেই নাজিমুর সেচ দপ্তরের পক্ষ বাস্তবকারের বেতার বিবৃতি অনুসারে ময়ূরাকী ও অজয় অববাহিকায় যে পরিমাণ জলের ঢল নেমেছিলো তা থেকে সরল অঙ্ক কষলে বোঝায়, ঐ পরিমাণ ভলবৃষ্টির জন্য বৃষ্টিপাত হতে হয় ২৬০ মিলিমিটার। আবহাওয়া দপ্তর বলছে

(IMD) ওই অববাহিকায় ১৮ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০০, চারদিনে মোট বৃষ্টি হয়েছিলো ২৪৮ মিলিমিটার। ঠিকই ছিল, বিশ্বাসযোগ্য তথ্য। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সেচ দপ্তর প্রকাশিত মুখপত্র 'সেচপত্র', বিশেষ বন্যা সংখ্যা ২০০০-এ দেখা যাচ্ছে ২৪-২৫ পৃষ্ঠার সারণিতে, যে ওই মন্থরাঙ্গী ও অজয় অববাহিকায় সেপ্টেম্বরের সেই চারদিনে মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বর্ণনাক্রমে ১০০৪ ও ৭২৬ মিলিমিটার। মুদ্রিত পরিসংখ্যান কোথায় গিয়া উঠেছে সেখান। বিশ্বাস টান খেতে যায় না! (ব্রষ্টব্য: উৎস মানুষ, জানুয়ারি ২০০১, 'আগামী বন্যা প্রতিরোধ সংখ্যা', কল্যাণ ক্রমের নিবন্ধ, পৃ. ১১)

কেন্দ্রীয় সরকারের (IMD) দেওয়া বৃষ্টিপাতের মাত্রা রাজ্যের সেচ বিভাগের IWD-ওয়ার চাইতে প্রচুর পরিমাণ কম দেখানো হয়েছে (২০০০ বন্যায়)। এই যুক্তিতে পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট কর্তারা 'নজিরবিহীন অতিবৃষ্টি', '১০০ বছরের রেকর্ড বৃষ্টি', 'মন্থাসুট বন্যা নয়' ইত্যাদি কৈফিয়ৎ দাবিল করছেন এবারই। অথচ অতীতেও প্রচুর বেশি অঙ্কের বৃষ্টিপাত নথিভুক্ত করা হয়েছে রাজ্য সেচ ও জলপথ দপ্তরেই, ছাপা হয়েছে রাজ্য-সরকারেরই নিজস্ব 'সেচপত্র' পত্রিকায়, তখন কিন্তু এত 'বড় গলয়' অতিবৃত্তিকে দাবী করা হয় নি। এখন হচ্ছে। যেমন ধরুন ২২ বছর আগে ১২৭৮-এর সেই কিতীষিকাময় বন্যা। ২০০০-এর আবহাওয়া দপ্তরের পরিসংখ্যানের (গণমাধ্যমে প্রচারিত) পাশাপাশি ৭৮-এর সেচ বিভাগীয় পরিসংখ্যান ('সেচপত্র', বন্যা ২০০০ বিশেষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১০ থেকে নেওয়া) তুলনা করলে যে-কোনো পাঠকই বৃষ্টিপাতের অঙ্কে বাড়বাড়ন্তের চেহারাটা চিনে নিতে পারবেন :

মোট বৃষ্টিপাতের জেলাওয়ারি পরিসংখ্যান

জেলা	আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে ১৮ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০০, ৪ দিনে মোট বৃষ্টিপাত (মি মি)	সেচ বিভাগের সূত্রে ১২৭৮ ৩১.৮ থেকে ৩.৯, এবং ২৭.৯ থেকে ১.১০.৭৮, ৯ দিনে মোট বৃষ্টিপাত (মি মি)
নদীয়া	৩১১	৪৩৬ (শেষ ২ দিনের তথ্য নেই)
উ. ২৪ পরগনা	১৯০	৭২৪
মেদিনীপুর	৯০	৫২৯
বাঁকুড়া	৫০	৬৯৮
পুর্নুলিয়া	১৬৯	৫৫৪

অর্থাৎ ১২৭৮-এও সেচবিভাগের দপ্তরে প্রচুর অধিক বৃষ্টিপাতের তথ্য এসেছিলো। আলিপুর আবহাওয়া কেন্দ্রের হিসেবের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু তখন এত চিন্তাচিন্তি হয় নি, অথচ এবার ২০০০-এর বন্যা নিয়ে 'অতিবৃষ্টি'ক অতিপ্রচার কেন? আরো একটা মজা আছে এই পরিসংখ্যানের বেলায়। ১২৭৮-এর বন্যায় রাজ্যে প্রাবৃত এলাকার পরিমাণ ছিল ৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার—রাজ্য সেচ দপ্তরের হিসেব। 'চাকর'র গত দশই বছরে অনেক নদী-উপনদী-শাখানদী মরে গেছে, অনেক নদীশাখা উঠে উঠে প্রায় কুলসমন হতে চলেছে, সব কটা ভাঙ্গাখারে জমা পলির ত্তর বেড়েছে। ফলে এখন বর্ষা জল অনেক বেশি এলাকা ভাসাবে। অথচ ২০০০ বন্যায় বড়ো প্রাবৃত এলাকার পরিমাণ দেখা যাচ্ছে ২৩,২৭১ বর্গকিলোমিটার— সেই রাজ্য সেচ দপ্তরকেই হিসেব। হাইকোর্ট গতবারের বৃষ্টিপাত গত ১০০ বছরের ইতিহাসে 'রেকর্ড' দাবী হল কি করে? হলে তো এবারের প্রাবৃত অঞ্চলের পরিমাণ ৫০ হাজারের (১২৭৮) চাইতে অনেক অনেক বেশি হওয়া কথা, সাধারণ নিয়মেই। স্ত্রী জবাব নোহেন তর্জাবক্রিগণ?

এইসব দেখে ওনে কি শেষে এটাই বৃষ্টি পাত হলে যে, রাজ্যে নদী-পরিচালনার গোড়ায় গলদ, নদী সংস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারি ব্যর্থতা, ভাঙ্গাখাণ (ডাম, ব্যারেল) থেকে ভুল ছাড়ার ব্যাপারে চরম দায়িত্বহীনতা, জাঙন রেখেই নয়েমি-বছর বোম্বার আর বীধ-নির্মাণ নিয়ে মাত্রাকড়া দুর্নীতি — এইসব কলঙ্কে ঢাকাতেই 'নজিরবিহীন অতিবর্ষণ' প্রচারের ঢাক ক্রমাগত পেটানো হচ্ছে? ভুলভোগী মানুষ কিন্তু ক্রমেই সত্যাটাকে বেশি করে চিনছে। পরিণতি ... জানা নেই!

‘ওরা কিছু না করলে, আমরা কিছু করতে পারি’

কল্যাণ রুদ্র

বা তুচ্ছের স্বাভাবিক নিয়মে আবার বর্ষা এসে গেল। বর্ষাকে সানন্দে বরণের পরিবর্তে একটা আশঙ্কা আর ভয় গ্রাম-বাংলাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অনেকেই আমন ধান লাগাতে সাহস পান নি পাছে আবার বন্যায় সব ভেসে যায়। অনেকে নৌকা বানিয়েছেন, কেউ বা মাচা বেঁধেছেন অনেক উঁচুতে। এইসব আপাত-মিত্ততাপ সংবাদগুলি বৃত্তিতে দেয় ২০০০ সালের বন্যা গ্রাম জীবনে কি গভীর ক্ষত রেখে গেছে। ঐতিহ্যময় বাংলার মাটির বাড়ি ক্ষত হারিয়ে যাচ্ছে। গত বন্যায় ভোগে যাওয়া ২২ লক্ষ বাড়ির অনেকগুলি পুনর্নির্মিত হয়েছে দর্মার বেড়া আর টালি দিয়ে, যাতে বন্যার সময় ক্ষত খুলে নেওয়া যায়। মহাজনের কাছ থেকে নেওয়া পর্বত প্রমাণ স্থলের বোকা আর শতকরা ২০ ভাগ সুদের চাপে অনেক কৃষকই চরবিত।

এবারও কি ভয়াবহ বন্যা হবে? সংশয়ী এই প্রশ্ন প্রায় সর্বত্র, আর উত্তর তো আমাদের সবারই জানা। গত বছর যে ভৌগোলিক অবস্থায় বন্যা হয়েছিল, এবার তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। বন্যার নিয়ন্ত্রণে দুটি প্রাথমিক শর্ত হল— বর্ষার তল সংরক্ষণ এবং নিকানী ব্যবস্থার উন্নতি, এই দুটি কাজই গত বছর সেই ‘ভয়াবহ বন্যার পরও চূড়ান্ত অব্যাহতি। কোনো জলাধারের ধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটেনি, তৈরি হরনি নতুন কোনো ছোট বা বড় জলাধার। ডি ডি সি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে জলাধার থেকে উদ্ধৃত তল ছেড়ে দেওয়া তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইছামতী সংকারে যেটুকু প্রহসন ঘটেছে তাতে নিকানী ব্যবস্থার কোনো উন্নতি ঘটবে বলে মনে হয় না। নদী সংকারে স্বাভাবিক নিয়ম হল নিচের দিক থেকে পলি অপসারণের কাজ শুরু করা, উদ্দেশ্যপূরণের এই রাজ্যে ইছামতী সংকারের কাজ শুরু হয়েছিল উত্তর দিক থেকে। ছায়াটি শুধা মাস অব্যাহার কটিয়ে সংকারের কাজে হাত দেওয়া হল জুন মাসের গোড়ায়, যখন বর্ষা এসে গেছে। স্বভাবতই কবী ইছামতীকে মুক্ত করা যায় নি। এই স্থবিরতার মূল কারণ অবশ্যই রাজনীতি। যারা ইছামতীকে কবী করেছে তারা নিশ্চিতভাবেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মদত পেয়েছে, তাই ইছামতীর চলার

পথের সব বাধা অপসারিত হবে— এই সরকারি ঘোষণা বাস্তবায়িত হয় নি।

এরত অবস্থায় বিধ্বংসী বন্যার সত্তাবনা থেকেই যাচ্ছে। পঃ বাংলায় সেপ্টেম্বর হল প্রাবনের মাস। গত পাঁচটি বড় আকারের বন্যা এসেছিল সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বা অক্টোবরের গোড়ায়। এবছরও ঐ সময় একটি নিম্নচাপজনিত তিন বা চার দিনের ভারী বৃষ্টি প্রাবন ডেকে আনতে পারে— এমন সত্তাবনার কথা রাজ্য সেচ দপ্তরও অস্বীকার করে না। ঐ দপ্তর নানা রাজ্য জুড়ে নানা স্থানে রেডিও টেলিফোন ও পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে আগাম সতর্কতা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এই আগাম বার্তা নানা পর্যায় পেরিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কতদূর পৌছাবে সেই আশঙ্কা থেকেই যায়। গত বছরের বানভাঙ্গি বাংলায় ২.১৮ কোটি মানুষের বিজীকাময় অভিজ্ঞতা এমন সন্দেহকে আরও বহুমূল করেছে, যদি আগাম সতর্কতা সময়মত মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া সম্ভব হয় সে ক্ষেত্রেও বানভাঙ্গি মানুষ কোথায় আশ্রয় পাবে সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয় নি। অতীতে প্রায় সব বন্যার সময়-ই স্থূল ও কলেজগুলি আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে; গত বছর বন্যার সময় সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে সাময়িক আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ জেলাতেই এ ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। মুর্শিদাবাদ জেলায় জনৈক সাংসদের আর্থিক সহায়তায় ৭টি আশ্রয়স্থল নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এছাড়া স্থূল কলেজগুলি প্রতি বছর আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রায় দুইমাস বাদ যায়, সুতরাং স্থূল কলেজকে বন্যাসুগুণ্ডের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার না করাই কাম্য। অবশ্য হীরক রাজার দেশের মত যদি ধরে নেওয়া হয় — ‘জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই’, তবে সমস্যা সমাধানের জটিলতা অনেকটাই কমে যাবে।

গত বছরের ভয়াবহ বন্যার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঐ বিপর্যয়ের জন্য অনেকখানি দায়ী পঃ বাসের রেল ও

সড়ক ব্যবস্থা। ১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার পর আচার্য প্রমুখ চন্দ্র রায় লিখেছিলেন— 'The Government was willfully and criminally responsible for the great havoc.' তিনি দাবি করেছিলেন রেলের কালভার্টগুলিকে আরও প্রশস্ত করে জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। গরু বন্যায় পং: বাংলায় ১৩৬৬ কি. মি. ভেঙে যাওয়া রেলপথ পুনর্নির্মিত হয়েছে জল প্রবাহের প্রয়োজনীয় পথ না রেখেই। কেবলমাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রে কালভার্ট কিছুটা প্রশস্ত করা হয়েছে।

এই চরম সরকারি উদাসীন্য একটি সন্দর্ভক প্রতিফলিত লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকার বিশেষ কিছু করবে না এটা ধরে নিয়ে মানুষ তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও বিচার চেঁচা শুরু করে দিয়েছে। এগিয়ে এসেছে বেশ কিছু অ-সরকারি সংস্থা। 'সেন্ট লেগের ডিভান্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার' দুটি পর্যায়ে উঃ ২৪ পরগনার গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৬০টি যুবককে বন্যাদুর্গতদের উদ্ধার ও সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়েছে। এ ব্যাপারে ইউনিসেফ (UNICEF) প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু ৩০টি নৌকা ও 'সাইক জ্যাকেট' তৈরি করা হয়েছে। যাতে বিপন্ন মানুষদের উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা যায়। ঘামাবপুর 'স্পেড' (Spade) নামে একটি সংস্থা মুন্সিগাঁও ও নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে 'বক্সসুইচ' 'কুচ' খণ প্রকল্প চালু করেছে: এক্ষেত্রে OXFAM বা UNICEF-এর মত সংস্থাগুলি আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এ সবই বন্যাপরবর্তী বা বন্যা চলাকালীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রকৃতি। ছোট ছোট আদর্শবাদী গণসংগঠন ও ব্যক্তিও সাহায্যমত গ্রাণ ঢেলে সাহায্য করেছে গতবার।

কিন্তু বন্যার তীব্রতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্বার জল সংরক্ষণের একটি সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। লক্ষণীয়, ডি. ডি. সির' সবকটি জলাধার এবং ম্যাসাজুর জলাধার কাড়খণ্ড রাজ্যের ভিতরে অবস্থিত। নবনির্মিত কাড়খণ্ড সরকারি হস্তিগায়ে ডি. ডি. সির' সমর মন্ডর বীচীতে সরিয়ে নিতে চেয়েছে। সুতরাং ভাবতে হবে এ রাজ্যের সীমার মধ্যে জল সংরক্ষণের কথা। সামগ্রিক জল সংরক্ষণ পরিকল্পনা সরকারি উদ্যোগ ব্যতীত সম্ভব নয়, তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এই কাজ কিছুটা করা যায়। 'সংকুতি ও সমাজ উন্নয়ন পরিবদ' নামে একটি অ-সরকারি সংস্থা মাগদহের একটি প্রভাতগ্রামে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে; যে-সব কৃষকের দু'বিঘা জমি আছে তাদের জমির এক অংশে সংস্থাটি একটি করে ৫০ x ৪০ x ৮½ ফুট গভীর পুকুর কেটে দিয়েছে। খরচ হয়েছে প্রায় ৬০০০ টাকা। এই কাজে জমির মালিক বেচ্ছায় প্রম দানও করেছেন। এই পুকুরে একাধারে মাছের চাষ হয়েছে আর শুবার

আপংকালীন ধার্মিক জ্যাকেট

বানের খরনোতা জলে ডুবে মারা যায় কত মানুষ! কত শিশু বৃদ্ধ-যুবা। জলে কোনো উপায়ে ভেসে থাকতে পারলে প্রাণরক্ষার সুযোগ থাকে। 'ডিভান্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার' সংস্থার কর্ণধার এক অভিনব জ্যাকেট তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন — অত্যন্ত সাধারণ সহজলভ্য উপকরণ নিয়ে যে-কোনো লোক এই সাইক জ্যাকেট নিজে বানিয়ে নিতে পারেন। পরকার হ'ল মোটা কাপড়, চামর বা রেপালের টুকরো: শাড়ী, মুড়ি দু'দিনে তাঁত করে নিলেও চলবে, আর ধার্মিকদের টুকরো (শিট) যা আতকাল রেডিও, টিভি বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি প্যাঁকিং করতে প্রচুর ব্যবহার হয়।

কাপড়ের টুকরো হাতকটা জানার আকারে কেটে নিম্ন। সমান মাপের দুটো। এবার দুটো কাপড়ের পোলের মধ্যে ধার্মিক শিট ঢুকিয়ে চারপাশ বড় হুঁচ নিয়ে পেশাই করে নিন। 'অবিকল' একই রকম আরেকটা পিস বানান। এরকম দুটো পিস হলেই যুক্ত-শিটে বেঁধে জ্যাকেট হয়ে গেল। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, এই



এরকম দুটো নিয়ে সাইক জ্যাকেট হ'বে একমুহুর।

মাফুল ধার্মিকদের জ্যাকেট গায়ে বেঁধে ছোট শিশু থেকে ভোয়ান-মুগ মানুষ জলে ডুবে থাকে। ডোবে না। যে-কোনো স্থানীয় ক্লাব বা ছোট সংগঠনের কর্মীরা ইলেকট্রনিক জিনিসের পোকাম ঘুরে ঘুরে অনায়াসে প্রচুর ধার্মিক শিটের টুকরো জোগাড় করতে পারে। তারপর বন্যার আগেই গ্রামে গিয়ে জ্যাকেট তৈরি করে দিতে পারে বা সাহায্য করতে পারে।

সময় জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হয়েছে। ফলত পুকুর বনন করার কাজে ৩ কাঠা জমি ব্যবহার করা হলেও বাকি ৩৭ কাঠা জমিতে দ্বিতীয় বার ফসল ফলেছে। এই ধরনের দ্বিমুখী জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগেও শুরু করা যায়, প্রয়োজন হয় না কোনো বিশেষ কারিগরী জ্ঞান কিংবা প্রচুর মুসলন। পং: বাংলার ৫৪,৫৬০ বর্গ কি.মি.বাপী কৃষিজমির ৫ ভাগ এলাকা জল-সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করলে বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাবে, সেচ ব্যবহার প্রদার ঘটবে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে,

ভৌম (underground) জলস্তর সমৃদ্ধ হবে, নদীতে পলির পরিমাণ হ্রাস পাবে, এবং বাড়বে শুধা মরসুমে প্রয়োজনীয় জলের যোগান। বড় জলাধারগুলি থেকে দীর্ঘ খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা করলে প্রচুর জলের অপচয় হয়। ভারতের কোনো সেচ প্রকল্পে জলাধারে সংরক্ষিত জলের ৪০ ভাগের বেশি কৃষি ভূমিতে পৌঁছে দেওয়া যায় নি। প্রায় ৬০ ভাগ জল প্রতি বছর বাষ্পীভবন ও মাটির দ্বারা শোষিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই ধরা আর বন্যা চক্রাধারে গ্রামবাংলার কৃষি অর্থনীতিকে আঘাত করে। এ বাচ্চো ভৌমজলের যোগানও সীমিত। এ বাচ্চো ব্যবহারক্ষেণ ১৪৬০ কোটি ঘনমিটার ভৌমজল প্রতিবছর সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়ে যায়। এই ব্যবহারের অবশ্যত্বাধী পরিস্থিতি হিসাবে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে আর্সেনিকের বিষ। সুতরাং ক্রমবর্ধমান জলের চাহিদা মেটাতে পারে বর্ষার কুটির জল। অপ্রতুল সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য এই সম্পদ আমরা ব্যবহার করতে পারি না। মনে পড়ে বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার কথা। আচ্ছ থেকে প্রায় সাত লক্ষ আগে তিনি লিখেছিলেন—

“... Bengal, which does not suffer from shortage of water, but from excess and unequal distribution.” [Collected Works of Meghnad Saha, Vol. II, পৃ. ২৪। রচনার সময়কাল ১৯৩২। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে গেছে কিন্তু একটি সামগ্রিক জল-সংরক্ষণ পরিকল্পনা আজও দূর অস্ত। বন্যা আর ধরার প্রকোপ ক্রমবর্ধমান।

প্রয়াত পদ্মলাল হাসগুপ্ত বন্যা ও ধরার অভিলাষ থেকে গ্রামবাংলাকে মুক্ত করতে নানা ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভেবেছিলেন। শাস্তিনিকেতনের কাছে মাঝি পাড়ায় তাঁর উদ্যোগে বিকট নীধি কেটে সেই মাটি দিয়ে উঁচু পথভাড়া তৈরি হয়েছে। অভয় নদীতে দ্রাবন গুরু হলে মাঝি পাড়ার সব পরিবার ঐ উঁচু পাহাড়ের আশ্রয় নেয়। বাংলার প্রতিটি গ্রামে মজা নদীগুলি থেকে মাটি কেটে অস্ত্রত একটি করে খেলার মাঠ পর্যাপ্ত উঁচু করে রাখলে বৎ মানুষ বন্যার সময় আশ্রয় পেতে পারেন। এই উঁচু আশ্রয়-স্থলে অস্ত্রত দুটি টিউবওয়েল বসিয়ে কিছুটা পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব। আগাম মজুত রাখতে হবে চিড়ে, বাতাসা ইত্যাদি শুকনো খাবার এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ পর। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বোকা গেছে বন্যার সময় যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হলে কলকাতা-কেন্দ্রিক ত্রাণব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছায় না। তাই ত্রাণব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের কাজটি বুঝি ওজস্বর্ণপূর্ণ।

অন্তএব, সরকারি ব্যবস্থার শব্দক গতির কথা মাথায় রেখে স্বাধীনতা বা সমষ্টিগত উদ্যোগেও কল্যাণ ক্ষয়ক্ষতি ও তাণ্ডব কল্যাণে কমিয়ে দেয়া যায়। চাই সদিচ্ছা, উদ্যোগ ও মানবমুখী স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি।

ভুক্তভোগীর পরামর্শ বন্যকবলিত মানুষদের জন্য

বন্যার সময় এসে গেল। কত জনপদ ডুবে যাবে, কত গরু মোর ডেসে যাবে, সরকারি হিসাবে একরকম সংখ্যা পাওয়া যাবে, বেসরকারি মতে আরো বেশি। হিসাবের খেলা চলছে, চমকেই থাকবে এইভাবে। এই খেলা ফ্রিজে রাখতেই হবে, এটা কেন অলিখিত সিদ্ধান্ত। কত লোকের ‘উপরি’ নির্ভর করছে এই বন্যার উপরে। কাশণ, প্রশাসনের উপর যেতে মীচ পর্বত কোথাও (কি রাজা সরকার, কি কেন্দ্রীয় সরকার) চিরকালের জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা নেই। সমস্ত নদী, নালা, খাস, বিল, পলি মাটি, আগাছা ইত্যাদিতে ভর্তি হওয়ার দরুন অল্প বৃষ্টিতেই ভেসে যাচ্ছে জনপদ। সরকারি আমলা, এমনকি পঞ্চায়েত বাবুদেরও গ্রামের জনসাধারণের প্রতি কোনো মায়া মমতা নেই। তারা বসে থাকে কল্যাণ সময় কত ক্রিপাল, চিড়া, গুড় চোখ পথে বাজারে বেড়ে সেওয়া যাবে। তার হিসেব করতে। গ্রামের জনসাধারণ জানেন, যাদের ভোট দিয়েছেন তারা বন্যা ঠেকাবে না, আমাদের আর করণীয় কী থাকবে? কিন্তু, জনসাধারণ সচেতন না হলে— এই সমস্ত বিপদ থেকে কোনো দিন রেহাই পাবেন না সরকারি ব্যবস্থায়। তাই, বন্যা আসার পূর্বেই বন্যা-কবলিত জনসাধারণের নিজেদের প্রয়োজনে নিরক্ষিত পরামর্শগুলির প্রতি নজর দিতে অনুরোধ করছি :

- (১) ভাতন এলাকায় বন্যা আসার আগেই নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে। পাকা রাজার ধারে (যারা জমি কিনতে পারেন না) মাটি উঁচু করে বাঁশের বেড়া দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে হবে।
- (২) যেখানে সেখানে, মলমূত্র ত্যাগ না করে উঁচু করে বাঁশের মাড়া বেঁধে সেখানেই মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে।
- (৩) ব্রিটিশ পাউডার, ডেটলের বোতল বাড়িতে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে।
- (৪) কিছু শুকনো কাঠ, ঘুটে, কেরোসিন তেল, পেঙ্গলাই, মোমবাতি, দ্রাম্ভিক প্যাকেট মুড়ে রাখতে হবে। টর্চ বাতি থাকলে খুব ভালো হয়।
- (৫) বিছানা পয় ওছিরে রাখার জন্য পলিখিন পেগার আগে থেকেই কিনে রাখতে হবে। অথবা জোগাড় করতে হবে।
- (৬) শুকনো খাবার, যেমন - বিস্কুটের প্যাকেট, চিড়া, মুড়ি, গুড় বন্ধ করে কাঁচের বোতল কিংবা বোয়ামে রাখতে হবে।

(৭) নলকূপের মাথাগুলিকে বন্যা আসার আগেই উঁচু করতে হবে, যাতে বন্যার ভঙ্গ নলকূপের মাথা না ঢেকে। এটা নিচ্ছেদের পক্ষে সম্ভব না হলে, অন্তত কলের মাথাটা পলিধিন, প্রাস্টিক বা টুকরো ত্রিপল দিয়ে মুড়ে বেঁধে দিন।

(৮) কিছু দরকারি ওষুধ আগাম সংগ্রহ করে পলিধিন মোড়া ব্যাঘ্রে বেধে দেওয়া খুবই জরুরি। বিশেষ করে সর্দি, জ্বর, বমি, পাতলা পায়খানার ওষুধ আর 'ও আর এস' সঙ্গে সাগা দরকার। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দরদী ডিকিৎসক ও বেক্সেসেসী দলের স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে এখনই যোগাযোগ করে প্রস্তুতি নিতে হবে। ... পরিষ্কার খাবার জল বোতলে বা ক্যারিকেনে ফতটা সম্ভব জোগাড় করে নিতে হবে।

(৯) এই সময় যোগাযোগ রক্ষার জন্য এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য গ্রামে গ্রামে ২-৩টা করে নৌকা রাখা দরকার।

মনোজ্যে সাহা
পদ্মানন্দপুর, মালদা

সংযোজন

(১০) বন্যা আসার বিপদ সংকেত সম্পর্কে গ্রামবাসীকে সজাগ থাকতে হবে। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ সংকেত প্রচার করার ব্যবস্থা আছে। সেটা যাতে সময়মত দেওয়া হয় তার জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস এবং থানার জালিয়ে রাখতে হবে।

(১১) সসামারের দরকারি কাগজপত্র, দলিল, সঞ্চয় সার্টিফিকেট, পারিবারিক নথি ইত্যাদি অমূল্য সামগ্রী মজবুত প্যাকেটে এবং পলিধিন মোড়কে সহজে সঙ্গে রাখুন।

(১২) ঘরে পেতল বা তামার ঘড়া অথবা বড় কাপা থাকলে সেগুলো পানীয় জলে ডুর্ভি করে, মুখ ভালো করে ঢেকে বন্ধ করে, মজবুত গাছের ওপরের দিকে বেঁধে দিন। কিংবা উঁচু শক্ত পোস্ট ঘরের কাছে থাকলে তার সঙ্গে বেঁধে রাখুন। এতে বন্যার পর দুর্ভাগ্য পানীয় জল কিছুটা পাওয়া যাবে।

(১৩) বানের তোড়ে ভেসে বেরিয়ে খার সব। স্থানান্তরের জন্য নৌকো জোটে না। বাড়ির ছাদের টিন (করেপেটেড শিট) কিংবা বেড়া বা গোয়ালঘরের টিন একটু বাকিয়ে ডোঙা বানিয়ে দিন। চরম বিপদে বাজা-বুড়ো মিলে এটাতে চেপে নৌকার মত যেতে পরবেন।

(১৪) ঘাসের সঙ্গতি আছে আগাম 'বন্যা-ঝীমা' (ইনসিওরেন্স) করিয়ে রাখুন, যেখানে সুযোগ আছে।

সূত্র : আন্তর্জাতিক 'জরুরী অবস্থা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ',
আমেরিকা। [http://www.csta.gov/emermgmt/phases/
index.htm](http://www.csta.gov/emermgmt/phases/index.htm)

বন্যার জল সরে যাওয়ার পরে

সকলন : অনসূয়া মুখোপাধ্যায়

বি

পাত ধরবাড়ি, রাস্তাঘাট, জলের লাইন, নষ্ট হওয়া চোতর্ভূমি, বাস্তবসম্মত — এসব পুনরুদ্ধার করা, সরকার পক্ষায়েত বা স্থানীয় প্রশাসনের বদনামা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু বর্জিত অবস্থাতেও নিচ্ছেদের ব্যবহার জল ও রোগ সংক্রমণের উৎসগুলিকে অব্যাহত রাখে। প্রতিরোধের ব্যবস্থা কিছু নেওয়া যেতে পারে নিজ অঞ্চলের উদ্দেশ্যে :

- যে ক'দিন সম্ভব, ঘট্টাকু সম্ভব, পানীয় জল কুটিয়ে খান। ফুটন্ত অবস্থায় জলকে ১০ মিনিট রাখলে অধিকাংশ ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। তারপর জল ঠাণ্ডা হলে ব্যবহার করুন।
- জল ফোটারোর মত অবস্থা বা সঙ্গতি না থাকলে হ্যাণ্ডপম্পে ট্যাবলেট বা ক্লোরিন (ক্লোরিন দ্রবণ) দিয়ে পানীয় জল শোধন করে নিন : ৪ লিটার জলে ১টা হ্যাণ্ডপম্পে ট্যাবলেট অথবা ৬/৭ টেবুটা ক্লোরিন ফেলে আধ ঘণ্টা রেখে দিন ঢাকা দিয়ে। তারপর পাওয়া যাবে নিশ্চিত।
- বানের নোংরা জল ঢুকে কুয়ো, পাতকুয়ো, ইঁদুরা, টিউবয়েল বা নলকূপের জল দূষিত হয়। প্রত্যেক কেসের প্রকৃতপক্ষে 'জনস্বাস্থ্য কারিগরি' দপ্তরে শোধন-ব্যবহার সরঞ্জাম থাকার কথা। এমনটিই থাকে না তার বন্যার সব তছনছ। অতএব নিচ্ছেদেরই করে নিতে হবে। পরিমাপমত ব্রিচিং পাউডার দিয়ে জল পরিষ্কার করে নেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। ব্রিচিং পাউডার সরকারি জ্ঞান দপ্তর, পঞ্চায়েতের গ্রামসভা, বেসি-বিপসি বেক্সেসেসী সংস্থা ও এন ডি ও'সের থেকে সংগ্রহ করতে হবে। তারপর পাউডারের পরিমাণ ও পদ্ধতিটা সঠিকভাবে জেনে নিয়ে কাজ করতে হবে। একই পরিমাণ ব্রিচিং সর্বত্র প্রয়োগ করলে কাজ হবে না। কল ও কুয়ের সাইজ অনুসারে ব্রিচিং-এর পরিমাণ হিসেব করে দিতে হবে।

কুয়ের ক্ষেত্রে

কুয়ের ব্যাস বা চওড়ার মাপের ওপর নির্ভর করবে কতটা ব্রিচিং দিতে হবে। ৩ ফুট চওড়া ছোট কুয়েতে প্রতি ফুট

গভীরতার জন্য সেড় (১২) কাপ পাউডার লাগবে— ঘরে ব্যবহৃত মাঝারি সাইজের চায়ের কাপ হলুই হবে। চায়ের ভাঁড়ের মাশে হবে না। বিজ্ঞানসম্মত হিসেবটা হল— ৩ ফুট চওড়া কুয়ো যদি ৩০ ফুট গভীর হয় তাহলে ব্রিচিং পাউডার লাগবে ৩০-এর সেড় গুণ, মানে ৪৫ কাপ। কুয়োটা যদি ৫ ফুট চওড়া হয় তাহলে প্রতি ফুট গভীরতার জন্য সাড়ে চার (৪½) কাপ ব্রিচিং পাউডার লাগবে। তার মানে, ৫ ফুট চওড়া কুয়ো যদি ৩০ ফুট গভীর হয় তাহলে পাউডার লাগবে সাড়ে চার, তগ তিরিশ — ১৩৫ কাপ। কুয়োর মাপের ওপর ব্রিচিং-এর পরিমাণ নির্ভর করবে। হিসেবটা এরকম—

৩ ফুট চওড়া কুয়োতে প্রতিফুট গভীর-জলে ১½ কাপ ব্রিচিং পা.	
৪	৩
৫	৪½
৬	৬
৮	১২
১০ " " " " " "	১৮ কাপ ব্রিচিং পা.

এই হিসেব মফিক কাপের সংখ্যকে কুয়োর গভীরতা দিয়ে গুণ করে নিশেই হবে।

- এবার উপযুক্ত পরিমাণ ব্রিচিং পাউডার একটা বড় বালতি বা পাত্রে নিয়ে তাতে ১০ গ্যালন (৪৫ লিটার) জল মিশিয়ে ওলে নিন। পুরো ব্রবণটা ভালো করে কুয়োর জলে, সেয়ালে, পাড়ে, সর্বত্র ছিটিয়ে নিন। কুয়োর কোনো অংশ যেন কাদ না যায়। ফ্রোরিনের কড়া গন্ধ নাকে পাবে। এবার পলিথিন শিট বা ব্রেশপল দিয়ে কুয়োর মুখ ঢেকে বেঁধে দিন।
- চব্বিশ ঘণ্টা এভাবে রেখে দিন। পরের দিন কুয়োর মুখ খুলে জল নেড়ে দিয়ে ফ্রোরিনের ঝাঁঝলে গন্ধটা বেহিয়ে যেতে দিন। ওপর দিক থেকে খোলাটে জল খানিকটা তুলে ফেলে নিতে পারেন। ধীরে ধীরে কড়া গন্ধ চলে যাবে। জল ব্যবহারের যোগ্য হবে। নিরাপদ হবে।

নলকূপ বা টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে

- কোন কলের জন্য কতখানি ব্রিচিং পাউডার লাগবে সে হিসেবটা আগে ঠিকমত করে নিতে হবে। আপনার টিউবয়েল বা টিপকলের পাইপে কতটা জল ধরে সেটা প্রথমে হিসেব করে বের করতে হবে। পাইপটা কত ইঞ্চি

মাপের সেটা জানতে হবে। যেমন ধরুন, আপনার টিউবকল যদি ৬ ইঞ্চি পাইপের হয় তাহলে ১ ফুট পাইপে জল থাকে সেড় গ্যালন। কল যদি ১০০ ফুট গভীর হয় তাহলে পাইপে মোট জল থাকছে সেড় তিনতক একশ', মানে দেড়শ (১৫০) গ্যালন।

- জল শোধন করতে প্রতি ১০০ গ্যালন জলের জন্য ৩ কাপ ব্রিচিং পাউডার লাগে। চায়ের কাপ, ৮ আউন্স মাপের হবে। সেই হিসেবে ৬ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর টিউবকল বা নলকূপে লাগবে ৪½ কাপ ব্রিচিং পাউডার। বিশ্ব জনস্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র এবং বিশ্ব

রেডক্রস সোসাইটি থেকে একটা হিসেবের লিস্ট দেওয়া হয়েছে —

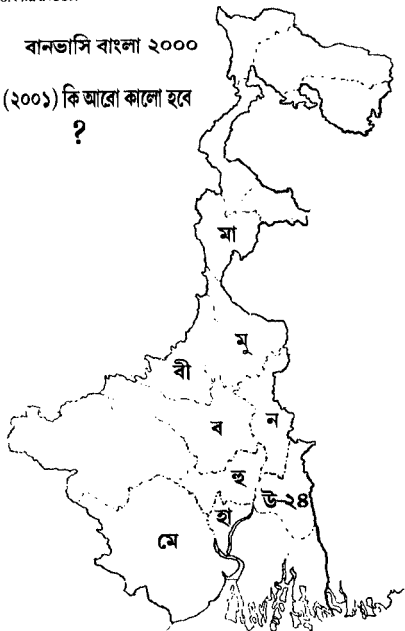
- ৩ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর টিপকলে ৩৭ গ্যালন জল ধরে; ব্রিচিং পাউডার লাগবে ১ কাপ
- ৪ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর কলে জল ধরে ৬৫ গ্যালন, ব্রিচিং পাউডার লাগবে ২ কাপ
- ৫ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর কলে জল ধরে ১০০ গ্যালন, ব্রিচিং লাগবে ৩ কাপ

- ৬ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর কলের জন্য ৪½ কাপ
- ৮ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর কলের জন্য লাগবে ৮ কাপ।
- এরপরের কাজগুলো প্রায় আগের মতই। নলকূপের মাপ অনুসারে সেইমত ব্রিচিং পাউডার ১০ গ্যালন বা ৪৫ লিটার জলে ওলে নিন। টিউবয়েলের ওপরের ঠাক দিয়ে পাউডার-গোলা ব্রবণ ঢালতে থাকুন, কলের বাইরের গায়েও ঢালুন এবং ধীরে ধীরে হাতল টিপে পাম্প করুন। এভাবে দশ-পনের মিনিট ধরে ব্রবণ মেথলে ফ্রোরিনের ঝাঁঝলো গন্ধ বেগোতে শুরু করবে।
- এবার টিপকলের মাথা এবং কলের মুখ পলিথিন শিট বা ব্রেশপলের টুকরো দিয়ে ঢেকে বেঁধে দিন — রিক কুয়োর মত। এভাবে কয়েক ঘণ্টা রাখুন, পারলে চব্বিশ ঘণ্টাই রাখুন।
- পরদিন কলের মুখ খুলে দিন। জল পাম্প করে প্রথমে খানিকটা ফেলে দিন। ধীরে ধীরে ফ্রোরিনের কড়া গন্ধ চলে যাবে। এবার নিশ্চিতকরে কলের জল ব্যবহার করুন।

(যাবতীয় তথ্য ইন্টারনেট মাধ্যমে অ্যাডমিরিকার ইন্সট্রাক্টর রাফোয় জনস্বাস্থ্য দপ্তর, আন্তর্জাতিক Disaster Information Centre এবং রেডক্রস সূত্রে পাওয়া।)

বানভাসি বাংলা ২০০০

এবার (২০০১) কি আরো কালো হবে
?



সকল ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সপ্ট লেক, কলিকাতা ৭০০ ০৬৪ হইতে প্রকাশিত এবং
'পৈঙ্গী', ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা ৭৪ হইতে মুদ্রিত।



শরণ সংখ্যা

cur
A/A 18/07/07

- ধর্ম কী, ধর্ম কেন • বেদ-এ সত্যি কী আছে •
 ভারতের আর্থ-মোহকতা • জ্যোতিষ-ডিগ্রির রাজনীতি
 • গর্ভ নিরোধক 'নেট-এন' পুরুষতন্ত্রের মারণাস্ত্র •
 • বাঘ মামি সংবাদ •



শেষ কথা

মেঘনাদ সাহা

১৯২১ সালে মেঘনাদ সাহা যখন অধ্যাপক সমারফিন্ডের আমন্ত্রণে তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব 'তাপীর আয়নের' বিষয়ে বক্তৃতা দানের উদ্দেশ্যে জার্মানির মিউনিখে উপস্থিত হন, বিশ্বকাবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন মিউনিখে অবস্থান করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেঘনাদ সাহার ইতিপূর্বে কোন পরিচয় ছিল না। অধ্যাপক সমারফিন্ডের কাছেই কবিগুরু প্রথম মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক অবদানের ভূয়সী প্রশংসা শোনেন। মেঘনাদ সাহা কবিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রজ্ঞাপন করলে, কবি অত্যন্ত প্রীত হন এবং মেঘনাদ সাহাকে দেশে ফেরার পর শান্তিনিকেতন পরিদর্শনের জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেন।

অধ্যাপক সাহা ১৯৩৯ সালের নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে যান এবং ১০ই নভেম্বর সেখানে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটি 'একটি নতুন জীবন দর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধাকারে ভারতবর্ষে ২৬ ফেব্রু, ১৯৪৬ পৃঃ ১৩৭ (ইং ১৯৩৯) সংখ্যায় প্রকাশিত হলে, এর বিরুদ্ধে বহু সমালোচনা ছাপা হতে থাকে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা পশ্চিমে নীলসী গ্রী অলিনসবর রায়েব শীর্ষ সমালোচনার উত্তর দিতে প্রয়াসী হলে গার্বাহিকভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস ও বেদ, উপনিষদের মর্মবানী সম্পর্কে বিবরণ আলোচনা নিম্নলিখিত অংশে প্রকাশ করেন :

- (১) সমালোচনার উত্তর—ভারতবর্ষে ২৬ ফেব্রু ১৩৭ ফেব্রু ১৯৪৬ (ইং ১৯৩৯)
- (২) বিজ্ঞান ও চৈতন্য—ভারতবর্ষে ২৭ ফেব্রু ১৩৭ আষাঢ় ১৯৪৬ (ইং ১৯৩৯)
- (৩) বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানের প্রচার—ভারতবর্ষে ২৭ ফেব্রু ১৩০ পৌষ, ১৯৪৬ (ইং ১৯৩৯)
- (৪) সবই ব্যাধি আছে—ভারতবর্ষে ২৭ ফেব্রু ১৩৭ ফাল্গুন ১৯৪৬ (ইং ১৯৪০)
- (৫) উপসংহার—ভারতবর্ষে ২৭ ফেব্রু ১৩৪৬ (ইং ১৯৪০)

অবশেষে ক্রমাগত উত্তরদানে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি উপসংহার শীর্ষক প্রবন্ধে ধ্বনিত হন। এই অংশের শেষে মেঘনাদ সাহা শেষ কথা নামক এক ছোট গল্পের অবতারণা করেন, যাকে এককথাকে যেমন বাংলা ভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট কল্পবিজ্ঞানের গল্প হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়, অন্যথাকে এই গল্পটিকে এক প্রাচীনপন্থীর কিংবদন্তি আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা-করণ্যাদ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে দুই পৃষ্ঠার গল্প 'শেষ কথা' পুনর্মুদ্রিত হল।
— মণিরঞ্জন ডাট্টাচার্য।

এটি উদ্ধৃত হল কলকাতা পুরসভা প্রকাশিত (১৯৪৪) 'জন্মশতবর্ষে প্রজ্ঞাপন' সংকলন গ্রন্থ থেকে, পৃঃ ১১২-১১৩।

ভারতবর্ষে আমার প্রবন্ধ দুইটি প্রকাশিত হইবার পর যৌমাছির চাকে ঢিল মারিলে যে রূপ হয় সেই রূপ অনেক প্রকার সমালোচনা, কদালোচনা, গালাগালি নানাধানে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সর্বের উত্তর দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না—এবং আমার প্রবৃত্তিও নাই, অস্বাভাবিকও নাই। নিছক মুক্তিহীন গালাগালির কোন সত্ত্বের আছে কি না জানি না, গালাগালি করিতে পারিলে বোধহয় ঠিক জবাব হয়। কিন্তু তাহাতে অতীষ্ট-সিদ্ধি হয় না, তজ্জন্য ঐ সময়েও গালাগালির পাশা জবাব দিতে আমি অসমর্থ। মাত্র একজন লেখক আমার বেদসম্বন্ধে মতবোঝ জন্ম আমাকে ও (আমার প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য) ভারতবর্ষে পরিচালক সম্পাদক মহোদয়কে 'নরকে' পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সম্পাদক হইতে শাস্তি-খণ্ডায়ন করিয়া নরকের টিকিট নষ্ট করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু আমার নরকের টিকিট গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। উপসংহারে, এই সম্বন্ধে একটি গল্প আপনাদের চন্দ্রবিহার স্নেহে সবেষণ করিতে পারিলাম না। গল্পটি এই—

'দুই বন্ধু—প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী। প্রাচীনপন্থী, বেদ, উপনিষদ-পুরাণের কথাজ্ঞানিত, পঙ্কিকায যত রকম উপবাসের বিধিব্যবস্থা আছে তৎসমুদয় পালন করিত, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিত এবং ইতি টিকটিকি পান্নি মানিয়া চলিত, কোনরূপ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিত না, স্বপাক ভিন্ন আহার করিত না। নবীনপন্থী ছিল বস্তুতাত্ত্বিক কোন কিছু শাস্ত্র-বিধি মানিত না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিত। যথাসময়ে মৃত্যুর পরে প্রাচীনপন্থী গেল 'হিন্দু'র স্বর্গে, নবীনপন্থী গেল বৈজ্ঞানিকের 'নরকে'। কিছুদিন যায়। নবীনপন্থীর অনুরোধে প্রাচীনপন্থী একদিন রিটার্ন টিকিট কাটরা নরক নর্গনে কাহির হইল। কিন্তু সেই যে গেল আর স্বর্গে কিরিয়া আসিল না। ব্যাপার কি? না-ফেরা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হইয়া প্রাচীনপন্থীর স্বর্গবাসী জনৈক বন্ধু তাহাকে চিঠি লিখিয়াছিল; প্রত্যুত্তরে বন্ধুকে প্রাচীনপন্থী যে চিঠি দিয়াছিল তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রাচীনপন্থী লিখিয়াছে—

'... বৈজ্ঞানিকের নরকের সীমানার উপরিভ হইলে প্রথমতঃ জীবন উত্তাপ ও তৃষ্ণা অনুভব করিলাম, ভাবিলাম যাত্রা করিয়া কি স্বকমগ্রহি করিয়াছি, এখন উত্তাপ? কিন্তু

সীমানার ভিতর প্রবেশ করিবারাত্র স্বর্ণের গাড়ি বদলিয়া নতুন গাড়িতে উঠিতে হইল; এখানে একটা বড় ভাণ্ডার দেখিতে পাইলাম। ভাণ্ডারের কপা করিবার আমার শক্তি নাই, নতুন গাড়িতে প্রবেশ করিবারাত্র দেখিলাম অশ্চর্য! ... আর উত্তান নাই, খাসা ঠাণ্ডা এবং মৃদুস্বাদ হাওয়া বহিতেছে। ব্যাপার কি? শুনিলাম, এখানকার সমস্ত গাড়িই air-conditioned। গতকাল স্টেশনে গাড়ি খামিলে নামিয়া বন্ধুর আবাসে উপস্থিত হইলাম। ওখানকার বিধি-স্বাধা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। স্বর্ণে যেমন আমাদের পরিচয় করিতে হইত না, কেবল ইঞ্জিনের সড়ায় হাক্কির থাকিয়া অল্পখার মামুলি নাচ দেখিতে হইত এবং নারস-কবির ভাঙ্গা গলায় পৃথিবীর 'গেজেট' শুনিতে হইত, পানীয়ের মধ্যে একঘেয়ে ভাস্ক ও ধেনো মন—অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি যে সব যন্ত্রের সহিত বর্জন করিয়াছিলাম স্বর্ণে ভাষার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ আমাকে ঐ সমস্ত জিনিস ভোগ করিতে দেওয়া হইত—তেমনি বৈজ্ঞানিকের নরকে উহার সবই উণ্ডী অথচ কি চমৎকার ব্যবস্থা! যদিও নরক দেশটি অত্যন্ত গরম, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে যন্ত্রবলে উত্তাপকে কার্যে পরিণত করিয়া যদিও নরক দেশটি অত্যন্ত গরম, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে যন্ত্রবলে উত্তাপকে কার্যে পরিণত করিয়া যন্ত্রবলে উত্তাপকে কার্যে পরিণত করিয়া air-conditioned করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং উত্তাপ মোটেই

অনুভূত হয় না। তুচ্ছ পাইলে ice-cream সরবৎ, খাবার টেবিলে সর্বসম্প্রদায় টাটকা ফলমূলের প্রচুর্য এবং নতুন ফ্রাঙ্গীতে উদ্ভাবিত অপরূপ আহার্যের ব্যহার, পারিবারি ও মুগ্ধ বতঃই সুখার উল্লেখ করে। স্বর্ণে বেড়ান স্বকম্মারি, ঘোড়াগোলা বুড়া হইয়া গিয়াছে প্রায়ই গাড়ি উণ্ডার, কিন্তু নরকে air-condition হাওয়া গাড়ি, দিবা 'খেয়ে-দেয়ে-মুরে' আরামে আছি। রেডিওর সুইচ টিপিলে বহিঃগতের সব বসর শুনিতে পাই, বিদ্যাত গায়ক-গায়িকার কলা-কুশলী সঙ্গীত, অভিনেতা-অভিনেত্রীর বক্তৃতা, খাট, নৃত্য-কলা প্রভৃতি দেখিয়া শুনিয়া মন আপনা হইতেই মুগ্ধ ও বিভোর হইতে থাকে। বহিঃগতের কোন ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে যখন ইচ্ছা হয় museum-এ যাই এবং planetarium-এ প্রবণ বক্তৃতা শুনি। স্বর্ণের এক ঘোরে জীবনযাত্রার কি সুখ আছে জানি না, কিন্তু আমার কাছে বৈজ্ঞানিকের নরকের জীবনযাত্রা বড়ই অস্বাভাবিক ও সোভজনক মনে হইয়াছে। সুতরাং আমি আমার 'বর্ণবাস' Cancel করিয়া ভবিষ্যতে 'নরক-বাস'ের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি।"—

বর্তমান লেখককে ঘাঁহা, প্রাচীনপন্থীর মত নরকে পাঠবিহার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রভাব আমি সাদৃশ্যে গ্রহণ করিলাম।

৩২

সহস্রাব্দের মূল্যায়ন

অমর্ত্য সেন

সংক্ষেপিত বঙ্গানুবাদ : সুরত কন্যোপাধ্যায়

১৯১২-১৩ বৃত্তাব্দে, অর্থাৎ আশ্ব থেকে ক্রিষ্টাব্দিক চারশ বছর আগে মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সম্রাট আকবর। সেটা ছিল হিজিরা কালপঞ্জিকার ১০০০ অব্দের সূচনাকাল। এই কালপঞ্জিকার পন্থা অনুযায়ী সহস্রাব্দের সমাপ্তি এক উদ্ভীর্ণনার সূচি করেছিল, যা দিহি ও আগ্রায় ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। এই উদ্ভীর্ণনা আকবরকে পাদম-সংক্রান্ত একগুচ্ছ নীতি যোগ্য করে অন্তর্গত করেছিল। রাষ্ট্রশাসন-সংক্রান্ত এই মহান আত্মপর্যায়ের একটি ছিল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা। সম্রাট তাঁর বিখ্যাত ঘোষণা 'ধর্মপালনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যেন প্রতিবন্ধকতার সন্দেহীন না হয় এবং প্রত্যেকে যেন একটি ধর্মমত পরিচালনা করে নিজের পছন্দমত নতুন একটি ধর্ম গ্রহণের সুযোগ পায়।'

উপরোক্ত অথবা অন্য যে কোনো নীতি একটি সহস্রাব্দের অবসানেই বিশেষ প্রসঙ্গিকতা লাভ করবে, আর অন্য সময়ে তার কোনো মূল্য নেই — এরকম ধারণার কোনো বিশেষ

ব্যবণ ছিল না। তবুও, তৎকালীন সরকারি কালপঞ্জিকা অনুসারে সহস্রাব্দের অন্তিম লক্ষ্য অতীত ঘটনাবলি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে, মূলনীতিসমূহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যতের রূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করার পক্ষে শুভকাল বলে পরিগণিত হয়েছিল।

এটা অবশ্যই ঠিক যে, কোনো কালপঞ্জিকা-কৃত সময় বিভাজনের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা ছোয়াসবুনি জড়িত থাকে। পন্থার সূচনা অন্য কোনো সময় থেকে শুরু হতে পারত অথবা সময়ের বিভাজন-পর্বগুলি ভিন্ন সৈরীর হতে পারত। একটি নতুন সহস্রাব্দের সূচনা সম্পূর্ণই এক সর্বমান গ্রহণিত রীতি। বস্তুত, ১৫৮৫ বৃত্তাব্দে সম্রাট আকবর নিজে হিজিরা কালপঞ্জিকার পরিবর্তে তারিখ-ইলাহি নামে এক নতুন সময় সাধক কালপঞ্জিকা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। যে সর্বসমগ্রী ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা তিনি করেছিলেন, সেই দীন-ইলাহির মত এই কালপঞ্জিকাও বেশিদিন টেকেনি। সহস্রাব্দ সম্বন্ধে যে

কোনো ধারণার ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকা তাই একান্ত অপরিসর্য।

এতদসত্ত্বেও, অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটতে পারে তা শুকসংস্কারের বিবেচনার জন্য আমাদের মনে গৈথে যাওয়া কৃত্রিমরূপে সৃষ্ট ইতিহাসের কোনো বিশেষ মুহূর্ত একটি শুভ অবসর হয়ে উঠতে পারে। কর্তমানে আমরা যেটিকে বৃত্তীয় কালপঞ্জিকা বলে জানি এবং যেটি সমসাময়িক বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত আন্তর্জাতিক কালপঞ্জিকা রূপে পরিচিত, সেই পরিমার্জিত রোমান কালপঞ্জিকা অনুযায়ী খ্রিস্টীয় সহস্রাব্দের আসন্ন সমাপ্তিকালকে এরকমই এক শুভক্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। সহস্রাব্দের অবসান নিয়ে কর্তমানে সারা বিশ্বে পরিলক্ষিত উৎসাহ-উল্লাসনার কোনো সুগভীর ও সর্বোৎকৃষ্ট বাস্তব ভিত্তি হয়তো নেই। তবুও উৎসাহ-উল্লাসনার এই মুহূর্তটি একটি বিশেষ ক্ষণ হয়ে ওঠার সাথে সাথে আমাদের কাছে অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাতের এবং জিজ্ঞাসু হবার সুযোগ এনে দিয়েছে।

এই ভাষণে আলোচ্য বিষয়ের সীমাবদ্ধতার বিচারে এর শিরোনামটি দৃষ্টান্তই পরিচায়ক। সম্ভেদ নেই যে বিগত সহস্রাব্দের প্রকৃত ‘মুদ্রায়ন’ করার চেষ্টা নিতান্তই অসম্ভব। এই ধরনের কোনো প্রয়াসের পক্ষে পৃথিবী বিরাট বড় এবং একটি সহস্রাব্দও বিশাল এক সময়। যে পরিস্রেক্ষিতের ওপর ভিত্তি করে এরকম মূদ্রায়নের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে, তা বেছে নেওয়াও কম কঠিন নয়। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার পরিবার্তে কিছুটা সীমিত ও আত্মসীমিত শর্তে আমরা বিশ্ব ইতিহাসের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলি ব্যাখ্যা ও অনুধাবনের চেষ্টা করব।

সহস্রাব্দ পূর্বের পৃথিবী

এক হাজার বছর আগে, অর্থাৎ প্রথম সহস্রাব্দের শেষে পৃথিবীর অবস্থা কী ছিল তা নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের সূচনালগ্নে পৃথিবীতে ঠিক কী ঘটিছিল? প্রথম সহস্রাব্দের সমাপ্তি অশঙ্ক্য আর আতঙ্কের এক কাভাবরণ সৃষ্টি করেছিল। সহস্রাব্দ সমাপ্ত হলেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ভয়াবহ ‘শেষ বিচার’-এর দিন উপস্থিত হবে — প্রকল্পিত এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এক ভয়ানক আতঙ্ক গোটা ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেদিন ১০০১ খ্রিস্টাব্দের সূচনা হল, সেদিন ইউরোপের লক্ষ লক্ষ আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ হস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

এই ভীতি ও আশঙ্কার মধ্যেও কিন্তু বশিষ্ঠা, সংকুতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত

ছিল। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে সহস্রাব্দের সমাপ্তিজনিত আতঙ্কও যুদ্ধ-বিগ্রহগুলিকে বধ করতে পারেনি। বিশেষ করে ইউরোপে তখন যে যুদ্ধগুলি ইচ্ছিল, সেগুলিও যথারীতি চালু ছিল। ১০০০ খ্রিস্টাব্দে শেভালমারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নরওয়ে ডেনমার্কের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। এর অল্পকাল আগে কার্মানরা শেষ স্বাধীন বোহেমিয়ান জাতি প্রাচীনচিহ্নে পদানত করে এবং পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। এই লড়াই নতুন সহস্রাব্দের একেবারে গোড়ার বছরগুলিতে সংঘটিত হয়েছিল। বহিরাক্রমণের কালে বৃটেনের অবস্থা তখন ছিল সংকটময়। ৯৯১ খ্রিস্টাব্দে ম্যালডনের যুদ্ধে ডেনমার্ক এসেন্স অঞ্চল দখল করে; ৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ডাইকিংরা ইয়র্কশায়ার ধ্বংস করে; ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে নরওয়ে ও ডেনমার্ক লন্ডন অবরোধ করে এবং ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্ক উইট বীপে হামলা চালায়। ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে নর্ম্যান বিজয় অভিযানের আগে পর্যন্ত দেশটিতে কোনো সংহতি ছিল না।

আমাদের নিজেদের অঞ্চলে, অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশেও বিভেদ ও যুদ্ধবিগ্রহের অভাব ছিল না। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের প্রাক্কালে বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করতেন পাল রাজারা, পশ্চিম ভারত ও উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা ছিল প্রতিহার রাজবংশের অধীনে, তামিলনাড়ুতে শাসন করতেন চোল রাজবংশ, কুম্বলখণ্ড ছিল চালুক্যদের নিয়ন্ত্রণে, মধ্যপ্রদেশ ছিল কালচুরি কংশের শাসনাধীন, পূর্ব রাজস্থানে শাসন করতেন চাহামনীরা, আর মালবা রাজ্য ছিল পারমারদের অধীনে। দক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও মধ্যভাগ ছিল চালুক্য বংশের একটি ধারার শাসনাধীন, আর অন্য একটি ধারা ছিল ওজুরাতে শক্তিশালী। প্রথম সহস্রাব্দ শেষ হবার সময় চোল রাজবংশের নৃপতি রাজরাজ শ্রীলঙ্কা অধিকার করেছিলেন।

ইসলামী শাসন ও তার প্রভাব

এতলি হল নতুন সহস্রাব্দের সূচনাকালীন কিছু বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য। কিন্তু আরো একটু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সহস্রাব্দের পর্যালোচনা করলে দুটি বড় পরিবর্তন আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করবে। ইসলামী শক্তির উত্থানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল নতুন সহস্রাব্দ, আর তা শেষ হচ্ছে পাকিস্তান শক্তির বিশ্বব্যাপী প্রাধান্যে। এই উভয় ঘটনাই বিশ্বপ্রকৃতিতে পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। প্রথম সহস্রাব্দের শেষভাগে সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের শাসনভার ন্যস্ত ছিল পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজবংশের হাতে। পরবর্তীকালে এই

* ১৯৮৮ নভেম্বরে প্রিন্সিটোন ‘মিলেনিয়াম কমিশন’-র সভায় অধ্যাপক সেনের প্রদত্ত ভাষণ : An Assessment of the Millennium.

শাসনভার চলে যায় বিভিন্ন ইসলামী শাসনকর্তার কাছে, যার সর্বশেষ রূপ ছিল মুঘল সাম্রাজ্য। পরে এই শাসনভার আবার হাত বদলে বৃটিশের কাছে চলে যায়। তাদের অধীনেই আমরা এই সহস্রাব্দের প্রায় শেষ পর্যন্ত কাটিয়েছি। ইতিহাসের এই প্রধান ধারাবাহিকের অতিঘাত ও তুচ্ছনিত প্রতিক্রিয়া বিচার না করে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সহস্রাব্দের মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

ভারতে ইসলামী শাসনের সূচনা ছিল এক বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অংশ। প্রকৃতপক্ষে, নতুন সহস্রাব্দের শুরু শতকগুলিতে বিশ্ব পরিবর্তিত বিচার করলে আটলান্টিক থেকে উত্তর আফ্রিকা হয়ে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপকূল জুড়ে পশ্চিম এশিয়া তথা ভারত পর্যন্ত ইসলামী শাসনের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন একটি রেখা আমরা দেখতে পাব। ভারতে রাজ্যছায়ে পরিবর্তে আক্রমণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে এর সূত্রপাত। ১০০০ খৃষ্টাব্দের ঠিক শুরুতেই খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে মুসলমান নৃপতিরা দুর্বীর অভিযান শুরু করেছিলেন। গজনির সুলতান মাহমুদ বারবার ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু এসে শাসনের পরিবর্তে তিনি লুণ্ঠন ও ধ্বংসলীলার ওপরেই জোর দেন। পরবর্তী শতকগুলিতে এইসব অভিযানের পরিবর্তে ভারতে সুলতানি যুগ থেকে মুঘল সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিভিন্ন মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত হয়ে ওঠে অশেষ মুসলমান দেশ।

ভারতীয় সভ্যতার সত্যায় ইসলামী প্রভাবের আত্মীকরণ কহ হিন্দুধর্মকারী চক্ৰবর্তী। এরা প্রাক-মুসলমান পর্বতে ভারতীয় সভ্যতার নিখাদ শুদ্ধ যুগ রূপে দেখে থাকেন। এর থেকে স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে আসে যে, প্রাক-মুসলমান পর্ব সত্যিসত্যিই এরকম কোনো শুদ্ধতার অধিকার ছিল কিনা। একই সাথে এই প্রশ্নও জাগে : ভারতে ইসলামী শাসন ও সংস্কৃতির একীভবনকে আমরা কোন চোখে দেখব, আর ভারতীয় সভ্যতার সম্ভার ওপর এই একীভবনের প্রভাব কীভাবে মাথা হেঁচ? আমি সংক্ষেপে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করছি।

পাশ্চাত্যীয় প্রাধান্যের চরিত্র ও প্রসার

দ্বিতীয় দশকের প্রমুখী সহস্রাব্দের শেষভাগে পাশ্চাত্যীয় শক্তির উত্থান সন্দেহাত্মক। বৃটিশ শাসনও অবশেষে এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ ছাড়াও রয়েছে আরো বড় একটি সাধারণ বিষয়, যা বিশ্ব জুড়ে সমকালীন ভাষ্যকারদের মনোবোণ আকর্ষণ করেছে। এটা হল পাশ্চাত্যীকরণ ও পাশ্চাত্যীয় প্রাধান্য সন্দেহাত্মক প্রশ্ন, যা কিনা রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সাথে এমন এক সাংস্কৃতিক প্রভাবেরও অধিকারী, যা এর আগে কোনো সভ্যতারই ছিল না।

১০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে অনেক বেশি ভাবসাম্য ছিল। যদিও নব্যজাগরণের অগ্রদূতরাণী পরিবর্তনগুলির সূচনার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং শিল্প বিপ্লব ও আলোকিত সমাজের পথে অগ্রসর হবার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশ ইওরোপের বিভিন্ন প্রান্তে পরিসংকীর্ণ হচ্ছিল, তবুও ইওরোপ ও বাকি পৃথিবীর মধ্যে বিরাট কিছু বৈষম্য ছিল না। ১০০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভূতটায় অটোর স্থায়ী নিবাস ঘোম হলেও প্রথম সহস্রাব্দের অগ্রিমুখেই নতুন কোনো রোমান বিজয় অভিযানের আশঙ্কায় পৃথিবী কৈশে ওঠেনি। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উন্নয়মান নগর ভেনিস ডালমেশিয়ান উপকূল ও আন্ড্রিয়টিক সাগর অঞ্চলে প্রভুত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল প্রকৃত অর্থেই স্থায়ী একটি ক্ষমতার কেন্দ্র। ষষ্ঠ শতাব্দী ধরে এশীয় ও আরবিক বণিকেরা যেভাবে বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল, এশিয়া ও পশ্চিম ইওরোপের সাথে ভেনিস ও জেনোয়ার বাণিজ্যিক সেনসেম তার থেকে আলাদা কিছু ছিল না। চীন, জাপান, ভারত, ইরান, আরব ভূখণ্ড এবং আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র সহ অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের প্রভুত্ব ছাড়াই নিজেদের মতো করে এগিয়ে চলছিল।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এই পুরনো কেন্দ্রগুলি ছাড়াও আমেরিকা মহাদেশে ছিল একাধিক মহান সভ্যতা। যদিও ১০০০ খৃষ্টাব্দেই এরিক্‌স রেড-এর পুর লেইফ এরিকসন আমেরিকা 'আবিষ্কার' করেন বলে মনে করা হয়, আসলে কিন্তু তাঁর পক্ষে নোভা স্কটিয়ার ওপারে যার এগোনো সম্ভব হয়নি। এর ফলে ইউকাতান উপদ্বীপের চরম উন্নত মায়া সভ্যতা অথবা সমগ্র পেক জুড়ে ছড়ানো তিহাওয়ানাকো সভ্যতার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে পুরনো পৃথিবীর পক্ষে কোনো ধারণা কবাই সম্ভব ছিল না। বিগত সহস্রাব্দের শেষার্ধ্বে আমেরিকা মহাদেশের দুই ভূখণ্ডের নতুন চেহারা লাভের পরেই প্রকৃতপক্ষে ইওরোপের প্রাধান্য সম্পূর্ণ হয়। পূর্বতন সভ্যতাগুলিকে বলপূর্বক দমিত অথবা পরাজিত করে তাদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে পদনত করে অথবা কখনো কখনো সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে এই পুনর্গঠন সম্ভব হয়েছিল।

এশিয়া ও আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই অবদমন ততটা সর্বাঙ্গিক ছিল না। তা সত্ত্বেও এই দুই মহাদেশেও পশ্চিমী প্রাধান্যের সমস্যাগুলি ছিল। এটা এমনই একটা বিষয় যা আজও আমাদের মনোবোণ আকর্ষণ করে চলেছে। সমকালীন বিশ্বে পাশ্চাত্য পুনিয়ার হাতে অসামান্য মূল্য ক্ষমতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীর কতটা অংশের 'পাশ্চাত্যীকরণ' হয়েছে, তা নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা

কিছু চিন্তাকর্ষক প্রশ্ন মনে জাগে। পাশ্চাত্যকরণ বলতে কী বোকার? এর ফলে সৃষ্টি নির্ভরশীলতার মাত্রা কতখানি? এর ফলাফল কতটা বিনাশকারী?

অ-পাশ্চাত্যীয় বেশগুলির ওপর পাশ্চাত্যীয় সংস্কৃতির প্রভাবের গ্রহণযোগ্যতা অকশাি একটি কেন্দ্রীয় ও সর্বমুখ্য প্রশ্ন। পাশ্চাত্যের এই কর্তৃত্ব কোনো কোনো অঞ্চলে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত অর্জন করেছে, আবার অন্যান্য স্থানে তীব্র অসন্তোষের কারণ হয়ে উঠেছে। এর মূল্যায়ন আমাদের কীভাবে করা উচিত? বিতীর্ষ দফার এই প্রশ্নাবলী নিয়ে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

ইসলাম ও ভারত

তাহলে, প্রথম দফার প্রশ্নাবলি — অর্থাৎ ভারতে ইসলামী সংস্কৃতির আত্মীকরণ এক ভারতীয়ত্ব ও ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতিতে তার প্রভাব কতটা — তা নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। ইসলামী প্রভাবের ফলে ভারতে কী ঘটেছিল? তথাকথিত ‘ওচ্চ’ প্রাক-ইসলামী সংস্কৃতি রূপে যে সাময়িক একটি সংস্কৃতির চরিত্রায়ণ কিছু সমকালীন ভাষ্যকার কখনো কখনো করে থাকেন, ইসলামী প্রভাব কি সত্যিসত্যিই তাকে এক কদম উন্নত সংস্কৃতিতে পরিবর্তিত করেছিল? এই সহস্রাব্দের প্রারম্ভিক বছরগুলিতে ভারতীয় গুরুত্ব হারানোর এক বেনদী সমকালীন ভারতবর্ষের বাস্তবনৈতিক চর্চায় কিছুটা অনুভূত হচ্ছে। গত সহস্রাব্দে যা ঘটেছিল, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার বিচার করা কতটা যুক্তিযুক্ত?

প্রাক-মুসলমান যুগে ভারতও যে শুধু হিন্দু ভারত ছিল না, ওকতেই সেটা অকশাি মনে রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, প্রাক-মুসলমান পর্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় সভ্যতা রূপে বিনি বসিত, সেই অশোক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এছাড়া হর্ষ সহ আরো অনেক মহান অ-হিন্দু সভ্যটিও ছিলেন। গভর্নীর সুলতান মাহমুদের আক্রমণকালেও পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশের শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বস্তুত, মাঝখানে ভাঙ্গাঝুঁড়ি হিন্দু সেনা রাজবংশের অতি সংকীর্ণ অধ্যায় বাদ দিলে বাংলার শাসন অতি দ্রুত বৌদ্ধসেনার হাত থেকে মুসলমানদের হাতে চলে যায়।

এটোও অকশাি স্মরণে রাখতে হবে যে ইসলাম বাতীত বিশ্বের প্রায় সবকটি প্রধান ধর্ম গত সহস্রাব্দের বহু আগেই ভারতে ভালোভাবে স্থান করে নিয়েছিল। বৃটেন বৃষ্টিধর্ম বিস্তার লাভ করতে শুরু করে সপ্তম শতকে। এর অন্তত তিনশ বছর আগে, অর্থাৎ চতুর্থ শতকেই ভারতে বৃষ্টিান সম্প্রদায়ের

উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। জেরকালেমের পতনের অব্যবহিত পূর্বেই ইক্ষ্মীরাও ভারতে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। আর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম অতি দীর্ঘ সময় ধরে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই অর্থে মুসলমানদের আগমন ছিল মোহাংই এক সংযোজন।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। ভারতে বৃষ্টিশ শাসনকালে শাসকবর্ণ ও প্রজারা ছিল একে অপরের থেকে পৃথক। কিন্তু মুসলমান শাসনকালে এই পার্থক্য ছিল না। জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ ছিল মুসলমান। এই ভূখণ্ডের বৃহৎ সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এই সংঘাত এতই বড় যে সমকালীন বিশ্বের চারটি বৃহত্তম মুসলমান জাতীয় জনগোষ্ঠীর তিনটিই রয়েছে এই উপমহাদেশে — ভারত, পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। আর, বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলমান জনগোষ্ঠী এই উপমহাদেশের বাইরে যে দেশে রয়েছে, সেই ইন্দোনেশিয়াও প্রধানত গুজরাত থেকে আগত ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশে পরিণত হয়। ততদিনে ইসলাম ভারতীয় বেশকিছু ধর্ম হয়ে উঠেছিল।

যদিও ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম একে অন্যের থেকে পৃথক, তবুও এই দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে উভয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল প্রধানত একীভূত। সঙ্গীত, চিত্রকলা অথবা কাব্যে এই একীভবনের প্রচুর দৃষ্টান্ত বর্তমান। বস্তুত, এই একীভূত রূপকে বাদ দিয়ে বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতি উপলব্ধি করা অসম্ভব। গভর্নীর আক্রমণ সহ ইতিহাসের অন্যান্য বিজ্ঞির বিভেদমূলক দৃষ্টান্ত সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতিতে উদ্ভেজনা তথা সংঘাত সৃষ্টির কারণ ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে আত্মও বিদ্যমান। তা সত্ত্বেও সমকালীন ভারতীয় সভ্যতাকে কর্তব্য প্রভাবের এক বৌদ্ধ ফসল রূপে না দেখলে বোকা সম্ভব নয়। এই প্রভাবের মধ্যে ইসলামী উপাদান খুবই শক্তিশালী।

সমকালীন ভারতীয় সংস্কৃতির সুসংহত চরিত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে বহু ভাষ্যকারেরা বিশেষভাবে শিখরতলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে অন্য একটি ক্ষেত্রে সংহতির এমন এক উদাহরণ পেশ করতে চাই, যা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুঘল সভ্যত আকবর তারিখ-ইলাহি নামে একটি সংহতিমূলক কালপঞ্জিকা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও দেশের অন্য দ্বায়ে এরকমই এক প্রয়াস সফল হয়েছিল।^১

বাংলা কালপঞ্জিকা অনুযায়ী এখন ১৪০৫ অম্ব। এই সংঘাতটি কোন্ অর্থ বহন করে? এর ইতিহাস সাংস্কৃতিক

^১এ মসলে ইষ্টক History of the Calendar, M. N. Saha and N. C. Lahiri (New Delhi, CSIR, 1992)

সংহতির এক বিশেষ রূপ। হিজিরা কালপঞ্জিকা অনুযায়ী ১৬৩ অব্দে (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) বাংলা সৌর কালপঞ্জিকাকে — যা ছিল প্রচলিত শক কালপঞ্জিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ — হিজিরা কালপঞ্জিকার সঙ্গে ‘মিলিয়ে’ দেওয়া হয়। অন্য কথায়, বাংলা কালপঞ্জিকাকে নিছিয়ে এনে তৎকালীন বাংলা অব্দকে ১৬৩ করা হয়। তার পর থেকে চান্দ্র কালপঞ্জিকা হওয়ার কারণে হিজিরা অব্দ এগিয়ে গেছে, আর বাংলা ‘সন’ হিজিরা অব্দের থেকে নিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু হুমায়ুন কালপঞ্জিকা অনুযায়ী নিজাম বর্মীয়া ক্রিদ্দাকর্ম পালন করার সময় একজন বাঙালি হিশুর একথা খেয়াল নাও থাকতে পারে যে, তার হিন্দু আচার-আচরণ যে তিথি-কাল-কণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, তা ইচ্ছারত মহম্মদের মত্না থেকে মদিনা গমনকে স্বরণীয় করে রাখার সঙ্গে সম্পর্কিত।

বিগত সহস্রাব্দে এই উপমহাদেশে এক অসাধারণ সংহতির উদ্ভব পরিলক্ষিত হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা প্রায়শই এই উদ্ভূত সংহতির অস্তিত্বকে নাকচ করে দিতে চাইলেও যে সংহতি অর্জিত হয়েছে তার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশই প্রায় নেই।

পাশ্চাত্যীয় প্রাধান্য

এবার বিত্তীয় দফার প্রয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা যাক। পাশ্চাত্যীয় প্রাধান্য এবং বিশ্বব্যাপী তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কী ভাবা হয়? ভারত সহ পাশ্চাত্য-বহির্ভূত বিশ্বের বহু অংশে এটা একটা উরেণ ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় এ বিষয়ে যে সমালোচনা হয়, তার সঙ্গে ভারতে কৃত সমালোচনার প্রকৃতি একই বকম না হলেও ঔপনিবেশিক শাসনোদ্ভব বিশ্ব পশ্চিমী প্রভাবের সমালোচনা ভারতেও যথেষ্ট শক্তিশালী। ইতিমধ্যে ‘সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ’ নিয়ে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বিশ্ববাপী বেশ বড় মাপের সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় লেখকদের অবদান যথেষ্ট পরিমাণ।

সমকালীন বিশ্বে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বহু দৃষ্টান্ত সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। এওলি সম্পর্কে অবশ্যই পুমানুপুখ সমালোচনার প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, বহু ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ আঞ্চলিক সাহিত্যিক ঐতিহ্যের যে সৌবল্য ঘটেছে, সে সম্পর্কে মন্যক দুঃখপ্রকাশ করে তাকে বধ্যাঘতভাবে প্রতিহত করা যায়। অপরদিকে পাশ্চাত্যকরণের অল্প সমালোচনা এই সত্যত পরিবর্তনশীল বিশ্বে অস্বৈচ্ছিক রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে আড়াল করার চলে হয়ে উঠতে পারে। মেয়েদের শিক্ষাদানের মতো বহু সম্বেহাতীত বিষয়ে শুধু তালিবানরাই যে পাশ্চাত্যকরণের ছাপ মারে তা

নয়। পাশ্চাত্যকরণকে প্রতিহত করার ব্যাগাডবর বহু আঞ্চলিক স্বীকৃতিবির বিলম্বশী সমালোচনাকে নস্যং করার জন্যও খুব শক্তিশালী উপায় হয়ে উঠতে পারে।

কাকে বলে পাশ্চাত্যকরণ?

একটা সহজ প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যাক। ‘পাশ্চাত্যকরণ’ বস্তুটা কী? প্রাচীন ভারতীয় সেই কাহিনীর অল্প মামুঙলির হতীশর্পনের মতো বিভিন্ন ভাব্যকারেরা পাশ্চাত্যকরণের বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে থাকে। গল্পের মতো কেউ পা ওলির, কেউ চাঁদের, আবার কেউ বা নীতের কণা করে থাকেন। কিন্তু কাহিনীর সেই সত্যিকারের হাতিটোর মতো এক্ষেত্রে এমন কোনো গোটা একটা হাতির পূর্ব-নির্দিষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয় যেটা পা, চাঁদ, নীত এবং শরীর নিয়ে তার সম্পূর্ণ আকৃতি লাভ করবে। একথা কণা কেটেই পারে যে, পাশ্চাত্যকরণ আসলেই এমন নয়। আমাদের ধ্যান-ধারণা ছাড়া এর বাহীন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাছাড়া, গোটা বস্তুটাকে আমরা যা বলে ধরে নিচ্ছি, সেটাও কিচাৰ বিষয়।

এ বিষয়ে আমার অভিমত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া ভালো। পাশ্চাত্যকরণের ধারণাটি সমকালীন তর্ক-বিতর্কে এত বেশি সহজ ও সম্বেহাতীতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যে, বধ্যাঘত সাংস্কৃতিক সমালোচনার নকচ না যেতেই সহজ হয়ে উঠছে না বলে আমি বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্যকরণ ও তার অবশ্যকী প্রভাব সম্বন্ধে আশঙ্কার মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সমস্যা রয়েছে। প্রথমত, দেশের বাইরে থেকে আসা যে কোনো প্রভাবকেই পরনির্ভরতা বলে দেখা ঠিক কিনা এবং তার ফলে পাশ্চাত্য মূল্য থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করাকে পাশ্চাত্যকরণের প্রচেষ্টা বলে গণ্য করা উচিত কিনা। যদি পাশ্চাত্যকরণকে ভয় পেতে হয়, তবে কোনো একটি বিষয় বা চিন্তার উৎসকে নিছক চিহ্নিত করার পরিবর্তে প্রয়োজন তার বধ্যাঘত বিশ্লেষণ। দেশ-দেশান্তর থেকে আহরিত জ্ঞান বিশ্ববাপী সাংস্কৃতিক তথা বিজ্ঞান ও গণিতের অগ্রগতিতে প্রভূত সমৃদ্ধ করেছে। সৃজনশীল প্রভাব থেকে পরনির্ভর অবশ্যকী নির্ভরশীলতার প্রভেদ করতে না পারার অক্ষমতা একান্তই মূর্খমির পরিচায়ক।

বিত্তীয়ত, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক মেলবন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা, বিষয় বা কৃৎকৌশলের সঠিক উৎস নিরূপণ করা দুঃস্ব কাজ। সাম্প্রতিক কালে পাশ্চাত্য মূল্য থেকে পাশ্চাত্য-বহির্ভূত সমাজওলিতে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য প্রভাবের আবির্ভাব ঘটেছে। এর মধ্যে ইংরাজি বা ফরাসি ভাষার মতো অনেক কিছুই সম্বেহাতীতভাবে ইওরোপীয়। অনান্যিক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তি অথবা

সংস্কৃতিক আচার-অনুশীলনের মতো বিবরণগুলি উৎপত্তিগতভাবে খুবই মিশ্র হতে পারে। কোথায় এগুলির উৎস, তা নির্ণয় করার চেষ্টা এই কারণেই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

ভূতীত, মুক্তিবাদিতা এবং চিন্তাধারা সংক্রান্ত 'পাক্ষাতীর্থ' ও 'ভারতীয়' ধ্যানধারণার মধ্যে বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় কিছু সরলীকরণ খুবই সহজ ও ভাসা-ভাসা বলেই মনে হয়। এই ধরনের সরলীকরণ গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে, কারণ উভয় ঐতিহ্যের মধ্যেই রয়েছে যথেষ্ট বৈচিত্র্য। এ বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করব।

উৎস নিরূপণের অসারতা

একটি চিন্তাধারা বা বিষয়ের ভৌগোলিক উৎস নিয়ে চিন্তিত হওয়ারটা এত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কেন? পাক্ষাত্যকরণ যদি প্রকৃতই উদ্বেগের কারণ হয়, তবে নিম্নক বিদেশী উৎসগুলোর পরিবর্তে এর কিছু সু-প্রভাব চিহ্নিত করা প্রয়োজন। পেনিসিলিনের ব্যবহার কি পাক্ষাত্যকরণের প্রভাব? শেল্পীয়রের কাব্য উপভোগ্য করাকে কী বলব? অন্যদিকে, কালিদাসের কাব্য পাঠ করে গেটে কি ইওরোপীয়ের মর্যাদা হারিয়েছিলেন? পর্বতগীতরা আসার আগে লংকা ভারতে অপরিসীম ছিল। তাহলে কি ভারতীয় রাজাকে পাক্ষাত্যকৃত বলব? বাঙালিরা এখন যেভাবে ছানার ব্যবহার করে, তা তারা পূর্ব ভারতে বসবাসকারী ইওরোপীয়দের কাছ থেকে শিখেছিল। তাহলে কি বাঙালি মিষ্টিকে বাঙালি কলা যাবে না? সংস্কৃতিক যোগাযোগ ও সংস্কৃতিক অধীনতার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই?

যদি কোনো কিছু সংযোজীতভাবে বিশেষ করেন। দেশের বা সংস্কৃতির উৎপাদনও হয়, তবে অন্যত্র তার ব্যবহার সেই দেশ বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভিধারক হবে — এমন পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

'যেখানেই উৎস হোক না কেন, আমাদের বোধগম্য ও ভোগ্য সকল মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ শুৎকণাৎ আমাদের নিজস্ব হয়ে ওঠে। যখন আমি অন্য দেশের কবি ও শিল্পীদের আমার আশীর্ষ বলে মনে করি, তখন আমার মনুষ্য আমার গর্বের কারণ হয়ে ওঠে। অকৃত্রিম আনন্দ নিয়ে আমি যেন মনুষ্যের সকল মহান শৌর্যকে নিজের বলে ভাবতে পারি।'

এর অর্থ একথা অস্বীকার করা নয় যে, অন্য কোনো স্থান থেকে আমদানিকৃত কোনো আচার-আচরণ যদি একটি

অঞ্চলের জনগণের কাছে মূল্যবান বলে পরিগণিত স্থানীয় কোনো রীতি-নীতি বা ঐতিহ্যকে অবদমিত বা ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, তবে তার প্রতিরোধ করা অবশ্যই সম্ভব। এরকম প্রতিটি আচার-আচরণের প্রত্যেককে একমিকে তার উপযোগিতা (অর্থৎ অন্যদের কাছ থেকে আমাদের কী কী মূল্যবান বিষয় শেখার আছে), অন্যদিকে তার অবদমন ক্ষমতা (অর্থৎ বাইরের প্রভাবের ফলে আমাদের নিজস্ব কোন কোন মূল্যবান বিষয় আমরা বিস্মৃত হচ্ছি) নিয়ে বিচার করতে হবে। এই বিচারের জন্য কোনো বিষয়, ধারণা বা কৃৎশীলনের সঠিক উৎস নিরূপণ করাটা জরুরি নয়, আর এগুলির অস্তিত্বও তথ্য সূত্রনশীল ও ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়নের থেকে একে অলাভা রূপেই দেখতে হবে।

প্রতিটি সংস্কৃতিক আমদানিকে সোজা-সুজি নয়, করে নিয়ে অথবা সেগুলিকে চমৎকার বলে গ্রহণ করে সমস্যাটির সমাধান সম্ভব নয়। বিভিন্ন জীবনধারা ও রীতি-নীতির মধ্য থেকে জনগণের ইচ্ছামতো বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা বাড়িয়ে তোলাটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়।

ব্যক্তিশেষের ওপর এই বেছে নেওয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়াটা কিছু পরিমাণে খুবই কাজে আসে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হতে পারে যেখানে কমতানালী অথবা অধিকতর আর্থিক সাহায্যপুষ্ট বৈদেশিক সূত্রের থেকে প্রতিযোগিতার ফলে স্থানিক সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অস্তিত্ব বিপর্যয় হয়ে উঠতে পারে। এই কারণে সমাজকেই স্থির করতে হবে যে উদ্ভাবনীয় পরিমাণ অর্থনৈতিক মূল্যের বিনিময়েও সনাতন জীবনব্যায়ার কোন কোন বিষয় সে সংরক্ষণ করতে চায়। যদি সন্তুষ্টিসিদ্ধি সমাজ চায়, তাহলে অবশ্যই জীবনশৈলী সংরক্ষণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে এরকম সংরক্ষণের মূল্য এবং যে সকল বিষয় ও জীবনশৈলী সংরক্ষিত হবে তার জন্য সমাজ কতটা মূল্য দিতে রাজি — এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখা করাটাই সমস্যা। অবশ্যই এই ব্যয়-উপযোগিতা বিশ্লেষণের (cost-benefit analysis) ক্ষেত্রে কোনো পূর্বনির্ধারিত সূত্র নেই। কিন্তু এই ধরনের পদ্ধতির মুক্তিযুদ্ধ একটি মূল্যায়নের পক্ষে খোঁটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল এই বিষয় নিয়ে গা আলোচনার জনগণের অংশগ্রহণের সম্ভবতা। চড়া মূল্যের বিনিময়ে প্রতিটি বিদ্যারী জীবনশৈলীকে জিইয়ে রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা হরতো নেই, কিন্তু সামাজিক ন্যায়ের বাতিরে জনগণ যেন তাদের ইচ্ছা হলে এইসব সামাজিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে অংশ নেবার অধিকার লাভ করতে পারে।

[আগামী সংখ্যায় — 'বিজ্ঞান, পণ্ডিত ও সংস্কৃতির প্রসার']

পুরুষতন্ত্রের নয়া মারণাস্ত্র — ‘নেট এন’

সুজিত কুমার দাস

ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে বীর্ধমেরামি হরমোন গর্ভনিরোধক ইনজেকশন-নেট-এন (nortisterone enanthate)-কে সরকারি কন্ট্রোল্লিড কন্সম্পিউতে নেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই দেশের ১২টি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডাক্তারি ট্রায়াল দেওয়া শুরু হবে। ১৯৯৪ সালে সরকার হাজার প্রতিবাদ সত্ত্বেও ‘ডিপো-প্রভেরা’ নামে অন্য একটি একই প্রকৃতির বীর্ধমেরামি হরমোন গর্ভনিরোধক ইনজেকশন-কে ভারতে লাইসেন্স দেয়, তবে সেটিকে সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মেয়েদের উপর নির্বিচারে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি, শুধু আইভেট প্রাকটিসের ক্ষেত্রেই অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ‘নেট-এন’ও লাইসেন্স পেয়েছে ১৯৯৬ সালে। তার আগে সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আই-সি-এম-এর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ) তথাকথিত স্বয়মিচ্ছ (volunteer) গ্রামীণ মেয়েদের উপর নেট-এন চূড়ান্ত পর্যায়ের ট্রায়াল দিয়েছিল। তদানীং অব্যাহতি পার্থক্যক্রিম্যর একটি বাড়াবড়ি হওয়াতে কিছু ক্ষেত্রে ট্রায়াল বন্ধ করে দিতে হয়। পরে মামলার কারণে সমাপ্ত হওয়ার আগেই ট্রায়ালটি বন্ধ করে দিতে হয়। সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রক আশ্বাস দিয়েছে যে নেট-এন কন্টন কেন্দ্রগুলিতে উপযুক্ত তদারকি ও পরামর্শদানের ব্যবস্থা রাখা হবে এবং তার ভিত্তিতে আইনের বাধা কেটে গেছে। যদিও এটা তেমন কাজের কথা নয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে বরাবরই নির্যেস রয়েছে যে নিয়মনিষ্ঠ ডাক্তারি তদারকি ছাড়া নেট-এন ডিপো-প্রভেরা প্রকৃতি ওষুধ প্রয়োগ করা চলবে না। নতুন অঙ্গ্যাসের তাৎপর্য সরকারি স্বীকারোক্তি যে, আগে ফাঁকিবাড়ি যা গাফিলতি হত।

সরকার ও সাপোপাসরা অকথা দাবি করেছে—

• চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নেট-এন একটি কার্যকর ও নিরাপদ গর্ভনিরোধক

• সহজে প্রয়োগ করা যায়

• সস্তা এবং ভারতের মেয়েদের পক্ষে উপযোগী

• নেট-এন অবলা মেয়েদের হাতে হস্তিয়ার তুলে দেয় যাতে তারা প্রজনন ক্রিম্যর ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। তাই এখন নেট-এন প্রচলন খুবই সমরোপযোগী কারণ

এটা ‘নারীর স্বমতায়ন’ (women’s empowerment) উত্থাপনের বহুর।

জনস্বাস্থ্য, গণবিজ্ঞান, নারীমুক্তি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রকৃতি ক্ষেত্রে সক্রিয় সংগঠনগুলি ‘ডিপো-প্রভেরা’র সময় প্রতিবাদ করেছিল। এবারেও সিলি ও কলকাতায় প্রতিবাসের কঠ সোজার হয়েছে। প্রতিবাদীরা তথা ও যুক্তি দিয়ে যেভাবে সরকারি দাবিগুলি খণ্ডন করেছে তা বিচার করতে গেলে বিবরণি নিয়ে একটু প্রাথমিক তথ্য জানা সরকার।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা

নারীমহের প্রজনন অঙ্গের স্বাস্থ্য ও ক্রিয়াকর্ম বিকটাক বজায় রাখা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের স্তরে নিম্নসুত হরমোনগুলির প্রভাবে প্রান্তিক স্তরে ইন্ট্রোজেন ও প্রজেক্টেরোন নামক দুটি হরমোন নিম্নসুত হয়। আসলে একওয়াই হরমোনের সমষ্টি ইন্ট্রোজেন-এর প্রভাবে প্রতি কতৃচক্র ডিম্বাশয় থেকে একটি পরিণত ডিম্বাণু নির্গত হয় এবং অতর্জরায়ু (করায়ুর অঙ্গবের ক্রিমি) পরিবর্ধিত হয় যাতে নিষিক্ত ডিম্বাণু সেখানে নিষিক্ত (গর্ভধারণ) হতে পারে। ডিম্বাণু নিষিক্ত না হলে পরিবর্ধিত অতর্জরায়ু বিচ্ছিন্ন হয়ে কতৃচক্র হিসেবে নির্গত হয়ে যায়। গর্ভধারণ ঘটলে তা বজায় রাখা এবং সন্তানের ক্ষম পর্যন্ত তাকে লালন পালনের সাহায্যকারী হরমোন হল প্রজেক্টেরোন। নেট-এন ইনজেকশনে থাকে কৃত্রিম প্রজেক্টেরোন, তাকে বলা হয় ‘প্রজেক্টিন’। প্রজেক্টিন বেছে টুকে এই স্বাভাবিক হরমোন দুটির শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যপরম্পরাকে ভেঙে দেয়, ফলে পরিণত ডিম্বাণু নির্গত হয় না, তাই গর্ভসম্ভারও হয় না।

মেহের স্বাভাবিক হরমোনের ক্রিয়াকম্যপ বিপর্যয় করে গর্ভনিরোধ করার প্রক্রিয়াটি দুটি কড় সমস্যার সৃষ্টি করে। এক, হরমোন দুটির ক্রিয়াকর্ম ওধুমায় প্রজনন অঙ্গেই সীমাবদ্ধ নয়, আরো অন্য কো জায়গায়। যেমন অস্থিবৃদ্ধি, অস্থির ক্ষয় বজায় রাখা, রক্তে কোলেস্টেরল-এর পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ প্রকৃতি ক্ষেত্রে ইন্ট্রোজেন-এর ভূমিকা আছে। স্রম্বকোষের বিকাশ ও স্বাস্থ্যরক্ষা, মস্তিষ্ক ও থাইরয়েড গ্রহির স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম প্রকৃতি বিষয়ে প্রজেক্টেরোন ক্রিয়ানীল। এভাবে গর্ভনিরোধক ওষুধে স্বাভাবিক হরমোন নেই, থাকে কারখানায় ডেরি কৃত্রিম রাসায়নিক, যা স্বাভাবিক হরমোনের সব কাজগুলি করতে পারে না, একটা দুটো পারে। এই কৃত্রিম হরমোন দেছে চোকালে তা স্বাভাবিক

হরমোনের উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং তাকে অকেজো করে দেয়। ফলে কৃত্রিম হরমোন দীর্ঘ মেয়াদে ঢুকলে যেহে স্বাভাবিক হরমোনের অভাবজনিত বৈকল্যের শিকার হয়। এই বৈকল্যের কারণে কী কী ক্ষতি হয় এবং তা কীরকম বিপাক্ষনক, সেই বিশদ অটিকানো বা অপসারণ করা যায় কিনা সে নিয়ে কোনো ধর্মবা গবেষণা এখনো হয় নি। দুই, এছাড়াও মেয়ের অসংখ্য অন্যান্য হরমোন ও জৈব-রাসায়নিক উপাদান পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চান্দাপোড়েনে সামঞ্জস্য আনার প্রয়াস নিয়ে কাজ করে। এর মধ্যে একটি অতিমান হরমোনের বিকল্প কৃত্রিম রাসায়নিক দীর্ঘকাল ধরে বাইরে থেকে শরীরে ঢোকাতে সেই সামঞ্জস্য বিধানে কী কাহার সৃষ্টি করবে এবং তার ফলাফল কী হবে, তা নিয়ে কোনো গবেষণা এখনো হয় নি। তিন, গর্ভনিরোধক ওষুধটি মেয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ওষুধ কোম্পানি থেকেই যে প্রয়োজনীয় নিয়মবিধি ও সতর্কতা পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালিত না হলে কী কী এবং কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে তা নিয়েও কোনো গবেষণা হয় নি। না, ভুল কৌচাকবের না, এদেশে এই ধরনের বিপদটি অতি বাস্তব ঘটনা এবং এই বিশদ উপেক্ষা করাতে স্বাস্থ্যহানি প্রাণহানি আকছার ঘটে থাকে।

ডক্টর ব্যাটলের ধরন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান যেমন বা কোম্পানির নির্দেশ অনুসরণ করে ইনজেকশনটি দেওয়া হল। তাহলে কী হতে পারে? কোম্পানির নির্দেশগুলিই বা কী? এইসব কথা শুধু জানা দরকার তাই নয়, বাকি ইনজেকশন কোঁড়া হচ্ছে তাকে কথাতুলি জানানো ডাক্তারের অন্যতম বাধ্যতামূলক কর্তব্যও বটে। সত্যি বলতে কী, এদেশে অধিকাংশ চিকিৎসকই এই বাধ্যতামূলক কর্তব্য বিষয়ে সচেতন নন অর্থাৎ কথাতুলি চিকিৎসকদেরও জানা দরকার।

কার্যকরিতা :

ঠিক সময়মতো নিয়মিত দেওয়া হলে নেট-এন হরমোন পিল বা কণার-টি গর্ভনিরোধকের মতোই কার্যকর। দু'মাস অন্তর গিলে চলে, এটা সুবিধা। বিপাক্ষনক পার্যপ্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হলে অন্যান্য গর্ভনিরোধক তখনই বন্ধ করে দেওয়া যায় কিন্তু নেট-এন দু'মাস ধরে ক্রিয়ালীল থাকবেই, এটা অসুবিধা। সন্তান চাইলে বন্ধ করার ৬ মাস থেকে ২ বছরের মধ্যে প্রজনন ক্ষমতা ফিরে আসার কথা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা ঘটে না।

নিরাপত্তা :

বিরোধী পক্ষের ভয়ানক আপত্তি এই ক্ষেত্রে। বিবরটা তুলতরও বটে।

কতুভাবেই বৈকল্য : অনিয়মিত, অত্যধিক, দীর্ঘস্থায়ী

রক্তক্ষরণ হতে পারে বা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব ঘটতে পারে। শতকরা ৯০ জনের একটা না একটা ঘটতে পারে, রক্তের অন্তর্ভুক্তনজনিত বৈকল্য : অপ্রত্যাশিত স্থানে অমট রক্তপিণ্ডে আটকে হার্ট, ফুসফুস, মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে,

আর্থেরোসক্লেবোসিস : ধমনীর গা কঠিন হয়ে গিয়ে হার্ট, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অঙ্গের রোগ সৃষ্টি করতে পারে, অডিওপোরোসিস : হাড় ফোঁশড়া হয়ে গিয়ে ডাক্তার কুঁকি বেড়ে যায়,

কাপসার : ঘন ও ভরাঘুর কাপসারের কুঁকি বাড়তে পারে, ওজন : অস্বাভাবিক বাড়তে বা কমতেও পারে, বিপাক্ষীয় বৈকল্য : সবটা স্পষ্ট হয় নি তবে জানা গেছে যে কয়েকটি রোগের কুঁকি বেড়ে যায়,

অবসাদ : সদা কর্মরত মেয়েদের কাছে এটা অভিলাষের মতো,

পরবর্তী প্রজন্ম : যদি গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে তাহলে এই ওষুধের প্রভাবে বাচ্চা বিশেষত মেয়ে হলে প্রজনন অঙ্গসহ নানা অঙ্গবৈকল্য ও রোগের শিকার হতে পারে।

চিকিৎসকের কর্তব্য : বিরোধীপক্ষের সবচেয়ে বেশি আপত্তি এই ক্ষেত্রে যে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিধি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলি এদেশের চিকিৎসাক্ষেত্রগুলি পালন করে না, করার কোনো অভিজ্ঞতা কারো নেই।

এক — ডোক্তার যোগ্যতা : সবার উপর নেট-এন প্রয়োগ করা চলে না। গর্ভসঞ্চার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যে নেট-এন দেওয়া হয়, স্থায়ী গর্ভনিরোধকের জন্য অন্য প্রক্রিয়া আছে। ডাক্তারকে আগে ডোক্তার যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে এটা জেনে নিয়ে যে

• ডোক্তা গর্ভবতী নন • তার সন্তান আছে কিন্তু গুণদায়িনী নন • তার গর্ভসঞ্চারের কুঁকি আছে • তিনি ইনজেকশন দেওয়া ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নিয়মিত আসতে রাজি • বুঝিয়ে গিলে তিনি নিজের কতুভাবেই রেকর্ড রাখতে পারেন।

দুই — স্ব-উপলব্ধ পছন্দ (informed choice) ও বৈকল্যের অবহিত-সম্মতি (voluntary informed consent) : গর্ভনিরোধকের প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি, সবরকম সম্ভাব্য অবস্থিত প্রতিক্রিয়ার কথা, প্রতিক্রিয়া শুরুতে কীভাবে চেনা যায়, ঘটলে তখন কী করতে হবে প্রকৃতি বিষয় ডাক্তারকে এমনভাবে ও এমন কাছায় বুঝিয়ে বলতে হবে যাতে ডোক্তা মোটামুটি সুকণ্ডে পারেন। এছাড়া আরো কী কী অস্বাস্থ্যীয় গর্ভনিরোধক প্রকরণ আছে, তাদের ব্যবহার প্রাণদী ও অবস্থিত

প্রতিক্রিয়ার কৃষিকর্ম তা বুঝিয়ে বলতে হবে যাতে মেয়েটি তার সুবিধামতো প্রকরণটি নির্ভরশীল পছন্দ করে নিতে পারেন এবং অবহিত-সম্মতি দেন। পাশ্চাত্যপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসার গ্যারান্টি চিকিৎসাকেন্দ্রে দিতে হবে।

ডিন — যোগ্যতা নির্ধারণের আরো হ্যাণ্ড : রাজি হলে মেয়েটিকে প্রদান করে ও তার সম্পূর্ণ সেরপসীকা (ডাক্তারি ও ল্যাবরেটরি) করে জেনে নিতে ও দেখে নিতে হবে যে

ডোক্তার তত্ত্বাবধায় বাতাবিক ও নিয়মিত, কোনো বৈকল্য নেই, তিনি অন্য কোনো রোগে ভুগছেন না — বিশেষত ক্যান্সার, হিট ও রক্তবাহনালীর রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তের অক্সিজেনজনিত রোগ, রক্তাক্ততা, ডায়াবিটিস, লিভারের রোগ প্রভৃতি। পরীক্ষালব্ধ তথ্য বিশ্লেষণ করে বিচার করতে হবে যে তিনি উন্মুক্ত রোগের কৃষিকারে ভুগছেন কিনা।

চার — প্রমাণ : যোগ্যতার পরীক্ষার পাশ করলে প্রথম ইনজেকশন দেওয়ার উপযুক্ত সময় হল শুভ্রাবাহার প্রথম সপ্তাহ। পরের ইনজেকশনগুলি ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে দিতে হবে, যেসি হলে আবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে যেসিটি গর্ভবতী কি না। আই-সি-এম-আর ট্রায়ালে চতুর্থ ইনজেকশনের পরে একজন গর্ভবতী হলেও নজর না দেওয়ার ফলে তার মেহে আরো দু'টি ইনজেকশন ঢোকানো হয়। যার কপালে এরকম ঝঁঝে ঢাক গর্ভকালোদের পরিসেবা দিতে হবে। পরের ইনজেকশনের দিনটি মনে করিয়ে দিলে ভাল হয় এবং না এলে বোঝা বরবর নিতে হবে। প্রতি ইনজেকশনের সময়ে ডোক্তার প্রয়োজনীয় ডাক্তারি ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষাগুলি করতে হবে এবং কোনো অসুবিধার কথা ডোক্তার জানালে তত্বনি অনুসন্ধান করে কারণ নির্ধারণ করতে হবে। এইসব কিছুই রেকর্ড রাখতে হবে।

এখন বলুন, হাজার হাজার ডোক্তার কেন্দ্রে এই সব কর্তব্য পালন করার যোগ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান সেলে ক'টা আছে? ওয়াকিবহাল ব্যক্তি তত্বনি উত্তর দেবেন, 'একটিও নেই'। গোড়ার দিকে গর্ভধারণ নির্ণয় করার আয়োজন আছে হাতে গোনা কয়েকটি কেন্দ্রে। ইনজেকশনটি কোঁড়ার বিশেষ কৌশল অধিকারশে কর্মীই জানে না, প্রশিক্ষণ দিতে হবে; ভাল শ্রমায় ইনজেকশন দেওয়ার ফলে গর্ভনিরোধে ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। একই গাফিলতিতে হেপাটাইটিস বি ও এইডস্ রোগ ছড়ায়। আর ডোক্তাকে সব কথা বোঝানো? চিকিৎসাকর্মী হো বটেই, অধিকাংশ চিকিৎসকই নেট-এন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, তাই ডোক্তাকে বোঝানোর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। অজ্ঞতা অপরাধ নয়, না জানলেও জেনে নেওয়া যায়। আসল কথা হল এসেশের

চিকিৎসাব্যবস্থায় 'সোপলক-পছন্দ', 'অবহিত-সম্মতি', রোগীকে সব কথা বোঝানো, 'নারীর ক্ষমতায়ন' প্রকৃতি স্বাধীনতা প্রায় কেউই শোনে নি, এসব কথার স্থান কী তাও বোঝে না; ভারতের কোনো সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের বীভূতীকৃত আচরণের চর্চা করেনা হয় নি। তাই এখন হওয়ার প্রশ্ন ওঠেনা। শুধু পাশ্চাত্যপ্রতিক্রিয়ার ব্যাধাবর্তি নয়, আই-সি-এম-আর ট্রায়ালে গর্ভনিরোধের ব্যর্থতা, প্রজনন ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের ব্যর্থতা ও অন্যান্য অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াও অনেক হয়েছিল এবং তা নিয়ে আই-সি-এম-আর নিজেই কী মন্তব্য করেছিল একটু চিনবেন? 'অধিকাংশ মেয়েই ইনজেকশন নেওয়া বন্ধ করেছেন প্রথম বা দ্বিতীয় ইনজেকশনের পরেই, তার ফলে কোথা যায় যে বিশ্বটায় তাদের ঠিকমতো বোঝানো হয় নি, তাদের হাতে প্রচারপত্রগুলি নেওয়া হয় নি এবং চিকিৎসাকেন্দ্রের কর্মীরা তাদের সঙ্গে মায়সারা আচরণ করেছে ... কর্মীরা আন্তরিকভাবে কর্তব্য পালনে অংশ না নেওয়ার জন্য এবং গর্ভসংহারে রোধ ও পাশ্চাত্যপ্রতিক্রিয়ার বিষয়ে মেয়েদের হাতে পর্যাপ্ত তথ্য ও বোধগম্য ব্যাখ্যা না দেওয়ার ফলে, তারা ইনজেকশন নেওয়া বন্ধ করে দেন।' অত্যা আই-সি-এম-আর এক্ষেত্রে একটি গবেষণা প্রকল্প চালিয়েছে, অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ের দাতব্য চিকিৎসালয় নয়। গবেষণা প্রকল্পের কর্মীদের সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করা হয়, তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কাজের তদারকি করা হয়, যাচাই মূল্যায়ন করা হয় এবং সরকার মতো সংশোধন করা হয়। তাতেও এরকম পূর্ণশা। শুধু কর্মীগণই অপরাধ নয়, কর্তৃপক্ষের কীর্তিও আশ্রয়স্থি কিছু নয়। যে মেয়েদের উপর নেট-এন ট্রায়াল দেওয়া হয়েছিল, আই-সি-এম-আর তাদের আর কোনো বোঝাবার সাথে নি, তাদের উপর শীর্ষমহাদ্বি প্রভাবের তথ্য জোগাড় করে নি, তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে কেউ জানে না। অত্যা এই রকম সব ব্যাধারদের দিয়ে বেশ জুড়ে হাজার হাজার মেয়ের উপর ইনজেকশন দেওয়ার ধপা করা হচ্ছে।

দিল্লি ও ভোপাল শহরে উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে চিকিৎসারত কিছু ক্রীড়োগ-বিশেষজ্ঞদের কাছে অনুসন্ধান চালিয়ে এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে নেট-এন প্রাইভেট প্রাকটিসে মোটেই জনপ্রিয় নয়। মাত্র ২০% চিকিৎসক নেট-এন ব্যবহার করেছে এবং তাদের মতে মেয়েরা এটি পছন্দ করেনা, কভ বেশি পাশ্চাত্যপ্রতিক্রিয়া হয়, বেশ দামী, এবং তদারকি ও সতর্কতার স্বামেলা এত বেশি যে ব্যবসায় পোষায় না। যে মেয়েদের নিজেদের বাছাই ও ব্যক্তিগত করার একটু ক্ষমতা আছে, তাদের মধ্যে নেট-এন চলেছে না। কিন্তু বরবর পাওয়া যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে কোম্পানি ইনজেকশন প্রতি ৩০০-৫০০

টাকা নিচ্ছে নানা অপপ্রচার করে যথা, একটা ইনজেকশনে এক বছর গর্ভনিরোধ হয় বলে, এতে গর্ভমেচন হয় ইত্যাদি। কর্তারও বেজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের ভুল বুঝিয়ে এই গর্ভনিরোধক প্রয়োগের গণকর্মসূচি চালাচ্ছে।

এই ধরনের গর্ভনিরোধকের উদ্ভব হয়েছে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশে, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে মেয়েদের কাছে কার্যকর ও নিরাপদ এবং দীর্ঘমেয়াদি গর্ভনিরোধকের খুবই চাহিদা। কিন্তু কোম্পানির হাজার প্রচার সন্তোষ সেখানে মেয়েদের মধ্যে এর কটতি নেই। এসব সেলে নেট-ইন প্রয়োগ করা হয় প্রধানত কর্তাদের উদ্যোগে মানসিক প্রতিবন্ধী, মানসিক রোগী, কয়েদি, তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে অভিবাসী মেয়েদের উপর যাদের প্রায় করার, পছন্দ করার, প্রত্যাখ্যান করার তেমন সুযোগ থাকে না।

এই আক্রমণ কেন?

ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

বা জন্ম নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগ শুরু থেকেই পরিচালিত হচ্ছে সাহেবী সাম্রাজ্যবাদী শিবির তথা মার্কিন অর্থসাহায্য ও পরামর্শ মারফত। লুটনকারী সাহেবরা বলছে যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি ভারতের মতো লুপ্তিত দেশগুলির দারিদ্র্যের আসল কারণ, তাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের দারিদ্র্য ঘোচাতে চায়। এই তত্ত্বও শিবিরেছে যে গর্ভধারণ আসলে একটা রোগ। প্রাথমিক উপনিবেশের গরিব মেয়েদের এই রোগ থেকে বাঁচবার জন্য ওদের বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছে গর্ভধারণ-বিরোধী টিকা (anti-pregnancy vaccine), ভারতে প্রয়োগ করার প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ।

আসল কারণগুলি তেমন গোপন নয়। ৯ দিন আগে (১৯৯৮) মার্কিন বিদেশমন্ত্রী ম্যাডেলেন অলব্রাইট বলে ফেলেছেন, 'পরিবার পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক কর্মসূচি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিরও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থরক্ষা করে থাকে'। বহু মার্কিন সরকারি দপ্তরে এই বীকৃতি আছে যে মার্কিন কানিসিলর হার্বিই তৃতীয় বিশ্বের জন্ম নিয়ন্ত্রণ দরকার। লুটনকারী দেশগুলির কর্তাদের মনে একধরনের আতঙ্ক বিরাজ করে যে লুপ্তিত দেশের জনগণ ক্রমশ সংখ্যায় বিপুল হয়ে উঠে লুটন ব্যাহত করবে, তাদের দেশে সম্পদ যা এখনো আছে তা নিজেদেরই ভোগ করবে, এবং ফলে সাহেবী জেগবিলারী

দ্বীপনব্যাহার ভবিষ্যত অঙ্ককার হয়ে পড়বে। এক মার্কিন পণ্ডিত প্রকাশেই সুপারিশ করেছেন যে পরম্পর বোমা ফেলে তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা কমাতে। ইউজেনিয়ার তত্ত্ব কি তুলে গেছেন? এই তত্ত্ব বিজ্ঞানী সাহেবরা জাতিবিষেহী, তারা অ-সাহেবদের অধম প্রাণী বলে বিশ্বাস করে, এতই অধম যে তাদের স্ত্রীভাষন করেছে লাভ নেই। তাই এদের যৎসব্বন্ধি বন্ধ করতে হবে। পশ্চিমী আধুনিক বিজ্ঞানী সমাজের অসংখ্য গবেষণা ও এই আছে এই তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের ভিত্তিতে গাঁড় করারোর তাগিদে। বাসপ্রথা, কু-ক্লক্স-ক্লাব, অ্যাপার্টাইড,

নাৎশীবাদ বা ফ্যাসীবাদ প্রভৃতি রাজনীতির মূল ভিত্তি ইউজেনিয়ার তত্ত্ব অর্থাৎ জাতিশ্রেষ্ঠত্ব। অবশ্য সেই সঙ্গে মুনকাসর্ব্বথ চরিত্রের ছিটকে উদ্যোগও আছে। নেট-এন কোথাও তেমন বিক্রি হচ্ছে না, বেজ্ঞান্য দলে দলে কিনছে না, তাই সাহেবী কোম্পানির দেশের সরকার এদেশের সরকার ও অন্যান্য

প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কেনাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সাহেবকে সাহেব না দেখিলে ...!

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির দিকে একটু মনোযোগ দিলে বোঝা যায় যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর থেকে ভারতের সরকার (তা সে যে-পার্টিরই হোক না কেন) প্রায় সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমী নীতি ও কর্মসূচি শিরোধার্য করে মেনে নিচ্ছে। এর কারণ সর্ব্বকরে শুধু দুইটি বা পরনির্ভরতা নয়, উভয়পক্ষের কর্তাদের মতাদর্শগত মিলও আছে। একদিকে মিল রয়েছে পুঙ্খবহুগত মতাদর্শে। ১৯৪৪ সালে কুট্রিম প্রজেক্টিন উদ্ভাবিত হয়। পকাশের দশকে নারী পুরুষ উভয়ের উপর ট্রায়াল হলে দেখা যায় ডিহাণু নির্গমন ও শুক্রাণু তৈরি দু'টাই বন্ধ হয়। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ে যে এক পুরুষের শুক্রাণুর একটু ছোট হয়ে গেছে। বাস, তখুনি পুরুষের উপর ট্রায়াল বন্ধ করে দেওয়া হল। ঠিক হল একমাত্র নিরাপদ না হলে পুরুষের উপর কোনো ট্রায়াল দেওয়া হবে না। সেই অলিখিত নিবেদনটা এখনো বলবৎ আছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের হত পরীক্ষা নিরীক্ষা সব চলাছে মেয়েদের উপর। হরমোন গর্ভনিরোধক ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যু ঘটলেও কেউই নিরাপত্তার কথা ভেবে মেয়েদের উপর ট্রায়াল বন্ধ করার প্রশ্ন

তোলে নি। আবার সেখান, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী
হাড়ী বন্ধাকরণের অস্ত্রোপচার নারীর চেয়ে পুরুষের ক্ষেত্রে
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ও নিরাপদ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে
অস্ত্রোপচারের ৯৫% হয় নারীর উপর। আরো সেখান, পুরুষের
ব্যবহার্য 'নিরোধ' সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর গর্ভনিরোধক
হওয়া সত্ত্বেও আক্রমণটি মেয়েদের নিকটেই ঘনীভূত করা হচ্ছে।
অর্থাৎ রাজার মতো প্রজাও পুরুষতান্ত্রিক।

জন্মনিয়ন্ত্রণ কি চাই না?

তাহলে কি জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ওকালতি করা হচ্ছে?
বিরোধী পক্ষের বক্তব্য মোটেও তা নয়। আসলে জনসংখ্যা
নিয়ন্ত্রণে এত বেশি আবারে গল্প ও অপপ্রচার চলে যে শিক্ষিত
মানুষও অজ্ঞের মত আচরণ করে। জনসংখ্যা নিয়ে এত
অসংখ্য গবেষণা হয়েছে যে মনগড়া কাহিনীর অবকাশ বৃথ
কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্রের কারণ নয়, মানুষকে গরিব করে
রাখলে জনসংখ্যা বাড়ে। বিশ্বের যে সব দেশে বাহ্যিক
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে সেখানে কোথাও নেট-এন
দরকার হয় নি। পশ্চিমী দেশে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ
করা হয়েছে তখন এত সব গর্ভনিরোধক প্রকরণও ছিল না।
আমাদের সমাজে মেয়েদের নিজেদের ভাগিদেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ

দরকার। এটা প্রমাণিত যে মেয়েদের শিক্ষা, আর্থিক
স্বনির্ভরতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকলে তবেই
জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়, না হলে নয়। এইসব কথা কঠোরা
জানেন। ১৯৯৪ সালে কাইরো-তে জনসংখ্যা ও উন্নয়ন নিয়ে
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং ১৯৯৫ সালে বেজিং-য়ে চতুর্থ
বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে এইসব কথা সোচ্চারে বলা
হয়েছে। ভারত সরকার প্রস্তাবগুলি গ্রহণযোগ্য অস্বীকার করেছে
এবং ২০০০ সালে গৃহীত জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে একই কথা
বলে মেয়েদের বৈজ্ঞানিক-প্রণোদিত নিয়ন্ত্রণের উপর চোখ মেওয়া
হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তরপ্রদেশ, মহাশ্রম, রাজস্থান,
মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, দিল্লি প্রভৃতি রাজ্যে ইতিমধ্যেই
জন্ম নিয়ন্ত্রণে বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা
জানি, সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা বাহিনী যখন নেট-এন নিয়ে
মেয়েদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন হউপলক-পছন্দ,
অবহিত-সম্মতি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি চুলোয় ধাবে,
বলপ্রয়োগের ভূমিকাই প্রধান হয়ে পড়বে। পুরুষতন্ত্র যথার্থিতি
অকুস্থলে পরিচালকের ভূমিকায় থাকবে। এই আক্রমণ রূপে
গেলে সর্বস্তরের সমাজ-সচেতন গণতান্ত্রিক মানুষকে এগিয়ে
এসে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হল বিষয়টি সর্বত্র
প্রচার করা, যতজনকে পারা যায় জানানোর কাজে নেমে পড়া।

বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষ ডিগ্রি এবং রাজনীতি

দেবাশিস চক্রবর্তী

বিষয়টির দৃষ্টি ঝিক রয়েছে। এক, জ্যোতিষচর্চা ও বিজ্ঞানের
বিষয়বস্তু হিসাবে স্নাতক/স্নাতকোত্তর স্তরে এর পঠনপাঠন
কতটা বিজ্ঞানসিদ্ধ? দুই, এধরনের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার
শিখনে কি বা কোন পরিকল্পনা কাজ করছে? প্রথম প্রশ্নটির
উত্তর অত্যন্ত উৎস মানুষের পাঠকবর্ণের কাছে নতুন করে
বলার প্রয়োজন নেই। বরং দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর বোঝার চেষ্টা
করা থাক।

গুরু ভবে, কোথায়

কেন্দ্রে আলোচনা শুরু হয়েছিল গত বছর (২০০০) ১৬ই
জুন। এই সময়ই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান
হরি গৌতমের নির্দেশমত একটি কমিটি তৈরি হয়। ঐ কমিটিতে
অন্যান্য সদস্য ছাড়াও ছিলেন কমিশনের দুজন লোক। কমিটির
মিটিং-এ 'বেদিক জ্যোতিষশাস্ত্র'র (Vedic Astrology) কোর্স
ছাড়াও 'কর্মকাণ্ড' (Karmakanda) নামে আর একটি কোর্সের
প্রস্তাব রাখা হয়। এই 'কর্মকাণ্ড' কোর্সটির বিষয়বস্তু হল



ছবি : দেবাশিস ঘাট

পুরোহিততন্ত্র, আগবন্ধ, মন্ত্রোচ্চারণ— এইগুলি। কমিটি বেশ
কয়েক মাস পর কমিশনের কাছে একটি রিপোর্ট দাখিল করে।
ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক বহরের ২৫শে জানুয়ারি
ঐ দুই কোর্সের অনুমোদন দেয়। এই কর্মে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী

কমিশন ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এক চিঠি পাঠায়। এই চিঠিতে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে 'জ্যোতির্বিজ্ঞান ও শৌর্যহিতা'—এর পঠনপাঠন চালু করার ক্ষেত্রে কমিশনের সবুজ সম্মত দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো ও প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেত্রে ১৫ই মার্চ শেষ দিন ধার্য করা হয়। কমিশনের অতিরিক্ত সচিবের বক্তব্য অনুযায়ী নাকি বস বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সম্মতি জানিয়ে আবেদন পাঠিয়েছে।

মঞ্জুরী কমিশনের বিশেষজ্ঞ কমিটি এই দুই কোর্সের সিলেবাস চালু করবে এবং সেই সিলেবাস এমনই করা হবে যাতে কমিশনের মতে 'ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাদারী মানুষজন এমন কি বাস্তবীভূত-অর্থনীতির গবেষকরাও উপকৃত হবেন।' ডিগ্রি কোর্সের সমন্বয়ী তিন বছর, তবে কেউ এক বছর বা দু'বছরও পড়তে পারে। একবছর পড়লে সার্টিফিকেট, দু'বছরের শেষে ডিপ্লোমা আর তিন বছর সফল পাঠ্যক্রমের শেষে ডিগ্রি প্রদান করা হবে। স্নাতকোত্তর স্তরেও পাঠ্যক্রম চালু করা হবে এবং তা হবে দুই বছরের জন্য। এমনকি কেউ এ নিয়ে গবেষণা করে Ph.D. বা উচ্চতর (Post Doctorate বা D.Sc.) ডিগ্রিও লাভ করতে পারেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া পরে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র ও কর্মকাণ্ড কোর্স চালু করার প্রশাসনিক ও অন্যান্য রূপরেখা বিবৃতিভাবে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে উক্ত বিভাগ চালু করতে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন ছয়জন শিক্ষক-কর্মচারী। একজন প্রোফেসর, একজন রিডার, দুইজন লেকচারার, একজন লাইব্রেরিয়ান ও একজন কম্পিউটার অপারেটর (১)। এই কোর্সে ছাত্রদের কাছ থেকে কী বেতন নেওয়া হবে, তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে চিঠিতে। যেমন, একটি স্নাতকস্তরের পড়ুয়ার কাছ থেকে বছরে ৩,০০০ ও স্নাতকোত্তর স্তরে ৪,০০০ টাকা নেওয়া হবে। মাঝেমধ্যে বিখ্যাত জ্যোতিষ-বিদ্যারসম্মত তাদের 'মূল্যবান' বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই কোর্সগুলি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আরও করবে (মূলত ছাত্রছাত্রীদের বেতন থেকেই) প্রচুর পরিমাণে এবং বা দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগটিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা যাবে। অকশ্যই শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন, কমিশন অনুমোদিত ও প্রস্তুত।

প্রতিবাদ ও নিষ্কিন্দা

সেপের ও সেপের বহিরের ভারতীয় বিজ্ঞান সমাজের প্রতিবাদ ও প্রায় তিনশত সমাজ-বিজ্ঞানীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রতিবাদপত্র, এমনকি সেপের প্রায় সমস্ত অগ্রদূতী সংবাদপত্রের স্বতায়ত সম্পূর্ণত উপেক্ষা করে কবিশন তার সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন বিজ্ঞানীর

স্বাক্ষরিত যে আবেদন কমিশনের সামনে রাখা হয়েছে, তার কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি। '... We, the members of the Indian Scientific Community feel that the proposal by the UGC is a giant leap backwards, undermining whatever scientific credibility our country may have so far achieved. We request the UGC to abandon this ill judged course of action ...' এ প্রসঙ্গে কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও বিখ্যাত পদার্থবিদ প্রোফেসর যশপালের বক্তব্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে সমাজবিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার অঙ্গ হিসাবে জ্যোতিষবিদ্যার ক্ষয়, ও এর নানাবিধ পরিবর্তনের ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কেন ও কীভাবে এই বিদ্যা যুগযুগান্তর ধরে মানুষ ও সমাজে গভীর প্রভাব রেখেছে তাও বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর মতে এর জন্য নতুন করে কোনো বিভাগ খোলার প্রয়োজন তো নেইই, এমনকি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এর পঠনপাঠন চালু করা সম্পূর্ণ একপেশে ও অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। প্রোফেসরের তীর্থক উক্তি, 'যদি কমিশনের হিসাবে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র-ই সময়গণনার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হয়, তবে পরমাণু ঘড়ি (atomic clocks), কার্বন, ইউরেনিয়াম ডেটাইং ইত্যাদির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাই তৈরি হত না। কোপারনিকাস, নিউটন বা আইনস্টাইনের 'সময়' সম্পর্কে কখনো গবেষণার অর্থ কোথায়? এদের কাজের আগে 'পবিত্র বৈদিক' শব্দ যুক্ত নেই, তাই?' তাঁর বিশ্বাস 'কোনও আত্মবিশ্বাসী ও আত্মসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ই এমন কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে না'।

প্রোফেসর যশপালের বিশ্বাস যাই থাকুক না কেন, কমিশন-চেয়ারম্যান প্রোফেসর হরি গৌতম-মহাশয় প্রায় একভাবে ও বিনাধায়ে তাঁর অবাঞ্ছিত, অটোক্রিক কালী বর্ষণ করে চলেছেন। তাঁর সর্বশেষ মন্তব্যটি (অবশ্যই UGC-র সিদ্ধান্তের সমর্থনে) হায়দ্রাবাদের এক সভায়, 'নোবেল বিজয়ী ভারতীয় বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন-ও জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত আখ্যা দিয়েছিলেন।' রমনের মতো একজন প্রকৃত বিজ্ঞানীকে শ্রীশৌভম যখন এজাতীয় বিতর্কে জড়িয়ে ফেলেছেন, তখন আমাদের মতো ভারতীয়দেরও কিছু সভ্য তুলে ধরার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্যার রমনের ভাইপো প্রোফেসর এস. রামশেখর (যিনি নিজেও একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'রমন কোনদিনই জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং এ সম্পর্কে আলোচনা তিনি নিষ্যতোজন মনে করতেন।' ব্যাসাঙ্গের ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৮৮ সালে) প্রোফেসর রামশেখরের লেখা বই 'C. V. Raman - A Pictorial

Biography'-তে এসবই লেখা আছে: 'শ্যার রমন কোনবিনই কুসংস্কারগ্রস্ত ছিলেন না এবং আচার-বিধি-অনুষ্ঠানকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। ... এমনকি তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম যাতে না হয় তার নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন ...'। এহেন মানুষটিকে মিথ্যার ফালে বন্ধি করে ধীরে ধীরে সত্যতা ও শিক্ষার নমুনা দেখালেন প্রোফেসর গৌতম? প্রসঙ্গত স্বরণ করা যেতে পারে আজ থেকে ২৬ বছর আগে (১৯৭৫ সালে) বিশ্বের ১৮৬ জন বৈজ্ঞানিক (যাদের মধ্যে ১৯ জন নোবেল বিজয়ী)— যাদের অন্যতম ছিলেন ভারতের মধ্যে সূর্যমণা চন্দ্রশেখর, জ্যোতিষের বিরাট এক যৌথ বিকৃতি বেন। এরই একটি পংক্তি — '... time has come to challenge directly and forcefully the pretentious claims of astrological charlatans.' প্রোফেসর গৌতম একথা অস্বীকার করতে পারবেন?

কাসের কথায়, কাসের জন্য

মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ডঃ মুরলীমোহনর যোগী, যিনি নিজে একজন শিক্ষাবিদ, পদার্থবিদ, এ ব্যাপারে তাঁর সম্মতি জানিয়েছেন। তাঁর মতে একদল বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত কমিটি যে রায় জানিয়েছে, তা সঠিক হতে বাধ্য এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয় যে কোর্সগুলি চালু করার ব্যাপারে তাদের সন্নিহিত জানিয়েছে, তাতে তিনি বিশ্বাসী। আমরা, যাধারণ জ্ঞানগত কিছু সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকরে। ভারতের অটুটে বিগত বহু বছরে কি কোনো বিশেষজ্ঞ বা ডঃ যোগীর মতো দুঃখদর্শী নেতা জন্ম নেন নি, যাঁরা এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে পারতেন না? আজ কোন মানুষ বিশেষজ্ঞরা সর্বব হুগেন এবং ডঃ যোগীর সার্বক নেতৃত্বে এমন এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে সম্মতি জানালেন— এ প্রথ বাজাবিকভাবেই আমাদের মনে আসে। লক্ষ্যীয় — এই বিশেষজ্ঞের দলে নেই ভারতের সেরা বৈজ্ঞানিক বা শিক্ষাবিদ-রা, নেই ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি বা সোসাইটিগুলির কর্ণধার বা প্রতিনিধিরা (যেমন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস বা ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স)। নেই বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো মুভমেন্টের জননেতাও। আমরা জানি, এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আছেন অবৈজ্ঞানিক মনোভাষার কিছু শিক্ষাবিদ, ডঃ যোগীর খুব কাছে কিছু শোক যীরা তাঁর সৌখন্য, আছেন এ'কি কুংহণ ক্য-এর মতো কিছু ব্যক্তি। এই ব্যক্তিটি ভারত সরকারের শিক্ষাবিভাগের বর্তমান সচিব। এর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (Bio-data)-র একটা পরিচয় মেলে এই বিভাগের সরকারি Web-site-এ, যাতে বলা আছে, 'শ্রী স্য অস্ট্রোনিক প্রণা, শক্তি, বায়ুবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান এবং তিনি নতুন বিদ্যার ভারতীয় বিদ্যাবচন থেকে 'জ্যোতিষ আচার' নামে একটি কোর্স-ও করেছেন।' প্রসঙ্গত UGC-র সদস্য দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ এস কে যোগী (যিনি CSIR-এর প্রাক্তন অধিকর্তা

ও পদাধিকার) ও ডঃ শিশ্রা গুহ মুখার্জী (যিনি বর্তমানে জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মণিকটিলার ক্যান্সারজিস্ট)-দের থেকে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ডঃ যোগী বলেন, যেভাবে তড়িঘড়ি করে কমিটি গঠন করে সেই কমিটির রিপোর্ট কমিশনের সামনে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছিল, তাতে বিবয়টি নিয়ে কমিশনে আলোচনা আলোচনা করার সুযোগই ছিল না। ভাবুন: ডঃ যোগীর কথামতো ১৬ই জুনের (২০০০) মিটিং-এ জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনার কোনো সুচিই ছিল না! এমনকি জানুয়ারির কমিশনের মিটিং-এ ও কমিটি প্রস্তাবিত কোনো বিষয় বা রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয় নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পাঠ্যক্রম চিহ্নিত করে কমিশন পবিত্রার লিখেছে যে কোর্স চালু করার সমস্ত নিয়মাবলী কমিশন নিজে অনুমোদন করেছে।

অসল কথাটা এবার বোঝার চেষ্টা করা যাক। কমিশনের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তি ও মাননীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী বিভিন্ন সভাসমিতি ও প্রতাপরিকায় যে ধরনের সাফাই গাইছেন তা থেকে এই প্রস্তাবের পিছনে কমিশনের যুক্তির একটা ধারণা পাওয়া যায়। প্রথমত, বেশ কয়েকটি তথ্যকথিত নামকরা সংস্থা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি জ্যোতিষশাস্ত্র বহনন থেকেই পড়ানো হচ্ছে (উদাহরণ: এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোনোটিই UGC অনুমোদিত নয়)। যেমন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী সঙ্কট বিদ্যালীও বা মহর্ষি মহেশ যোগী বিশ্ববিদ্যালয় বা ভারতীয় বিদ্যাবচন। বস্তু ও ব-প্রচারিত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব আয়েস্ট্রোনিক্যাল স্টাডি-তেও জ্যোতিষশাস্ত্রই পড়ানো হয়। দ্বিতীয় কারণটি বেশ আধুনিক ধরনের। জ্যোতিষশাস্ত্র নাকি পশ্চিমী দেশগুলো গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এটি আর পাঁচটা বিজ্ঞানের বিষয়ের মতোই সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রচার হয়। আর তৃতীয় কারণ? জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তি বেকার সমস্যার সমাধানের একটি পদ্ধতি! UGC-র 'গাইডলাইন' বা নির্দেশনামা অনুযায়ী সঙ্কট ও প্রাচ্য বিষয়ের (Oriental Studies) সঙ্গে এই জ্যোতিষশাস্ত্রের নতুন বিভাগটি একযোগে কাজ করতে পারে। এ সম্পর্কে রোরিলা থাপারের বক্তব্য: 'যদি জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে সত্যিকারের অধ্যয়ন করা হয় তবে এই বিভাগকে সঙ্কটের সঙ্গে নয়, বরং গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy)-এর সঙ্গে সহযোগিতায় যাওয়া উচিত। সেক্ষেত্রেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিজ্ঞানসিদ্ধতার প্রমাণ হয়ে যাবে।' রোরিলা থাপারের মতে জ্যোতিষশাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত বলা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানকেই অপমান করা।

আদালত ও একটি স্নায়

UGC-র প্রস্তাবকে অসাবধানিক ও বৈজ্ঞানিক যৌগ্য করে অপ্রত্যাশিত হাইকোর্ট এক রিট পিটিশন দেওয়া হয় করেকমাস আগে। সেই পিটিশনে স্বাক্ষরকারী তিনজনের

একজন হলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী (মলিকিউলার ব্যায়োলজিস্ট) ডঃ পি. এম. ডার্বি। আলপলডের কাছে UGC-র ওপর একটি মামলা (mandamus) জারি করার প্রার্থনা করা হয়। অফু হাইকোর্টে একবাক্যে এই আবেদন খারিজ করে দেয়। হাইকোর্টের রায় হল, 'বিশেষজ্ঞের মত অনুযায়ী জ্যোতিষশাস্ত্রের এক গভীর ও বিদ্যুত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। ... কমিশন হল বিবিধ সংস্থা (Statutory body) এবং যেহেতু বিবিধটি (আস্ট্রোলজি) নিয়ে মতভেদ রয়েছে, সেহেতু কমিশন এক ধরনের অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেই পারে ... এই প্রয়োজনীয়তা গবেষণার আওতার মধ্যেই পড়ে ...'। কোর্টের রায়ে বেডাবে জ্যোতিষ-কে বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, তা আরও বিশ্বস্তকর। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে উদ্ধৃতি তুলে কোর্ট দেখিয়েছে যে জ্যোতিষশাস্ত্র বিজ্ঞান, ও তাকে নিয়ে পড়াশোনার প্রয়োজন রয়েছে। ব্রিটানিকায় কী ধরনের সেই ব্যাখ্যা? 'বিজ্ঞানই হোক বা অবিজ্ঞান, জ্যোতিষবিদ্যা মানুষ তথা বস্তুজগতের নানা ঘটনাক্রমের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের অবস্থানের ভিত্তিতে ... প্রাচীন এমনকি আধুনিক সভ্যতারও এর প্রভাব অনস্বীকার্য। ...'

মজার বিষয় হল, যে-ব্রিটানিকা থেকে উদ্ধৃতি তুলে কোর্ট দেখিয়েছে জ্যোতিষ হল বিজ্ঞান, সেটি ইন্টার ডিউরি সংকল্প, যার প্রকাশ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। একটি রাজ্যের উচ্চতম আদালত তার রায়েই জন্য সাহায্য নেয় (আর সেই রায় একটি বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে) এমন একটি সংকল্পের থেকে যা দুশো বছরের পুরনো! এবং সেই সময় যখন এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ইন্টারনেট সংকল্প একটু ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায়। আর ঐ ইন্টারনেট সংকল্পের সমতুল্য ১৯২৭-এর মুরগের ১৫তম সংকল্প (বই হিসেবে) জ্যোতিষ নিয়ে কী বলে শোনা যাক — "astrology is a type of divination ... defined as a pseudoscience and considered to be diametrically opposed to the theories and findings of modern science.... Copernican revolution of the 16th Century dealt the geocentric worldview of astrology its shattering blow." এইভাবে জ্যোতিষবিদ্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা রেখে এবং প্রয়োজনীয় ও গভীর কোনো ধরনের উত্তর বোঝার বা সমাধানের ক্ষেত্রে জ্যোতিষের ব্যর্থতা জানিয়ে ইন্টারনেট সমাপ্তি টানে — 'In short, modern western astrology, though of great interest sociologically and popularly, generally is regarded as devoid of any intellectual value.'

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার সাম্প্রতিক মেকোনো সংকল্প খুললেই পাঠক লক্ষ্য করবেন জ্যোতিষ নিয়ে টাকার এক সুচিহ্নিত ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা, যে আলোচনা কোনো

অবস্থাতেই কোনো মানুষকেই জ্যোতিষ সম্পর্কে বিভ্রান্তির স্বপ্ন দেখে না। আলপলড তার নিজের যুক্তিতে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু — এটা কি মেনে নেওয়া যায়, এনসাইক্লোপিডিয়ার মতো একটি কেবলমাত্র ডিকশনারী-ই হল এই বিতর্কে মহামান্য আলপলডের একমাত্র রেফারেন্স? বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জগতের যেকোনো প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানে কি একটি ডিকশনারীই যথেষ্ট? 'বেদ' মনে করেন, তখন আমাদেরও 'অবৈদিক' কিছু প্রশ্ন থেকেই যায় (১) পিটিশনের আবেদন কি এতই সামান্য ও গুরুত্বহীন যে প্রাথমিক স্তরে একবাক্যে একে উড়িয়ে দেওয়া যায়? (২) যদি বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র (Vedic astrology) বিজ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকে, তবে একে আগেই কোর্স/পাঠ্যবিষয় হিসাবে গুরু করা হয়নি কেন, যেখানে UGC-র প্রকর্তনের সময় থেকেই নারীশাস্ত্রী শিক্ষাবিদ বা বৈজ্ঞানিক এর উচ্চতম পদ অলাভকৃত করে এসেছেন? কোর্ট একথা একবারও ভাবল না। কেন? (৩) এই কোর্সের ব্যয় বহন করতে UGC-র কয়েক কোটি টাকা লাগবে। সাধারণ কর্মমাতার টাকা কেন ব্যয় করা হবে এমন একটি বিষয়ের অধ্যয়নে, যেটি অত্যন্ত বিতর্কিত এবং যাকে নিয়ে কখনই একটি সাধারণ সূত্রে শৌছানো অসম্ভব? (৪) সংবিধানের ২১এ পরিচ্ছদ অনুযায়ী সেলশাসীর মৌলিক কর্তব্যের (Fundamental duties) অন্যতম হল বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার প্রসার। UGC-র এই সিদ্ধান্ত কি সংবিধানকে উপেক্ষা করা নয়? সহহৃদি কোথায়

আমরা অশা করতাই পারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা UGC-র এলাপ অবৈজ্ঞানিক ও অব্যক্তি সিদ্ধান্তকে প্রত্যাহার করা যে আমাদের দেশের বিজ্ঞানসচেতন মানুষেরা। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের উচ্চশিক্ষার উচ্চতম স্থানে মৌলবাদী চিন্তাধারার সোচ্চ আসীন থাকবে ততদিন কোনো না কোনো সময় এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সন্ধাননা তৈরি হবে, হতে থাকবে। শুনতে অবাক লাগলেও এটা সত্য যে মৌলবাদের পূজারীরা আজ অনেক বেশি সংহত, অনেক বেশি উগ্র। অনুসূল রাজনীতির ব্যর্থতাবশত প্রতিদ্রাব্যশীল শক্তি আজ নিরাপদ। অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে তাই তারা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি পরিকল্পিত ও কৌশলী। তুলনার প্রগতিশীল উদারমনস্ক মানুষজন হাফট বিচ্ছিন্ন। আর এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। হিন্দুধর্ম ও তার পুনরুত্থানকে রুখতে হলে আজ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রগতিবাদ ও প্রগতিবাদীদের একীকরণ। কাজটা শক্ত মনে, কিন্তু অসম্ভব নয়। সদিচ্ছা ও সততার এই প্রচেষ্টা আমাদের প্রতিরোধী হতেই হবে। নতুবা আগামী দিনগুলো হবে আরও ভয়ঙ্কর।

বৈদিক সমাজ ও মূল্যবোধ

তপোব্রত সান্যাল

বৈদিক মূল্যবোধের বিষয়টি আলোচনা করার আগে মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায় তা স্পষ্ট হওয়া প্রকার। মূল্যবোধ কথাটি হালের, ইংরেজি "ভ্যালুজ" এর প্রতিশব্দ। মূল্যবোধ হল কোনো সিদ্ধান্তের বৈদিক বা আবেগজাত মূল্যায়ন। যে কোনো কাজের পেছনে একটি সিদ্ধান্ত থাকে এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মানুষ সব দিক খতিয়ে নেবে — বিচার করে সিদ্ধান্তটির সম্ভাব্য ফল বা অন্য কোনো বিকল্প থাকলে সেটির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াও। আসলে মূল্যবোধ ব্যক্তি নির্ভর। আমার মানসপ্রকৃতি, যুক্তি, আবেগ একান্ত আমারই, অন্যের বোধের সঙ্গে তার মিল নাও হতে পারে। প্রচলিত অর্থে মূল্যবোধের মানে দাঁড়িয়েছে নৈতিকতা। নৈতিকতা আসলে সমর্থক মূল্যবোধ কারণ সমাজ শৃঙ্খলার ভিত্তি হল সু-নীতির প্রতি আনুগত্য। যে-মূল্যবোধজনিত সিদ্ধান্তে সমাজ-শৃঙ্খলার হানি হয়, তা ন-এর্থক মূল্যবোধ। সংক্ষেপে সমর্থক মূল্যবোধের একটি অন্য প্রতিশব্দ আছে — "ইউ" ন-এর্থক মূল্যবোধকে সংক্ষেপে বলা হয়েছে "বিস্ট"। সমাজ বিরোধী সব সিদ্ধান্তই "বিস্ট" বা ন-এর্থক মূল্যবোধজাত।

বেদে মূল্যবোধের প্রতিফলন বিষয়ে জানতে কিছু প্রস্তাবনার প্রয়োজন আছে। বিপুল বৈদিক সাহিত্য থেকে মূল্যবোধ সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে সেগুলির আনুপূর্বিক আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। বেদের যুগে সমাজ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সে-যুগের মানুষের মূল্যবোধের ধরন আশা করা যাবে। বেদ চারটি — ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রতি বেদের আখ্যার চারটি অংশ — সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। চার বেদের প্রোহ-মন্ত্র-যাগযজ্ঞ-আচার-নিয়ম ইত্যাদির সংকলন হল সংহিতা। ব্রাহ্মণে আছে যজ্ঞের নানা ক্রিয়া ও আচারের কথা। ব্রাহ্মণ গদ্যে লেখা। ব্রাহ্মণকে সংহিতার অংশ বলা যায়। আরণ্যক ও উপনিষদে বৈদিক ঋষিদের গভীর উদ্ভূতজ্ঞানসার প্রকাশ ঘটেছে। অথর্ববেদের কোনো আরণ্যক অংশ নেই। বৈদিক চিন্তায় তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। প্রধানতম ধারাটি (সূক্ত সংখ্যা ও উল্লেখ বিচার করে) দেবতা-বন্দনা ও যজ্ঞ করে তাদের সন্তোষ বিধানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বৈদিক যুগে ধারণা ছিল যে দেবতাদের দ্বারা পোষিত না হলে ইহজীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ সম্ভব নয়। এই ধারণা থেকেই নানা যজ্ঞক্রিয়ার উদ্ভব যা কার্যত দেবতা-ভোগ। দ্বিতীয় ধারাটিতে আমরা দেখি (অথর্ব বেদেই বেশি) নানা ধরনের কুসংস্কার-প্রণোদিত ক্রিয়া যা শূদ্র হলেই তুচ্ছতাক, কাড়ফুক, শত্রু বিভাডন, বিশ্বনিবারণের বহু

মন্ত্র বা সূক্তের মধ্য দিয়ে। তৃতীয় ধারাটিতে মানুষের বোধের প্রসার ও উৎকর্ষণ ঘটেছিল। কবিতা আগ্রহী হয়েছেন সুতির রহস্য উদ্ঘাটনে, উৎসুক হয়েছেন কে এই বিশ্ব প্রপঞ্চের স্রষ্টা, কী তাঁর স্বরূপ — এইসব প্রশ্নের উত্তর জানতে। প্রথম দুটি ধারার মধ্যে — তা' ঘড়ই অস্বাভাবিক মনে করা হোক — অনুসৃত আছে মানুষের সৃষ্টি ও নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রার একান্ত অভিসার। মানুষ যখন আত্মতৃপ্ত, তখনই সে তত্ত্ব-সন্ধানের উৎসাহী হতে পারে। তৃতীয় ধারায় হয়েছে এই অনুভবের উদ্ভাস।

এই তিনধারার বাইরে ছিল পরিবার ও সমাজকে শৃঙ্খলিত করার প্রয়াসও। বিশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন যে সমাজকে সুস্থিত দেয় না, বৈদিক ঋষিদের রচনায় তার প্রমাণ মেলে। সমর্থক মূল্যবোধের ওপর তাঁরা জোর দিয়েছিলেন। বৈদিক সমাজে বৈদিক নমনীয়তা ছিল, পরবর্তীকালে তা' কঠোর ও অনমনীয় হয়ে পড়ে। চতুঃপ্রায় ও চতুঃপ্রাণ্ড সেযুগে ছিল সমাজ-জীবনের ভিত্তি। চতুঃপ্রায়ের মধ্যে মানবজীবনের যে পর্যায়-বিভাগ আছে, তা' সত্যই প্রশংসনীয় সামাজিক সংস্কার। বর্ণ-বিভাজন নিয়ে অকণ্ঠ অনেক মতামতেরা আছে। মানুষে-মানুষে শ্রেণীভেদ আজকের ব্যক্তিবাদী মানুষ মেনে নেন না। এ-যুগটি বিষয়ে পরে আসছি।

ঋগবেদের সূক্ত-সংখ্যা ১০২৮টি। দশটি মণ্ডলে বিভক্ত সূক্ত। এইসব সূক্ত রচনা করেছিলেন বিভিন্ন ঋষি বা ঋষি গোষ্ঠী। বেদের পতিতদের বিচারে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম — এই ছটি মণ্ডল প্রাচীনতম, দশম মণ্ডল সবচেয়ে অর্বচীন আর প্রথম ও অন্তিম মণ্ডল দুটি এর মাঝামাঝি সময়ের রচনা। ঋগবেদের বেশির ভাগই ঋগে আছে দেবতাদের স্তুতি ও যজ্ঞের প্রশংসা। চরিত্রটি দানস্তুতি ঋগবেদে আছে যেখানে জুড়িফার দেবতার কাছে সম্পন্ন প্রার্থনা করছেন। বৈদিক ধর্ম বলতে বোঝাত জৈতিক প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষযোগ্যতার কোনো পশ্চিমালী পদার্থের আরাধনা। এদের ব্যক্তিরূপ কল্পনা করে দেবত্ব আরোপিত হয়েছিল। নির্বিঘ্ন ও সম্পন্ন জীবনযাত্রার জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানাতেই সেযুগের মানুষ, যজ্ঞ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আত্মনে আত্মতি দেওয়া হত, দেওয়া হত সোমরসও। বেদের আদি ধর্মীয় ধারণাকে কল্পনাবদ্ধ বলা যায়। দশম মণ্ডলে তা' বিশ্বদেবতাকে পরিগণিত করেছিল। দেবতারা ছিলেন ঋগভেদের নিয়ামক, সভ্যপ্রদী ও কতবান, অকল্যাণকে তাঁরা জয় করতে পারেন। সেযুগে মনে করা হত মানুষের বাসনাপূর্তি দেবতাদের ওপর নির্ভর করে। দেবতারা সাধু ও সং মানুষদের পূরকৃত করেন, দুঃখীদের সেন শান্তি। বেদে

সেবতাদের সংখ্যা ৩৩; কিন্তু যাকের হাতে প্রধান বৈদিক সেবতা হলেন ভিন্‌নন — অগ্নি (পৃথিবীর সেবতা), সূর্য (আকাশের সেবতা), ইন্দ্র বা বায়ু (অন্তরিক্‌শের সেবতা)। এরা কর্ম ও মহত্ব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপাধি গ্রহণ করে ছিলেন। যাক বলেছেন যে, সব সেবতাই এক আত্মার নানা প্রকাশ।

সে-সময় অনেক জটিল যজ্ঞানুষ্ঠান করে কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা হ'তে দেখা যায়। বেদের সময় থেকে শিব ও বিষ্ণুর পূজা গ্রাধানা শেতে আরম্ভ করে। কেবল ছিল দেবকল্পিত, নিচের অনুবাদ থেকে বোঝা যায়:

করণ-কন্ধান (খ ৭/৮৬)

... অতীষ্ট যিনি সেন ও গোহেন, সে করণ সেবতায়
অপাগটিতে অসি ভুরি সেবা করিব দাসের ন্যায়;
অজান মোরা, হে অর্ঘ্যসেব, জান দাও কবিতর!
হোতাবে ধনের আশর, করণ, কর যে প্রেরণ কর।

(পার্ব্যমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ)

বাস্তোপ্পতি কন্ধান (বাস্তোপ্পতি গৃহের সেবতা)
(খ ৭/৪৪) ... আমরা যে-খন প্রার্থি তোমার পাশ —
দাও মিটিয়া অশ।

দ্বিপদ এবং চতুষ্পদের মাঠে
(যেন) তব শুভ সুখ রাজে। ... (ঐ)

পূজা কন্ধান (পূজা হলেন সূর্য)
(খ ১/৪২) ... কৃপা কর, দাও অতীষ্ট, ধন,
তেজস্বীকর, উদর পূরণ
তব সেবাও রক্ষা-শক্তি যেমন; ... (ঐ)

যে-যাগারটি সঙ্ঘটিত, তা হল — জীবন নিয়ে কোনো নৈরাশ্যবোধ সে-যুগের মানুষের ছিল না। তাঁরা নিঃসঙ্কোচে সেবতাদের কাছে সোনা, গো-ধন, পুত্র-পৌত্রী প্রার্থির প্রার্থনা জানাতেন। সুখ বলতে তাঁরা বস্ত্র-বান্ধবা বুঝতেন। ভোগে তাঁরা নিমগ্নই ছিলেন না। পরবর্তী কালে ভোগবাদের হিন্দু শাস্ত্রে উৎসাহ নেওয়া হয় নি, বলা হয়েছে — এ জীবন, এই সংসার দুখের আকর। বেদের যুগে এই বোধ কিন্তু মানুষের ছিল না। যেসে তেমন ভাবে লোভাও বলা নেই মনুষ্যদের শক্তি কেমন হওয়া উচিত, বলা নেই নরকের কথাও। কেবল বলা আছে যে ধর্মিক মানুষরা তাঁদের প্রাণা সম্মান ও পৌষ লাভ করবেন মৃত্যুর পর। যে ত্রিবর্গের ক্রাণ (ধর্ম, অর্থ ও কাম) পরে আচরণীয় বলে শৈলীর শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে, বৈদিক সাহিত্যে লোভাও এদের পারস্পরিক বিভ্রান্ততার কথা বলা হয় নি। গীতার প্রীতুক এই মতের সমর্থন করে বলেছেন যে তিনি ধর্মের অক্লিষ্ট কার। আসলে, মানুষের সুখাকাঙ্ক্ষার মধ্যে তো কোনো অনায়া নেই। বৈদিক যুগের মানুষদের বিশ্বাস ছিল সেবতাদের প্রত্যেকেই কেবল তাঁরা জীবনে সুখ পেতে পারেন।

বৈদিক যুগের দ্বিতীয় ধারায় কিছু মানুষের মধ্যে সংস্কার-কল্যাণ প্রকট হয়েছে। ঐন্দ্রজালিক ও আভিচারিক নানা ক্রিয়ার আধিক্য অর্থবৎ বেদে। ঋগ্বেদে আছে বিগ্ন নিবারণের জন্য নানা মন্ত্র। পশুনা বা পাবি থেকে অমঙ্গল নিবারণের মন্ত্র (৪৪/২ ও

৪৩), বিঘ ভাড়ার মন্ত্র (১/১১১), সর্বাঙ্গের রোগ নিবারণের মন্ত্র (১০/১৬৩), গর্ভস্থ প্রণকে কুদৃষ্টি থেকে এড়ানোর মন্ত্র (১০/১৬২), সপত্নীকে বশ করার মন্ত্র (১০/১৪৫), শত্রু লাভনের মন্ত্র (১০/১৬৬) অলঙ্কারী দূর করার মন্ত্র (১০/১৫৫) ইত্যাদি। একাড়া আছে যুগপাড়নি মন্ত্র (৭/৫৫), সম্ভান লাভের মন্ত্র (১০/১৮৩), বৃষ্টি হওয়াদের জন্য ব্যাঙকে (মন্তুক) স্তুতি। হেয়ালি ধরনের মন্ত্রও আছে (৮/২৯ ও ১/১৬৪)।

বিঘ ভাড়ার মন্ত্র থেকে একটা শোনাই

... ত্বি সূর্যেতে সব বিঘ ছুঁতি,
যথা যোলকেতে মন ঢালে শুঁতি,
রবি চিরমিন বেঁচে পূজা পান,
মোরা হারান না এই প্রাণ।
রবির সবুজ ঘোড়ায় রথ চলে,
মধুবিদ্যা সে মধুপানে
তোমারে, হে বিঘ, করেছে যে মধুময়।

(পার্ব্যমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ)

অর্থবৎ বেদে যে ধরনের সমাজব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়, তা' ঋগ্বেদের সমাজব্যবস্থার থেকে আলাদা। অর্থবৎ বেদের মূলত দুটি ভাগ। একটিতে আছে গুণ ও মঙ্গল কর্মের স্যোতক নানা মন্ত্র। আর অন্যটিতে ঐন্দ্রজালিক ও আভিচারিক ক্রিয়ার বর্ণনা। অর্থবৎ বেদের বৈশিষ্ট্য এর দ্বিতীয় অংশটি, যেখানে রয়েছে অনেক জাদুমন্ত্র যা'র পাঠে অপসেবতার ভূট হবেন, শত্রুদের ওপর অভিশাপ বর্জাবে ও সেই সঙ্গে গুণাকারীরা আশীর্বাদ পাবেন। এইসব মন্ত্রতন্ত্রের অনেকটাই তুড়ে আছে রোগ-বলাই ও তা নিরাময়ের নানা উপায়। রোগের এক অপসেবতার নাম 'ডকমন' যা'র উদ্দেশ্য অনেক মন্ত্র অর্থবৎ বেদে আছে। অনেক ঔষধকেও স্নোকে'র সাহায্যে কর্নি করা হয়েছে। পণ্ডিতরা মনে করেন অর্থবৎবৈদ্য ভারতীয় ভৈষজ্যবিদ্যার আদি উৎস। বর্নীরূপের মন্ত্রও অর্থবৎ বেদে নেহাত কম নেই।

ঋগ্বেদের কিছু আভিচারিক সূক্ত এবং অর্থবৎ বেদের ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র পাড়ে মনে হয় মানুষ যেন ক্রমে ক্রমে সেবতার প্রতি আস্থা হারাতে শুরু করেছিল। এই অনায়াই মানুষকে কুসংস্কার-প্ররোচিত নানা আভিচারিক ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার দিকে আকৃষ্ট করে। পণ্ডিতরা অবশ্য মনে করেন এইসব মন্ত্র-তন্ত্র আসলে এসেদের নানা উপজাতির বিদ্যমান লৌকিক আচার থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অনেক কবিতা প্রথম দিকে এইসব লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। পরে আর্য ও আর্বের ভারতের আদিবাসীদের সংস্কৃতিক সংলগ্ন থেকে বেদে এইসব মন্ত্র-তন্ত্রের উদ্ভব হয়ে থাকবে। সে যা হোক, বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় ধারায় মন্ত্রের বিজ্ঞানসার বিস্তার ঘটেছে। বহুসংখ্যক থেকে সরে এসে কবিতা এই ধারাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই সময়ে সেতুগের মানুষরা বুঝলেন যে বহুসংখ্যক নান আদ্য লাভই মানুষের অসুখ হওয়া উচিত।

বিশ্বপ্রণয়ের বৈচিত্র্য ও বিশালতাই তাঁরা অভিজ্ঞত হ্যায়েছিলেন, এই বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে তাঁদের সন্ধিৎসা ছিল। দুটি বিশ্বাত সৃষ্টের কিছু অংশের নিচের অনুবাস থেকে বৈদিক কবিরের এ-সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় মিলবে :

নাস দাসীয সূক্ত (৩ - ১০/১২৯) —

... কে জানে সে কথা আদিম বারতা?

কিরূপে ক্রম সৃষ্টি সব?

বিশ্ব প্রথমে, পরে তা সেবতা,

কে তবে জানিবে সে উদ্ভবত?

(প্যারীসাহেন সেনগুপ্তের অনুবাদ)

কোন সেবতা (৩ - ১০/১২১)

... বিপুল বিশাল সলিল আছিল কিম্বতরি,

সে-কল আগুনে জন্ম মানিল গর্তে ধরি,

তা' হতে জাগিল দেব-ব্রহ্ম যেই জন্ম নতি,

কোন সে সেবতা পৃথিবী আমরা প্রদানি হবি?

(এ)

“কইং সেবাদি হবিবা বিধেয়?” — এই জিজ্ঞাসাই মন্দির করেছে সেমুগের জ্ঞানপিপাসু কবিরের।

অর্থক বেদেও বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য নিয়ে বেশ কয়েকটি সূক্ত আছে। সৃষ্টিকর্তার বর্জন নিয়ে যে সংশয় কণ্ঠবেদে উদ্ভাস্ত অর্থক বেদে তার যেন কিছুটা নিরসন হয়েছে। কিম্বদন্তীরূপে কাল বা সময়, প্রশা, প্রজাপতি প্রভৃতি ধারণার প্রকাশ আমরা এতে দেখি। সূর্য বা বেহিত জগৎ ধারণ রূপে কল্পিত হয়েছে। এর সঙ্গে স্পষ্টতই আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার কিছুটা মিল আছে। সৃষ্টিতে সিসৃদ্ধ বা কালের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা হয়নি। অর্থক বেদের পৃথিবী সৃষ্টিতে (১২/১) তত্ত্ব চিন্তা ও কাব্যগুণের সমন্বয় ঘটেছে। মোট কথা, বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় ধারায়তে মানুষ নিজের জাগতিক দার্ঘ্যের বাইরে অন্য কথাও ভেবেছে।

বৈদিক যুগের সমাজ-ব্যবস্থায় চতুর্বর্ণ-প্রথার প্রচলন সম্ভবত আদর্শগত কারণে সমাজপতির্য ক'রে থাকবেন। বৈদিক বৃত্তির অনুবর্তন সম্ভবত এই শ্রেণী বিভাজনের হেতু। জন্মসূত্রে কবিভাগ্য বৈদিক যুগে তেমন কঠোর ছিল না। নইলে গৃহসময় ও বিশ্বাসিত্বের মত ক্রিয় রাক্ষ ক'রে ব্রাহ্মণ্য অর্জন করলেন। মহর্ষি চ্যাবন কি করে শাব্যত রাজার কন্যা সূকন্যার পানিগ্রহণ করলেন। কি করেই বা গোত্র পরিবারহীন সত্যাকাম গুরু কর্তৃক ব্রাহ্মণ বর্ণের অঙ্গভূত হলেন। এর থেকে কেহা যায় মানুষের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও বৃত্তি বর্ণের নির্যাক ছিল, জন্মসূত্র নয়। বৈদিক সমাজে এই বর্ণপ্রথা এবং ব্রাহ্মণ্য নিয়ে বিশ্বত আলোচনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব থাকলেও আপাতত সীমিত পরিসরের কারণে আপাতত বিরত থাকছি।

সেমুগেও ছিল পিতৃ-ভাত্তিক পরিবার। পিতার কর্তৃত্ব বৌধ পরিবারে ছিল সবচেয়ে বেশি। ভাত্তব্য বা (ভাত্তবুতো-বুডুতো ভাত্তি) একসঙ্গে থাকতেন। ভাত্ত বিরোধের ঘটনাও

অপ্রতুল ছিল না। পিতার অকর্তমানে পরিবারের দায়িত্ব পেতেন জ্যেষ্ঠপুত্র। জাতি-জাতীয়-কৃষ্ণ-বন্ধনের প্রতি বিশেষ সমাদর জাগনের কথা বেদে আছে। শুধু মানুষ নয়, মনুষ্যের প্রাণীর প্রতি স্নেহিত প্রদর্শনের কথাও বেদে বলা হয়েছে।

কন্যার চেয়ে পুত্রই, আভকের মতই, পিতামাতার প্রার্থিত ছিল। ‘পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাধ্য’ — এই ছিল সেমুগের মানসিকতা। নিয়োগ প্রথা (সন্তানহীন বিধবার সেরের দ্বারা সন্তান উৎপাদনের অধিকার) প্রচলিত ছিল (৩ - ১০/১৮/৭, ১০/৪২/২)। গেলন প্রেম, অবিধ সন্তান, অগম্যগমন — এ সবই আভকের মতই, বিদ্যমান ছিল। বেদে বর্ণপতীক পুরুষ ও বর্ণপতিকা নারীর উল্লেখ আছে। বর্ণিত ধর্মসূত্রে পুনর্বিবাহিতা নারীর গর্তজাত সন্তানের নানা অধিকারের কথা বলা আছে। এই ধর্মসূত্রে আরও বলা আছে যে দ্বী কলহপরায়ণা, পাপবিত্তা, এমন কি পরাপ্রহতা হলেও অত্যাজনীয়, ব্যক্তিচরিত্রী হলেও ক্রমার যোগ্য। আরও একটা বিধির কথা বলা এই ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যা ‘আভকের মানদণ্ডেও যথেষ্ট উনার ও আধুনিক। কোনো সামাজিক অপরাধের ফলে ব্রাহ্মকে পতিত বলে ঘোষণা করা যায়, স্ত্রীকে নয়। পতিত ব্যক্তির পুত্ররা পতিত ব'লে ঘোষিত হতে পারে। কিন্তু কন্যারা এই অনুশাসনের বাইরে (১৩/৪৭/৫১-৫৩)। কোনো বধ-প্রথা কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা পিতা না করলে সে নিজের পছন্দমত বিবাহ করতে পারে। এতটা সামাজিক মুক্তমনস্কতা সবেদে বৌদ্ধায়ন ও বর্ণিত ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে নারী কখনো স্বাধীন হতে পারে না। সে বাগো পিতার দ্বারা, যৌবনে স্বামীর দ্বারা ও বার্ষিক পুত্রের দ্বারা রক্ষিত।

চার বর্ণের অন্তর্বিবাহ থেকেই ক'ল সংকর তত্ত্বের উদ্ভব। অনুলোম ও প্রতিলোম — দুধরনের অসংক' বিবাহ সেমুগে হত। পাত্র উচ্চবর্ণজাত ও পাত্রী নিম্নবর্ণজাত বলে, তাকে অনুলোম এবং এর বিপরীতটিকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হত। এই অসংক' বিবাহের প্রচলন ভারতীয় ক'লপ্রথাকে অত্যন্ত কঠিন ক'রে তুলেছে।

সে যা হোক, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক শান্তি বিধান। কবি সন্তোষপ্রদায় নয় এই উদ্দেশ্যে রচিত অর্থক বেদের একটি মন্তব্য (৩/৩০) অপূর্ব অনুবাদ করেছে।

“এ গৃহে শান্তি ক্রমক বিরাজ যত্ন-চচন বলে পরমব্রহ্মকে থাকুক সকলে যুগা যুগে দৃষ্ট চলে। পুত্রে পিতার, মাতা-মুহিতার বিরোধ হউক দুঃ, পত্নী-পতির মধুর মিলন হোক আরও সুমধুর। ভায়ে-ভায়ে যদি ধ্বং থাকে তা' হোক আজি অবধান, ভগিনী যেন যোগ ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে মান। জ্ঞান জ্ঞান যেন কর' যখনে তোমো সকলের প্রাণ, নানা মন্তব্যের আওরাজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।”

গাহইয়া জীবনের শেষে অরণাকাসী হয়ে নীতিনিষ্ঠ নিরাসক্ত জীবন যাপনকে বানপ্রস্থ বলা হত। স্ত্রীক বানপ্রস্থী

হওয়া যেত। মনু বলেছেন (৬/২) যে গৃহস্থ যখন পত্নীরের সামর্থ্য হারানেন এবং তাঁর অপত্যের অপত্য হয়ে, তখন তিনি কানগ্রহ অকল্যাণ করবেন। বনে বাস আবশ্যিক ছিল না, তবে গৃহে নিরাসক্ত উপাসীন ভাবে জীবন যাপন করা প্রচলিত ছিল। বানপ্রস্থীর বিশেষ ধর্ম ছিল গুপ্তাচার। তপস্যার মাহাত্ম্য কণ্ঠবসে ও অর্থ বৈশি একাধিক সমাজ কীর্তিত্ব হয়েছে (১ - ১০/১৫০/৪, ১০/১৪৪/৬) এবং অ - ১১/৭/১। মনু-সংহিতাতে তপস্যার প্রচুর প্রশংসা আছে (১১/২০৫, ২০৯, ২৪২, ২৪৪, ১২/১০৪)।

চতুর্থ আশ্রম হল সন্ন্যাস বা যতি। উল্লেখ্য, বানপ্রস্থী না হয়েও সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণে সে যুগে বাধা ছিল না। সন্ন্যাস-কামী গৃহস্থ তাঁর সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করে যাবেন যাব একাশে দান করতে হবে ত্রাণকণ ও দীন পরিচর্যের মধ্যে। বানপ্রস্থীর গৃহপ্রদেয় ফেরার অধিকার ছিল না, কিন্তু সন্ন্যাসীর গৃহী হওয়ায় বাধা ছিল না। সন্ন্যাসীকে গৃহ-সম্পত্তি ও বিষয় কামনা ভোগের অস্বীকার করতে হবে, তিনি অধিসংসারত পালন করবেন, বর্ষাকাল ছাড়া কোনো গ্রামে এক রাত্রির বেশি কাটাবেন না, গ্রাণধারণের জন্য যা প্রয়োজন তাই আহার করবেন, ভূমি শয্যা গ্রহণ করবেন, মৌমী থাকবেন এবং বৈরাগ্য ও সত্যকে আশ্রয় করবেন। সন্ন্যাসী হবেন পরিভ্রাঙ্ক, হবেন অনিক্ষেপ। সন্ন্যাস-আশ্রমেরও ত্তরভেদ ছিল — কুটীচক, বহুদক, হস ও পরমহংস (শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ভট্টব্য)। পরমহংসই প্রকৃত ব্রহ্ম বা আত্ম-জ্ঞানী।

বৈদিক যুগের কণ ও আশ্রম-প্রথার পরে আসে সমাজ শৃঙ্খলার বিষয়ে আলোচনা। বৈদিক যুগে 'ধর্ম' কথাটি আইন বোঝাতে ব্যবহৃত হত। সেযুগে সমাজ-বিরোধী কাজ নেহাত কম হত না। হত্যা, দস্যুতা, অপহরণ, প্রতারণা বর্ধি ছিল। এসব সমাজবিরোধী কাজের জন্য শাস্তির সঙ্গে কতিপুর্ণ সেওয়ামের রীতিও ছিল। কণশোধ না দিলে অপরাধীকে একটি ম্রণম বা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া হত। রাজা ছিলেন দণ্ডদাতা কিন্তু তিনি নিজে দণ্ডনীয় ছিলেন না। রাজ্য, ব্যাভিচার, অগম্যাগমন, জগ্নহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি অপরাধও সেযুগে হত। ওগুলির কোনো কোনোটির জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হত। কণ সংক্রান্ত দৃষ্টি ভঙ্গের কথাও বৈদিক সাহিত্যে আছে। বাক্সনদের সংহিতায় বামী, প্রতিবাসী ও মধ্যস্থের (এখনকার 'আরবিট্রেটর') কথা আছে। নৌতম ধর্ম সূত্রে আছে, নিকিত ও মান্যপা ব্যক্তি অপরাধ করলে পদ্যের তুলনায় তাঁকে দ্বিগুণ শাস্তি দিতে হবে। মৃতের সম্পত্তি-বিভাজনের রীতি ও বিধির কথা ধর্ম সূত্র সমূহে আছে।

আসলে মানুষের প্রকৃতি অতীতে এদেশে যেমন ছিল, বর্তমানে তার ইতিবিশেষ হয় নি। জুয়া সেযুগেও ছিল, বিশেষ করে পাশা খেলা নিয়ে। কুর্জির প্রকৃতির মধ্যে যে দ্রুত ক্রিয়ার কথা মহাভারতে আছে, তার অরণ্য বৈদ্যের যুগেও পাশা নিয়ে জুয়া কেলার প্রচলন ছিল। কণবৈদ্যের বিখ্যাত অঙ্ক সূক্তটিতে এক দ্রুতাসক্তের অনুশোচনা বিদ্যুৎ হয়েছে। এই সূক্তটির অংশ

বিশেষ এইরকম —

'অগ্নি যখন ভাবি আর পাশা খেলব না, তখন খেলার সঙ্গীদের এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করি। কিন্তু ছকের ওপর শিল্পক বর্ষের পাশাপাশিকে সেখানে আমার মাথা ঠিক থাকে না। যেমন হঠাৎ নারী উপনপতির কাছে যায়, আমিও তেমন খেলার সঙ্গীদের বাড়িতে চলে যাই। (১০/৩৪)। এমন কি বিধবারাও অর্থ উপার্জনের আশায় মৃত্যুকাল্যে যেত (৩৭ - ১/২৪৪/৭)।

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বৈদ্যের যুগের সমাজে মূল্যবোধ সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। মানুষ যতই সত্য ও প্রগতিকামী হোক না কেন, তার অন্তর প্রকৃতির বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। সে একদিকে উপাধ, মুক্তমনা ও যুক্তিপন্থী অন্য দিকে অনুদার, সংকীর্ণচেতা ও স্বার্থসন্ধ। এই দ্বিচারিতা মানুষের মজাগত। সে একদিকে যেমন নীতিপরিচয়, সুমনস্ক ও সত্যনিষ্ঠ, অন্যদিকে তেমনই দুর্নীতিগ্রস্ত, ব্যভিচারী ও অসৎ। আজ আধুনিক সভ্যতাগর্ভী সমাজে আমরা যা 'সেখি, বৈদ্যের যুগেও মানুষের মানসিকতা একই ধরনের ছিল। স্বর্জনের মনস্তত্ত্বের আলোকে বৈদ্যের মধ্যে কেবলই উচ্চ তত্ত্ব, জিজ্ঞাসা ও উপেক্ষার উদ্ভাস ঘটেছে, এটা সর্বাবশেষে সত্য নয়। বৈদ্যের মধ্যে অতি নগণ্য বিষয়েরও অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু এইসব সাধারণ বিষয়ের উপস্থাপনাই বৈদিক সাহিত্যকে সেযুগের অসামান্য সামাজিক দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বৈদিক সাহিত্য একাধারে মানবিক। সেযুগের অধিকাংশ মানুষ চাইত নির্বিঘ্ন, সুস্থ, শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন। তার অসহায়ত্বই তাকে কদম্ব করনা, অভ্যচারিক ও ঐশ্বর্যজালিক ক্রিয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাববীর্য প্রগতির যুগেও আমরা কি আমাদের আচরণকে অধৌক্তিক ও নির্বিচারে আচার ও সন্তোষের বশত থেকে মুক্ত করতে পেরেছি? মোহ ও গুণ, পূর্ণতা ও বিভ্রাতি, কামনা ও নিঃস্পৃহা, দুর্নীতি ও দুর্নীতি, সত্য ও মিথ্যা, জাগ ও ভোগ, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়েই মানব-জীবন, যার মধ্যে, অনুসৃত তাঁর মূল্যবোধ, 'ইষ্ট' ও 'দ্বিষ্ট'। বৈদিক কবির চোখেছিলেন মানুষের সত্য যেন ক্রমবিকাশের পথে পূর্ণতা পায়, চেয়েছিলেন সমমনস্ক সমভাবাপন্ন হয়ে মানুষ নির্বিঘ্ন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ গড়ে তুলুক। কণবৈদ্যের সংজ্ঞান সূক্তে (১০/১৯১/২-৪) তারই অস্ত্রাত্ত আভাস:

সমাদী ব আকৃতির সমাদী হনয়ানি যঃ।
সমানমস্ত্বে বা মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

তোমাদের আকৃতি (সত্ত্ব), তোমাদের হৃদয়, তোমাদের মন সমান হোক। যাতে তোমাদের পরম ঐক্য সাধিত হয়, তাই হোক। এরই মধ্যে অনুসংহিত আছে বৈদিক মূল্যবোধের ভিত্তি।

কণ স্বীকার : কেবলমী - চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীমোহন সেনগুপ্ত (২) 'অনুর কণিষ্মধর্ম' - দ্বীরেন্দ্রনাথ দত্ত (৩) ভারত-ইতিহাসে বৈদিক যুগ - নরেন্দ্রনাথ তর্জাচার্য।

আর্য-অভিমান ও ইতিহাস-চর্চা

প্রসেনজিৎ চৌধুরি

ইতিহাসের পুনরীক্ষা নিয়ে সন্দেহ। অবশ্য এই পুনরীক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত নির্মোহ যুক্তি ও তর্কাতীত তথ্য। এই শর্ত মেনে চললে মুক্তমনা ঐতিহাসিক নিচের নতুন ব্যাখ্যাকে সানন্দ স্বীকৃতি জানাবেন। তবে অশ্ব ও অতুলনীয় আর্য 'জাতি'-র গৌরব প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করার উদ্দেশ্যে যখন ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করে অকৃত তথ্য ও উদ্ভট তত্ত্ব সগর্বে উত্থাপন করা হয়, তখন তাকে আর্য-কেন্দ্রিক অজ্ঞতা বলাই সমীচীন:

আর্য-মাহাত্ম্য প্রচারের অত্যাধুনিক অভিমান উনিশ শতকের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল। ঐতিহাসিকরা যাকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। তার একটি বৈশিষ্ট্যই ছিল এই আর্ঘ্যভিমান। এই অভিমানের উলস উগ্রতাকে বিজ্ঞপন্বিত করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :^১

মোকমুলর বলেছে 'আর্য',
তাই তনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি গয়ে।
মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক,
আমরাও তাই — করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাকি বলে থিক্‌ তারে থিক্‌,
শাপ দি পইতে ছুঁয়ে।

সম্প্রতি আবার আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতির মাহাত্ম্য স্বীকৃতির উদয় প্রকৃতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন। যেমন পৈরিকীকরণের যে প্রকাশ্য বা গোপন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তারই এক অচ্ছেদ্য অংশ এই আর্ঘ্যভিমান। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের ঐক্যবর্ধনীয়বিশেষত উপনীত হয়েছিল — এই বক্তব্য আর্ঘ্যভিমানের এক কল্লপ্রচারিত বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকে শপথের তর্কচর্চামণি ও দরুনাম সরস্বতীর পুনরুত্থানপরী প্রচারে এই কল্পনাশ্রয়ী বক্তব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। হিন্দু পুনরুত্থানবাদীরা ইদানীং এমন দাবিও সদস্ত করেছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বসৃষ্টির 'বিগ বেং' ভবের নিগূঢ় রহস্য আসলে আর্য কবিমুনিরা প্রাচীন ভারতেই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের মতে কম্পিউটারের যে দুই সংখ্যাবিশিষ্ট গননা পদ্ধতি — তার উদ্দেশ্য পাওয়া যায় প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে। এইসব মূর্তের সমর্থনে কোনো প্রামাণ্য তথ্য উদ্দেশ্যের কিন্তু বলাই নেই। আত্মপ্রাধান্য এই প্রকার অত্যাধুনিক প্রমাণ ছাড়াও আর্য সমাজ ও সভ্যতার অতুলনীয় প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংশ্ল

নির্মিত কতগুলো অতিকথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচার করা হয়। ইতিহাস-পুনর্নির্ধারনের পরিকল্পনা সন্ধানত একটি পুথিকায় বলা হয়েছে : '... the antiquity of Bharat runs into 197,48,67,097 years.' এই উদ্ভট দাবির সপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক বা অন্য কোনো ধরনের প্রমাণ কি আছে? যারা আজ ইতিহাস পুনর্নির্ধারনের কথা বলছেন তাঁরা সাক্ষ্য-প্রমাণ বা যুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন না। আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে তথ্যের অভাব হলে তাঁরা 'তথ্য' নির্মাণ করে নিতেও প্রস্তুত।

আর্য্যার বহির্ভারত থেকে এসেছিলেন — এই বক্তব্য যদুনাথ সরকার, রবেনচন্দ্র মজুমদার, সুমিত্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো ঐতিহ্য-অনুপ্রাণী পণ্ডিতরাও সমর্থন করেছেন। সম্ভ্রতি কিছু লেখক কোমর বেঁধে লেগে গেছেন এই বক্তব্যের অগুহতা প্রমাণ করতে। আর্য সংস্কৃতিকে আনেকেই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আধার বলে গণ্য করেন। তাই এই সংস্কৃতির বাহকদের ঐতিহাসিক ভাবে বহিরাগত বলতে অনেকেই কৃষ্টাবোধ করেন — এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ভাষ্য্য, হিন্দুত্ববাদীরা প্রমাণ করতে বদ্ধ পরিকর যে ভারতবর্ষ (= হিন্দুস্তান) আর্যদের শিকড়মূহ। জনৈক লেখকের^২ উক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে : 'পরিব্রাজক ভারতের অসিদ্ধমত বসিন্দা আর্য্যার, কেননা তাঁরা ১২৭, ২৯,৪২,০৮৬ বৎসর পূর্ব হতে এই দেশে বাস করেছেন।' ইতিহাস-চর্চার নামে কী ধরনের নাকুত-নাশুত কাহিনী আর্ঘ্যভিমানী লেখকের রচনায় স্থান পায় তার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই উক্তি। কলা বাজ্যা, হিন্দুত্ববাদী লেখকরা শুধু প্রাচীনত্ব দাবি করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তাঁরা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার নেপথ্যেও আবিষ্কার করেছেন আর্য প্রত্নতার অধিতীয় অবদান।

ভারতীয় সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি : সমন্বয়ের ইতিহাস। বহু হিন্দুত্ববাদী লেখক কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের এই দিকটিকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন। তাঁদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে আর্যদের গতির ম'শাই। এই প্রসঙ্গে বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে নাকচ করে আর্য-আধিপত্যকে প্রস্তর দেওয়া একটি তথ্যের উল্লেখ করা যায়। হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আর্য-অভিভাবের কাহিনী পুনরায় সিঁধতে গিয়ে জনৈক লেখক বলেছেন : 'আর্য আশ্রয়িত্য বৃষ্টান-মুসলমানদের বাদ দিয়ে আসমুদ্র হিমালয় ভারতবর্ষের পর্বত ও সমতলে বাস করা সকল সমতলবাসী, কনবাসী, পাহাড়বাসী আর্য বংশধর।' ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই উক্তি

ভারতের বর্ণাশ্রম জনজাতীয় সমাজ-সংস্কৃতির স্বাভাবিক-বর্কীয়তাকে অস্বীকার করার প্রচ্ছন্ন প্রবণতা বিদ্যমান। (সবাইকে আর্থব্দ প্রদান করে একশৈলিক [monolithic] আর্থ সমাজের ধারণা প্রচার করার প্রেরণাও সম্ভবত এই উক্তির পেছনে সক্রিয়।) ভারতের সমতল ও পাহাড়ে যুগযুগান্ত থেকে বাস করা অনার্য জনগোষ্ঠীসমূহকে “আর্য-বংশধর” স্বীকৃতি দিতে গিয়ে লেখক বেশ মজার যুক্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে আর্থরা ভারতের আদিবাসী, যদিও খৃষ্টপূর্ব ২,০০০-১,৫০০-এর মধ্যে আরিয়ান (Aryan) নামক একটি অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করে। খুব সম্ভব, এই অসভ্য আরিয়ানদের আক্রমণের কালে কতগুলো আর্য জনগোষ্ঠী জঙ্গল ও পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সমতলের আর্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এই পলাতক আর্য গোষ্ঠীগুলোকেই আজ ‘টাইবেল’ বলা হয়। এই প্রকার আর্থভূগোলিক বক্তব্য থেকে একটা অনুমান আমরা করতে পারি: ‘হিন্দুত্বপন্থী’ কিছুদিন পর নৃতত্ত্বেরও পুনর্নির্ধন দাবি করবে।* হিন্দুত্বপন্থী লেখকের এই যুক্তি সত্যিই উদ্ভট। ইতিহাস বা নৃতত্ত্ব কোথাও এই তথ্য-বিকৃতির সামান্যতম সমর্থন নেই। অবশ্য এই কথা বলা বাজ্য যে, যারা আর্থ-অভিমান প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে অতীত-চর্চায় প্রতী তাঁরা ইতিহাসকে বিকৃত এবং সভ্যকে গোপন করতে কখনো কৃষ্ঠাবোধ করেন না। কিছুদিন পূর্বে এন. এস. রাজারাম ও এন. কা ‘The Deciphered Indus Script’

শীর্ষক একটি বই লেখেন। এই বই-এ তাঁরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে হরপ্পা সভ্যতা আসলে আর্থ সভ্যতা। এই বক্তব্য প্রমাণ করতে তাঁরা এমনভাবে তথ্যকে বিকৃত করেছেন যে দুজন মার্কিন পণ্ডিত বলতে বাধ্য হয়েছেন ‘The Deciphered Indus Script is based on blatantly fake data.’ এই প্রকার সমালোচনার প্রতি হিন্দুত্বপন্থী লেখক/ঐতিহাসিকরা নির্ভীক। তাঁরা আসলে নিজের রাজনৈতিক-সামাজিক ডাকনামের সমর্থন বোঝেন অতীতের বৃকে এবং এই প্রচেষ্টায় তাঁরা উদ্ভাবন করেন বিভিন্ন কিছু অতিকথা (myth)। আর্থ সভ্যতার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা এবং অবিধাষ্য প্রাচীনতা প্রচার করতে তাঁরা যে ‘ইতিহাস’ লেখেন তা আসলে মিথ্যাময় ‘মিথা’প্রতী কাহিনী।

তথ্যসূত্র

- ১) হইব্রুজরনালী, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮৩
- ২) Akhil Bharateeya Itihas Sankalan Yojna : Concept and Working, New Delhi, n.d.
- ৩) দ্বিতী বিশ্বাসন্য সরকারী, আর্থ সমাজের আদি বেশ, পৌষাট, ১৯৮৭, (অসমীয়া অনুবাদ)
- ৪) মনুসংগ্ৰহ ভাষ্যত্রয়, অম্বার পরিচয়, (অসমীয়া), কলকাতা, ১৯৯৭
- ৫) M. Witzel and S. Farmer, ‘Horse play in Harappa : The Indus Valley Decipherment Hoax’, Frontline, 13 Oct. 2000

শৈলী

ভা লো ছা পা র জন্য

অফসেট • কম্পিউটার টাইপ সেটিং • গ্রাফিক্স ডিজাইন • সিল্ক স্ক্রীন

৪এ, মানিকতলা মেইন রোড,

কলকাতা-৭০০ ০৫৪

ফোন : ৩৫২-২২৬৩ ফ্যাক্স : ৩৫১-৯৮৫৫

ই-মেইল : sailee@cal3.vsnl.net.in

ধর্ম ব্যবচ্ছেদ

দুলাল বিশ্বাস (চার্বাকানন্দ)

ধর্ম কী, সত্যই বা কী? বৌদ্ধ নেওয়া যাক দুইয়ের ব্যুৎপত্তির। ধু ধাতুর উত্তর ম যোগে ধর্ম। ধু ধাতুর অর্থ ধারণ করা। অর্থাৎ ধর্ম সেই জিনিস, যা ধারণ করে আছে মানুষকে। কার্যত কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানুষই ধারণ করে আছে ধর্মকে। প্রথম অর্থে বোঝা যাচ্ছে— ধর্ম আপনে সেই প্রকৃতি, যা সৃষ্টি করেছে মানুষকে, এবং পালন পোষণও করে চলেছে তাকে। দ্বিতীয় অর্থে মানতে হয়— মানুষই সৃষ্টি করেছে ধর্মকে তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে। প্রথমটিকে অতএব বলা যায় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ধর্ম, দ্বিতীয়টিকে প্রতিষ্ঠানিক বা গড়াপেটা ধর্ম। এক কথায় প্রথম ধর্মটি ধারক, দ্বিতীয়টি ধৃত। আমাদের আলোচ্য এই ধৃত অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানিক ধর্মই। মানুষগড়া যে প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্ম নির্ভরশীল। সেই প্রতিষ্ঠানের আর এক নাম যদি হয় সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম সেখানে অভিহিত হতে পারে সাম্প্রদায়িক ধর্ম হিসাবেও।

আর একটু বক্তব্য আছে ধর্ম সম্পর্কে। ধর্ম কথটির ইংরাজি প্রতিশব্দ Religion। কিন্তু ওটা শুধু প্রতিশব্দই, প্রতিবস্ত বা বিকল্প নয়। ধর্ম শব্দের ভারতীয় অর্থ জীবনযাপন পদ্ধতি, কিন্তু রিলিজিয়ন কেবলমাত্র উপাসনা পদ্ধতি। বট্রান্ড রাসেল এইজন্যই বোধকরি বলেছেন—ইউরোপ ধর্মকে কেবল গ্রহণ করেছে, অবলম্বন করেনি। রিলিজিয়ন তাই পুরোপুরি ধর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। রিলিজিয়ন অতএব ধর্মের একটা অঙ্গ মাত্র, সবটা নয়।

মানুষ তার ভালো-মন্দ, সুখ-সমৃদ্ধি, স্বার্থ-পরমার্থ, নীতি-নিরাপত্তা বিবেচনা করে গড়ে তুলেছে ধর্মকে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেও। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, মাটি-জল-হাওয়ার ওপে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান তথা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম, ইহুদি, বাহাই, শিখ, শিটো, কনফুসিয়াস ইত্যাদি কত নামের ধর্মই না গড়ে উঠেছে পৃথিবীতে।

আর সত্য? সত্য কথটার ব্যুৎপত্তি—অস্ ধাতু + অং = সং। সং + য = সত্য। অর্থ— প্রকৃত, বাস্তব, অখণ্ড বিশিষ্ট। দেখা যাচ্ছে, সত্যের সঙ্গে ধর্মের যে অংশের সম্পর্ক, সেটাই প্রকৃত, অর্থাৎ স্ব-ভাব। ক্ষুধার্ত খাদ্য খোঁজে, তৃষ্ণার্ত জল খোঁজে, আত্মীয় ছোটো আত্মীয়ের খোঁজে, শত্রু কাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষার জন্য চলে আক্রমণ অথবা পলায়ন।



এইগুলিই মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম, স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম। এগুলির যথার্থতা বা বিদ্যমানতা সম্পর্কে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। বরং এগুলির সঙ্গে মিল খোঁজা হয় বস্তু বা পদার্থের ধর্মের সঙ্গে। এই যেমন— লবণের স্বাদ লবণাক্ত, চিনির স্বাদ মিষ্ট, অগ্নি বিকীরণ করে উত্তাপ এবং বরফ শৈত্য। এসবই সত্য, এবং প্রাকৃতিক সত্য। প্রাকৃতিক ধর্মও বলা চলে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম? কতটা সত্য প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের? কতটা স্বাভাবিক, কতটা সার্বজনীন? স্বভাবধর্মই নিহিত যে সত্য, তা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, অচ্ছেদ্য। প্রতিষ্ঠানিক ধর্মে কোথায় এহেন অবিচ্ছিন্নতা, অপরিহার্যতা?

আইনস্টাইনেরই এক বিখ্যাত উক্তি— বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান খপ্পর। এই উক্তির দ্বারা, আমার মনে হয়, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ধর্মীয় মৃত্যুতা তথা ধর্মাক্ষতা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন মুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তার। অপরপক্ষে মানবকল্যাণে সক্রিয় হতে হলে বিজ্ঞানেরও

প্রয়োজন নীতিসমৃদ্ধ ধর্মীয় প্রেরণার। আইনস্টাইনের এই উক্তিতে আর যাই থাক, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধর্মের প্রতি কিছুমাত্র মোহের প্রকাশ নেই, নেই কোনো সাম্প্রদায়িক ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যও। ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার এবং মানবহিতৈষ্যতার উত্তরাধিকারই ব্যক্ত বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর এই উক্তিতে।

ধর্মওযাঙ্গা বা এমিকে মুখিই আছেন— যেখানে কোপ সেখানেই কোপ মারবেন এবং ভূত অবিচার করবেন বলে। ফলে বিজ্ঞানকে বীরা ভয় করেন যমের মত, এবং তাকে প্রতিহত করতে আশ্রয় নেন নানা অশ্ববিজ্ঞানের, তাঁরাও বাকবলে করছেন আইনস্টাইনকে ব হ হ বিজ্ঞানের সমর্থনে। ধর্ম ওকুলের বাগাড়ম্বরে শেখপর্বত আছা রাখা যায়নি বলেই সম্ভবত তাঁদের আলয় বৃক্ষতে হয়েছে বৈজ্ঞানিকদের ছত্রছায়ায়।

ধর্মের এই বিপথগামিতার একটা কারণ তার বয়স। অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের। ধর্মের প্রথম সৃজন ঘটছে প্রয়োজনের তাগিদেই। প্রতিবেশী পশুকুলের হিংস্রতা এবং প্রতিকূল প্রকৃতির ভীষণতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রাকসভ্যতার যুগ থেকেই মানুষ হতে চেয়েছে দুখবদ্ধ। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই যুগ পরিণত হয়েছে গোষ্ঠীতে, এবং গোষ্ঠী সমাজে। ভৌগোলিক তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে সমাজব্যবস্থায় ঘটতে থাকে ক্রমিক বিবর্তন। সভ্যতার ক্রমবিকাশ: সংস্কৃতি এই সভ্যতাই চলিছে অংশ। চলতে চলতে পায়ে পায়ে যেমন তৈরি হয় চলার পথ, সংস্কৃতির পথও তেমনি তৈরি হতে থাকে ভাবায়, ধর্মে, শিক্ষায়, শিল্পকলার অগ্রগতিতে। যা কিনা সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার সঙ্গে। গোড়ার দিকে এগুলি চিহ্নিত ছিল না আলোচনা ভাবে। ক্রমে সভ্যতার বয়স যত বাড়়ে, বাড়়ে সংস্কৃতির বয়সও। সেই সঙ্গে ধর্মের বয়সও। সংস্কৃতির অন্যান্য শাখাগুলির মত ধর্মেও ঘটতে থাকে বিবর্তন, পরিবর্তন। বিভাজনও। সেখা সেখা যত মত তত পথ, ভাত্তরিক সাম্রাজ্য। ক-এর ধর্ম, খ-এর ধর্ম, গ-এর ধর্মে ঘটে বিচ্ছিন্নতা, বিভিন্নতা। চেহারায সঙ্গে চরিত্রও পা-টাতে থাকে ধর্মের।

‘যত মত তত পথ’ কথাটা আলোচনার দাবি রাখে। নানা দেশের, নানা সভ্যতার, নানা সংস্কৃতির জীবনযাত্রা এসে বিশেষে যে দেশের ভূগোলে, ইতিহাসে, সে দেশের ঐতিহ্যে কথাটা অবশ্য নতুন নয়। নানা ধরনের নানা রোগ যেমন সৃষ্টি করেছে সমস্যা, দিয়েছে সমাধানের ইঙ্গিতও। যুগে যুগে এদেশে জন্মেছেন উদারপ্রাণ মহাপুরুষবল, ওনিরেছেন সমন্বয় এবং সহিষ্ণুতার বানী। কিন্তু কালসয কুটীলা গতি ধর্মকে মূক্ত হতে যেতনি জটিলতা থেকে। এখানে কথাটা নতুন করে যিনি ওনিরেছেন, জটিলতার নিরসন করেই ওনিরেছেন। কিন্তু

জটিলতা তাতে কমেনি। কারণ, বাস্তবে যেসব ধর্মমত এখন চলছে তারা নিছকই জানে না নিজ নিজ পথের ঠিকানা। বাস্তবে তাই সেখা যায় যত মত তত ধাঁধা, যত পথ তত কাধা। তুলনার জন্য অন্য একটি ক্ষেত্রের অন্য একটি বিষয় এখানে তোলা যায়। বিষয়টি অতিশয় জনপ্রিয় একটি স্রোগান। ঐ স্রোগান বলেছে— দুনিয়ার মজদুর এক হও। মজদুরগণ কড়টা এক হয়েছেন তাঁরাই বলতে পারবেন, কিন্তু তাঁদের ইটনিয়নগুলিতে সংখ্যা এবং অনৈক্য ক্রমশ যে বেড়েই চলেছে। যদিও তাঁদের কাণ্ডার বা সর্বত্রই প্রায় এক। এই একই ভাবে ঈশ্বর এক এবং অধিতীয়— এই স্রোগান গিরোধার্য করেও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা সাম্প্রদায়সমূহ তাদের সংখ্যা বাড়িয়েই চলেছে। মত ও পথের এই অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাবৃদ্ধি বহন করছে কীসের ইঙ্গিত— সমস্যার ইতিব, না বিবৃতির?

ফেরা যাক আগের প্রসঙ্গে — সেই বয়সের প্রসঙ্গে। সেই সঙ্গে তোলা যাক আর একটি তুলনা। ধরা যাক পাঁচ বছরের এক শিশুর জন্য তৈরি একটি জামা। জামাটি দামি কাপড়ে তৈরি এবং সেটি তৈরি করেছে এক দক্ষ কারিগর। শিশুর গায়ে জামাটি বেশ মাপসই এবং মানানসইও। যার গায়ের জামা সেই শিশু ক্রমে হল কিশোর এবং সেই কিশোর ক্রমশ যুগক। কিন্তু যেহেতু জামাটি তৈরি দামি কাপড়ে এবং দক্ষ দর্শির হাতে, পরকর্তী বয়সে তার দেহের আয়তন শিথল, চতুর্থণ হলেও বরাবরের জন্য সে পরতে চাইল ঐ একই জামা। কিন্তু বাস্তবে সেটা সম্ভব কি ?

সময়ের সাথে সভ্যতা পাণ্টাচ্ছে, সমাজ পাণ্টাচ্ছে, সংস্কৃতি পাণ্টাচ্ছে। যুগের ভাষা—ভাও পাণ্টাচ্ছে। পাণ্টাচ্ছে, তার মানে এগোচ্ছে। সবকিছুই এগোচ্ছে সময়ের সাথে তাল রেখে। এগোচ্ছে না কেবল বুদ্ধি ঐ ধর্ম। সংস্কৃতির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যাত্মকী তার শাখাগুলির রূপান্তরও। এই রূপান্তর যারা মানছেন না, থেকে যেতে চাইছে একই ভাষায়, অথবা চাইছে শেখনে ঘিরে যেতে, আত্মকের পরিভাষায় তাদেরকেই বলা হচ্ছে মৌলবাদী। শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ পার হয়েও মৌলবাদীরা ধর্মকে টানছে নাকি তার মূল্যের দিকে। ঐ পঞ্চাশদুর্বীনতাও বিপত্তির এবং বিপথগামিতার অন্যতম কারণ ধর্মের।

যুগে ঐশ্বরের কথা যতই বলুক, অন্তরে বিচ্ছিন্নতার বীজ থাকেই ধর্মের। একমুখে সে যখন বলে— ঈশ্বর এক এবং অধিতীয়, সব মানুষ সেই ঈশ্বরের সন্তান—অন্যমুখ তখন আওড়াতে থাকে—আমরা পবিত্র, তোমরা পানী। আমরা পুণ্যায়, তোমরা পাপও। আমরা মহান, তোমরা স্রেচ্ছ। আমরা ইমানদার, তোমরা কাফের। তাকিরে দেখুন শিক্ষাডতন,

শিল্পনিকেতন, ক্রীড়াসনের দিকে— কেমন বসেছে মিলনের মেলা! উৎসব, আনন্দ, কলরব! এবার বলুন সকলকে— যাও তোমরা, হাজির হও উপাসনালয়ে এবং অংশ নাও ধর্মনিষ্ঠানে। বাস, হয়ে পেল! মিলনের ব্যস্ততা বন্ধিয়ে তখন কেউ ছুটল মন্দিরের দিকে, কেউ মন্দিরের দিকে, কেউ গির্জায়, কেউ গুরুদেয়ারায়। কেউ গুরুদেয়ারায়। কেউ সিনাগগে। সকলের জন্য সব উপাসনালয়ের দ্বার খোলা থাকে না, বলাই বাহুল্য। উপাসনার পদ্ধতিও সকলের সমান নয়। ঘাঁষ উদ্দেশ্যে এই উপাসনা সেই উপাস্যের ভাবমূর্তিতেও বেজায় ফারাক। ধর্ম এখানে সহজেই শিকার সংকীর্ণতার, বিচ্ছিন্নতার। ইচ্ছার পর ইচ্ছন জুগিয়ে ধর্মও রাসলাস। এই জিনিসটাকে করে তোলে আরও উগ্র, আরও উত্তপ্ত। আরও শণিত। ধর্মাত্মতার ঢাল এক হিসেবে তরোয়ার একই সঙ্গে যখন ওঠে মানুষের হাতে, মনুষ্যত্বের সর্বশাসন তখন খনিজে আসতে ঘেরি হয় না মোটেই।

ধর্মকে যদি ধরা যায় একটি মুদ্রা, তাহলে যে শিটটা তার হেড, সেই শিটে থাকবে মেহ-মমতা, প্রেম-ভালবাসা। যে শিটটা টেল, সে শিটে থাকবে ঈর্ষা-রেষ, হিংসা-হানাহানি। একপিতে থাকবে জীবের দয়া, ভ্যাগ, সেবা। অন্যপিতে লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা। অর্থাৎ, মানুষের ভাবাবেগ বা আছে, তাই আছে ধর্মের বহুভাব। এই মানুষই একেক সময় দু'থেকে কাতর হয় অন্য মানুষের দৃষ্টিতে। আবার এই মানুষই সেবার সাহসেও পিশাচ হয়ে ওঠে বলির খড়্গ হাতে পেলে। এসবই চলে ধর্মের নামে। ধর্মের প্রেরণাতেই একশ্রেণীর মানুষ আত্মনিয়োগ করে আত্মের সেবায়, আত্মের গুজরায়। আবার একশ্রেণীর মানুষ ঈপিয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, নৃশংস হত্যাকাণ্ডে। কাজেই স্বীকার করতেই হচ্ছে ধর্মের সভ্যতা, শোভনতা, কোমলতা যেমন আছে, অসভ্যতা, বর্বরতা, কর্কশতাও আছে। উর্ধ্বপতন যেমন আছে, অধঃপতনও আছে।

অধঃপতন সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে যৌনাচার বা যৌন-উচ্ছ্বলতা আসবেই। যৌনাচার সম্পর্কে ধর্মের নির্দেশ বহুদূরী হলেও প্রধান যে দুটি মত, তারা পরস্পর বিরোধী। এক মত চায় যৌনাচার সম্পূর্ণ বিনাশ বা দমন। অন্যমতে, বলতে গেলে, যৌনতাই প্রধান অঙ্গলক্ষণ। শাস্ত্র আছে— বীরধারণ ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্ম শব্দের অন্যতম অর্থ বীর্য। বীর্যের নিষ্ক্রিয়তাই আদর্শ এই মতাবলম্বীদের কাছে। কঠোর সংযম, ভ্যাগ এবং কৃচ্ছতার মাধ্যমে পালন করতে হয় এই ব্রত। এদের একটা বড় গ্রন্থই গ্রন্থন করেন সন্ন্যাস। কং সন্ন্যাসী আবার স্বরোপাসনার শুধু নয়, মানুষের সেবাজেও উৎসর্গ করেন নিজেদের। সন্ন্যাসকে সকল দেশেই তাই দেখা হয় প্রাচীর চোখে। যে যুগে জন-সংযোগ এবং রাষ্ট্রীয় সেবাকর্মের ছিলনা এতটা প্রসার এবং

ব্যাপকতা, সে যুগে ভ্যাগী, সেবাপ্রতী সন্ন্যাসীদের ছিল বিশেষ একটি ভূমিকা।

তবে একথাও ঠিক, মহত্ব তথা মহান ব্যক্তিত্ব কেবল এই সন্ন্যাসীদের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। সন্ন্যাস নেননি, ব্রহ্মচারী হননি এমন কং মানুষের মধ্যেও আমরা পেয়েছি কং প্রতিভাবান এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্বকে। তাঁরা অনেকটাই ছিলেন য য় কেন্দ্রে দিকপাল। সর্বজনবিদিত এইসব নামের তালিকায় বিবেকানন্দকে রাখা যাচ্ছেনা টেকনিক্যাল কারণে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ দত্তকে আমরা যদি রাখি সেখানে? যে প্রতিভা, দ্রষ্টা এবং অহেমা নিয়ে নরেন্দ্রনাথ কাজেছিলেন, বিবেকানন্দর পাত না করলে তার সব বার্থ হয়ে যেত? শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যর তাঁর চলার পথে অন্য একটা দিশা খুলে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মূল চলচ্চিত্র তো নিহিত ছিল সেই নরেন্দ্রনাথেরই। বিবেকানন্দ যখন বলেন— বীতশাশ্রী আপেক্ষা সূত্রেলা বেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে — তাঁর সেই কণ্ঠে নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ ভি ধ্বনিত হয় না? হাম্মিজির দুর্গভ উক্তিওতির মধ্যে আরেকটি : 'যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিশ্ববাস অশ্রমোচন করতে পারে না অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরো রুটি নিতে পারে না, আমি সে ধর্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাস করি না।' এই উক্তির শিছনে বেশি করে আছেন কে — ঈশ্বর-অস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ, না সত্যেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথ? নববীপের শ্রীচৈতন্যের বঙ্গোত্তেও কলা যার এমন কথাই। নিমাই পণ্ডিতের প্রতিভা এবং পণ্ডিত্য কি কোনো অবদানই জোগায়নি তাঁর চৈতন্যোদয়ে? উপদান জোগায়নি নীলাচলে মহাপ্রভু অর্জনে? পথ, তবে পালা সড়ক নয়। সহজিয়া বা অধোরপহীসের মত বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক মতের কিছু শাখা এই পথের পথিক। বহমানতা হারিয়ে ভারতে বৌদ্ধধর্ম যখন আবদ্ধ আচারের মক্কাবানুরণিতে, ঐ ধর্মের একটি শাখা মহাবানপহীরা ডুবে যায় যৌনাচারের মগ্নসোতে। ভৈরবতন্ত্রের মত তান্ত্রিকমতে তো বটেই, বৈষ্ণবমতেও কোথাও কোথাও কামাচার প্রবেশ করে তাদের ছন্দবেশে। কামগন্ধ নাহি ভায়— বলে যোগ্য করেও বৈষ্ণবগ্রেই যেভাবে বর্ণিত হয়েছে নৌকা-বিলাস, বস্ত্রহরণ এবং গোপবর্মণীপাসহ রাসলীলা, এ যুগের পোর্নোগ্রাফি অন্যমানে দাবি করতে পারে তার গুত্তরবিকার। ঐ সম্প্রদায়েরই কবিমহাক্কনদের অতুলনীয় কাব্যকীর্তি বৈষ্ণবপন্যাবলী ঐ মস্তকে যদি সমৃদ্ধ না করত, ঐ মত বা তত্ত্ব টিকে থাকার অধিকারই বোধকরি হারিয়ে ফেলত। ঐ যুগে নির্মিত সেবালয়গুলির গায়েও সেবা যায় শিল্পসম্মিত যৌনতার ছাপ, যা এখনও আকর্ষণ করে স্বেচ্ছাসিদ্ধের অসংখ্য পর্যটককে। কোনরকম, বাজুমাছের মথিরগায়ে খোদিত ভাস্কর্য তথা নিপুণভাবে শিল্পিত কামকলা বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে

নিম্নে বিবর্তন অবলম্বিত এই দুটি সৌধকে। শুধু দুটিই বা বলি কেন, এমন সৌধ আরও অনেকই তো রয়েছে!

ধর্মাত্মদের দ্বারা পৃথিবীর অধিকাংশ পাপ বা পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয় কিনা, তা নিয়ে ভর্ক থাকতে পারে। আরও। এই সব কর্মের দ্বারা গাইড বা পথ প্রদর্শক, হিন্দুধর্মের আওতার ভেতরে বলা হয় গুরু বা পুরোহিত। ইসলাম ধর্মে মোল্লা বা মুর্শিদ। বুদ্ধধর্মে পাদরি বা কামার। যে ধর্মই থাকুন, লোকসমাজে এদের স্থান কিন্তু যথেষ্ট উচ্চ। ধর্মচর্চাশে এদের নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। এইমুগে, এই বিবেচনায় লভ্যকও।

হিন্দু ধর্মে এই প্রথা সর্বপ্রাচীন এবং সর্বতোমসা। বৈদিক যুগে, কিংবা তার আগেই উদ্ভব এই প্রথার। বৈদিকযুগে সংগঠিতরূপে বিকশিত হয় যাগযজ্ঞ শুরু হয়ে গেলে। ঐসময় শোষণতার ভেতন প্রচলন হয়নি। সেসময় এবং বৈদিক নির্দেশাবলী পুণ্যযাত্রার প্রবাহিত হত প্রকৃতি এবং মৃত্যির মহামা: বোদান্তি ধর্মমতই ভারতের অগ্রজতম ধর্ম। প্রকল প্রাকৃতিক শক্তিস্থির উপর ব্যক্তিত্ব তথা সেবস্থ আরোপ করে তাঁদের উদ্দেশে স্বকল্পতি এবং যাগযজ্ঞের প্রচলন ঘটে বেদের নির্দেশেই। ঐসব স্বকল্পতি বা মন্ত্র অধিগত করা বা আয়ত্তে রাখা সম্ভব ছিল না বিচারে, পতপালনে বা কৃষিকর্মে সদাব্যস্ত লোকসাধারণের পক্ষে। ফলে, সূচুভাবে বোকে আত্মিকরণ, বিশুদ্ধভাবে স্বরূপ এবং যজ্ঞস্থানে নির্ভুলভাবে উচ্চারণের জন্য একাত্মভাবে গড়ে উঠেছিল এক বিশেষ শ্রেণী। এই শ্রেণীই তদানীন্তন পুরোহিত শ্রেণী বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়।

শাস্ত্র সবসময় বলে থাকে — কানক্রোধাদি বড়রিপুকে দমন কর। কিন্তু কী অর্থ এই দমনের? সম্পূর্ণ বিনাশসাধন, নাকি বনীকরণ? যদি বোকার বিনাশসাধন, তাহলে কলতেই হবে, এদের সম্পূর্ণ বিনাশ সম্ভব নয়। কারণ, এগুলি মানুষের স্বভাবধর্ম, জন্মলব্ধ প্রকৃতি বা প্রপাটি। ধর্ম কথাটা এখানে বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। স্বভাবধর্মের নিম্নে লবণ লবণাক্ত, লবণ না দিলে ব্যঞ্জন খাবিষ্ট হয় না। আবার মাত্রাবিহীন লবণ পড়লে সে ব্যঞ্জন মুখে তোলা যায় না। মানুষের স্বভাবধর্ম এইরকম। কাম না থাকলে বংশধারা লুপ্ত হয়ে পৃথিবী কবে মনুষ্যশূন্য হয়ে যেত। ক্রোশ আছে কলেই মানুষের অধিনিহিত শক্তি আত্মপ্রকাশের পথ বুঁজে পাচ্ছে এবং হিংস্র শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা সম্ভব হচ্ছে। এই দুটির মাত্রাতীত প্রকাশ আবার মানুষকে করে তোলে অমানুষ, পতরও অধন। প্রাচীন মুনিগণিষের চরিত্র শাস্ত্রে, পুরাণে বেদনব কীর্তিত হয়েছে তাতে সমর্থন মেলে একবার। কবি রিপুগুলি সম্পর্কেও খাটে একথা।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অনুসারে অকল্য পালনীয় বিষয় এই চারটি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। সেবা যাচ্ছে, শাস্ত্রের বিচারে কাম অন্যতম এবং অচ্ছেদ্য পালনীয় ধর্ম। কিন্তু গীতার শ্রীকৃষ্ণ

বলেছেন নিষ্কাম ধর্মের কথা। সমস্ত কর্ম তিনি করতে বলেছেন কামনাশূন্য হয়ে এবং ফলের আশা না রেখে। তাঁর ডাবায়— মা কলেশু কলানম। আপাত প্রবণে মনে হয়, এয়েন বিজ্ঞানমনস্ক এক ব্যক্তির বিজ্ঞানসম্মত নিবেদন। নৈর্ব্যক্তিক উক্তি: কিন্তু বাস্তবে তাই? এয়েন রসনাসীনের সেই রসস্বাদন। সামনে ধরে নেওয়া হয়েছে টুক-আল-নিষ্টি নেমতা কিন্তু নিবিড় করা হয়েছে জিহ্বার ব্যবহার। পাপ-ফলের ব্যবহারই যেখানে নেই, সেখানে রাতভেগে পড়াশুনা করবে কে? মাড়কুমির স্বাধীনতার জন্য উদ্বৃত্ত বাদনা, অপরিসীম কামনা যদি নাই থাকত, অগ্নিযুগের বোকারা প্রাণ বিতেন কীসের প্রেরণায়? মানুষ কি জুয়টিভির হাতের পক্ষা যে খেলার উপকরণ হিসাবেই তামা ব্যবহৃত হবে সরাগীতন? জয় বা পরাজয়ের ভাগ থাকবেনা তাদের জন্য? ভজ্ঞনের স্বথে কসে যে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন নিষ্কাম ধর্মের এবং উপদেশ দিয়েছেন নিজেকে নিমিত্তমাত্র ভেবে আত্মীয়বধে প্রবৃত্ত হতে, তিনিই তো আবার লোভ সেবিমে বলেছেন অর্জুনকে — জিতলে রাজত্ব এবং যল দুইই পাবে এবং মৃত্যু ঘটলে স্বর্গে যাবেই। কণায় এবং কাজে, উপদেশে এবং নির্দেশে এখানে কোনো সামঞ্জস্য রইল কি? অবশ্য কৃষ্ণের সমর্থনে একটা কথা এখানে বলা যায়। গীতার যে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা পাই, তিনি প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রবক্তা বা প্রচারক ছিলেন না। ছিলেন পুরস্কার রাজনীতিক বা কূটনীতিক। ধর্মই যদি তাঁর মূল বক্তব্য হত, তাহলে অর্জুনকে তিনি উপদেশ দিতেন নামসংকীর্ণনের, বা হোম-যজ্ঞের, গাথীর ধারণার নয়।

মহাভারতে সেবা যাম ধর্মের আইন শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার তুলে দিয়েছেন নিজের হাতে। নিজের মনোমত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। অর্জুনকে উপদেশ ছলে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন — সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও—মামেকং লরণ ব্রহ্ম। উপদেশটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ উপনিষাদের অনুসরণে। কিংব্রথ্যাও যেহেতু এক প্রকার স্বরণ এবং কৃষ্ণ স্বরণ সেই ব্রহ্ম, অতএব অন্য কোনো ধর্মমত বা তাদের প্রবক্তাপগকে গ্রাহ্য করেনা। এখানে ‘মামেকং’ কথাটির অর্থ, বলা বাহুল্য,— আমিই সেই এক!

দ্বিতীয় অর্থ ধরা যেতে পারে এইরকম—অন্য সব ধর্ম বলতে যোকানো হয়েছে বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাকমত। এই ধর্মমতগুলি তখন ছিল নিরীশ্বরবাদী এবং বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিদ্বন্দী। সময়টা ছিল গুপ্তযুগ, যাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সুবর্ণযুগ। যতদূর জানা গেছে, ঐ যুগকেও ধরা হয় মহাভারতের রচনাকালের মধ্যে এবং গীতা সম্ভবত ঐযুগই প্রসিদ্ধ। ঐ যুগেই ভগবদ্গীত নাস্তিক মতবাদগুলোকে মুখে ফেলবার যে একটা সর্বাত্মক চেষ্টা চলেছিল, ইতিহাসই তার

সাক্ষ্য বহন করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাননিতে এই চেষ্টাও প্রতিফলিত হতে পারে।

এতক্ষণ কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে দু-এক কথা যা বলা হল তা কিন্তু বর্তমান লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। শ্রীকৃষ্ণ ভারতে অত্যধিক জনপ্রিয় একটি চরিত্র। বয় ধর্মগ্রন্থে এবং কাব্যকাহিনীতে অবিসংখ্যারী নাথক। যুগে যুগে এই চরিত্রে ঘট্টোহে অসংখ্য হাজারো পাণ্ডেইছে বয় পরিকর্তন, বিবর্তন এবং সংযোজন। মুক্ত হয়েছে ভক্তিবাদ এবং অবতারবাদ। কোথাও তিনি মূর্ত পরিপূর্ণ মানবসত্তা, কোথাও বিমূর্ত আধ্যাত্মিকতার স্বপ্রকাশ। যথেষ্ট দস্যুপলপতি এক কুয়ের নাম পাওয়া যায়। মহাভারতে পাওয়া যায় প্রাজ্ঞ, রাজনীতিক, কৌশলী শ্রীকৃষ্ণকে। বৈকবকবিসের হাতে পড়ে বৃদ্ধাবনে তিনিই আবার কিশোরপ্রেরের ঠাকুর বা নাগর। কালোই, কৃষ্ণ নামের কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র যদি থাকতেনই, ভক্তকবি এবং ভাবিতিক লেখকদের সৃষ্ট ধূমজাল ছিন্ন করে তাঁকে উদ্ধার করা সত্যিই কঠিন।

লোকসংস্কৃতি এবং লোকচরিত্র, এ দুইয়ের প্রভাব পারস্পরিক। লোকধর্ম লোকসংস্কৃতিরই অংশ। পারস্পরিক এই প্রভাব লক্ষিত হয় কেবল কাব্যে বা পুরাণেই নয়, সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও। লোকচরিত্রের ছাপ ধর্মের উপর যেমন পড়ে, পড়ে ধর্মসম্পৃক্ত শিল্পের উপরও। ফলে, লোকচরিত্র বিচারে শিল্পের যে নিমগ্ন একলা ছিল গৌরবের, পরকর্তী কালে তাই হয়ে দাঁড়ায় লজ্জার। কোনোরকের, বাজুগাহের ডান্ডবের কথা আগেই বলেছি। ঐ দুই মন্দির পায়েই শিল্পিত তৎকালীন লোকচরিত্র তথা লোকচরিত্র ছাপ। যেহেতু এই ছাপ আঁকা একেবারে সেবালয়ের পায়ে, বৃদ্ধতে হবে, সে যুগের ধর্মচারেও অস্বাভাব্যে মিশে ছিল অবাধ বৌদলীলা বা কামকলা।

ফলে বা খটকার, ঘটেছে তাই। কোনো সেন বা জাতি বর্ষন ঐশ্বর্য, ক্রীলাস, আরাধন, আরাধন হাবিয়ে ফেলে তার শৌর্য, বিক্রম তথা আত্মরক্ষার ক্রমতা, আত্মরক্ষাকারীতা তখনই প্রেরণিত হয় দুর্বল সেই দেশের উপর ঙ্গণিয়ে পড়তে। শক-কাল, পাঠানমোগল এইভাবেই ঙ্গণিয়ে পড়েছে ভারতের মাটিতে। লুটন এবং ধ্বংসলীলার পর সবাই ফিরে গেছে য য হানে, তা কিন্তু নয়। গোড়ার দিকে এসেছিল যেসব বর্ষর বা অর্ধবর্ষর জাতি, তারা মিশে গেছে বৃহত্তর জনজীবনের স্রোতে। পরের দিকে যারা এসেছে তারাও মিশে গেছে জনকটা, কিন্তু সবটা নয়। তারা বিন্দুস্থানী হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিন্দু স্থানী। তা হবার কথাও নয়। তাদের ধর্মও ইতিমধ্যে পরিণত যথেষ্ট। বিশিষ্টতাবাদ অবশ্যই নির্মার্, কিন্তু সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সম্মান অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ধর্ম সর্বদা মানতে চাইছে না ইতিহাসের এই অমোঘ নির্দেশ। ধর্মের আড়ালে তাই

অগ্রয় বুজ পয়ে সাংসাদয়িকতা, সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা এবং অবশ্যই মৌলবাদ। পুরো সংস্কৃতির বদলে দলপট ধর্মকেই তাই ওরুড় ফেঁদা হচ্ছে বেশি এবং সমাধানের সূত্র সমস্যা থেকে ক্রমশঃই সরে যাচ্ছে দূরে।

আমাদের মূল বিবেচ্য ধর্ম— যে ধর্ম সৃষ্ট মানুষের জন্য এবং মানুষের দ্বারা। এখন দেখা যাক সে ধর্ম কতটা কালে এসেছে মানুষের। না, এই বিবেচ্যকারের চোখে কেবল নয়, দেখতে হবে অনাসব চোখের ভিন্ন আলোতেও। যে চোখের উপর ভরসা আছে আপনার, আমার এবং অন্য সকলের। এবার তাকান এই উক্তিটির দিকে— 'এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধকার দেয়।' বলতে পারেন কে বক্তা এই উক্তির? রাজতত্ত্ববিদগোষ্ঠী স্বাধীনচেতা কোনো রাজনৈতিক নেতা? তা বলতে পারেন, কিন্তু তাহলে সেই নেতার নামটি আপনাকে বলতেই হবে—কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'রাজ্যের চিঠি'তে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন একথা। রবীন্দ্রনাথ দিকে যে ধর্মকে মানতেন, সেটা বৃহত্তর মানবধর্ম। আচার-সর্বধ সাংসাদয়িক বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম কখনও তাঁর প্রয় পাঠান। এই জাতীয় ধর্মকে তিনি বলেছেন ধর্মমোহ বা ধর্মকরা। 'অচলায়তন' নাটকে এই করা ভান্ডার আত্মনৈই তিনি জানিয়েছেন। 'বর্ষর রসি' এবং 'বক্তব্যরী' জোরদার করেছে এই আত্মনৈই। এই কবিই তো লিখেছেন—

সে অগ্র বহন কেহ কান্ডে,

সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বাঙ্ক নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে পীড়াইবে বিচারের আসে,
দরিরের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘাশ্বাসে
সরে সে নীরবে।

শোরণযন্ত্রে নিম্পিষ্ট নিরস্তর অসহায় করণ একটি ছবি ফুটে উঠেছে মার কয়েকটি ছত্রে। গর্বাঙ্ক নিষ্ঠুরের অত্যাচারে শিষ্ট মনুষ্যের পোষিত ধর্মবিশ্বাসের অনুসরণেই ডাক তাদের ভগবানকে। কিন্তু তথাকথিত সেই ভগবান সম্পূর্ণ অন্ধম প্রতিকারে, তাই তাদের স্বল্প যত্নাকাতর দীর্ঘাশ্বাস এবং নীরবে মৃত্যুবরণ। এই রবীন্দ্রনাথই কিন্তু লিখেছেন মোহসম্পৃক্ত ধর্মের কথা যা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। উদ্ভূতির শেষ চরণে আছে নীরবে মৃত্যুবরণের কথা। অচলায়তনে, রক্তকরবীতে কবি কিন্তু সহ্য করেননি এই নীরবতা। নাটকটির পাত্রপাত্রীপা সেখানে প্রচণ্ড ভাবে মুখের প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে। প্রতিরোধের ক্ষেত্রে টেনেই তিনি ডাক দিয়েছেন তাদেরকেই প্রাতিষ্ঠানের একটি কবিতায়— দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতোই ঘরে ঘরে! এই সংগ্রামের আর এক নামই তো সংঘর্ষ!

এইসব মিলিয়ে এখানে আভাবিত এ যুগের আর এক চিন্তানাম্যকের কণ্ঠ। যে কণ্ঠে ধ্বনিত আর এক চিরায়ত বাণী— ‘ধর্মীয় যন্ত্রণা হচ্ছে বাস্তব দুর্ভাগ্যের অভিবাঞ্ছিত এবং সেইসঙ্গে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়, নির্জীব অথবায় ঠিক যেমন সজীবতা। ধর্ম জনগণের আফিম।’—একথা বলেছেন বিশ্ববিদ্যুৎ কাল মার্জ, বিশেষ একটি গ্রন্থের ভূমিকায়। মজার ব্যাপার এই, মার্জের উক্তির শেষ বাক্যটিই কেবল ব্যবহৃত হচ্ছে তাঁর পক্ষের এবং বিপক্ষের লেখক এবং বক্তাদের উদ্দেশ্যে। একপক্ষ বলেছে—মার্জ ধর্মকে আফিম বলেছেন এজন্য, আফিমের মত মাদকতা ধর্মেও বিদ্যমান। আফিমখোররা আফিমের নেপায় পড়ে থাকে বৃন্দ হয়ে। তারা চায়না অনায়েমের প্রতিকার এবং প্রতিবাদ। ধর্মোদ্ধারা বা ধর্মবিধ্বাসীরাও ঠিক এমন। অন্যপক্ষ বলে অন্য কথা। তাদের মতে মার্জ ধর্মকে হয়ে দেখানোর জন্যেই বলেছেন একথা। মার্জ ধর্মের, ধর্মবিধ্বাসের ঘোরতর বিরোধী। ধর্মকে তাই তিনি তুলনা করেছেন নিকৃষ্ট এক মাদকদ্রব্যের সঙ্গে।

এ প্রসঙ্গে নিবন্ধকারের মত এইরকম—এই দুই পক্ষেই সত্য যেমন আছে, অসত্যও আছে। ধর্ম মাদকতা যেমন আছে, একটা প্রতিবাদও আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ধর্মপ্রবর্তাই কোনো না কোনোভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর সময়ের ধর্মের ‘হানির বিরুদ্ধে। ধর্মীয় অনাচার, ভীষাচার এবং কলাচারের বিরুদ্ধে। বৃদ্ধ, যীত, মহাশয়, কবীর, নানক, চৈতন্য, মার্টিন লুথারের নাম ওঠে এই প্রসঙ্গেই।

তবু বলা যায়, মাদকতা বা মত্ততা ধর্মের নিজস্ব একটা স্বভাব, এবং সে স্বভাব দুঃপনয়ে। হয়ত অপনয়েও। মার্জের উক্তিতে এই ভিনিসটার উল্লেখ অকথ্য একটা সত্য হিসাবে, ধর্মকে নিষ্ক হয়ে দেখানোর জন্যে না। যন্ত্রণাকাতর, হতাশাগ্রস্ত মানুষ, যে মানুষ শিকার তথাকাবিত ‘অপুষ্টি’ রোগের, শান্তির আশায় ঝুঁকতেই পারে ধর্মের দিকে। এমন যেমন এ ছেন মানুষ ঝুঁকছে ধর্মাত্মের দিকে। ওষুধ হিসাবে কোথাও কোথাও

ব্যবহৃত হলেও আফিম আসলে কিন্তু আফিমই। তবে যন্ত্রণাকাতর কণিক একটা ক্ষমতা তার আছে। ধর্মেরও আছে ঠিক এমনই এক ভূমিকা। হতাশ প্রাণে ধর্ম সন্কার করে কিছু আশা, কিছুটা সান্ত্বনা। সীমিত ক্ষেত্রে হলেও মার্জের দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মের প্রতি এখানে কিছুটা ইতিবাচক। নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস আর কিছু না পারুক, একটা বিরতি কাজ কিন্তু করেছে। বিশ্বতবি এক বিশ্ববিদ্যুৎ, দুই জগতের দুই সুমহান ব্যক্তিত্বকে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে একই মঞ্চে। ধর্ম নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়—মার্জের এই উক্তি শ্রাবণ উষ্ম থাকে তাঁর উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশ্যেও। মার্জবাদ বৈজ্ঞানিক, ঢালাও ভাবে একথা বললে মনে হতে পারে মার্জবাদ হয়ত যান্ত্রিক একটা মতবাদ। যন্ত্র যতই বিজ্ঞানসম্মত

ধর্ম নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়—মার্জের এই উক্তি শ্রাবণঃ উষ্ম থাকে তাঁর উত্তরাধিকারীদের উদ্দেশ্যেও। মার্জবাদ বৈজ্ঞানিক, ঢালাও ভাবে একথা বললে মনে হতে পারে মার্জবাদ হয়ত যান্ত্রিক একটা মতবাদ। যন্ত্র যতই বিজ্ঞানসম্মত হোক, তা মানুষের সম্পত্তি, মানবতার সম্পদ নয়। মানবতার সঙ্গে মার্জবাদের যথাযথ সমন্বয় ঘটেনি বলেই সম্ভবত বিশ্বজুড়ে ঘটে গেল তার সাম্প্রতিক বিপর্যয়।

হোক, তা মানুষের সম্পত্তি, মানবতার সম্পদ নয়। মানবতার সঙ্গে মার্জবাদের যথাযথ সমন্বয় ঘটেনি বলেই সম্ভবত বিশ্বজুড়ে ঘটে গেল তার সাম্প্রতিক বিপর্যয়। জগৎ ধর্মের উৎপত্তি গম্ভীর থেকে। গম্ভীর অর্থ-গমন, গতিশীলতা। জগৎ অর্থাৎ বিশ্বপৃথিবী সর্বদা গতিশীল। সেইসঙ্গে গতিশীল পৃথিবীর উপরকার যাকতীয় স্বভাব এবং প্রাণীও এদের মধ্যে মানুষ আবার গতিশীল

ওষু নয়, প্রগতিশীল। অর্থাৎ অগ্রগতিশীল। মানুষ তাই এগিয়ে চলেছে সবার আগে, হুনে করে নিয়েছে সবার উপরে। সব বস্তুপ্রাণীই একসাথে মানুষেরই সহচর, প্রতিবেশী। কিন্তু পাঁচছাজার বছর আগে তারা যেখানে ছিল, এখনও রয়েছে সেইখানেই। প্রাণীকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই মালিক স্বরচিত সত্যতার এবং সংকুচিত। আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষ যখন এগিয়ে চলেছে স্বাভাবিক গতিতে, স্বাভাবিক নিয়মে, তাহলেই একটা অংশ তখন চাইছে পিছিয়ে যেতে—শত শত অথবা কয়েক সহস্র বৎসর আগের জীবনে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কারণ মানুষ যাত্রী নয় টাইম মেশিনের, কল্পনার যে মেশিন মুহূর্তে সন্ধ্যা করে কালের যে কোনো স্বাবধান। সেহুহাত শিশুর পরিত্যক্ত জামা সাড়ে তিনহাত পূর্ববয়স্কের গায়ে পরাতে

গেলে যে বিশিষ্ট ঘণ্টা, মৌলবাদীরা ঘটতে চাইছে সেই বিশদই।

মৌলবাদীরা ধর্মকে নাকি নিরে যেতে চায় তার মূলের নিকে। যে ধর্মের মূলে আমের নাকি বয়ঃ সন্মুখ। মূল মানে এখানে অতীত, আত্মকাল : কর্তমান ওদের কাছে থেকেও নেই, ভবিষ্যৎ তো নেই-ই। তাহলে ধরে নিতে হবে ধর্মাত্মতা এবং ধর্মীয় মৌলবাদ একই জিনিস? না, এটা ঠিক নয়, তবে একরকম। একথা ঠিক নয় যে ধর্মাত্ম মানেই মৌলবাদী, তবে মৌলবাদী মানেই যে ধর্মাত্ম, এতে সন্দেহ নেই। সময়ের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে চলার কথা শুনলে এরা আঁতকে ওঠে আর বলে— গেল গেল, সব গেল। আধুনিকতার অত্যাচারে ধর্ম গেল, গ্রাম গেল, মান গেল। তোমরা কে কোথায় আছো, সবাই ছুটে এসো— বাঁচাও তোমাদের ধর্মকে, সংস্কৃতিকে, জাতকে!

এরপর? এরপর যা হবার তাই হয়। হিসা, ঘৃণা, হানাহানি। দাঙ্গা, যুদ্ধ, জরি আন্দোলন। অকথ, অবৈধ হস্তক্ষেপ রাজনীতিতে। দলে বেশগুস্ত ধর্মওয়ালারাই কেবল থাকে, তা নয়। শৈথী ও পেশাওয়ালার কায়েরীরাও থাকে। শান্ত স্থির সরোবরে পলধন তখনই হয় মত্ত মাতঙ্গের ওগাখাতে। ন্যায়-নীতি, বিচার-বিবেচনা মুহূর্তে হয় ছিন্নিড়, নিকিহ:

সে কান্টা লাগে রাজনীতির গায়েও। রাজনীতিও বসে নড়েচড়ে। না বসে উপায় কী? মৌলবাদের গ্রাস যেখানে ধর্ম, ধর্মের গ্রাস সেখানে রাজনীতি। এ এক অতুচ্ছ মাসোন্দার। ধর্ম মানে এখানে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানিক তথা সাম্প্রদায়িক ধর্ম। ফলে ধর্ম যেখানে সেইখানেই অসহিষ্ণুতা, সেইখানেই সংকীর্ণতা। ধর্মের এই চরিত্র রাজনীতিকদের অজানা, তা নয়। তা সবেও তাঁরা সহ্য করে এসেছেন ধর্মকে, প্রলয়ও দিয়েছেন। ধর্মপ্রিয়ী জনগণের মাথোঁই যে তাঁদের সাপেটার, ভোটবাংক! হাতে রাখতে হলে তাদেরকে তোলা দিতেই হবে। এই তোলা দিতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত কোণাড় গোলায় যাবার। শেষেব বলতেই হয়— ধর্ম, দুই হুটো, তফাৎ যাত। সতীত্ব, তথা অস্তিত্ব বিপর হলে তাই মাঝে মধ্যে ত্রোগান ওঠে রাজনৈতিক মহলে— ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করতেই হবে রাজনীতি থেকে। রাজনীতিকে দুঃশমুত্ত করতেই হবে। যেন যত দোষ সব ঐ ধর্ম ঘোষের। নিজে খেয়া ভুলসির পাড়া। রাজনীতিতে দুর্ভাগ্যবান বলে সম্প্রতি শোরগোল উঠেছে। তারজন্য দাবী কেবল ধর্মই! রাজনীতি নিজে নয়! ভোটের লড়াইয়ে লাভের ঘরে অল্পপাতের তরে এমন কোনো কর্ম আছে যা করছে না রাজনীতিকরা?

সব ধর্মেই নীতিমূলক গুটিকয় উপদেশ থাকে। মেটামুটি সব ধর্মে মান্যতাপ্রাপ্ত উপদেশগুলির কয়েকটি নির্দেশবাচক,

করেকটি নিবেদ্যবাচক। দুই ভাগে ভাগ করে সাম্মলে সেগুলি পাঁড়ায় এইরকম—

নির্দেশবাচক

১. সদা সত্য কহিবে
২. সর্বদা সংপথে চলিবে
৩. পরিশ্রমে দান করিবে
৪. গুণজননের লক্ষ্য করিবে।

নিবেদ্যবাচক

১. কাহাকেও হিংসা করিবে না
২. অসৎ সঙ্গে মিলিবে না
৩. পরধনে সোত করিবে না
৪. দুর্নীতিতে প্রব্রম্ব দিবে না।

উপদেশগুলি অপ্শাভন, নাকি অপ্রাসঙ্গিক? মান্য অসম্ভব সকলের, তথা রাজনীতিকদের পক্ষে? স্বীকার করতেই হবে, এগুলির মধ্যে কয়েকটি মান্য কঠিন রাজনীতিওয়ালাদের কাছে। এই যেমন— সদা সত্য কহিবে, সর্বদা সংপথে চলিবে, কাহাকেও হিংসা করিবে না! সদা সত্য কহিতে গেলে রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা কেওয়াই বন্ধ করে দিতে হয়। ভোটের সময় বক্তৃতার সিংহভাগই তো জুড়ে থাকে কুড়ি কুড়ি ভসতা আখাসে! ডিওইন প্রতিষ্ঠতিতে! আর সংপথে চলা? দল বাঁচাতে, ক্ষমতা হাটাতে যেসব কৌশল বা কার্যচুপি অবলম্বন করতে হয়, তাদের বেশিরভাগ থেকেই তাহলে হাতওটাতে হয়। দুর্নীতিতে প্রব্রম্ব? স্বপক্ষের দুটকে পাসন আর বিপক্ষের শিটকে মদন, এ তো গোড়ার কথা আজকের রাজনীতিতে! আর হিংসা? এখানে হিংসা মানেই তো রাজনীতি আর রাজনীতি মানে ঘেরাও, পালাপালি, অবরোধ, ভাঙচুর, জরিপনা। রাজনীতিতে হিংসতা স্বীকৃত সেই আদিকাল থেকে। এ ব্যাপারে আমাদের কৌশল্য আর ওদের মেয়িয়ারতিসি, এই দুইয়ে পার্থক্য বড় একটা নেই। অতএব যে ধর্ম, তোমার নীতির বুলি তুমি আওড়ে যাও বখারীতি। এভাবে রাজনীতিতে বিরক্ত করতে আর এসো না! এভাবে রাজনীতির গুটিকবণ কখনও হলনি, কখনও হবেও না। যে ধর্ম, তুমি বরং চেষ্টা কর নিজেকে বাঁচাতে! কারণ, ঐ মৌলবান আসছে ওেতে, প্রাণটি তোমার যাবে কেড়ে।

ধর্মনিরপেক্ষতা

এবার ধর্মনিরপেক্ষতা। আমাদের সংবিধানের বা উচ্চতম তত্ত্ব। তত্ত্বটি, তথা প্রসঙ্গটি অতিশয় জনপ্রিয়। তবু বলব, এর প্রচার যতটা, প্রসার ততটা কিছুতেই নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নিরপেক্ষ একটা সংজ্ঞা হাতের কাছে নেই, তা নয়। কিন্তু তার ধারেকাছে কেউ বড় একটা হাঁটে না। দূরে থেকেই নমস্কার ঠোকে তাকে আর জোরসে হেঁকে বলে— ধর্মনিরপেক্ষতা-কি-জ্ঞ। ধর্মনিরপেক্ষতা সাফাংভাবে ধর্মের কোনো ব্যাপারই নয়। ধর্মের জ্ঞান অপেক্ষা না করাটাই হচ্ছে তার নীতি! রাষ্ট্র পরিচালনায় ঐ নীতিতে অকণ্ঠই হতে হবে ধর্মের সঙ্গে অসম্পর্কিত এবং অনপেক্ষ। শিকাব্যবহাওকেও যুক্ত করতে হবে

এই নীতির সঙ্গে। কারণ শিক্ষা গড়ে তোলে রাষ্ট্রের ভাঙ্গী নাগরিকগণকে। ধর্ম কোনোভাবেই চলিত বা প্রভাবিত করতে পারে না ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নীতি-নিয়মকে। ইংরাজিতে একেই বলা হয় সেকুলারিজম্ (secularism)।

ধর্মনিরপেক্ষ কথটির যে ব্যাখ্যাটি শোনা যাচ্ছে সকাইতে বেশি, সেটি এইরকম—ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা বলে যদি কিছু থাকেই, তাকে থাকতে হবে ধর্মকে নিরোপ্য করে পাতিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে। ধর্মনিরপেক্ষতা কথটির মানে এখানে ধরা হচ্ছে—সর্ব ধর্মে সমদর্শিতা, অর্থাৎ সকল ধর্মের প্রতি সমান লজ্জা বা সহিষ্ণুতার ভাব পোষণ করা। নিরপেক্ষতা কথটির অর্থ এখানে ধরা হয়েছে পক্ষপাতহীনতা অথবা সকলের প্রতি সমান পক্ষপাতিত্ব। মোটকথা, ধর্মকে বাম দিয়ে বা পাশে সরিয়ে রেখে নয়, তার প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাকে মনোতা দিয়ে তবে ঠাই পেতে হবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে।

শোলা অতএব শব্দটা নিয়েই। বাংলার 'নিরপেক্ষতা' ব্যবহৃত দুটি ক্ষেত্রেই। ইংরাজিতে Neutrality এবং Secularism শব্দদুটির অর্থ আলাদা, ব্যবহৃতও তাই। নিউট্রালিটির বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া উচিত অপক্ষপাত, অর্থাৎ কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা। সেকুলারিজম্ বলতে বোঝার অন্য একটি বিশেষ অর্থ, যার আভাস আগেই দিয়েছি। সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বললে বুঝতে হবে সেই রাষ্ট্রকে, যে রাষ্ট্রের শাসননীতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের আশ্রয় না কোনই সম্পর্ক। সাম্প্রদায়িক বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের তো নয়ই।

কিন্তু তাই কি চলছে এসেছে? এসেছে এবং অন্যান্য অনেক দেশেও? ব্যবোচিত ধর্মীয় রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে কিছু না বলাই ভালো। কারণ ধর্মই গৃহস্থায়ী সেখানে, রাষ্ট্রনীতি গৃহভূতা। ধর্মই সেখানে জুমুহু, রাষ্ট্র জুমুহুরদার। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এতটা অবশ্যই চলেনা, তবে ধর্ম নাছোড় এখানেও, সেই কমলির মতই। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ, আমরা অসাম্প্রদায়িক—একথা ঘোষণার পরেও দেখা যায় ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং সংস্কারের হাত ধরে ধর্ম ঢুকে যাচ্ছে শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত। লোকসভায় এবং বিধানসভায় সদ্য নির্বাচিত সদস্যদের একাংশ এখন পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করে ধর্মপ্রতি ঈশ্বরের নামে, সংবিধান বা জনগণের নামে নয়! হতে পারেন ঈশ্বর সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পত্তি, কিন্তু কী তাঁর সম্পর্ক ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে? রাষ্ট্রীয় অতীত এখনও কোথাও কোথাও শুক্ল হ্রদ ধর্মভরার মাধ্যমে। আদালতে ধর্মগ্রন্থ হুঁইয়ে শপথগ্রহণ করানো হয়। সম্প্রদায়নির্বিশেষে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানগণ, যাদের কাছে গভীর জনগণের আস্থা এবং আনুগত্য—তাঁরা কি পারেন সাম্প্রদায়িক কোনো ধর্মমানে বা তথাকথিত কোনো সাধুমহাত্ম্যার পায়ের তলায় সেই সম্পদ

দুটিয়ে বিতে? অন্যদের বেলায় যদি থাকতে পারে নির্দিষ্ট আচরণবিধি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এই যন্ত্রাঙ্গের বেলায় কেন তা থাকবে না? যন্ত্রতত্ত্ব ধর্মমুক্তানের উদ্ভোধন, ধর্মীয় পন্থারীনে যথেষ্ট কণীকিতরণ, এগুলো সেই বিধিভাঙ্গা নিয়ন্ত্রিত হতেই পারে।

রাজনীতি এবং ধর্মনীতি— দুইই সর্বগ্রাসী। মানুষ এই উভয় রাসেরই গ্রাস। সাধুভাষায় বলা যায়— ইহারা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকেই অশুশা করিয়া তোলে। রাজনীতির কথা এখন থাক। আমাদের আলোচ্য বিষয় যে ধর্ম, সেটা কিন্তু সেই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই। একটা প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে, প্রতিষ্ঠান ছাড়া ধর্মের অস্তিত্ব তাহলে সম্ভব নয়? কেন নয়? আরে, সেটাই তো আসল ধর্ম, যার আর এক নাম মানবধর্ম। জাতি-কর্ণ-রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাননির্বিশেষে সে ধর্ম সকলের কাছে এক এবং একাকার। সে ধর্ম একান্ত মনুষ্যদের সঙ্গে, মানুষের সুখ-তৃপ্তা, প্রেম-ভালবাসার সঙ্গে। মানুষ বিহনে ধর্ম অতএব নিরাশ্রয় এবং নিরকল্য। শাস্ত্রের পৃষ্ঠায় দেখা আছে যে ধর্ম তা তন্ত্র, নিষ্প্রাণ এবং নিরর্থক। মানুষের প্রাণের স্পর্শ পেলে তবে সে যে প্রাণবন্ত। সার্থক এবং সমর্থক। মানুষের মধ্যে ধর্মিক আছেন তাই ধর্ম আছে টিকে। শাস্ত্র নয়, প্রতিষ্ঠান নয়, মানুষই প্রকৃতপক্ষে আধার ধর্মের। আদর। ধর্মের আলোচনায় ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতি তাই অপরিহার্য। সেই মানুষের বৌদ্ধে, ধর্মের বৌদ্ধে সাহায্য নিয়েছি একটি ছন্দের। ছন্দের নাম যেহেতু পদ্যর, নিবন্ধকার যেহেতু নন আধুনিক কোনো কবি, পাঠক পাঠিকাদের বৃকতে অতএব অসুবিধা হবেনা :

ধর্ম তো নিরকল্য নিষ্প্রাণ
ধর্মিকের প্রাণস্পর্শে না জাগিলে প্রাণ।
শাস্ত্র নয়, ধর্ম ন্যায়-নীতি ভালবাসা,
মানবতায়ীন ধর্ম শকুনির পাশ!

ধর্ম যার প্রাণ তাঁর কর্মই শরীর,
জ-ন্যয়ের কাছে শুভ নহে ধর্মবীর।
প্রতিবাদী কষ্ট যার সত্যের সুরব,
সম্বোধে অটুট যিনি করুণায় ব্রব।

শকুনির সকলের তরে চক্ষে জল,
সত্যভারী সমদর্শী সংকটে অটল,
স্বার্থের মুখে তুলে ধরে নিজ অন্ন,
ধর্ম তাঁর স্পর্শে মানে নিজেকেই ধনা।

আর্তের আত্মীয় যিনি ত্রাতার আপন—
তিনিই ধর্মিক— ধর্ম তাঁর আচরণ।

লোকে খুঁজে ফেরে ধর্ম, ধর্ম খোঁজে তাঁরে
নিঃশেষে বিলায়ে সেন যিনি আপনারে :

আমাদের মধ্যে কারো কারো পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে কিছু কিছু পড়াশুনা থাকলেও বৈজ্ঞানিক/যুক্তিবাদী ধ্যানধারণাকে নিষ্কর, পরিবারিক ও বা সামাজিক জীবনের আচরণ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে আমরা পূর্বে কোনেদিনি ভাবিনি। যুব সম্ভবত ১৯৮১ সাল নাগাদ 'উৎস মানুষ' পত্রিকা হাতে আসে। তখনকার সময়ের কিছু লেখা যেমন শালগ্রাম শিলা, মালা বাড়ে রোগ সারে, প্রমিথিউসের পথে, সাপ নিয়ে কিংবদন্তী ইত্যাদি পত্রিকার সামগ্রিক লেখাগুলোকে বুকে ওঠার জন্য গড়ে উঠল 'উৎস মানুষ' পাঠ্যক্রম, 'হরিণখাটা'। পাঠ্যক্রমের সামগ্রিক আসরে পত্রিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়া যেত, তর্ক-বিতর্ক হত। পাঠ্যক্রমের আসরেই আলোচনা শুরু হল,— আমাদের ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক ক্ষেত্রে যুক্তি নির্ভর আচরণ অনুষ্ঠান কীভাবে গড়ে তোলা যায়। আমাদের পরিবারিক অনুষ্ঠান যেমন বিয়ে, আছাদি, সন্তানদিগর মুখে ভাত ইত্যাদির একটা প্রচলিত সমাজ স্বীকৃত রূপ আছে। দীর্ঘ আলোচনা আলোচনার পরে উপরোক্ত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের বিকল্প একটা বসড়া রূপ পাঠ্যক্রমে তৈরি করা হল যেখানে ঠাকুর পুরুষের কোনো ভূমিকা নেই। হরিণখাটা বাক্যেরের আশেপাশের অঞ্চলের পরিচিত লোকজনদের ডেকে পাঠ্যক্রমের তৈরি বসড়া নিয়ে আলোচনা আলোচনা হল। এর পর বাস্তবে কাজ শুরু হল। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কাজ হয়েছে মরগোড়ার প্রজ্ঞাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে।

১৯৮৩ সনের অক্টোবর মাসে হরিণখাটা ব্লকের উত্তর রাজাপুর গ্রামের শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর প্রচলিত প্রথাগত প্রাছাদি না করে একটি শ্রবণসভার আয়োজন করেন। এটিই আমাদের এলাকার প্রথম শ্রবণসভা। প্রথম শ্রবণসভার সময় এলাকার প্রাচীনপন্থী মানুষজন বিরোধিতার মরব ছিলেন। লোকানে, পাড়ার এ নিয়ে ভট্টালা, প্রায়ই নজরে পড়ত। কিন্তু তার পর থেকে আর হত শ্রবণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রাটোতেই প্রথমটার মত এত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। এ পর্যন্ত আমাদের এলাকার বিগত কয়েক বছরে ১৮টি শ্রবণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতগুলো শ্রবণসভা একই এলাকায় হওয়ার পেছনে সম্ভাব্য কারণগুলি এরকম :

(১) মরগোড়ার কাজকর্মের পদ্ধতি সম্পর্কে যার যে খিলাসই থাকনা কেন, প্রতিটি শ্রবণসভার উদ্যোক্তা তার চারপাশের আতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি পরিবারের লোকজনকে শ্রবণসভায় উপস্থিত থাকার জন্য আত্মকিক ভাবে আমন্ত্রণ জানান। আমাদের এলাকার প্রতিটি শ্রবণসভায় যতলোক উপস্থিত থাকেন তাঁদের মধ্যে পনের আনা লোকই এখন তাঁদের প্রিয়জনের বিদ্যেপে শ্রবণসভার আয়োজন করতে পারবেন না

বা করবেন না। কিন্তু উদ্যোক্তাদের বিনীত ও আত্মকিক আবেগম উপেক্ষাও করতে পারেন না। তাই প্রতিটি শ্রবণসভা একটা গণচরিত্র পাশ।

(২) এ পর্যন্ত যতগুলি শ্রবণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলির উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলকেই এলাকার লোকেরা, সম্ভ্রম ও আপসে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লোক বলে জানেন। শ্রবণসভার ধ্যানধারণা কারো কারো মনে আঘাতের সৃষ্টি করলেও আবার আঘাতগ্রস্ত মানুষজনদেরা জানেন তাঁর প্রয়োজনের সময় এই সমাজ সংস্কারক লোকগুলিই প্রথম পাশে এসে দাঁড়াবে। তাই এলাকার বেশিরভাগ লোকের মনে উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে একটা দরাসের ভাবনাও থাকে।

(৩) শ্রবণসভার কার্যক্রম (প্রতিকৃতিতে মাস্যাপন, দাঁড়িয়ে দাঁড়ানো পাসনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, প্রয়াত জীবন নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি) একজন মনে প্রাণে গতানুগতিক ভাবনাচিত্রায় খিলাসী লোককেও তাৎক্ষণিক ভাবে নড়া না দিয়ে পারেনা।

(৪) এলাকার দু'একটি সংগঠন যেমন ফোটনিশ কমিটি, অর্থবিস্তার কুসংস্কার বিরোধী কমিটি এসকল কাজগুলিকে সচেতন ভাবেই দেখছে।

১৮টি শ্রদ্ধা-অনুষ্ঠানের তালিকা

সাল	উদ্যোক্তা	প্রয়াত ব্যক্তি
১৯৮৩	সতীশচন্দ্র মণ্ডল	মা
১৯৮৪	শিরিধর বিশ্বাস	বাবা
১৯৮৪	রামপদ বিশ্বাস	বাবা
১৯৮৫	দিলীপ ভৌমিক	বাবা
১৯৮৫	সুনীল রায়	বাবা
১৯৮৭	অরিন্থম ভৌমিক	বাবা
১৯৮৮	প্রমোদ ও প্রভাস পাল	মা
১৯৮৯	প্রমোদ ও প্রভাস পাল	বাবা
১৯৮৯	মনোরঞ্জন দেবনাথ	মা
১৯৯০	দেবনাথরায় দাশগুপ্তী	বাবা
১৯৯১	সুরেশ ও বলরাম মজুমদার	মা
১৯৯৪	উপেন ব্যাপারী	মা
১৯৯৪	সুখমার কল্লার	বাবা
১৯৯৫	গোপাল ব্যাপারী	বাবা
১৯৯৫	জ্যোতির্ময়ী মজুমদার	স্বামী
১৯৯৭	কৃষ্ণমার ঘোষ	মা
১৯৯৮	সনাতন ঘোষ	দাদি
১৯৯৮	মহাসেন ঘোষ	মা

প্রতিক্রিয়া :- শ্রী নিরঞ্জন বিশ্বাস, হরিণখাটা



বনের খবর

শুরু (৩)

বিক্রপদ চন্দ্রবর্তী



বনের খবরের বিক্রি বেড়ে গেছে।

মিস্ কিচির-মিচির চিড়িয়াখানায় গিয়ে পত্তরাত্তর সাফাংকার নিয়েছিলেন। সেই সাফাংকারের কথা বনের নিজস্ব পত্রিকা 'বনের খবর'-এ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, 'বনের খবর'-এর বিক্রি হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। সম্পাদক ডক্টর ব্রজা হ্যা তো খুব খুশি। কিচির-মিচিরের মাইনে বাড়িয়ে দেবেন বলেছেন।

কিচির-মিচিরও, স্বভাবতই, খুবই খুশি। আরো খাটতে শুরু করেছেন।

• •

আজ মিস্ কিচির-মিচির সুন্দরবন থেকে চিড়িয়াখানায় আসা হালুম মামার সাফাংকার নেনবন ঠিক করেছেন। ডান দিকের ডানা থেকে সাইড ব্যাগ বুলছে। তাতে আছে নোট নেওয়ার খাতা। কলম। টেপ-রেকর্ডার। টিফিন-কৌটো। ইত্যাদি।

টিফিন কৌটোয় আছে গোটা দশেক ঘাস-পোক আর গোটা ছয়েক গঙ্গা-ফড়িং। দু-একটা গম-দানাও থাকতে পারে। 'হ্যাঁ রে! তুই আমাদের কিচির-মিচির না? 'আই কিচির-মিচির?'

'বন থেকে এত দূরে, শহরের এই চিড়িয়াখানায়, আমার নাম ধরে কে ডাকাডাকি করছে রে বাবা!' অবাক হন কিচির-মিচির। গলাটা অনেকটা হালুম-মামির মতো না? হ্যাঁ। সেই রকমই তো!

উড়তে উড়তেই, একবার পেছন ফেরেন কিচির-মিচির। 'ও মা। হ্যাঁ! হালুম-মামিই তো! কী আশ্চর্য! হালুম মামিকেও ধরে এনেছে মানুষগুলো! ওঃ! পারে এরা। যাই। একবার সেবা করা উচিত। সেবা না করলে বনে বদনাম হবে।'

ডানার এক ঝটকায় ঘুরে, কিচির-মিচির এসেন হালুম-মামিমার খাঁচায়। বসলেন গোহার জালের ওপর দিকে। বেশি কাছে থাকটা ঠিক হবে না। বলা যায় না।

গলায় যতটা সম্ভব সহানুভূতির স্বর ফুটিয়ে তুলে কিচির-মিচির বললেন, 'এ কী গো মামি। তোমার এ অবস্থা কী করে হল! এই তো, দিন দশেক আগেই তো তোমার সঙ্গে বনে সেবা হল। এখানে তোমাকে সেবতে হবে— ভাবতেই পারছি না!'

হালুম-মামি ডান 'হাত'-এর থাবা দিয়ে কপাল চাপড়ে বললেন, 'সবই কপাল মা! সৌন্দর্যবনের সুখ কপালে সইল না। মানুষের ফাঁদে পা দিয়ে আজ এই জেলখানায় আশ্রয় পেইচি মা!'

'এরা তোমায় ধরার জন্যে ফাঁদ পেতেছিল?' কৌতূহলী হন কিচির-মিচির।

'তবে আর বলচি কী। আমি শিকারে বেইরেছি। আমার সাপা মনে কাপা নেই কো মা। তা দেখলুম, বনের ভেতরেতে একটা বেশ নখরকান্ডি ছাগল ঘুরছে। তখন কি ছাই জানি, ও ছাগল নয়। মায়াশ্রেণ!'

'মিছে কথা কইব না মা। একটু জল এল জিবেতে। আহা! কতকাল ছাগল খাইনি। হরিণ আর বুনো গুয়ারা খেয়ে খেয়ে জিবে একেবারে অরুচি ধরে গেছে। তাই একটু গুটি গুটি পায়ের এতলুম। আর ওই এতলুনেই কাল হল মা। কতায় বলে, লোবে পাপ, পাপে মিছা।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে গেলেন 'বনের খবর' পত্রিকার নবীন সাংবাদিক। 'তারপর মামি? তারপর কী হল?'

মামি বললেন, 'ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে কাদতে বললেন, 'জাঁহতক আমি দু-পা এগিয়েছি মা, অমনি, কাপা নেই কওয়া নেই, কোথেকে কী একটা এসে ধাক্কা করে লাগল আমার পিঠেতে। বাস্ অমনি অজ্ঞান।'

'ওই যে ঘুমের ইনজিন্‌ নাকী যেন বলে ইনজিরিত? ওই সেই হুঁড়ে মেরেছিল গো মা!'

অনেক কষ্টে হাসি চেপে, কিচির-মিচির বললেন, 'ঘুমের ইনজেকশন?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওই জিনিস। আহা গো মা। যখন ছোটটি ছিলুম, আমার মা পই-পই করে বলে দিয়েছিলেন। বসেছিলেন,

“বাহ্য! খুব সাবধান! ছাগল-টাগল বনে ঢুকলে খেতে হাস না যেন। ওগুলো মানুষের পাতা ফাঁদ। জোর দামামাটিকে এই করে মানুষেরা ধরে নিয়ে গেছে।”

‘মার কতা! গুরু-বাকি। তবু ওনিনি। লোবোতে পড়ে অমনি করিচি। এখন তার ফল হাতে হাতে টের পাচ্ছি মা।’

কথা ঘোরতে কিচির-মিচির বললেন, ‘হ্যাঁ মামি, এরা খেতে-টেতে নিচ্ছে?’

মামি বললেন, ‘মিছে কথা কইব না মা। এসের যত্ন-অস্তিরে কোনও তুরটি নেইকো। বাওয়া-নাওয়া বলো, ডাক্তার-বলি বলো—ওগুলো সব ঠিক আছে।’

বলতে পারো, ‘বনেও তো তোমরা একা-একাই থাকো মামি। এখানেও একা। তবে আর দুঃখ কিসের?’ সে কতা তো সত্যিই মা। আমরা তো আর শিকারের (সিংহদের) মতো দল বেঁধে থাকি না। আমরা একা-একাই থাকি। তবু মা, বন তো আর জেলখানা নয়। তোমার মামার সঙ্গে, ছেলে দুটোর সঙ্গে আর সারা জীবন দ্যাঁকাই হবে না — এ কতটা ভাবলেই, বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে ‘যাচ্ছে মা।’

‘হাসু-বলুর কী হবে মামি?’ কিচির-মিচির সহানুভূতি দেখান।

‘তা ভগবানের কিরপায় ওদের ঠিক চলে যাবে। এমনভেও তো ছেলে-মেয়েদের বয়স কচর-সুয়েক হলোই, আমরা ওদের ছেড়ে চলে যাই। বাণিনীদের এটাই নিয়ম। জাম্বো-জাম্বাস্তর ধরে চলে আসতে।’

‘তবে হ্যাঁ। ছেলের সব শিকিয়ে পড়িরে সিঁচি। পোতোয় (প্রথম) যে দিন ওদের মাংস বিলাম, সেও আগে আমি খেয়ে তারপর বমি করলাম। তখন সেই নরম মাংসটা ওরা খেল। সে-সব কতা মনে পড়লে মনটা হু-হু করে ওটে।’

‘শিকার ধরার জন্য, কীভাবে পোতোয় ওটি-ওটি পায় এগোতে হয়, কখন ছুটেতে হয়, কত দূর থেকে শিকারের ওপর লাপ মিড়ে হয়, শিকারের কোন্ জায়গাটাকে কামড়ে ধরতে হয়—সব শিকিয়ে সিঁচি মা।’

‘তোমার মামাকে তো কোনও কামেলাই পেরাতে হয়নি মা। সব আমি একাই সামলেছি।’

‘হ্যাঁ মামি, স্ত্রিদের ঘুম-টুম হচ্ছে তোমার?’ কিচির-মিচিরের সাংকামি প্রশ্ন।

‘ওই ঘুমের ইন্জিন খেয়ে দু-তিন দিন তো বেধোরে ঘুমলুম। ঘুম যে একেবারে হচ্ছে না, তা নয় মা। বরং, বনেই

ঠিক মতো ঘুম হত না। পাতার শব্দ শব্দ। বা এটা-ওটার শব্দ ওনলেই, সজাগ হয়ে যেতাম। শব্দের ভয়ে’।

‘তুমি তো বনের মেয়ে। তোমাকে আর এসব কতা কী কলব মা। তুমি তো জানোই, বনে বিপদ একেবারে, থাকে বলে গায়ে সেপটে থাকে। একেনে অবিশি সে ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চিন্তি।’

‘হ্যাঁ রে কিচির-মিচির, এই গারবখানায় আমাদের সৌন্দর্যবনের আর কেও আছে?’

‘কিচির-মিচির বললেন, ‘হ্যাঁ গো মামি। তোমারই মাসতুতো দুই দাদা আছেন। একেবারে ঠিক তোমার শেখন দিকে। সেওঘালের আড়াল আছে বলে দেখতে পাছো না।’

‘তাই বলি, একেনে এমন সুরেলা গলায় কে এমন হাসুম-ছলুম করে ডাকচে? আহা! আমার সেজ মামির দুই ছেলে। দুটো ছেলেরই গানের গলাটা খুব ভাল ছিল গো। মনের মুখে (মুখে) আর কোনও (বোধ হয়) গায় টায়ন। সবই কপাল মা! সবই অদেউ।’

‘তুই নাকি কাগজের আপিসে চাপরি পেইচিস?’

‘হ্যাঁ মামি। আর সেই কাজেই তো আমার এখানে আসা। গতবার পতরাটাকে নিয়ে লিখেছিলাম। এবার ডেকেছিলাম হাসুম মামাকে নিয়ে লিখব। তা, তোমাকেই যখন হাতের কাছে পেয়ে পেশাম, তখন এবার তোমাকে নিয়েই লিখব ডাবছি।’

‘তাই লিখিস তো মা। আমার নাম কবে লিখবি। লিখবি — আমি বলিচি। লিখবি, যে, বনের পত্ত-পাখি-সাপ-খোপরা কি সব ভেড়া হয়ে গেছে? নইলে, এই মানুষগুলো বনের ভেতরে ঢুক বাগ-সিন্ধি-হাতিকে ধরে আনচে কী বলে? সবাই একজোট হয়ে কুকে দাঁড়ালে এরা পারত আমাদের ধরে আনতে?’

‘আর এত কাণ্ড করে ধরে আনা কেন? না, আমাদেরকে সং সেক্সে রোজ খাঁচার গোড়ায় পাঁড়িয়ে থাকতে হবে আর মানুষগুলো এসে চৌচাবে। ডিল ছুঁতে। যজ্ঞে সব।’

‘আর লিখিস তো মা, মানুষগুলো হচ্ছে একেরখবের মিভোবাধি। বলে কিনা বাগে (বাগে) মানুষ যায়। বরে গেছে আমাদের মানুষ খেতে। মানুষগুলো জঙ্গলে ঢুকবে। মধু নেবে। কাট (কাঠ) কাটবে। আর সুখোণ পেলেই আমাদের পেচনে লগাবে।’

‘আমরা ভাই ভয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। শব্দ করে নয়। আর মানুষ খেতে আমরা ভালও বাসি না।’

হাসুম-মামি বললেন, ‘তারপর দ্যাঁকো মা, ওনিচি, কিডালকে নাকি মানুষেরা ‘বাগের মাসি’ বলে। কত অন্যায় কতা

বালা দিকি। বাগে আর বিড়ালে? কখনও তুলনা হয়, না কোনওদিনও হয়েছে?

‘ওরা তো বহাল ডব্বিতে মানুষদের বাড়িতে থাকে। খুশী, মাচটা খায়। বড় ভোর ইস্তুর আর আরশোলা মারে। ওদের সঙ্গে কখনও আমাদের তুলনা হয়? এসব কথা শুনেলেও গা-পিঁপ্তি হলে যায়।’

কিচির-মিচির বললেন, ‘আচ্ছা মামি, বনে তো তুমি খুব চান করতেন। এখানে চান করো?’

‘সে যা চান, সে আর বলে কাক নেই মা। কী একটা হস্তর এনে ধরলে। বানিকটা ফুরফুর করে বিষ্টির (বুষ্টির) মতন হল। বাস্! হয়ে পেল চান। অতঃ, বনে কত নদীতে গা ডুবিয়ে থাকতুম। খন্টার পর খন্টা। তুই তো দেখিচিস মা।’

‘তোমায় যদি এরা আবার বনে ছেড়ে দিয়ে আসে, তুমি যাবে?’ এবার মোক্ষম বান ছোড়েন কিচির-মিচির।

মামি হালুম-কলুম করে বলেন, ‘সাব মানে? এই মুহুর্তে যাব। এইটুকু পুঁচকে ঘরে বাগ (বাঘ) থাকে? ছাঃ। বনে তো এক একটা লাপই (লাফই) পিঠাম কুড়ি-তিরিশ ফুটের। তা এখানে দিতে পারবে?’

‘এক রাষ্ট্রেরই মাসে যেতাম তিরিশ কিলোগ্রামের মতো। তা এরা কোণাতে পারবে? তবে হ্যাঁ। একদিন শিকার ছুঁত তো ঠানব হরি মটর!’

‘তবে? সেটাও তো ভাবতে হবে? এসেব কিছু এমন বনও আছে মামি, যেখানে তুমি বনের মধ্যেই থাকবে, অথচ রোজ ঠিক সময়ে খাবার-স্বাধার পাবে। শরীর ঝাঝপ হলে ডাক্তার-বাদি দেখাতে পারবে।’ কিচির-মিচির লোভ দেখান মামিকে।

মামি বললেন, ‘তেমন হলে তো ভালই হয় রে মা। বয়স হয়েছে। আর তেমন লাপ-কাপও করতে পারিনা। তার ওপরে হাঁটুর ব্যতের ব্যাঙটা (ব্যাঙটা) বন্ধ বেড়েছে। আমাবস্যা-পুষ্টিমেতে আকও বাড়ে। তেমন কিছু যদি হয়, তো মম্ব কী? হাব সেকানে। আর সে শুধু আমি কেন মা, বনের সবাই যাবে।’

‘আচ্ছা তা হলে আসি মামি?’

‘ওমা! সে কী রে! একঝুনি চলে যাবি?’

‘হ্যাঁ মামি। লেখা ধরাতে হবে কাগজে।’ ডানা মেলে উড়ে যান কিচির-মিচির। মামির কুক-ভান্ডা হাফাকার গুকে ধাওয়া করে! আকাশেও!



সায়ক দত্ত (ঝাডু)

৩০ - ৪ - ১৯৮৯

৬ - ৮ - ১৯৯৫

“সে ওড়িমের মতো ভেসে গেছে,
চাঁদর জ্বালোর দেশে গেছে,
যেখানে দিলে ছোসে গেছে
হাসি তার রেখে গেছে রে।”

আদরের স্বভূকে মনে রেখে—

বাবা মা মাসী

কোম্পাগন, কালীতলা

‘সত্য’ স্মরণে

“যেতে নাহি নিব, তবু যেতে নিতে হয়।” ঠাঁ যেতে নিতে হ’ল। আমাদের বন্ধু সত্যরত্ন করকে আমরা যেতে দিলাম। ঘরে রাখার কোনও উপায়ই আমাদের জানা ছিল না। আমাদের মধ্যে ছিল না। তাই গত ৯ই জুলাই, ২০০১-এ সত্য চলে গেল।

অনেক স্বপ্ন আর ইচ্ছা বুকে নিয়ে অনেক কাজ অসমাপ্ত রেখে, সত্যকে যেতে হল। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে দুরারোগ্য হৃদযন্ত্রের অসুখের সঙ্গে লড়াই করে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই শেষ পর্বত হাব মানতে বাধ্য হ’ল।

বৌবনের শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত সত্য ছিল একজন প্রকৃতি গণকর্মী। মানুষের ভাল কিভাবে করা যায়, সবাইকে নিয়ে কিভাবে ভাল থাকা যায়, একের বিশেষে সবাই মিলে কিভাবে কাঁপিয়ে পড়তে হয়, সত্য তার জীবন চর্চায় এ সবই দেখিয়ে গেছে। তাই ওর চলে যাওয়াটা মনতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও ...। তার অসমাপ্ত কাজ ও স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই সত্য আমাদের মধ্যে আছে, থাকবে।

পূর্ববী ঘোষ



যেমন গুডুম তেমনি রবে, শব্দ হবে না

৮ ৭ ৮৭ ৮৭। ঘড়িতে তখন রাত 'একটা'। অন্ধকারে মুখোশ পরে এগিয়ে চলেছে বসু সর্দার ড্রাগন। হাতে উদাত্ত ছোরা। এদিকে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জিও কম যায় না। সহকারী রতনলালকে নিচে রেখে, দুহাতে দুটো পিস্তল নিয়ে জলের পাইপ বেয়ে তরতর করে উঠে গেল দোতলায়। তারপর অন্ধকারের বুক চিরে বাঁচাও আর্তনাদ। সঙ্গে গর্জ্জে উঠল দীপকের পিস্তল — গুডুম গুডুম।

এমনভাবে গল্গো এগিয়ে চলে। 'কোথা হতে কী ইইয়া যায়' দস্যু মোহন অশুশ ইইয়া যায়। ড্রাগন বা কালনাগিনীরা অন্ধের জন্য বেঁচে পালিয়ে যায়। পরের দিন সকালে গোয়েন্দা ডাক পায় নতুন লড়াইয়ের।

আমাদের এবারের বিষয় অবশ্য গোয়েন্দা কাহিনী নয় গুডুম, কোথাও ব্যাং।

ছেলেছেলেকরাদের মুখে চিটাও চিটাও। কেন এমন এই গুডুম আওয়াজ, সাইলেন্সার লাগালে কেনই বা সে চুপচাপ?

প্রথমে আসা যাক কার্টুজ। এর ভেতর ভরা থাকে বিস্ফোরক। যাকে গান পাউডার বলে। কার্টুজের পেছনের দিকে ম্যাকামির্জি একটা জায়গা থাকে, 'ক্যাপ' বলে তাকে। ট্রিগার টিপলে ফায়ারিং পিন এসে থাকা মারে সেখানে। এই থাকাতেই জ্বলে ওঠে বারুদ। মৃত্যুর আগে মহাবলী ঘটোৎকচ যেমন মহাবপু হয়ে উঠেছিল। একটুখানি বারুদ পুড়ে তেমনই বিস্ফুরিত হয়। বহুগুণ। মানে অন্তত ৩০ গুণ বেড়ে যায় তার গ্যাসীয় আয়তন, এক সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ে। এত বিপুল আয়তন গ্যাস আর চাপ ধরে রাখার জায়গা কোথায়, ওইটুকু খোলার মধ্যে? সামনের দিক খোলা। অতএব সমস্ত গ্যাসীয় শক্তি বুলেটকে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। আয়েদ্যাত্তের ভেতরে প্রসারমান গ্যাসের ঠাই নেই। তাই সেও বুলেটের পিছু নেয়। বাতাসে প্রচণ্ড জোরে থাকা দেয়। এই থাকার স্থানীয়

বাতাস দূরে সরে যায়। সে জায়গার চাপ কমে যায়। আশপাশের হাওয়া ছুটে আসে। বাতাসের এই সঙ্কোচন-প্রসারণেই সৃষ্টি হয় বিকট আওয়াজের। বাতাসের এই থাকাথাকি কমাতে পারলেই চুপচাপ কাল হাসিল, বিকট আওয়াজ হয় না।

আর এই কার্টুজই করে সাইলেন্সার। গ্যাস বাইরের বাতাসে আছড়ে পড়ার আগে এই সাইলেন্সার যন্ত্র তার শক্তিকে লঘু করে দেয়। ইংরেজি সিনেমায় আকছার দেখা যায়, লম্বা নলের মত একটা কিনিস পিস্তলের মুখে প্যাচ ঘুরিয়ে আটকে নিয়ে গুলি ছুঁড়তে। ওটাই সাইলেন্সার যন্ত্র। এর ভেতরে সারিবদ্ধভাবে সাকানো থাকে ধাতব পাত। যার পোশাকি নাম ব্যাফল। প্রতিটি ব্যাফলের মাঝখানে থাকে একটা গর্ত। যার মধ্যে দিয়ে বুলেট গলে বেরিয়ে যায়। এই গর্তটা

অনেকটা চক্রবাহের মত। অভিমুখ্যর মত বুলেটই প্রবেশ করতে পারে। অনুসরণ করা গ্যাস ভীম, ঘূর্ণিঝড়ের মতই আটকে যায়। গ্যাস ব্যাফলের মধ্যবর্তী স্থানগুলোয় প্রসারিত হয়। এই প্রসারণের ফলে ওদের গতিবেগ কমে যায় বেশ ভালরকম। ফলে, নলের বাইরে যখন বেরিয়ে আসে তখন সে হানিবল বা হীনবল। সে আর বাতাসে আলোড়ন তুলে গোলমাল পাকাবে কী করে!

সাইলেন্সার লাগানো শব্দজন্মের ব্যাপারটা থাকলেও গ্যাসের গতি আটকানোর দরুন বুলেটের গতিবেগও কিছু কমে যায়। এ ছাড়া সাইলেন্সার অকেজো হয়ে যেতে পারে, যদি নলের মধ্যে বুলেটের গতিবেগ (মাকুল ভেলসিটি) শব্দের গতিবেগের চেয়ে বেশি হয়। সে ক্ষেত্রে বুলেট নিজেরই বেনস হয়ে বাতাসে গুতিয়ে বেশ জোর আওয়াজের সৃষ্টি করতে পারে।

সমীরকুমার ঘোষ



প্রসঙ্গ : 'জ্যোতিষ ... বিজ্ঞান?' — প্রত্যাশা পূর্ণ হল না

'জ্যোতিষ কি আসলো বিজ্ঞান?' পুস্তকটি পড়ে মনে হয়েছে এই লেখা কালের জন্যে। নিরক্ষর মানুষদের জন্য নয়, সেটা বলাই বাহুল্য। আবার, শিক্তরা — যারা সত্যি হাত-সেখা-আংটি পরা ইত্যাদিতে নির্ভর করে বাড়ি-গাডি করেছেন বলে বিশ্বাস করেন, মামলা-মোকদ্দমায় জরী হয়েছে বলে বিশ্বাস করেন, অফিসে পদোন্নতি করেছেন বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা এ বই পড়ে তাঁদের নির্বাচিত পথ থেকে তিসার্ধও সরছেন না। কেননা, হাত-সেখা-আংটি-পরা ব্যাপারটা তাঁদের কাছে একেবারে পরীক্ষিত সত্য। ভূতীয়, 'পাটোয়ারী' বুদ্ধিবাদী amorphous এক শ্রেণীর মানুষ যারা যেখানেই ছাই সেকেন, সেটা অমনি উড়িয়ে দিয়ে থাকেন অমূল্য রতন আবার আশায়। এসেছে একটা ধাক্কা। চতুর্থ শ্রেণীতে আছেন আমার মতো হস্তভাগারা — গণহকার (এবং কারিগরী)-দের ছবি সৈনিক কাগজে বা রাজ্যের হোর্ডিং-এ দেখলে যাদের আপাদমস্তক জ্বলে যায়, নিম্নলি আক্রোশে রক্তচাপ বেড়ে যায়। গণহকার (এবং কারিগরী)-দের অপদহ করার জন্য মনে মনে যুক্তির প্যাঁচ আঁটতে গিয়ে যারা হঠাৎ টের পায় যে একটা ভুলের অঞ্চল ব্যাপকভাবে চালু জিনিষকে ভুলে বলে প্রকাশ্যে যুক্তিসংস্কারে দেখানোটা কত লজ্জা কাঙ্ক্ষ। এইরকম কিছু যুক্তির বোঁকে এবং তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের আশায় অমলেন্দুবাবুর বইটি তুলে নিয়েছিলাম। কিছুটা হতাশ হয়েছি পড়ে। অর্থনৈতিকদের অমলেন্দুবাবু কিছু হালকা যুক্তি দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন। হিরোশিমা-নাগাসাকির বোমাবিস্ফোরণে ভিন্ন ভিন্ন রুশির বহু লোকের এক লহমায় একই ভাগ্য-নির্ধারণ, চীনা উপকথা, বুদ্ধদেবের বাণী, মেল্লিকোর ভূমিকম্প, একই মূর্ত্তে জমগ্রহণ করা দুটি শিশুর ভিন্ন ভাগ্যগতি, ভাগ্যবিপর্যয়গ্রস্ত বহিমবাবুর জ্যোতিষ-বিষয়ে ইত্যাদি নানা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অমলেন্দুবাবু-এ বুদ্ধজিকির অসারতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বলতে থিখা লাগছে যে এখানে কোনো যুক্তি নয়; যুক্তির উপহাসনার

একটা প্রাথমিক সোপান-মাত্র। এ সব বহু জ্ঞানানুশীল তথ্য দিয়ে যে-যুক্তির পথে আসা প্রয়োজন ছিল, সে-পথ লেখক যত্নবর্নিত। ফলে গোটা ব্যাপারটাই গেছে বেশ দুর্বল হয়ে। অমলেন্দুবাবুর অসম্মান মেধা যে এ সব হাল্কা কথাইর আলস্য নিয়েই ইতি টানবে, তা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। আমার প্রত্যাশা অনেক বেশি ছিল। শিক্তদের জন্য অমলেন্দুবাবুর prescription হলো — বিজ্ঞানের মূল লক্ষণগুলো কী এবং হাত-সেখার বুদ্ধজিকিটা আগাগোড়াই সে সব লক্ষণগুণ্য, অতএব সেটা বুদ্ধজিকিই। আমরা সবাই জানি বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল, নতুন নতুন পরিবর্তিতর উদ্ভবের সাথে পরিমার্জনীয়। আমরা সবাই এ-ও জানি যে হাত-সেখা বুদ্ধজিকির ভিতটা সেই একই অপরিবর্তনীয় নবগ্রহের কাঠামোর ওপর খাড়া করা আছে। শিক্তদের কাছে এটা কোনো নতুন ধরার নয়। তবু তাঁদের মধ্যে যারা হাত সেখাবার তারা দেখাবেই। মল আঙুলে বিল আংটি ধারণ করে 'আরো বড়ো' হওয়ার অদম্য বাসনা তাঁদের ঘাবে না। পেশাগত যোগ্যতা, মেধা ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির কোনো ঘাটতি না থাকা সত্ত্বেও বহু উচ্চশিক্ষিত, সুভার সম্ভ্রান্ত উচ্চমনের এবং মানের নাগরিক এ বুদ্ধজিকি থেকে নিজেদের সরিয়ে আনতে পারছেন না। বহিমবাবু কন্যা-ভাগ্যবিপর্যয়গ্রস্ত হয়ে এ বুদ্ধজিকির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন — এটা বড়ো কথা নয়; তাঁর মতো উচ্চবুদ্ধিবৃত্তিমাত্রী মানুষ কেন এ বুদ্ধজিকির নিকে পর পর দুবার আদৌ বুকুচ্ছেলেন, এটাই মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল। অমলেন্দুবাবুর প্রাঞ্জল সহজ ভাষায় এসব মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থাকলে তাঁর রচনাটি অন্য চেহারা নিত।

এ বুদ্ধজিকিটার বিরুদ্ধে লড়াই প্রকৃতভাবে জোরদার হতে পারত কৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণগুলির মাধ্যমে। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেয়ে ওই আত্মা-ধর্মী কথাবার্তার ওপরই যেন বেশি নির্ভর করেছেন লেখক। তা না হলে এত অব্যবহ, এত দায়সারাজাবে 'অয়নচলন' — এর বিবরণের সমাপ্তি ঘটলো কেন? 'ক্রান্তিবৃত্তকে মাফকনে রেখে, ৯ ডিগ্রি উত্তরে এবং ৯ ডিগ্রি দক্ষিণে, এমন ১৮ ডিগ্রি প্রশস্ত পথ' — এর অবস্থান বোঝা এত কষ্টকর কেন? এ সব মোক্ষম অগ্র যত্নের সঙ্গে, কৌশলের সঙ্গে, প্রয়োগ করলে দুটিসং হতে পারতো বুদ্ধজিকিবাদের রাশিচক্রের ইমারত। কিন্তু এ সব সুযোগ ঘুরেই অবলোকে করে অমলেন্দুবাবু চলে গেছেন হাল্কা কথায়, যেমন — ইউরোপ-আমেরিকা-চীন-মেক্সিকো ইত্যাদি দেশের গণহকার (এবং কারিগরী)-দের রাশিচক্রের ভাগ নিয়ে মতান্তরের বিষয়টিতে। এবং এখানে মারাত্মক একটি ভুল করে বসে আছেন তিনি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন মতান্তর মানসেই

বিশ্রান্তি, আর বিশ্রান্তি মানেই অপরিস্রব বা বৃদ্ধকর্কি। কিন্তু বিশ্রান্তি কি আমাদের পদার্থবিশ্বের মধ্যে নেই? Max Planck যখন 'Quanta'-র প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন বিশ্রান্তি ঘটেনি? Einstein যখন Quantum Mechanics প্রস্তাধান করেছিলেন তখন বিশ্রান্তি ঘটেনি? Niels Bohr-এর প্রস্তাবিত আণবিক Planetary model যে আর্ক প্রায় গল্পকথা এ কথা অমলোদ্ভাবুর মতো সুশুণিতত্বের স্বরণ করতে বলা আমার ধৃষ্টতা। তবু বিবয়টা পাড়লাম এই কারণেই যে, রাশিচক্র ভাগের ব্যাপারে নানা ধূনির নানা মত কিন্তু গণৎকারদের বৃদ্ধকর্কটাকে ধরিয়ে দেবার পক্ষে কোনো সবল যুক্তিই নয়।

একই রকমের কুশালা সৃষ্টি করেছেন লেখক, গুরু ও মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে মানুষের মনের myth-গুলোকে নিয়ে। আমরা সবাই জানি যে, প্রকৃতির শক্তিগুলো যখন মানুষের অগম্য থাকে, তখন মানুষ কল্পনার পাখা মেলে ব্যাপারগুলো বোঝার চেষ্টা করে। ('পথের পাঁচালি' বইয়ের 'সর্বভূমি' যেমন মেঘ ডাকলে বলে 'দেবতার নলপাচ্ছে') এটা অদি মানবের কাছে বৈজ্ঞানিক যুক্তিরই নামান্তর। প্রকৃতির এই শক্তিগুলোর কারণ যখন মানুষের জানা হয়ে যায় তখনো সবলভাবে থেকে যায় এই myth-গুলো — আমাদের collective unconscious-এ স্বপ্নে, সংস্কৃতিতে, এবং বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করতে থাকে আমাদের কাব্যসাহিত্যকে। সুতরাং কোনো গ্রহের লাল রঙ দেখে কোনো যুদ্ধবাক জ্ঞাতির যদি রক্ত-স্রবণের কথা মনে আসে এবং সেই গ্রহকে তারা তাদের যুদ্ধের দেবতার নামে চিহ্নিত করে, সেটা কল্পনা বটে উদ্ভূত নয় মোটেই। একই কথা কোনো গ্রহের গ্যাসীয় বিবাক্ত পরিমণ্ডল সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে কোনো জ্ঞতি যদি সেই গ্রহকে নিছক উচ্ছলতার জোরে সুন্দরী প্রেমের দেবী বলে কল্পনা করে। Myth-টা উদ্ভূত নয়, উদ্ভূত হচ্ছে এই myth-গুলোর আধুনিক কলিত রূপটা, যেটা ভাঙিয়ে আধুনিক ডক্টরেট-করা গণৎকার (এবং কারিগরী) করে যাচ্ছেন।

এবারে আনছি গ্যালিলিও প্রসঙ্গটা। অমলোদ্ভাবু লিখেছেন যে গ্যালিলিওকে ৭০ বছর বয়সে 'অপরাধী' হিসেবে সাব্যস্ত করা হলো এবং অঙ্ককার শাস্তিধারে অকথা নির্ধাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

এই তথ্যটা ভুল। বিজ্ঞানের ইতিহাস-সংক্রান্ত কোনো প্রামাণ্য বইতে একথা লেখা নেই যে গ্যালিলিও-র ওপর অকথা নির্ধাতন করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বারান্তরে বিস্তারিতভাবে লেখার ইচ্ছা রইল।

সৌমিত্র সাহিত্যী
কল্যাণী

সম্পাদকের সামান্য জবাবনি

জ্যোতির্বিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এ বই লিখেছেন 'উৎস মানুষ'-এর পাঠক সমাজের কথা মাথায় রেখে, যে উৎস মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অ-বিমুক্ত সাধারণ-শিক্ষিতদের চেতনার কাছে পৌছানোর চেষ্টা করে চলেছে। এ কাজে যুক্তি-বিজ্ঞানবাদের গাভীর, তথ্য-তত্ত্বের গভীর বিস্তার এবং জ্ঞান-বৈদম্বের সঙ্গে সহকারোধ্যতা, সরলতা এবং সুখপাঠ্যতার সমঝোতা করতে হয় খুব সাবধানে। এতে গ্রহের উদ্দেশ্য বা মান বিদ্রুত হলে অবশ্যই আমাদের সজাগ হতে হবে। এবং এই কারণেই প্রত্নলেখককে ধন্যবাদ। তিনি, কঠোর ভঙ্গিতে হলেও, অকপটে যে সমালোচনাগুলো করেছেন সেগুলি আমাদের কাছে লাগবে; পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের আগে প্রাক্ত্ন লেখক অকপটই সমালোচনাগুলির প্রতি মনোযোগ দেবেন। ... তবে 'কাদের জন্য পুস্তকটি লেখা' এই গন্ধ (প্রত্নলেখকের) প্রসঙ্গ দুটো কথা সর্বিনয়ে বলি। এক, প্রকাশের মাত্র ৬ মাসের মধ্যে প্রায় তিন হাজার মানুষ দেখছেন এ বই কিসে নিয়েছেন, পড়তে। দুই, 'শিক্ষিতদের কাছে নতুন ধরন নয়' তবু তাঁরা আণ্টি-ঠিকৃদ্ধি মনে, খুব সতি। কিন্তু আরো সতি হল, সাময়িক-আর্থিক-মানসিক পীড়নে সহনশীল বয় শিক্ষিতজন জ্যোতির্বিদ্যার নিয়ে সোটাঁনায় ভোগেন। তাঁদের মনে জ্যোতির্বিদ্যার অসরভেদে যুক্তি সহজ করে বারবার ঢুকিয়ে দিতে একসময় উত্তরণও ঘটে, অপরিস্রব থেকে বিজ্ঞান চেতনায় উত্তরণ। লঘু মনে হলেও অমলেন্দুবাবুর এ পুস্তক সেই গুরুকর্মটি সাধন করবে বলে আমাদের ধারণা।

উৎস মানুষের বিশেষ ত্রয়ী সংখ্যা

নদী বন্দর বন্যা	১০
আগামী বন্যা প্রতিরোধ	৮
বন্যা নিয়ে বেঁচে থাক	৪

সংগ্রহে রাখুন

প্রাপ্তিস্থান : পত্রিকা অফিস (৩৫৮-৬০৯১ বা
৩০৪-০৯০৪)

পত্রপুট (২৪১-৯৭২৭)

এবং

বুকমার্ক, জনসাহিত্য গ্রন্থালয় (৯৮৩১১২৫-৭৮৮)

প্রাপ্তিসংবাদ

১। প্রকাশ : বারাসাত। ড. রণতোষ চক্রবর্তী। প্রকাশকাল : বারাসাত বইমেলা ২০০১। মূল্য ৩০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান : ১) গাশৈয়বাবাটী : ৭ কে এন সি রোড, বারাসাত (উ.) এবং ২) পূর্বপত্র : ৯ অ্যান্ডার্নি বাগান লেন, কলকাতা-৯।

ঘরের কাছে বারাসাত। তার ইতিহাসে যে এত বৈচিত্র্য এত পুরাতাত্ত্বিক সম্পদ সমাহিত, কে তা জানতো। বারাসাত নিবাসী রণতোষবাবু আপন খেলালে তথা সংগ্রহ করেছেন দুর্লভ সব সূত্র থেকে। ১৫/১৬ বছর ধরে আয়তন অনুসন্ধানে রুসস এই অনাড়ম্বর চেয়ারার পেয়ার ব্যাক বইটি। লেখকের নিকটনে তিনি লিখেছেন — ‘এ দেশে কাহিনী ও স্মৃতিকথার বিশেষ প্রসার থাকে সত্যেও কিন্তু মুক্তিগ্রাহ্য, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার রেওয়াজ কম। ... দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা একমাত্র আকস্মিক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেই সার্থক হবে।’ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গ্যাসেয় বাংলার নদী-নালা পথঘাট ভুল-ভ্রমল জরিপ করতে জেমস রেনেল নামে এক সার্ভেয়ারকে দায়িত্ব দেয় ১৭৬৪ সালে। এই রেনেলের জার্নাল ও মানচিত্র রণতোষবাবু উদ্ধার করেছেন। রোমান্থকের সব তথ্য জানা যায় ছোট বইটি থেকে।

কলকাতার বাইরে সাহেবদের বেড়ানোর স্বাভাবিক জায়গাগুলোর মধ্যে একটি ছিল বারাসাত। আমোদ-যুষ্টি চলত। এদেশের প্রথম ফোড়নোঁড় গুরু হয় বারাসাতে। আর ছিল মীল চাষ। মীলকৃতি। অত্যাচার। ভিত্তিমীরের বিদ্রোহ এখানেই। ... আবার অন্যদিকে খ্রীষ্টান্যর ঐতিহাসিক পীঠস্থান এই বারাসাত। মেয়েদের প্রথম পাঠশালা হয়েছিলো এখানেই, বিদ্যালয় প্রায়ই আসতেন। এরকম অতলে অজানা ইতিহাস-কাহিনী রয়েছে এ বইতে।

২। পরিবেশ বার্তা : হাতি হাতি। সম্পাদনা - সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক - পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ, কলকাতা। প্রকাশকাল-মার্চ ২০০১। বিক্রয়মূল্য নেই। যোগাযোগ : সচিব, পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ, ৪/১৯ এম. আই. ভি. টু., গল্ফ গ্রীন, কলকাতা ৭০০ ০৯৫।

ছোট পুস্তিকা পরিবেশ বার্তা ‘হাতি হাতি’ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশনা ইউনাইটেড স্টেটস ফিল অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ সার্ভিস’-এর ‘এশিয় হাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা’ প্রকল্পের অঙ্গবৃত্ত এবং আমেরিকাভারের ‘সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন’-এর ‘বিদ্যালয়ে জাতীয় পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রম’-এর অংশ।

বইটিতে রয়েছে সম্পাদকের জবানি — হাতির ভাণ নেই। হাতিদের প্রধান শত্রু গোশালিকারী। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন (১৯৭২) অনুসারে হাতি শিকার নিষিদ্ধ। ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চলে হাতির শিকারের জন্য চোরশিকার হয়েই চলেছে সেই সম্পর্কে পাঠ্যকাক তথ্য সমৃদ্ধ খবর বিস্তৃত পরিসংখ্যান দিয়ে জানানো হয়েছে। হাতি সংরক্ষণ সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর এই পুস্তিকার একমাত্র লক্ষ্য। এতে রয়েছে হাতি নিয়ে বাংলা ও ইংল্যান্ডে প্রকাশিত বইয়ের একটি তালিকা। ভারতবর্ষের হাতির সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলির একটি মাপও রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার হাতির নাম রয়েছে। রয়েছে আফ্রিকান এবং এশিয় হাতির প্রধান পার্থক্যগুলির তথ্য। হাতির বিবর্তনের গল্প সহ এদের গঠন ও বৈশিষ্ট্যের তথ্য রয়েছে এই প্রকাশনায়। তাছাড়াও রয়েছে হাটিকে ভলবাসার নানা গল্প, হাতি সম্পর্কে সাধারণ তথ্য তথ্য বিশেষজ্ঞদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞান। বই-এর শেষে বন্ধে ‘হাতির জন্য আইন’ রীতিমত মূল্যবান হবে বন্যপ্রাণী সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তি ও সংস্থাদের কাছে।

গ্রাহক চাঁদা

২০০১ থেকে উৎস মানুষের নাম হয়েছে প্রতি সংখ্যা ৮ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা। ডাক খরচ যথারীতি আমদেরই থাকছে। ডাকযোগে গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা :

বি ডি ৪৯৪

স-স্ট লেক

কলকাতা ৭০০ ০৬৪

চেক বা ড্রাফট চাঁদা পাঠালে UTSA MANUSH নামেই দিতে হবে। M.O. কুপনের নীচে নিজের নাম ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা চাই। বইরের চেক-এ অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হবে।

সংক্ষেপ

নতুন বিক্রয়কেন্দ্র ও পরিবেশক

পত্রপুট

৩৭/৯, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

(হারিসন রোডের উত্তর দিকে গলিতে)

ফোনে যোগাযোগ : ২৪১-২৭২৭ এবং ৩৫৭-৬৩৯১

(জ্যোতি) ৩০৪-০২০৪, ৩৪৩-৪১৫২, ৪৬৬-৯৪০৫

জলাভূমি প্রতিরক্ষা প্রয়াস

হাওড়া জেলার বালি সংযোগস্থান বিভিন্ন বোডার সংযোগস্থল থেকে পূর্ব দিকে সভানারায়ণনগর পর্যন্ত পরভা রেলওয়েল ৩৫ বিঘে সরকারি খিল সূত্রাংশ বিক্রাস, পরেশ ওহর মত প্রমোটারেরা যেমন তাপকিণ্ড ও কেমের কাগো ছাই ফেলে ভরাট করছে, অরণ্যলম্বাহকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ১০০ বছরের পুরনো গাছ কাটা হচ্ছে, তেমনি সংযোগস্থলের ডান পাশে জীতেশ্বর সিং-এর মত প্রমোটার সরকারি খিলে মাটি ভরাট করে মোটর গ্যারেজ বানানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এ সবের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষজন নাগরিক কমিটি তৈরি করে প্রতিরোধে সম্মিলিত হয়েছেন। কমিটির পক্ষে দাবি উঠেছে ঐ সব খিলে '৬৮ সাল থেকে নিয়ুক্ত মৎস্যচাষীদের স্বার্থরক্ষায় সূচনশীলভাবে মৎস্যধনুকের উদ্যোগে সমঝা চাষের ব্যবস্থা করার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার এবং এছাড়া বন্যা প্রতিরোধে জলাভূমিকে জলাধার হিসেবে ব্যীড়িয়ে রাখার দাবি।

ভাড়া আরও দাবি তুলেছেন সরকারি জলাভূমি প্রমোটারদের হাতে তুলে দেবার বড়মুঠো পিণ্ড বাকিদের বিরুদ্ধে প্রাসানিক তদন্তের। পঙ্কায়ত, বালি ধান, বি ডি ও, এস ডিও, কনসার, বিদ্যায়ক, জেলাসভাপতি, মৎস্যমন্ত্রী, পরিবেশমন্ত্রী সবার কাছেই প্রমোটারদের হাত থেকে সরকারি জলাভূমি রক্ষার জন্য আবেদন করা হয়েছে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে। প্রথম মহায়া বালি খানার উদ্যোগে জীতেশ্বর সিংকে গ্রেপ্তার করে 'ওয়েস্টবেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিসারিক (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৯৭'-এর জমিন-অযোগ্য মামলায় আপিলতে পাঠালেও অমুখ্য হাওড়ার প্রোন্সায়, তার ছাড়া পেয়ে যাওয়ার চিন্তায় এলাকার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ছাড়া পাওয়ার পর ওই ব্যক্তি খিণ্ডা উৎসাহে অন্য অনেক প্রমোটারদের সঙ্গে নিয়ে ৩৬ বিঘে জলাভূমি ভরাটের কাজে হাত দেয় ও মৎস্যমন্ত্রীর বিশেষে নাগরিক কমিটির পক্ষে '১৬ই জুন জলাভূমি বিবাস পালনের' হাতে লেখা সমস্ত পোস্টার ছিঁড়ে দেয়। প্রাথমিক বিধা বধ কাটের ও প্রমোটারদের ভয় ভীতি অগ্রাহ্য করে নাগরিক কমিটি ব্যাপক জনপাকে সাথে নিয়ে তাদেরকে উদ্বেগ করে। রাতের অন্ধকারে আনাচে কানাচে প্রমোটারি সলিটি মস্তানদের আনাগোনাও বেড়ে গেছে। ১নং ও ২নং পঙ্কায়ত প্রধানের ভূমিকায় মানুষজনের ক্ষোভের কারণ হল, এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে সরকারি খিল ভরাট, গাছ কাটা ইত্যাদির বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেওয়া, পুলিশের সহযোগিতা নেওয়া, সরকারি খিলে মাটি ভরাটের বিরুদ্ধে নোটিশ টাঙানো, এ সব পদক্ষেপ তো নেওয়াই হয়নি,

উপরন্ত ৩০ বছরের ট্যাক্সবিহীন জমিতে প্রমোটারদের নামে ট্যাক্স কাটা হয়েছে। নাগরিক কমিটি এই লবিও করেছে সরকারি জলাভূমি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

গত ৫ই আগস্ট বালি দুর্গাপুর নাগরিক প্রকৃতি কমিটি একটি সাধারণ সভার ডাক দেয়। উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ সভা বা নাগরিক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে ওই নাগরিক কমিটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া এবং একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করে আরও সংগঠিতভাবে এলাকার বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার সমাধান করা।

বালি দুর্গাপুর অঞ্চলে জলাভূমি বোঝানোর যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, এবং প্রাথমিক স্তরে তার জন্য কিছু কিছু মাটি/ছাই ইত্যাদি কেন্দ্রও শুরু হয়েছিল, সেই সব কাজ বন্ধ করে এই নাগরিক প্রকৃতি কমিটি। পুলিশ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং নিক্রমের দ্বারা আশঙ্কাদায়ক সমাধানে জলাভূমি বোঝানোর প্রথম ধাপের কাজ রুখে দেওয়ার ফলে এলাকার মানুষজনের মধ্যে উৎসাহ ও উদীপনা বাড়ে। তার ফলে এলাকার মানুষের উদ্যোগেই এই নাগরিক কনভেনশন ডাকা হয়েছিল গত ৫ তারিখে। কিন্তু প্রকৃতি কমিটির সৌকর্যের সভাখালে লৌহে দেখেন যে ইতিমধ্যেই রাজ্যের শাসক দলের স্থানীয় এক নেতার নেতৃত্বে অন্তত ৬০-এর মত বহিরগত (অনেকেই) ছেলে সভায় উপস্থিত। সভার শুরুতে উদ্যোগীদের একজন কেন এই সভা, নাগরিক কমিটির পূর্ব ইতিহাস কী এসব বিষয়ে বলতে শুরু করা মাত্রই শাসকদলের সদস্যরা হৈ হৈ করে গণযোগ্য তৈরি করতে শুরু — 'তুচ্ছ সব অজুহাত দেখিয়ে। তারা সভা পও করার জন্য তৈরি ছিল বলে নাগরিকরা বুঝতে পারেন। ঘাইহোক, এরপর বক্তা বিনা বাকাব্যে তুলে স্বীকার করে, সভাপতি-র নাম ঘোষণা হয়ে কিছু ফের বক্তব্য রাখতে গেলে তাকে আর বলতে নেওয়া হয় না। হৈ হৈ করে, বেঞ্চ বাকিয়ে তাকে থামিয়ে নেওয়া হয়। এরপর সভাপতি কমিটির নীতি আদর্শ কী হবে, কারা এই কমিটির সদস্য হতে পারবে ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত বিবৃতি পাঠ করতে ওঠেন। বিবৃতির একজায়গায় ছিল কোনও রাষ্ট্রনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্য এই কমিটির সভা হতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গেই ওদের মধ্যে প্রবল আপত্তি ওঠে — 'এই লাইন থাকে চলবে না' ইত্যাদি। এরপর তারা একে একে বক্তব্য রাখতে উঠে উদ্যোগীদের নাম ধরে ধরে ব্যক্তিগত কুৎসা করতে থাকে, জলাভূমি বোঝানো কেন দরকার, তার সংকল্প অনেক অশুদ্ধি নিয়ে বক্তব্য রাখে এরপর তাদের নেতা বক্তব্য রাখতে ওঠেন। সেই সময়ে তাঁর বক্তব্যে কিছু আপত্তিকর কথা থাকায় সভাপতি যৌথিকভাবে আপত্তি করেন। বাসু তার পরেই ওরা প্রবল হৈ চৈ, নানাবিধ শাসনি, ধুংসিত চিৎকার করে সভা বানচাল করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ওই দিন সভা আর করা যায় নি। অর্থাৎ পরিকল্পিতভাবে এক অসমিতিভাড়া সৃষ্টি করা হল।

প্রতিবেদক : নাগরিক কমিটি সদস্য



হয়েছে

□ গত ১ অগাস্ট ২০০১ বর্ষীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে গোলাচন্দ্র স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয় তাঁর ১০৬ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে। হিমাদীপ

গোহাষী, ড. জয়ন্ত বসু, দেবপ্রভ মণ্ডল মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করেন। স্মারক বক্তৃতা করেন ড. মুদ্রাজয় প্রসাদ গুহ। সভায় উপস্থিতির সংখ্যা খুব বেশি দেখা যায়নি।

□ ১১ অগাস্ট ২০০১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে একটি শ্রোতাসমৃদ্ধ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল — বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে 'জ্যোতিষবিদ্যা' প্রশয়নের উদ্যোগের বিরুদ্ধে। উদ্যোক্তা-পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মন্ত্রকালপাড়া জেলা কমিটি বিশিষ্ট আমন্ত্রিত আলোচকদের তালিকায় ছিলেন, অধ্যাপক যশপাল, পূর্ণা ভার্গব, সভাসাধন চক্রবর্তী, অশোক দাশগুপ্ত এবং উৎপল দত্ত (মঞ্চের সম্পাদক)। সহযোগিতায় বিবিধ বায়শশী গণসংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান পরিষদ ও গণসংগঠন সংঘ ছিল।

□ রহড়া মিশনপাড়ার 'খারিজ' নাট্য সংস্থা তাদের 'গাছ' নাটকে ৭৫তম অভিনয় উপস্থাপন করে রহড়া সুরেন্দ্রকুমার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, গত ৫ অগাস্ট রবিবার। বিশ্বকাপী পরিবেশ দূষণ, অরণ্য নিধন এবং মানুষের আগ্রাসী লোভের বিরুদ্ধে এক নির্মল পৃথিবীর অধেষণে সোচ্চার এই যক্ষসেজের মনোগ্রাহী নাটক। পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি হাতিয়ার হতে পারে বলে দর্শকদের মনে হয়েছে। পদনাটিকার কার্যকরী বৈশিষ্ট্যগুলি নিপুণ সঙ্গীত-বাদ্য সমন্বয়ে কুপীনাট্যের আনন্দ চমৎকারিত্বে নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গণ-চেতনার আদর্শে নির্মিত খারিজের 'গাছ' নাটক সম্পর্কে আগ্রহী পাঠকরা যোগাযোগ করতে পারেন — ৫৬৮ ০১৮৭ এবং ৫৬৮ ২৯৩৫ নম্বরে।

□ ইউরেকা জনস্বাস্থ্য প্রকল্প : অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্থ এবং অনুকোশিক-এর সহায়তায় আইসিটিএলএর এই সংস্থা 'মানুষের শরীরে দূষণের রাজ্য নির্ণয়'—এর ব্যবস্থা করে।

□ কোয়ার্ক সায়েন্স সেন্টার : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে কাডগ্রাম রবুনাথপুরের এই সংস্থা নানা কর্মসূচি পালন করে। পরিবেশ সুরক্ষার দাবি জানায়— কাডগ্রাম মহকুমার প্রতিটি কারখানাকে দূষণমুক্ত হতে হবে; গাছকাটা বন্ধ, বনসুজান করতে হবে, বনসম্পদ বিক্রির ৭৫ ভাগ বনরক্ষী কমিটিতে দিতে হবে ইত্যাদি।

□ সাধী পদাভিক : মেদিনীপুর হিজলবেড়িয়ার এই সংগঠন রক্তশান, মরণশোণর সেহান ও চক্কুনানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনাসভার আয়োজন করে ১৬ জুন,

হিজলবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এতে যোগ দেন যশন বসু, মলয় রায়, ডা. অশিস মাস্তা, ডা. অর্থা মাস্তা, ডা. স্বতীপ্রনাথ সামন্ত প্রমুখ। এখানে প্রায় ১০০ জনের চোখ পরীক্ষাও করা হয়।

□ মুদ্রচিত্তা : যাদবপুরের এই সংগঠন পালকাজার মোড়ের সংস্কৃতি চক্র মঞ্চে জ্যোতিষশাস্ত্র বনাম জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে এক বিতর্ক সভার আয়োজন করে। মূল বক্তা ছিলেন ড. অমলেশু বসোপাধ্যায়। সভায় নিম্মা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার।

□ বিজ্ঞান দরবার : হালিসহরের বিজ্ঞানমণ্ডলের ১৬ জুন মরণশোণর চক্কুনান নিয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন করে। উল্লেখ্য, প্রয়াত ননীগোপাল গাঙ্গুলি ও যোগেন চক্রবর্তীর চোখ দুটি আই ব্যাঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নেয় বিজ্ঞান দরবার। আলোচনার অংশে নেন জয়দেব দে, দেবজিৎ চক্রবর্তী, নিখিল রায়, স্বপ্নাসাধী রায়, শ্যামল অধিকারী, প্রতুলকুমার দাস প্রমুখ।

□ বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে গণবিজ্ঞান সমন্বয়ের উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খারভাগা হলে। ডা. পার্শ্বসম্মিত গুপ্ত, ড. পলাশবরণ পাল, ডা. বিষ্ণু মুখার্জি, যুগলকান্তি রায় প্রমুখ একযোগে নিম্মা করেন সিদ্ধান্তের। গানে প্রতিবাদ জানান প্রতুল মুখোপাধ্যায়।

এ নিয়ে কলকাতার হুতিবাগানে প্যালাল দাশগুপ্ত স্মৃতি ভবনেও সারাদিবসব্যাপী এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। জ্যোতিষ-বিরোধী বক্তব্য রঙিন আলোকচিত্র-সহ পেশ করেন ড. অমলেশু বসোপাধ্যায়।

□ সায়েন্স ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ : ঢাকার দক্ষিণ মুগলায় এই সংগঠন তৃতীয়বার বিজ্ঞান দিবস উদ্‌যাপন করল। ২৮ মে বিজ্ঞান দিবসে সংস্থার কর্মীরা 'শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান' শ্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। আয়োজন করে আলোচনা অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান মেলা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। মুগলাপাড়া কাজী জাফর আহমদ উচ্চ বিদ্যালয়ে দুদিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলা বসে। রাজশাহী বিজ্ঞান ক্লাব সমিতি আয়োজিত আলোচনা সভায় অংশ নেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব ফজলুর রহমান, অধ্যাপক এ কে এম আজহারুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, এস এম ইউনুসুর রহমান প্রমুখ।

□ মহলশপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের দিব্যর্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে ২৯ জুলাই আয়োজিত হয় আলোচনাচক্র। বিষয় 'জ্যোতিষ বিজ্ঞান কি না'। বিনম্রন রক্ষিত, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিন্ধনাথ মিশ্র, তাপস সরকার, রুহপ্রসাদ আচার্য, সুদীপ্ত ঘোষাল, দিলীপ পাল প্রমুখ জ্যোতিষ কেন বিজ্ঞান নয় তা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেন।

আজকের সূর্যোদয়

নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের নতুন প্রত্যয়

দীর্ঘ দুই দশকের ঐতিহ্য বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যে নতুন মাত্রা আনার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কলকাতা মহানগরীসহ রাজ্যের সবকটি শহরেই যানবাহনের গতি বাড়াতে গুরু হয়েছে সূষ্ঠ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি চওড়া করা ও মেরামতির কাজ। তৈরি হচ্ছে একাধিক উড়ালপুল ও সাবওয়ে। ফুটপাথ হচ্ছে দখলমুক্ত, জঞ্জাল সাফাই হচ্ছে নিয়মিত, দূষণরোধে নেওয়া হচ্ছে সঠিক ও কঠোর ব্যবস্থা।

এছাড়াও শহরমুখী মানুষের সামাল দিতে গড়ে তোলা হচ্ছে কলকাতার কাছেই নতুন এক উপনগরী। বনস্জন্ন ও সৌন্দর্য কর্মসূচির মাধ্যমে কলকাতাসহ রাজ্যের সবকটি জেলা শহরগুলিকে সাজিয়ে তোলারও ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনে আমাদের এই প্রচেষ্টা শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ৩৪৮০/২০০১/তথ্য ও সংস্কৃতি



প্ৰেছ: অফিস — বিডি ৪৯৪, সন্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪
ফোনে যোগাযোগ : ৪৬৬-৯৪৩৫/৩৪৩-৪১২৫/৩৩৪-০৯০৪/৩৫৮-৬৩৯১

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১ম খণ্ড) (যজ্ঞহু)	৩০.০০	ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচমিশের দাস	২৫.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)	৩০.০০	সাপ নিয়ে কিংবদন্তী	২০.০০
চলতে ফিরতে	১০.০০	বিবেকানন্দ অন্য চোখে	২৫.০০
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়	২০.০০	ঐতিহাসিকের পথে	১২.০০
অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে	৩০.০০	তিন অবহেলিত জ্যোতিষ	১৮.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	১৫.০০	কি আর কেন	২০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	৩০.০০	লুপ্ত হয়ে যায় স্বদেশভূমি	(নির্দেশিত)
প্রতিরোধ : অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	২৫.০০	খাবার নিয়ে ভাবার আছে	২৫.০০
জ্যোতিষ কি আসৌ বিজ্ঞান?	৩০.০০	শেকলভাঙা সংস্কৃতি	২৫.০০
[পরিবৰ্ধিত সংস্করণ]			

নদী বন্দর বন্যা ১০.০০ বন্যা প্রতিরোধ সংখ্যা ৮.০০ বন্যা নিয়ে বেঁচে থাকা ৪.০০

প্রাপ্তিস্থান : পঃপুট (৩৭/৯ বেনিগাটোলা লেন, কলকাতা ৯, ফোন : ২৪১-৯৭২৭

এছাড়া — বুক মার্কেট, পাতিলাম, জনস্বাস্থ্য গ্রন্থালয়, ১০ কার্তিক বোস স্ট্রীট [নিবারণ সাহা]

আগামী সংখ্যা নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে

‘উৎস মানুস সোসাইটি’র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সন্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত
এবং শৈলী, ৪এ, মানিকভাঙ্গা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত

We are thankful to CSIR, Govt. of India, for partial financial support in publishing the journal.



Cur. & Ed. 2001

● আফগান ইতিহাস ঘুরে ঘুরে আসে ●

প্রগতিশীলদের পৈতে নেওয়া ● স্বত্বা'রা তো বন্দিতা হয় না

● বেঠিক এখন সঠিক হয়ে যায় ●

● গ্যালিলিও অন্য চোখে ●



সূচিপত্র

আহরণ : কাবুলস্থ		
সংবাদদাতার পত্র	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০২
ফতা রহি	শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়	২১০
তোমাদের পৈতৃক ...	দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১১
ঠিক বেঠিক	সুজয় বসু	২১৪
বিপর্কয় শ্রোতাবিলাস	ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	২১৭
কিউবার ডাক্তার	ডেভিড দেবদাস (অনুঃ) বরুণ ভট্টাচার্য	২২০
সহস্রাব্দের মূল্যায়ন	অমর্ত্য সেন (অনুঃ) সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	২২১
গ্যালিলিওর নির্বাচন	সৌমিত্র লাহিড়ী	২২৫
কথ বনাম মানুস	সবাসাচী চট্টোপাধ্যায়	২৩০
পুস্তক পরিচিতি	সবুজ মুখোপাধ্যায়	২৩২
সংগঠন সংবাদ		২৩৩
বার্ষিক বিবরণসূচি		২৩৪

বিশ্ববিদ্যালয় : সমীক্ষকম্বর ঘোষ

বীথি : নিবারণ সাহা

প্রাপ্তিস্থান : পান্ডিয়ার, পত্রপুট, বুক মার্কেট

উৎস মানুস

ISSN 0971 - 5800

বি ডি ৪২৪, সেন্টসেক, কলকাতা ৬৪

BD 494, Salt Lake, Calcutta 64

অস্থায়ী কার্যালয় — প্রাক্তি, এস ৬/২, সেন্ট সেক,

কলকাতা ২১

জন ব্রাউন

বব ডিলন

জন ব্রাউন পাড়ি দিন এক বিদেশ উপস্থানে
মুখে পড়াই করতে।
যা অবশ্যই গঠিত তাঁর নরম-ধর্মির করে!
সে ধর্মি দেহ তাঁর তাঁর করে দাঁড়িয়েছিল
কোনো পোষাকে, সবসময়ে।
কষ্টজন্ম গ্রহণ দিয়ে দুখ ওঠিয়ে যা বান্দে—
“যা যা কষ্ট দুখের জোকে ন্যায়ের; আমার
মুখিতে গ্রহণ করে — তুমি আমারই হলে।
তোমার হাতে ধরা বন্ধু আমার মুখে গর্ব আসে।
ক্যাশেম বা বান্দে তুমি, পক্ষ পক্ষি অনেক,
পেগুনো দিয়ে কেমন দাক্ষ্যের সবাই বলে
যখনই তুমি ফিরে আসবেই ধরে।”
পূর্বেরে টেনে টেনে টেনে চলে যেন ...
কখনো সমানে চিঠি আসে যা’র আশ্রয় ...
ভরপুর ভ্রম চিঠি আসা করে। বহুদিন হল
আসে না জে কোনো পত্র।
কখনো ধান কি ভরও যা বেঁধে, বহুই ছিল বার্তা আসা।
অবশ্যে এক পত্রবার্তা এলো যা’র আশ্রয়
“যাও নেমে দেখ, টেনেই অবশ্যে
দিয়েছে তোমার পুত্র নিজের ধরে।”

মুখির গ্রহণিতে করে দুখ; নেমে আসে দাক্ষ্য। বোঁতে চরমিকে
কোমর যে তার চৈনিক সজ্জা, জোষ যে পাড় দ্য!
শেষে সব পোত চলে যেন গর ফোঁটার দেহা যেন।
কিছু নিজের জোষাকও যেন বিশ্বাস আর জ্বা না
বিস্তৃত দুখের তুমি চিঠি, উড়ু শেষে যোগ্য হস্ত।
“তার আমার গোদার হলে, ও কী হল জোর —
আমার মিথি, বন বিভায়ে কোমর যতন এনে বর্বরাম!”
“দেখ দেহি যা? যখন আদি মুক্ত বিরহিনীন্দা
তুমি ভেবেছিলে গর্বের কাজ, সবচেয়ে বড় কাজ।
ওঃ অবশ্য, মেইখানে আদি কী করছিলো জানো?
জ্বা ধারো দ্য ধরে। হজা এখং আত্মকর্মের কাজ।
কিছু বেঁধেই সবচেয়ে ভয় পেন্দাম; বড় টানো মুখ
দুখোমুখি, আদি মেমনাম, অজকে হিহ কনাম,
দেখি ওর দুখ ঠিক আমারই ধরে।” ...

অনুবাদ : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়



কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র

ইক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মপরিচয়নের সঙ্গে ভারতের ইংরেজ রাজের অধীনে তিন তিনটি রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়েছে। ইতিহাসে সে সব লড়াইকে বলা হত আফগান-আফগান যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধ ১৮৩৯-৪২ সালে। উপলক্ষ : রুশ-জাফর চাফ। কান্দাহারের আফগানিছানকে ভয়ানক করে ডাকঘরের দিতে হাত বাড়ালে, ফলে ফলে প্রৌশল্যে, যে করে হোক তা প্রতিরোধ করতে হবে এই ছিল ইংরেজের লক্ষ্য। আর, সেই লক্ষ্যই সামরিক অভিযানে, কাবুলে জেনারেল পুতলেকের অধিবেশনে আসতে বলাকার হয়। সেই বীর ভূতমার হয়ে থাকে মধ্যক যুদ্ধ। প্রায় দুই মাসের ইংরেজ সৈন্যের গোলাবর্ষন হয় অশ্রুপানিছনে। ভারতে গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড আকবার; ওয়াশিংটন নামে একজন প্রৌঢ় চিঠিও লেখে। সেদিন চিঠির অঙ্গপরে প্রেরিতফলে এসেলে নিরাপত্তা জারজ্ঞে। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৭৮ সালে। গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড লিটল। শেষ হয় ১৮৮০ সালে, লর্ড লিটলের আমলে। রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর আফগানরা সন্ধি করে বসে, কিন্তু সেসে সন্ধি কেবলি। কাবুলে নিযুক্ত প্রথম ব্রিটিশ রাজপুত আফগানিয়ার (Cavagnari) নিয়োগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুন হন। জেনারেল বগটস প্রতিশোধ দিতে কাবুল নগর করেন (১৮৭৯)। 'কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র' সেই পটভূমিতেই লেখা। প্রসঙ্গত বলা প্রকার, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধও ইংরেজ আফগানিছানের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারেনি। এমনকি তৃতীয় আফগান যুদ্ধও (১৯১৯) না। উত্তরাফগান, সের, খেতার — সব আধুনিক হাতিয়ারই ব্যবহার করেছিল ইংরেজ। সেই হিসেবে বর্ধন যুদ্ধ, কিন্তু আফগানিছান শেষ পর্যন্ত জয়ীই হয়ে গেল। সন্ধির ফলে ইংরেজ যেমন কাবুলে প্রুত নিয়োগের অধিকার পাবে, তেমনই খাস ইমোয়েল প্রুত নিয়োগের অধিকার হস্তান্তর করে দেয় আফগানিছানকে। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ উপলক্ষে 'কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র' পড়তে পড়তে জোশেপ ম্যামন্ট হয়ে ওঠে যেন 'হেলিওট কুন্সের প্রাচীর বর্ধন প্রাঙ্গণের কৃপাক্ষী'। সেদিনের সঙ্গে কত না মিল একালের সমাজব্যবস্থায়। উগ্রতায়, হিংস্রতায় এবার মনোবিকার সেরে হুজির নব কলংয়ের অধীনেই সমাজব্যবস্থা দ্বিতীয়ের জয়ীরাও। মনে হয়, অধীনের পরাজয়ের প্রাণি যেন এখনও কুন্সের পরাজয় না ওঠ।

এই বাস্তবত চিহ্নিতপথে লেখক ইক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৯-১৯১১)। বর্তমানের প্রচলিত আধুনিক ইংরেজি শিক্ষার শিক্ষিত ইক্রনাথ প্রথমে ইংল্যান্ডে বিদ্যালয় শিক্ষক, পরে অফিসেই। ফ্রান্সের দিকেও গিয়েছিলেন। এখানে একটি দীর্ঘ ভ্রম। ছাত্রও সমাজবাসিত নগর বিহবে অসংখ্য বস-বসে ফিরেছেন তিনি তৎকালের বিখ্যাত সাময়িকি 'কমকসী'র ভ্রম। তবে ছদ্মনাম ছিল 'পঞ্চানন' বা 'পাঁচু ঠাকুর'। ভ্রমের বিবরণে ছিলেন তিনি যার বলে 'প্রতীকশক্তি', তবে সববিষয়েই তিনি ছিলেন খাটি দেশপ্রেমিক। আজকে প্রেমিতেই প্রচুর গ্রন্থ এবং অন্যান্য যুদ্ধ বহন আনতের এখানে অধিকাংশ বাংলা-ইংরেজি সৈনিক প্রত্যাক বা প্রত্যাক সমর্থন লাভ করছে, তখন বাস ইংরেজ প্রত্যাক বাস করে একজন তৎকালিক 'প্রতীক বিদ্রোহী' লেখক যে-ভাবে তাঁকে অথচ বীরা ভ্রমের সাময়িকতার সঙ্গে ইংরেজের সমাজবাদ করে তা ভাবলে প্রত্যাক মধ্য দৃষ্টিতে আসে। ঘটনটি উদ্ভূত করা হয়েছে তাঁর প্রতীকশক্তির বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত দুই বই প্রতীকিত ইক্রনাথ প্রতীকশক্তি-র প্রথম ৭০ থেকে (সেতাল একাল, ৭ প্রকার সেন, কলকাতা-২)।

প্রসঙ্গত, এই প্রতীকিত উৎস মনুষ্য-এ উদ্ভূত করে অনেক মধ্যে তালিখনি প্রকাশনের প্রতি আনন্দের কোনোরকম সমর্থন বা মূল্যবোধ প্রতীকিত আসতে পারে না। প্রৌঢ়বানি শাসনবীতি বরাবরই বর্ধনীয়, নিশ্চয়ই। আনন্দের চিত্রের বেলগ্নি কেবল মানুষ, আনন্দের অঙ্গপরিণতি বা আধুনিক জনসংগঠন। প্রাণি বিদ্রোহ আনন্দের মধ্যে উগ্র প্রৌঢ়বানি শাসনব্যবস্থাকে সন্ধি দিতে পারলে আনন্দের অঙ্গপরিণতি কাছের মিলেগেছে।

৯ উৎস মানুষ

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (১)

প্রাচীনকালে—

ভূমিশিখিত অংশের প্রাতিপূর্ণক নিবেদনমিৎ। পূর্ণ পত্রে যুদ্ধের বিবরণ লিখিতো চাহিয়াছি; সুতরাং আমিও সেজন্য অতিশয় ব্যগ্র ইহা। পদবস্ত্রের কৃষ্ণাঙ্গুষ্ঠে ভর দিয়া আমার এই পত্রের প্রতীকিত করিতেছেন, তাহার সম্মুখ নহি। আপনাদের কৌতুহলের পায়ের আশ্রয় কৃত্তিম্য রাধা উচিত নয় বিবেচনায় আমিও সন্তুষ্ট ইহাতেছি।

যুদ্ধের নাম শুনিলে সকলের মনে একটা ধারণা হয় যে, অনেক লোক সারি দিয়া দাঁড়াইয়া গোলা-গুলি ছুড়িতে থাকে ও ভরওয়াল চালহিতে থাকে এবং সেইজন্য সম্মুখে মণ্ডায়মান আর একদলের আক্রমণ গ্রহণ করিয়া থাকে। পরে একদল সংখ্যাতো দুর্বল ইহা। পরায়ণ করে, অপরাধ তাহাদের পক্ষাৎ সৌভাগ্য যায়; যাহাকে পায় মারে, কাটে অথবা ধরিয়া আনে। আমি যে যুদ্ধ দেখিলাম, ইহা যদি সে রকমের হইত, তাহা ইহা। তাহার বিবরণ লিখিয়া আমি কষ্ট পাইতাম না। এখানকার যুদ্ধ

অতি আশ্চর্য্য এবং কৌশলময়। কাবুলবাসিন্দগণ দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে জ্ঞানে না। একা-এক মন্বযুদ্ধ করিতে ভাল বাসে বলিয়া আমার বোধ হইল।

কাবুলে যাহার বাস, সেই-ই আমাদের শত্রু: যে পুরুষ কাবুলের ভিতর পদচারণা করে, সেই মন্ব-যুদ্ধে অগ্রসর হয়— রবার্ট সাহেব এ কথা আমাকে আগে হইতে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। ফ্রেস কমিশনের মহোদয়ের প্রদত্ত চসমার তপ্তে আমি নিজেও দেখিলাম যে, তাহা যথার্থ। তাহাতেই যুদ্ধের প্রক্রিয়াটা ভালমতে উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

লড়াই এইভাবে হইতেছিল,— মনে করুন, একজন কাবুলী আমাদের বাসার নিকট দিয়া যাইতেছে এবং তাহার দুই হাত দুই পাশে ফুলিতেছে বা দুলিতেছে। ইংরেজীভাষায় বাধ এবং অস্ত্রের একই নাম—আর্ম: সুতরাং ইংরেজী মতে সে ব্যক্তি সমস্ত শত্রু, যুদ্ধার্থে অগ্রসর, অতএব সাধা পক্ষে বধা। আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ইংরেজ পক্ষে, এই মীমাংসা হইবামাত্র তাহাকে রণে পরাভূত করিবার উপায় স্থির করা আবশ্যক; অতর্নি পাঁচ সাত জন সৈনিক সেই কাবুলীটার দিকে সৌভিল, দুই চারিজন দুই একটা ঘুসা ঘানি কাইল, তাহার পর কাবুলী ধরা পড়িল। রবার্ট সাহেব সেনাপতি, তখনই অবিচারক মনেন; তাহার সম্মুখে পাশ্চাত্য কাবুলী আনীত হইবামাত্র, তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি কাশনিয়ারি (১) সাহেবকে ধ্বংস হত্যা করিয়াছে। আমিও দেখিতে পাইলাম, তাহার বিশ্রুটি মুখে হত্যার চিত্র সমস্ত সঙ্গীপমান; তখন আমার চসমা আর রবার্ট সাহেবের একমত হওয়াতে, তিনি আমাকে বলিলেন—খুন করিলে ফাঁসি হয় ইহা যথার্থ কি না?

আমি উত্তর দিলাম একশ বার। তিনি বলিলেন—দয়ার সহিত বিচারকে মোলায়েম করিতে হইবে; একশ বার ফাঁসি দেওয়া বিচারসঙ্গত হইলেও আমি দয়া করিয়া ইহাকে একবারের বেশী ফাঁসি দিব না। তৎক্ষণাৎ কাবুলীর একবার মাত্র ফাঁসি হইয়া গেল।

আমি রবার্ট সাহেবের বীরোচিত এই দয়া দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি। কিন্তু ইহার ভিতর দুইটি দুঃখের কথা উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম এই যে, কাশনিয়ারি সাহেবের সেই যতই কেন প্রকাণ্ড হউক না, তাহার হত্যাকারী প্রমাণে যত সৌকর্য্যে ফাঁসি হইতেছে, তত সৌকর্য্যে তাহাকে আঘাত করিতে হইলে, একটা আঘাতের উপর এক—শ সেড়—শ আঘাত করিতে হইয়াছিল; নহিলে তাহার শরীরে কুলগ্ন না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কাবুলীরা এমনই অল্পপ্রাণ এবং দুর্বল যে, তাহাদের মধ্যে একজনও রবার্ট সাহেবের দয়ার ফলভোগ করিতে পারিতেছে না,—

(১) Cavagmari.

যেমন কেন কাবুলী হউক না, একবার মাত্র ফাঁসি মিলেই তাহার প্রাণান্ত হইয়াছে। আমার বিশ্বাস্য, যে জাতির এইটুকু সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই, ইংরেজের সঙ্গে তাহার যুদ্ধ করা সাজে না। বাঙ্গালীরা কৃষ্ণমান, এই জন্য এই ইংল্যান্ডের এত ভক্ত।

অধিকন্তু দুঃখ এই যে, ফাঁসির আগে যত কাবুলীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের সকলেই আমাকে বলিল যে,— দুইদিন অগ্রপঞ্চাৎ মরিতেই হইবে, সুতরাং মরিতে কোন দুঃখ নাই। কিন্তু এ ভাবে মরিতে একটু কষ্ট হয়, অস্ত্র-হস্তে মরিতে পাইলে এ কষ্ট হয় না। আমার বিশেষভাবে এ কথা কতকটা সত্য; কারণ, ফাঁসিতে মরিতে হইলে মন বদ্ধ হয়, তাহাতে অভিযুক্ত কষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন কাবুলীকে আমি একদিন পরামর্শ দিলাম যে, এমন করিয়া মলা অপেক্ষা যুদ্ধে ক্ষণে ইইয়া ইংরেজের বশতা স্বীকার করাই উচিত। তাহাতে সে অসত্য দুঃখ আমাকে কতকটালা কট-কাটা বলিয়া শেষে চীৎকার করিয়া উঠিল,—কাবুল পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কাবুলী কখনো হইবে না; যেমন মূর্খ তেমনি শাস্তি: পাণ্ডুর ফাঁসি হইল।

এইরূপে ফাঁসি দৌবতেছিলাম, আমোদ করিতেছিলাম এবং বিশ্রুগ্ৰাপণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে সহসা একদিন রবার্ট সাহেব আমাকে বলিলেন যে, আমাদিগকে ঘেরাও করিতেছে, চলো আমরা এখন হইতে পলাইয়া যাই। 'যে আজ্ঞা' বলিয়া আমি আগে আগে সৌভিলাম; তাহার পর শেরপুরে আসিয়া আবার আমার ক্রমায়েতবস্ত্র ইইয়া বলিয়া রাখিয়াছি। বাহিরের খবর কিছুমাত্র জ্ঞানি না। রবার্ট সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা দিয়া যখন করিতেছি, সেই কথাবার্তার সারমর্ম লিখিয়া এ পত্রের উপসংহারে করিতেছি। যদি ফিরিয়া না যাই, কিম্বা আর পত্র লিখিতে না পাই, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক গৃহিণীর হাতের শাখা বাঁড় আপনি বুলিয়া দিগেন, এবং আমার শালগ্রামের সেবার ভার লর্ড লিটনের (১) উপর লিগেন, এই আমার অনুরোধ।

আমাদের শেরপুরে ঘেরাও হইবার দিন, দুঃখ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া রবার্ট সাহেব আমাকে বলিলেন,—বেশো, তুমি যেমন উপযুক্ত লোক, অন্য কাগজের সংবাদ-সংকলন যদি তেমনই হইত, তবে আমার ভাবনা কি? তাহারা যুদ্ধের কিছুই বোঝে না, কিছুই জ্ঞানে না। অতঃপর আমাকে বিবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে বাচাইবার জন্য আমাঃ যুদ্ধ ছাড়িয়াও বাধ্য থাকিতে হয়। তাহারা এখানে না থাকিলে, এই যে আমার বন্দী অবস্থায় আছি বলিতেই হয়, ভারতবর্ষে অন্যই

(১) তখনকার হুজুরট।

সংবাদ যাইত যে, সমস্ত কাবুলীকে ধ্বংস করিয়া আমরা ক্ষয়লাভ করিয়াছি। এই জন্য সংবাদবাতাসের সম্বন্ধে এমন নিয়ম করা আবশ্যিক, যাতে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে না আসিতে পারে। আমি সেবিলাম, কথা যথার্থ।

আর একদিন রবাত সাহেব বলিলেন,—সেখা, কাবুলের যুদ্ধ অধর্মসম্পূর্ণ বলিয়া অনেক অনুযোগ করিতেছে, কিন্তু ইহা বড় অন্যায়। খুষ্টিয়ান ধর্মই সত্যধর্ম; সুতরাং ইহার প্রচার আবশ্যিক, এ দিকে ধর্মের প্রতি সহজ কাহারও অনুরাগ হয় না। এমন স্থানে যুদ্ধ ভিন্ন নিরুপদ্রবে খুষ্টিয়ান ধর্ম কিসে প্রচারে আসা যাইতে পারে? আমি সেবিলাম—তাহার আর সম্বন্ধ কি? বিশেষতঃ হীত মনুষ্যের জন্য প্রাণ নিহাছিলেন; এখন তাহার জন্য মনুষ্যের প্রাণ লওয়াতে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না; অধিকন্তু অর্থনীতির নিয়মানুসারে সুদ লওয়া পাপ নহে, সুতরাং প্রাণের শোধ প্রাণ, তাহার উপর সুদ, ইহাতে দোষেরও কিছুই দেখি না। আরও এক কারণে খৃষ্টধর্মের অনুরোধে যুদ্ধ করা আবশ্যিক; মুসলমানেরা একহাতে কোরণ, অন্য হাতে তরোয়া লইয়া যায়; হাজার কোষা যেমন, সেই মত না করিলে চলিবে কেন? অন্যথা, অপরো ধর্মের যে ইচ্ছাকৃত করা হইবে। আমার কিছু উদ্ভটি করিয়া দিবেন বলিয়া এই দিন সাহেব আমাকে আশ্বাস দিলেন; কিন্তু ঐসি মনে পড়াতে আমার উদ্ভটিত্প্রহা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। সাহেবকে সেবিলাম, আপনার অনুগ্রহই যথেষ্ট, উদ্ভতির প্রয়োজন নাই। তবে কপালে থাকিলে আমিও বদ্ধ করিতে পারিব না; আপনাকেও এত আগ্রহ করিতে হইবে না।

সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এ যুদ্ধে প্রয়োজন কি? সাহেব বলিলেন—লর্ড সিটিন দেশে কাবা লিবিয়া কাহোর বিবয় ফুরাইয়া ফেলিয়াছেন; এখন একখনি বীররসালিত মহাকাব্য তাহার লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে; সেই অনুরোধই যুদ্ধ। কবির কল্পনা এবং রাজনীতিজ্ঞের কৌশল এমন সমন্বিত দেখিয়া আমার পরমানন্দ হইল।

সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'একটি স্বাধীন জাতিকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করা অন্যায় বলিয়া যে, সকলে এত পোলাযোগ করিতেছে, তাহাতে তোমার মত কি? আমি সেবিলাম, যাহারা এমন কথা বলে, তাহারা বোকা। ইয়েরজের মত স্বাধীনজাতির জাতি ভগতে আর নাই; সুতরাং যেখানে স্বাধীনতা পাইবে, ছলে ইউক, বলে ইউক, কৌশলে ইউক, তাহা আব্দাখ করিবার যত্ন করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি বরং তাহা না করিলে স্বাধীনতা গ্রহণতার প্রতি সম্বন্ধে সন্দেহই থাকে।

অন্যকার মত শ্রীচরণে নিকেন ইতি—।

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (২)

শ্রীপাশপদ্মে,—

সাদাক প্রসিদ্ধাভ্যর্থক নিবেদন মিদং। অনুমতি পাইলে

এইবার খসেছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। বাসালীর ছেলে, এত দুর্বলেনে ধাকা সহজেই কষ্টকর তাহাতে এই বিষম দেশে আসিয়া, এই বিষম সময়ে বাস করিতে আমায় যাহা হইতেছে, আপনি অন্তর্যামী, আপনার কখনই অবিনতি নাই।

শেরপুর হইতে আমরা বাহির হইয়াছি সত্য, কিন্তু তাহাতে চিত্তাবেগ বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। কে যে কাহাকে মারিতেছে, কে কেন মারিতেছে,—তাহার কিছুই আর বুঝিতে পারিতেছি না। কেবল নিত্য নিত্য নুতন ভয়ের কথা কণ্ঠাগার হইতেছে। আজি শুনিলাম, মীর বাজা আমাদের মাথা কাটিতে সম্মত করিতেছে, কাল শুনিলাম মহাশয়জ্ঞান কোথা হইতে উপস্থিত হইয়া লোক সংগ্রহ করিতেছে। তাবিয়া দেখুন, আফগানিস্তানের বাজা কাফা সকলেই যদি লাগে, তবে ইয়েরজের ভাণ্ডে যাহাই ইউক, আমার প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া যাওয়া দুর্ঘট হইবে।

অধিকন্তু কাবুলে যে সকল হিন্দু কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা পর্য্যন্ত পলায়নপরায়ণ হইয়াছে। যাপারটা ইহাতেই বুঝিতে পারিবে। তবে আমি শুধু এক দৃষ্টি-গামছার অনুরোধে কিসিয়া প্রাণটার উপর হাতা দিই কেন, বলুন। আফগানিস্তান জয় করার কার্য সমাধা ইউক, এখানে ইয়েরজের আদিপত্য দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত ইউক, তখন না হয় আমাকে একটা বড় চাকরি দিয়া একবার এখানে পাঠাইয়া দিবেন।

আরও এক ভাবনা আমার হইয়াছে। আমি যে এই সকল পত্র লিখি, যথেষ্ট বিশ্বাস থাকার দরুন রবাত সাহেব সবগুলি খুলিয়া দেখেন না। এ দিকে বিলাতে ও ভারতবর্ষে অনেক মিথ্যাবাদী লোক আছে; তাহারা রবাত সাহেব এখানে অনেক অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া কলরব করিতেছে; সেই জন্য সেদিন রবাত সাহেব এক লম্বা চৌড়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, দরকার না হইলে অত্যাচার করা হয় না এবং যতটুকু দরকার তাহার বেশী অত্যাচারও করা হয় না। আমার অক্ষর এবং এবারত দুই ভাঙা বগিমা, রবাত সাহেব আমাকে দিয়াই ঐ পত্রখনি লেখাইয়াছেন, সেই জন্য এত সবিশেষ জানিতে পারিয়াছি। এই পত্রের মর্মে অনেক মনে করিতে পারে, অল্প ইউক, অধিক ইউক, আবশ্যক ইউক, অনাবশ্যক ইউক রবাত সাহেবের কিছু অত্যাচার আছে। অথচ আমি ইতঃপূর্বে যে সকল পত্র আপনাকে লিখিয়াছি, তাহাতে সাহেবের নম্রা, গুণ, ধর্মজ্ঞান এবং সদাশয়তার উচিত স্মৃতি করিয়াই লিখিয়াছি। এখন ভাবনা এই যে, যদি ভবিষ্যতে এই সব কথা আপনার উপস্থিত হয় এক সাহেবের কবুল ভাবকের বিপরীত আমার পত্র লেখা হইয়াছে বলিয়া, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া একটা দণ্ড বিধান করে, তবে সর্বনাশ হইবে। আর সৈনিক-পত্নীধানে

তোপে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা আগনার অবিস্মিত নাই। উড়িতে আমি অন্ধম, তাহা জানাতেই কি, আর ভোলেই কি? বাঙ্গালীরা উড়িতে জানে না, তাহাও আপনি জানেন; অনেক ভয়লোক ছায়া হইতে, বারান্দা হইতে, উড়িবার চেষ্টা করিয়া শেষে গ্রাণটি উড়াইয়া দিয়াছেন।

সর্বোপরি স্থানভাণের সম্বন্ধ করিবার কারণ এই হইয়াছে যে, আমীরের খাতি দখল করিবার সময়ে কবিয়ার যে সকল পত্র পাওয়া যায়, কবিরাজনাথুল, দ্বিতীয় বিশ্বাসিত, রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ তাহা হইতে এক ভয়ানক অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, আমীরের সাহায্য লইয়া কবিয়ার পঞ্জাব পর্যন্ত দখল করিবে, এবং ইংরেজ-সেনাপতি, পঞ্জাবের অধিবাসী, ভারতবর্ষের রাজস্বাব্যর্থ, প্রজাবৃন্দ সকলেই তৎকালে কৃষ্ণকর্ণের নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে; এক উত্তর-পশ্চিম দ্রাঘিতে যে সকল দুর্গাদি আছে, সে সমস্ত কবীর মধুর বংশীজননি প্রকামারে ধরাশায়ী হইবে।

এ কথায় যে আশঙ্কার বিষয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আশঙ্কা বশতই বেহাফুর খাঁকে কৌশল করিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া বন্দী করা হয়, এবং সেনাপ্তরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুনিয়া থাকিবেন, এখনও এক একজন আফগানবাসীকে 'গবর্নর' ইত্যাদি পদ দিয়া বিশ্বাসভাজন করা হইতেছে। শুনিলাম, ইহাঙ্গিলের বস্তানি কার্যে আফগানস্থানে লোকসংখ্যা কমানিবার কল্পনা আছে, রবার্ট সাহেবকেও আমি চিন্তাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন বাস্ত ছিলেন, কিছু করিয়া কি বলিতে বলিতে মরিয়া গেলেন, আমি তাঁহার কথা ভালো বুঝিতে পারিলাম না। তবে কবীর পত্র বাহির হইবার পরে এ সকল হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই সকল কারণে আমি বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করি। সম্প্রতি ডাবনার চোটে এক অভিধান প্রস্তুত করিতে আমি মনোযোগ করিয়াছি। তাহার কিয়দংশ আগনার নিকট পাঠাই; উৎসাহ পাইলেই সম্পূর্ণ করিব।

আংলো-আফগান অভিধান

শব্দ	অর্থ
রুব-শব্দ	ভারতবর্ষকে অকিঞ্চাস।
বৈজ্ঞানিক সীমা	রক্তের নদী এবং হাড়ের পাহাড়।
দুর্ভিক্ষ	বৃষ্টি।
শত্রু	হমেল এবং স্বধর্মের মায়ায় যে প্রাণপণ করে।
সন্ধি	কবী।
দেখাধিকার	লীড়াইতে যতটুকু স্থানের প্রয়োজন,

মৃত্যু পর্যন্ত সেই পরিমাণ স্থান দখলস্থ রাখা।

এরূপ ভাবে সৈন্য সংস্থাপন করা বাহাতে বিপৎকালে এক দল অন্য দলের সাহায্য করিতে না পারে।

যাহাদের সহিত ব্যবহারে সভ্যতার নিয়ম এবং ধর্মের লাসন মানিবার প্রয়োজন থাকে না, এবং যাহাদের শিল্প-মহিমার অপূর্ণ চিত্রকরণ অটলিকানি ভাষা ও গৃহাদি কুসিদ্ধ করিলে কলঙ্ক নাই।

সেনাপতিত্ব

অসভ্য জাতি

কাবুলস্থ সর্বোদ্যাতার পত্র (৩)

শ্রীচরণকলমেশু,—

শেষে ফিরিয়া যাইবার জন্য পূর্ব পথে অনুমতি চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আজ্ঞাপত্র বা তাড়িতবার্তা কিছুই না পাইয়া মন বড় উত্তিগ্ন হইয়াছিল। কাবুলীরা যে রকম অধ্যাত্মিক এবং দুষ্প্রকৃতি, তাহাতে অনুমান হয় যে, তাহারা ডাক মরিয়াছে এবং তার কাটিয়া দিয়াছে; নহিলে আগনার মত দয়ালী লোকে কখনও বাতুলানাড়া হাতের ভাত বাতান খাইবার সাধে বাধা দিবে, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। ফলে, স্পষ্ট কথা বলাই ভালো, আপনি নিবেদন করিলেও আর আমি কাবুলে থাকিতাম না। কেন থাকিতাম না, তাহা বলিতেছি।

প্রথমতঃ, কাবুলীদের মত মূর্খ লোক পৃথিবীতে আর নাই। মূর্খ লোকে নিজের ভাল বোঝে না, কাবুলীরাও বোঝে না; সেই জন্য ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দেখুন, বলি রাজা মুরেরই তবু স্বর্ণের কাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরেজ অতি সুসভ্য সুশিক্ষিত এক সমচারী জাতি, বাঙ্গালার আসিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া, ইহার যে যে উপকার করিয়াছেন—ইংরেজের উপকারের কথা বলিতেছি না, আমাদের উপকার যাহা করিয়াছেন—তাহা প্রাণ থাকিতে কেহ ভুলিবে না! কাবুলীরা উপকারের কথায় আমল দেয় না; কেবল বলে যে, ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া আমাদের উপকার করিলেও আমরা লইতে চাই না, সাধপক্ষে অপকার করিতেও দিব না। যিবে না—তবে মরো। যেমন দুর্বুদ্ধি, শক্তিও হইতেছে। আর ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশী—এসব কথা মনেই শু আমি বুঝিতে পারি না। পরম আকর্ষক পরমেশ্বরের সকলই সৃষ্টি করিয়াছেন, সূতরাং মনুষ্য মাঝেই এক জাতি; ইহার আবার ভিন্ন জাতি কি? কাবুলীরা এমনই মূর্খ যে চারুপাঠ পর্যন্ত ইহাদের পড়া নাই; চারুপাঠে মানব জাতির কথা অনেক বার

লেখা আছে। তত্ত্বের পৃথিবী সমগ্রই এক : এক মাতী, এক জল, এক সঙ্কলি। তবে আবার ভিন্ন দেশ কিং হায়। ইহাদের ইহকাল ত পেলই, পরকালে পরিনামে ইহাদের কি হইবে, তাহাই ভাবিয়া আমার হৃদয় শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কাবুলবাসিন্দা! এখনও তোমরা অনুতাপ কর, এখনও পাপচিন্তা হইতে বিরত হও, এখনও ক্ষমা-প্রার্থনা কর, অবশ্যই মঙ্গল হইবে। যে হেতু অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তই স্বর্গের দ্বার। বাস্তবিক, আর আমি কাবুলে আসিতে ইচ্ছা করি না; তবে যদি যীতের ছেটি ভাই, সিদ্ধার্থের হাঁড়িকোলা-জ্যোতি, চৈতন্যের খুঁড়া—সেনজা মহাপুত্র, কাবুলে পদার্পণ করিয়া, কাবুলীদিগকে স্বার্থপরতা, বিবরীর ভাব, এবং দ্রাব্য হসেনাদির বোধ ছুলাইতে পারেন, আমারও সঙ্কল্প তাহা হইলে চলিতে পারে।

ভিত্তীয়ত, কাবুলের সমস্ত ব্যাপার এখন একঘেরে পোছ হইয়া পড়িয়াছে, রকমওয়ারি না থাকিলে যজ্ঞ নাই, বিবরণ লিখিয়াও সুখ নাই। ঐ রুবিয়া এল,—ঐ আমীর তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিল,—ঐ যুদ্ধের আয়োজন করিল—ঐ আজ মারামারি—ঐ ওখানে কটাকাটি—ইহা ছড়া নূতন স্বার্থ কিছুই নাই। তা একটা কথা ভাস্কর করিয়া বাড়ী বসিয়াই লেখা যায়; তবে আর যাসা খরচ করিয়া, রাম রাক্ষ উভয়ের ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া, প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজনটা কি? তাহার উপর আগাগোড়া কথার ঠিক রাখিয়া পর লেখা খুব সহজ ব্যাপার মনে করিবেন না, কারণ, নানা মূনির নানা মত। কাবুলীদের উপর অত্যাচারের কথা লইয়া যে প্রকার বাদ-বিসংবাদ হইতেছে, তাহাতে ‘না হাঁ’ যাহাই বলিব, তাহাতেই সর্বকলি। সেহাই ধর্ম্মের, আমি ইহার কিছুই জানি না, সাতাশী জন লোককে ফাঁস দেওয়া হইয়াছে বলিলেও আমার স্বস্তি, সাত-ন ফাঁস হইয়াছে, তাহাতেও স্বস্তি, মোটে হয় নাই, তাও স্বস্তি। ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন যে, কোনও পন্থেই ঐক্যবোধের কথা লিখিয়া ফেলি নাই। তবে বুক ঠুকিয়া এই ফাঁসির সম্বন্ধে এক কথা আমি বলিতে পারি; যাহাদের ফাঁসি হইয়াছে, ইংরেজ যদি এ যাত্রা কাবুলে শুভাগমন না করিতেন, তাহা হইলেও সে লোক কটার ফাঁসি হইত। নিভান্ত পক্ষে ফাঁসি না হইলেও তাহারা গলায় দড়ি দিয়াও মরিত। যাহার যাহা কপালে লেখা আছে, তাহা ঘটবেই ঘটবে; মানুষ কেবল নিমিত্তের ভাণী। সমস্ত নিরস্ত আর কিছুই নয়, নিরস্ত; তবে তার অত্যাচারের কথা ওঠে কিসে, তাই ত বুঝিতে পারি না।

যুদ্ধ হইতেছে, সে নিরস্তের লেখা, ঢাকা খরচ হইতেছে নিরস্তের লেখা, লোক মরিতেছে নিরস্তের লেখা; ইহা যে না মানে, সে নেহাত অজ্ঞান—সে খিরিষ্টান!

ভৃতীয়ত, শর্তরক্ষা—(রাসা আলুকও শর্তরক্ষা বলে, এ তাহা নয় জায়গার নাম)—বেলগয়ে প্রস্তুত; সুতরাং এখন আর কাবুলে থাকিবার প্রয়োজন নাই, থাকি তা মুক্তিসিদ্ধও নয়। প্রয়োজন নাই, কেন না, আগনার ঘনন ইচ্ছা হইবে তখনই এই বেলগয়ের কল্যাণে লোকগাড়ীতে হটক, মালগাড়ীতে হটক, ডাকগাড়ীতে হটক, আমাকে বস্ত্রাবধী করিয়া আবার চালান দিতে পারিবেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ গাড়ীতে স্ববর পাঠাইতে পারিব। কাবুলে থাকা মুক্তিসিদ্ধ নয়, কারণ লিটন বাহাদুর পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিয়াছেন যে, কবিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; তিনি কবিয়ার নাম করেন নাই বটে; কিন্তু বলিয়াছেন,—“That despotic and aggressive military Power which has for years been steadily advancing to her (i. e. that of the Indian Empire) gates—কহ কংসর ব্যাপিয়া রোক করিয়া যে অত্যাচারপরায়ণ এবং আক্রমণরত সৈনিকশক্তি ভারতসাম্রাজ্যের দ্বারভিত্তিতে অগ্রসর হইতেছে।” আমি কীর্ণকটীহী বাসালী, বলুন দেখি, আমার কি পঞ্চাংসর হওয়া উচিত নহে? আর লিটন বাহাদুরের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কাবুলে না আসিয়াও হয়ত কাণ্ডকারখানা অনেক দেখা যাইবে। হা ভগবান! আবার কি ‘চর্চ চর্চ উডেন চর্চ’ (১) শিখিয়া টাকা রোজকার করিতে হইবে?

চতুর্থতঃ আমার মনে বড় দুঃখ হইয়াছে; সংবাদ পাইয়াছি, যে কেহ কেহ আমার পক্ষে যে সকল কথা লেখা থাকে, তা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না, এমন কি কেহ কেহ আমার কাবুলে আসা পর্যন্ত বিশ্বাস করে না। এ দুঃখে আর কি কাবুলে থাকিতে ইচ্ছা করে? তবে ভিজ্ঞাসা করি, যাহারা এ কথা বলে, তাহারা কি কাবুলে আসিয়া আমাকে না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে? তবে বাপু কেন? সংবাদপত্রের নীতি, রাজত্বের নীতি এ সকল বোঝা না, অথচ গোল কর কেন?

বিশেষ অনেকেই যায়, আবার সেলো ফিরিয়া অহিসে; কিন্তু শুদ্ধ সেই কথা বলিবার জন্য লম্বাটোড়া একবান পত্র লেখা ভালো দেখায় না। অন্ততঃ কেবল সেই কথা লিখিয়া ক্ষান্ত হওয়াটা কখনই ভালো নয়। সেই জন্য পথে যাহা সেবিয়াছি কি গুনিয়াছি, তাহার মধ্যে এক জায়গার বৃত্তান্ত এবার লেখা কহিতেছে। জায়গাটার নাম বৈদ্যনাথ গুরুদেব দেওঘর।

(১) ইংরেজের দ্বন্দ্ব আমলে সমান। দুই চারি কথা ইংরেজী শিখরাই বাসালী সবেমতের সহিত কথা বার্তা চলাইতে এবং দুই পক্ষের উপাধ্বন করিত। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। হুতা—রাহের দিন বাবুকে সঙ্গে করিয়া সাহেব বখ সেখিতে করি হইয়াছেন; রাহের বিকে অদ্বি নির্দেশ করিয়া সাহেব ভিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কি? বাবুটির বিদ্যার কুলায় না সেবিয়া অল্প কথায় তিনি সাহেবকে বুকুজিলা দিলেন, ইহা ‘চর্চ চর্চ উডেন চর্চ স্যার’। চর্চ — সাহেবের লজ্জা।

বেলা ৯টার সময়ে বৈদ্যনাথের টেলনে ব্রহ্ম ভঙ্গ (২) করিলাম, অর্থাৎ গাড়ী থেকে নামিলাম। মাত্রিতে পা বিতে না-
দিতে একজন আসিয়া আমাকে বীকা বীকা বাসাল্য কণা কহিয়া
জিজ্ঞাসা করিল—‘বাবু আপনি কি বৈদ্যনাথ দর্শন করিতে
যাবেন?’ আমি বলিলাম—হী; তৎক্ষণাৎ আর এক ব্যক্তি
আসিয়া আমার ঐ কণা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকেও
বলিলাম হী; আরও লোক আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল; সেই এক
উত্তর পাইল। সকলেই আমাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত। তখন
আমার মনে হইল যে, আমি যে পঞ্চানন্দের কাবুলস্থ
সংবাদদাতা তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, নহিলে এত
আদর-বস্তু কেন? আমার মনে করিলাম, তাহাই বা কি প্রকারে
সম্ভব হইতে পারে? তবে আমি যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি,
তাহা নাকি আমার প্রেহালা সেবিলেই জানা যায় (অনেকবার
আশীর্ষিতে আমার মুখ প্রেরিয়া এটা টের পাইয়াছি), তাই ইহারা
বুঝিতে পারিয়া এ প্রকার করিতেছে। তখন একটু চিন্তাশ্রম
আপনা-আপনি হইল, মনে হইল যে, ধরাতেল আমার জন্মগ্রহণ
সার্থক, দূর্লভ মানব জন্মে আমার মত ব্যক্তি আরও দূর্লভ।
আত্মদের সঙ্গে অহঙ্কার, সেই সঙ্গে একটু অতিমান মিশিয়া
আমার স্বয়ংজলধি ওড়তোত হইতেছে; চক্ষুঘরের কোল দিয়া
ভোগ্যভোগ্য নির্ণয় হইতেছে, গীকা একটু স্কীত, একটু বন্ধিম
হইয়াছে—এমন সময়ে এইভাবে একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি
নিষ্ক্ষেপ করিয়া দেখি—ও না! গাড়ী হইতে যে নামিতেছে,
তাহারই এত সম্মান, এইরূপ অভ্যর্থনা—কাহারই আদর কম
না। কি অধঃপাত; কি দর্পহরণ! মুখ হইলই, লজ্জা হইল,
একটু রাগও হইল। আর সেখানে না দাঁড়াইয়া টেলনের বাহিরে
আসিয়া একখানি একা লইয়া বেওঘর যাত্রা করিলাম। পাখী
পাওয়া যায়, রাগে লইলাম না। গরুর গাড়ী পাওয়া যায়,
লজ্জায় লইতে পারিলাম না। মনের দুখে একটা চড়িয়া
পরীরের সব কয়খনি হাড় কেন এক ঠাই হইবে না, ইহাই
ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম।

মানুষের পুণ্ডিত আরম্ভ হইলে পদে পদে অপমান ঘটে।
আমার অহঙ্কার, তাহার গলে লজ্জা হইয়াছে, এটা বোধ হয়
সকলেই টের পাইয়াছিল; নতুবা একটা লোক আমার পায়ে
পায়ে ঢাক বাজাইতে বাজাইতে পৌড়িতে কেন। ডামাসে
করিতেছি না, সত্য সত্যই ঢাক বাজাইতে বাজাইতে একজন
পৌড়িতেছিল। এই দুখের অবস্থায় একটা গড়োয়ান আমার
কোলে বসিয়া সাধাণ্যামের প্রশ্ন সঙ্গীত ধরিয়া দিল। লোকটা
রসিক বটে, কিন্তু তাহার রসিকতায় আমার সর্বকাল ছলিয়া

যাইতে লাগিল। অথচ তাহার সঙ্গ ছাড়িবারও উপায় ছিল না।
তখন এমনই দুগ্ধা হইল যে, সেখানে যদি বাঁড়াইতে আমার
হৃদয় হইত, তাহা হইলে একা হইতে নামিয়া পৃথিবীকে বিধা
বিনীর্ণ হইতে বলিতাম, এবং বিনীর্ণ হইলে ধরনীপার্শ্বে হ্রস্ব
করিতাম। বাহা হউক, নিরুপায় হইয়া সেই বিটলে ঢাকীকে
কিঞ্চিৎ বৃন্দ দিয়া ক্ষান্ত করিলাম এবং বিরহিয়া গিলাম। অহঙ্কার
যে নাহ, ইহা বীকার করি, কিন্তু এত লম্বু পাশে একজন
ওকলওও অনায়াস, তাহার আর সম্বোধন নাই। এইরূপ বিতর্ক
করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম যে, আমার চতুর্দিকেই
পাছতওলা ঘাড় উঁচু করিয়া আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি করিতেছে।
পরে বুঝিয়াছি যে, সেটা পাছতের স্বভাব, আমার জন্য বিশেষ
করিয়া কিছু করে নাই। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, দুখের দশার
মানুষের স্বভাবতই এইরূপ মনে হয় যে সকলেই বুঝি তাহাকে
টিকোরা করিবার জন্য চলা-ফেরা করিতেছে, তত্ত্বি অন্য কোন
কর্মও তাহার নাই।

সেওঘরে পৌছিলে তবে আমার দুখের অবসান হইল;
আবার সুখ হইল। সবটী সাহেবই ইউন, প্রেসকমিশনারই ইউন,
আর লট সাহেবই ইউন, বোধ হয় কেহ আমার জন্য তাহের
ধবর পাঠাইয়া থাকিবেন; কারণ সেওঘরের প্রধান প্রধান
কর্মচারী—ডেপুটি ম্যাজিষ্টার, ডাক্তার, ইন্সপেক্টর মাষ্টার
প্রভৃতি—এবং যে সকল বাঙ্গালী সেখানে ভ্রমণ বা আবহাওয়া
পরিবর্তন করিতে আসিয়াছেন, সকলেই বুঝে ধুমধামের সহিত
আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং আমার সুখ-সম্বন্ধতা
সংসাধন বিষয়ে তৎপর হইলেন। বাস্তবিক মান্য ব্যক্তির
উপযুক্ত সমাধার করা সকলেরই কর্তব্য, বরং না করিলে
প্রত্যাব্য আছে। আমি এই সকল ব্যক্তির ব্যবহারে পরিতুষ্ট
হইয়াছি। যদিও ইহারা কর্তব্য কার্য করিয়াছিলেন মাত্র, তথাপি
ইহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে আমার বিধা বোধ হইতেছে
না।

সেওঘর অতি সুস্থ স্থান, কিন্তু সেসিলাম, এই দুখের
বাটতেই এক তুফান (১) হইতেছে। তাহার বিবরণটা লিখি।

সেওঘরে কিঞ্চিৎ শিবমূর্তি আছে, কিঞ্চিৎ বসিবার
তাৎপর্য এই যে, শিবমূর্তি বড়জোর আট আঙ্গুলের বেশী উঁচু
নহে। কিন্তু এই আট আঙ্গুল শিবের পসার হাইকোর্টের বড় বড়
কৌশলী হইতে বেশী। শিবের মন্ত্রোক্তের কর্মচারী এবং ঘাত্রী
বলে। এখন গত শ্রীপঞ্চমীর সময়ে এখানে বিস্তর ঘাত্রী
আসিয়াছিল; চিরদিনই আসিয়া থাকে, এবারও আসিয়াছিল।
তবে অন্যান্য বৎসর থাকিবার স্থানের ডাকনা থাকে না, এবার

(১) Storm in a tea-pot, এমন হইলে তিনি বোধ হয় দুখের অধিতে না লিখিয়া চারের বাটতেই লিখিতেন।

(২) যাহাকে বাবুর প্রেক্ষাগ্রহ বহন।

ধাক্কিয়ার স্থান পায় নাই। সরকার বাহাদুর কৃষ্ণ দিয়াছেন যে কাহার বাড়ীতে কত বাড়ী থাকিতে পাইবে, সরকার ইহাতে তাহার নিয়ম করিয়া দেওয়া ইহবে। আর কষ্ট স্বীকার করিয়া এই নিয়ম করিতে ইহবে বলিয়া বাড়ীওয়ালাদের কাছে কিছু কিছু দক্ষিণা পাইবেন বা লইবেন।

এইরূপ নিয়ম করা অতি সম্ভবই বলিতে ইহবে; কারণ আইনবিদগণ জনতা নিবারণ করা অবশ্য কর্তব্য। বাড়ীদের সম্বলেরই উদ্দেশ্যে এক, সূতরাং তাহাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেই শান্তি ভঙ্গ, এমন কি রাজবিষয় পর্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়। কয়জন লোক একত্রে থাকিতে পারিবে, ইহার নিয়ম করিয়া দিলে এ অপশঙ্কার অনেকটা প্রতিকার ইহতে পারে। মনে করুন, যেন একটা হাটে ৬ জন লোক থাকিবার অনুমতি আছে, একমূল খাদ্যের মধ্যে একজন গিড়ামহী, একজন মাতামহী, দুই মাসী, এক পিসতুতো ভগিনী আর এক সৌ, আর সেই ঘোড়ের কোলে আড়াই বৎসরের এক মেয়ে। এখন এই ঘোড়ের নিয়মিত সংখ্যার উপর হওয়াতে তাহাকে হানান্তরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেই, এ দলের দ্বারা কোনও অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ তাহারা শিশুর চিকিৎসা অন্য মনুষ্য থাকিলেই ব্যক্তের অনিষ্ট চেষ্টা করিবার অবকাশ পাইবে না।

দুঃখের বিষয় এই যে বৈদ্যনাথের রাজস্রোহী লোকওলা এ নিয়মের বশীভূত হইতে স্বীকার করে নাই; এবং অনুমতি লইয়া বাসা দেওয়া দূরে থাকুক, অনুমতিও লয় নাই, বাসাও নেয় নাই। এখানে শ্রীপক্ষ্মীর সময়ে বৃহৎ বৃষ্টি হইয়াছিল, শীতও কিছু ভয়ানক গোছের হইয়াছিল। দুঃপ্রকৃতি লোক এই সুযোগ পাইয়া সরকার বাহাদুরের আইনের জন্য এ সর্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে এই বলিয়া তারে খবর, দরবাখ ইত্যাদি নানারকমে এক হলদুল আরম্ভ করিয়া দিল। ইহার রটনা করিয়া দিল যে, বিশ্বর লোক শীত-বৃষ্টিতে মারা গিয়াছে, সরকার বাহাদুর আইন করাতো এবং আশ্রয় না দেওয়াতে এইটি হইল। সরকারের পক্ষ হইতে ডেপুটী বাবু বলেন যে, যমীনের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল এবং কেইই মরে নাই। এখন এই মরা না মরার প্রশ্ন হইতেছে; এ দিকে আইনকে কতকটা অপরাধী বিবেচনা করিয়া সরকার বাহাদুর আইনকে আপাততঃ সম্পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

তদন্তের ফল যাহাই হউক, আমার বিবেচনায় খাদ্যী মরা না মরা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কথাই প্রকৃত। একজন লোকও বোল আনা মরে নাই, ইহা হইতে পারে, কিন্তু মনে করুন, পাঁচশ লোক যদি আধমরা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আড়াইশ লোক মরিয়াছে বলিলে মোহ কি? তবে আইনের মোহ কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ শীত-বৃষ্টি বৈধবীন কার্য,

আইনের দ্বারা কিছু শীত-বৃষ্টির সৃষ্টি হয় নাই, আইনের উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ হইলে বরং শীত-বৃষ্টির নিবারণ হওয়াই উচিত ছিল।

যাহাই হউক, আমার মতে কাশা দেওয়া, আইন জারী থাকাই উচিত, এবং অনুমতির দক্ষিণায় যে টাকা উঠিবে, তাহাতে কলিকাতায় একজন শাস্তি বাড়িয়া দিলেও ইহবে। কিম্বা ফিরিশীদের জন্য একটা বে-খরচা পড়িবার ভুল করিয়া দিলেও চলিবে।

আপনি এই প্রস্তাবের পোষকতা করিলেই আমি সুখী হইব, ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি।

কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (৪)

শ্রীচরণকমলেশু—

সেবকম্য দণ্ডবৎ প্রশায়া নিবেদনকারী প্রভুর শ্রীচরণাশীর্ষকোঁদে এ ভূত্যের ঐহিক পারত্রিক সকল মঙ্গল বিশেষ। পরে শ্রীচরণ সন্নীপ হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া নিকর্যে শ্রীমুক্ত প্রেসকমিশনার মহাশয়ের কাটীতে পৌছিলাম।

দরজায় অনেক দাড়া-বাঙ্কির পর তাহার খী আসিয়া খুলিয়া দিল; আমি তখন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া কলবিলম্বে শ্রীমুখের হৃদয়ে হাজির হইলাম। খী আমাকে দেখাইয়া দিয়া কাপড় কাচিতে গেল। আপনি নাকি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথাই লিখিতে আসেন করিয়াছিলেন, সেই জন্য এত বিস্তার।

হাইড্রোকোবিয়ার রোগী জল সেবিলে যেমন আঁধারিয়া উঠে, শ্রীমুক্ত আমাকে সেবিয়া প্রথমতঃ সেইরূপ শব্দবাহু হইয়া উঠিয়া পাড়াইলেন; এবং আমি না বসে পর্যন্ত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে রহিলেন। তাহার পর আমাকে বসাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হেতু আগমন?

তখন তদীয় উপহার জন্য যে মর্তমানহুজুতী লইয়া গিয়াছিলাম, তাহা দিয়া বলিলাম, হে জনকুলের গৌরব, আমি কাবুল যাইব। আমার অভিসন্ধি বুকিবার জন্য শ্রীমুক্ত বলিলেন, এই যে কাবুলে এত কারখানা করা যাইতেছে, ইহাতে তোমার মত কি? আমি বলিলাম,—চূড়ান্ত।

শ্রীমুক্ত। পরঃপ্রেরকদের সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছিল, তাহাতে তোমার মত কি?—সেও চূড়ান্ত।

শ্রীমুক্ত। লর্ড লিটন সম্বন্ধে তোমার মত কি?—চূড়ান্ত।

ভাসিয়া বলিতে আসেন করিলে আমি নিবেদন করিলাম,—কাবুলের কারখানা বিষয়ে লোকে বলে যে, গবরমেণ্ট অনায়াসে লুণ্ঠ ব্যয় করিতেছেন, বিশেষতঃ মুর্তিস্কাবিয়ারের টাকা দিয়া যুদ্ধ করাটা ভাল হয় নাই। আমার মতে তাহা নহে। ভারতবাসী নেমক-হালায়; কেবল টাকার

কথাই বোঝে, আরে বাপু, আগে অর্থাৎ ইংরেজের আমলের আগে, চোর-ডাঙ্গাইতে সর্ব্বথ লইত, শুভন ত স্ববরে কাগজে হাস্যনা কর নাই। টাকা কার? টাকা ত গবরমেণ্টের। ডক্টর দুর্ভিক্ষনিবারণের টাকা দুর্ভিক্ষনিবারণের কার্যেই ব্যয় হইতেছে। মধ্যে হইতে মাহের তেলে মাছ ভাজিয়া লওয়ার মত, একটা চৌহদ্দীর যদি পাকা বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলে সুবের বিকর বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ নিবারণও বন্ধ নাই, কারণ এই দুবস্ত নীতে যে সকল বেহারা ও কুলী, ও সৈন্য সৈন্য ইহলোক পরিভ্রাণ করিতেছে—যুদ্ধে কেহ মরে নাই, মরিবে না, মরিলেও সে মরা মরই নয়—তাহাদের অভাব হেতু (কারণ যে মরে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পেট এবং মুখ নিশ্চিতে মরে; এবং সে আনিয়া টানিয়া যে বাজারটাহাদের আহার যোগাইত তাহারও মরে) চাউল এবং গোখর অবশ্য সজ্জা হইবে। তাহা হইলে বিলাতে রপ্তানী করিবার সুযোগ হইল। এ দিকে দুর্ভিক্ষও হইল না।

মিডীয়াড, পত্রেরকরের সম্বন্ধে নিয়মগুলির ত কথাই নাই। যুদ্ধের সময়ে সত্য কথা প্রকাশ হইলে অনেক দোষ, তাহা আমি অবগত আছি। বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিলে ইংরেজীতে তাহার অনুবাদ হয়, সেই অনুবাদ ডাকে ইউরোপে যায়; সেখানে রুবিয়ার চক্ষে পড়িলে রুবিয়া ডাবায় তাহার তর্জমা হইতে পারে; সেই তর্জমা আনিয়ার মধ্যস্থলবর্তী রুবিয়ার কর্ণাটবীরা কাবুলের ডাবায় কাখা করিয়া অনাধ্যাসে কাবুলীসিককে জানাইতে পারে। তাহা হইলেই বিস্ময়। বিশেষতঃ সত্য কথা কোনও সময়ই ভাস বস্তু নহে। আমি ত গ্রাণাঙ্কও বলি না।

তৃতীয়তঃ, এই সমুদয় কার্য বা অন্য কোন কার্য সম্বন্ধেই লর্ড লিটনের সোধ নাই এবং হইতে পারে না; ইহা আমি বিশ্বাস করি। কেনই বা তিনি এসকল জাতিয়া মাথা ধরাইতে যাইবেন। ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা রকম আচার ব্যবহার। এ সকলের কিছুই লিটন বাহাদুরের জানিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তিনি এখানে আসিয়া যাহা করিবেন, বিলাতে বসিয়াও তাহা করিতে পারিতেন, এ সহজ কথা যে বোঝে না, তাহার ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট। লিটন বাহাদুর কবি, বড় লোকের ছেলে, সৌম্য, তাই অভ্যাগাসের দেখা দিয়া ভারতভূমি পবিত্র করিবার জন্য কষ্টকে কষ্ট, দুঃসম্পর্কে দুঃসম্পর্ক না মনে করিয়া, কালাপানি পার হইয়া, লালপানি গন্ধুবৎ করিয়া ত্রিপাক্তর মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা কি আমি জানি না?

আমি আরও বলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত বলিলেন—যথেষ্ট হইয়াছে, তোমার মত সারগ্রাহী লোক ভারতবর্ষে অল্প আছে, নহিলে, এত দুর্দশা কেন?

তাহার পর আমি বলিলাম যে, তবে অনুমতি সেন ত বিদায় হই, বেলা অনেক হইয়াছে, প্রাধানিক করিতে হইবে।

সম্ভট হইয়া শ্রীযুক্ত আমাকে একখানা ছাড় চিঠি, একখানি গলায় খুলাইবার তক্তি, এক খোড়া নুলা রক্তের চসমা দিয়া বলিলেন, ইহা কশাচ তুলিও না, কশাচ ফেলিও না। আমি বলিলাম, শয়নে, স্বপনে, আগরণে, ধানে, ভোজনে, পানে, ইত্যাদিতে এই আমার সম্বল, এই আমার সম্বল, এই আমার সম্বল।

তথা হইতে গড়কলা কাবুলে পৌছিয়াছি। এখানে অভিশয় নীচ, নীলবর্ণের বরফ পড়িতেছে, এবং লোকগুলো নীল বানরের মত দেখাইতেছে। রবার্ট সাহেব আমাকে খুব ভালবাসেন। অন্য সকলে কাহনটাক টানিকার্ট আমাকে সেকাইয়া বলিলেন যে, এইগুলি ঠিকহারি করিয়া রাখিয়াছি; গলা পাই, উত্তম; না পাই, তাহাতে কিছু ফাঁসির অপমান হইবে না।

এই বলিয়া আমার হাতে ধরিয়া তাঁবুতে লইয়া গেলেন। সেখানে বেশি, সাহেবদের শোয়াক ফুরাইয়াছে। অন্য খোরাক না আসা পর্য্যন্ত ছোলার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে সাহেবদের কষ্ট হইতেছে। বাজের অর্থাৎ সৈন্যী লোকদের নিমিত্ত ছোলার কুলায় না বলিয়া অন্য প্রকার (১) ব্যবস্থা হইয়াছে; তাহাদের এক প্রকার বন্দোবস্ত আছে বলিয়া কেইই ভ্রিত্তি করিতেছে না।

এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল। লড়াই যে প্রকার হইতেছে; কল্যা তাহা সবিশেষ লিখিব।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

পত্রিকার এজেন্ট চাই

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের পরিবেশক বা এজেন্ট চাই। সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে ২০% কমিশন দেওয়া হবে। প্রত্যোগে যোগাযোগের ঠিকানা একই—বি ডি ৪৯৪, সেন্ট লোক, কলকাতা ৬৪।

টেলিফোনে যোগাযোগ :

২৪৪ ২১৩৬

৩৫৮ ৬৩৯১

২৪৮ ৩৮৫৭

ঋতা রাই

প্রভুল মুখোপাধ্যায়

বত ৪ সেপ্টেম্বর (২০০১) বা টেলিগ্রাফ পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার প্রকাশিত সংবোধিতা ছোট্টেই। কিন্তু তারই মধ্যে রয়েছে এক কল্পনামায়াধার ঘনি — যাকে অনুভব করে নিতে হয়। চুড়তার যমজ বোন কত! আর রঞ্জিতা! ঘনিষ্ঠ থাকে বোল বন্ধুরের কিশোরী। দুজনেই খোঁজবাকি আর্থনগিত ছিল — দুজনেই। প্রতিদিন ঘাটে হাজিরন করত — দুজনেই। তাদের বিদ্যাপতি, বিশেষ করে কতর, নজর কেড়েছিল স্থায়ী কোচ-এর। বত তৈরি ছিল অনেক ওপরে ওঠার, জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার যোগ্য হয়ে ওঠার। আচমকা বাবা মারা গেলেন লিউকোমিয়ায়। ওতপত্র? ... এখন রঞ্জিতা বৌকর, রাজ্য থেকে জাতীয় হয়ে, বত বহর সে জাতীয় রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে, হিরোনাম। আর কত! সে অত্যা-ঐচ্ছন্দ্য করে বসে সারানি বড়ি বাঁধে মায়ের সঙ্গে। রোজ ১০০০ বিড়ি বাঁধলে ০.১ টাক। বোনকে হারতে থেকে না কত! সংসারের দিনটি পেটের ভাঙতে ছোটতে হয়ে। ...

চুড়তা শহরে আছে পশ্চিমপাড়া।
একটি মেয়ের কীর্তি নজরকাড়া।
রঞ্জিতা রাই, বয়স শনের ষোল,
একশো মিটারে জাতীয় রেকর্ড হ'ল।
আছে কত রাই, তারই যমজ বোন।
সে বেছে নিয়েছে কুটিরের এক কোণ।
দু বোনই তো ছিল দারুণ সৌন্দর্যী
কত রাই আত্ম মিতব্যাক গঙ্গীর।
রানিং ট্র্যাকের জন্য কি গ্রাণ কীমে?
মাথা নিচু করে কত রাই বিড়ি বাঁধে।
মা-ও বাঁধে বিড়ি, মিলে দুজনের আয়,
কাষ্টস্ট্রে সংসার চলে যায়।

ক্রাস ফাইভেই পড়ত তারা তখন,
কোচের ট্রেনিং-এ দুর্বীর দুই বোন
গাশে উজ্জল, তখনই বাবাকে কেড়ে
গিল ক্যান্সার। ইচ্ছুল মিল ছেড়ে।
এমন সময় তাদের দুজন কোচ
বাড়িতে এলেন। স্বরে ফোটো সজোচ।
বসলেন তাঁরা — একটি মেয়ের ভার
নেবেন দুজনে, দুস ও বেলাধুলার
বরচ তাঁদের। দু বোনই প্রতিভাময়ী।
দুটি ফুলই ফোটো, এমন সাধা কই?

‘একজনকে তো স্বপ্ন ছাড়তে হবে।
বোনটা ছুটুক, আমি বসে যাই তবে,’
বলে ওঠে কত! ছিল কি দীর্ঘাধাস?
ফুল আর মাঠ হয়ে গেল ইতিহাস।

ফুলে যায় বোন, প্রাকটিস অবিরাম—
সারা দেশ ভুড়ে বাড়ছে তার সুনাম।
‘বোনটি আমার ছুটবেই এশিয়াতে,’
ব্রত ছোট হাত — কত রাই বিড়ি বাঁধে।

ডেইলি হাজার, মানে ঘরিশ টাকা;
মা-ও আমে কিছু, যোরে সংসার-চাকা।
‘কত না থাকলে কিছুই হতো না — উঃ’,
বলে রঞ্জিতা, দু পায়ে রানিং শু।
সামনে কি তার লিবিচয়ের সিঁড়ি?
চলছে সাধনা। কত রাই বাঁধে বিড়ি।

কিছু দিন আগে একটি প্রতিষ্ঠান
দুই বোনকেই জানিয়েছে সম্মান।
রঞ্জিতা হোক জয়ী — সে তো ঠিকই আছে,
আমরা বড়োবা হেরেছি কতর কাছে।
শত শুভাশিস কনাই রঞ্জিতায়,
কতর সামনে মাথা নত হয়ে যায়।

মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় ভয়—
সজ্ঞান যদি কতর মতন হয়?
তাইলে কি হবে? কিছুতে মন না মানে।
কতরা থাকুক কাঁধে উপাখ্যানে।
পরের কারণে স্বার্থকে দাও বলি—
এ তো নীতিকথা — নিজেই কি মেনে চলি?

তবু কি ক্রিয় বিবেক গোপনে কীমে?
আজও একমনে কত রাই বিড়ি বাঁধে।

সংবাদসূত্র : The Telegraph, September 4.2001 – Saga of Sibling Sacrifice – Madhumita Bhattacharya

প্রথম হল, কেন শুদ্ধবস্ত্রের ওপর এমন অভ্যাসের করা হত? কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্র কাজ করে। সেই কাজের ফল যদি তাদের হাতে না মিলে, তাহলে বামুনের সুবিধে, সংখ্যালঘুটি বামুন তাহলে সেই ফলের সিংহ ভাগ ঘেরে নিয়ে আয়েশ করে দিন কাটিতে পারবে, কাজকন্ডো না করেই। ডাঙো খাবারটা খেয়ে নিয়ে বামুন এটো ছুঁড়ে মেবে শুদ্ধুরের দিকে। আর শূদ্র যদি অনুযোগ আপত্তি তুলে বলে, 'আমরা তো এতো খাটিছি, তোমরা এমন বসে বসে বাছ কেন, আরাম করছো কেন?' বামুনঠাকুর তার সামনে তুলে ধরেন পূর্বজন্মের কর্ম ফলের কথা : 'আগের জন্মে পাপ করেছি তো, তাই তোদের এমন হীন জন্ম। তোরা খাট, আমরা আরাম খাই।' শূদ্র যদি বিব্রব-বিস্রোহে যায়, তাহলে তো ঐ-সব (আগে বলা) মনুর শাস্তি আছেই, আবার পৌরাণিক নরকের ভয় দেখানোর ব্যাপার সাধারণ আছে। এমন শাসনসোষণ কার্যে করে রাখা বামুন হয়েছে। এখন তোমরা— তোমরা কি এসব কথায় এখন কান দেবে?

আজ্ঞা ধরো এসব সন্তোষ পৈতে পরে বামুন-হওয়াটা যদি উপপাদ্য গ্রন্থাণের মতো ধরে নিই (Q.E.D.) একদম ঠিকঠাক : 'হিন্দু' ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ইত্যাদি, তাহলেও কি ঠিকঠাক মনে নেওয়া যায় এমন অনুষ্ঠান? কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য তোমাদের 'ভাঙ্কম' গুরুজনরা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, তা কি ঐতিহ্যের নিয়ম মেনে 'স্বধাৰ্থ' - ভাবে সম্পন্ন হয়েছে?

প্রথমেই দেখে নিই তোমাদের এখনকার বয়স কতো। অরিত্র-২৭, অনমিত্র-২৩, অনির্বাণ-২১, সায়ন্তন-১৮, মঘুখ-১৫। 'শাস্ত্র'-অনুসারে মঘুখ বসে তোমাদের সবার উপনয়ন-কাল কিন্তু পরিয়ে গেছে। পুরোহিত-দর্পণে লেখা হচ্ছে (বিধান দেওয়া হচ্ছে) : 'গর্ভাষ্টমে বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কাল। তদসম্ভবে বোড়পর্ব পর্যন্ত (Sic) উপনয়নের অধিকারকাল। অতঃপর সাবিত্রী পতিত'— আর উপনয়ন হয় না।' কিন্তু তোমাদের সঠিক বয়স পেরোন চার জনের উপনয়ন হল — অবশিষ্ট একটু প্রায়শ্চিত্তির করে মিতে হয়েছে, পুরুতকে কিছু দক্ষিণা ধরিয়ে দিতে হয়েছে।

পুরোহিত দর্পণ বলে বা পৈতের অনুষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ রূপ দেখে মনে হল অনেকগুলো ঘাপলা আছে। ব্রাহ্মচার্যশ্রমে ঢোকায় এমন অনুষ্ঠানে কি করে জাতি চুকে পড়েছে 'সমাবর্তন' — যেটা হওয়ার কথা গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশের সময়। অর্থাৎ ব্রাহ্মচারী এই একই দিনে গেরুয়া ছেড়ে গৃহী হয়ে পড়ছেন। পুরোহিত দর্পণকার ভট্টাচার্যি মশাই বারবার ফুটনোট দিয়ে জানাচ্ছেন*

১। 'উপনয়নের চতুর্থ দিবসে সাবিত্রী চতুঃসম কর্তব্য; কিন্তু এখন সর্বত্রই সেই দিবসে সেই অমিতেই ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।'

২। 'তখন বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মচারী আগমন করিলে ইহা সমাবর্তন কৃত হইত, এক্ষণে সে দিবসে সেই অমিতে করা হয়। কেবল অগ্নির নামকরণ যোগাদি করিবে।' (৪৫৩ পাতা)

৩। 'এখন একই দিবসে এই সকল কার্য (গার্হস্থ্যশ্রমে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় কাজকন্ডো, যেমন অলঙ্কার পরে নব তুলসীর পরে চামড়ার জুতো পরে 'বর'-বেশে সটান দাঁড়ানো) সম্পাদন করিয়া এই সময়ে উদীচ্য, কর্ম, কর্ম, শাস্তি, তিলকাদি এবং দক্ষিণাত্ত করা হয়।' (৪৫৫ পাতা, নম্বরটান সংযোজিত, বানান যথার্থ রাখা হয়েছে।)

এবার ঘাপলাটা কোথায় বুঝতে পারছো? বহুদিন ধরে ব্রাহ্মচারী থেকে গৃহী হওয়ার যে নিয়ম সেটা 'এখন একই দিবসে' সেরে ফেলা হচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা একটা আনুষ্ঠানিক ঢপ, ধান্না, প্রহসন।

এই আনুষ্ঠানিক পারম্পর্যহীন ব্যাপারটা আমাকে একটা গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেককাল আগে একটা পাহাড়ের কোলে তিব্বতির নদীর ধারে একটা মন্দির ছিল। তা' তীর্থযাত্রী পুণ্যার্থীরা যখন সেই নদী পার হতো তখন তাদের কাপড়টাকে হাভাবিক কারণেই হাঁটুর ওপর তুলে নিত। এরপর অনেক অ - নে - ক কাল ফেটে গেছে। সে নদী শুকিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও তীর্থযাত্রীরা কাপড় তুলেই নদী পার হন। অর্থাৎ কাপড় তোলাটা রীত্যাঙ্গল হয়ে গেছে। যেমন, পৈতে হয়ে গেছে বামুনদের বিজ্ঞাপিত বিদ্যালয়।

তাহলে বুঝি আনন্দ হল তোমাদের পৈতেতে — কিন্তু পৈতেটা ঠিক অর্ধেকটিকভাবে হল না। তাতে কি? হিন্দু ধর্মের সনাতন ঐতিহ্যের রক্ষণ তো হল — প্রতীকী এই অনুষ্ঠানে কে কার থেকে আলাদা, কে কার থেকে উঁচু নিচু — এটা তো পরিষ্কার কুিয়ে দেওয়া গেল। বর্ণ ও আশ্রম দুইই রক্ষিত হল। এবার তোমাদের গুরুজনরা যেন বানপ্রস্থ অবলম্বন অবশ্যই করেন — চতুর্দশম ব্রহ্ম করতে তো সেটাও বিধেয়। ব্রাহ্মচার্য, গার্হস্থ্য যখন হল, তখন old home-এ গিয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণই বা বাকি থাকে কেন! এসব কথা বললে তাঁরা অবশ্য খেপে যাবেন। আচ্ছা তোমরাই কল্যাতো, ঘটা করে পৈতে দিয়ে তাঁরা কল্যাতম ধর্ম বকে করছেন, কিন্তু বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাসের কোনো তাঁদের এত আপত্তি কিসে?

একটা মানসিক পরিবর্তনের কথা অকণ্য পেড়েছেন সুখীর কাকর।^১ উপনয়নের রিচায়ালের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে নাকি এক ধরনের 'নাসিষ্টিক ক্রান্তি' তৈরি হয় হিন্দু কান্দনের মনে, যার অব্যবহিত ফলাফল দাঁড়ায় পরমহ্রস্ব ও বিশেষ নায়ক (গুরু) - নির্ভরতা। হিন্দু বাহুন পুরুষের আত্মবিশ্বাসে ধামতি তৈরি হয় এই মহাজাগতিক পরম (শক্তি)-এর ওপর নির্ভরতার মঞ্চ। কিন্তু, কাকর যেটা খেয়াল করেননি, সেটা হল ব্রহ্মচারী যখন ত্রিসত্তা আহিকে বলেন, তখন (গুরুজী জগার সময়) তিন সঙ্কেত যথাক্রমে কিশোরী, যুবতী ও বৃদ্ধার মূর্তি কল্পনা ও তাঁদের বন্দনা করে গায়ত্রী মন্ত্র জপতে হয়।^২ এই কল্পনার মধ্যে হিন্দু পুরুষের যে অবশেষন কাজ করে, তা তাকে টেনে নিয়ে যায় কোনো এক মহাজাগতিক মাত্রার নিকে, এর ফলে নারীর অন্যান্য ডুমিকা এই ধরনের মহা-পর নির্ভর পুরুষের কাছে পৌঁছ হয়ে যায়।

ভাণ্ডা ভালা সাংস্কৃত - নিরক্ষর পুরুষ আর আচার্যের সৌলতে তোমাদের ত্রিসঙ্খ্যা ইত্যাদি আচার-বিচার শিখতে হয়নি, আমাকে কিন্তু এসবই শিখতে হয়েছিল — প্রতিদিন পালন করতে হয়েছিলো এসব আচার। খেয়াল রেখো, সেটা আমার বয়সেজির সময়, মেয়েদের নিকে তখন হী করে ডাকির থাকি আর জপের সময় নাকী কল্পনা করে যৌন-উদ্বেজনা পাই।

কিন্তু আমার খটকা অন্যত্র। আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না সাতাশ থেকে বোলা বছরের তোমরা সবাই বিনা কাকরবো, বিনা জিজ্ঞাসায় এমন এক রিচায়াকে মেনে নিলে কি করে? তোমাদের অন্তত চারজন এখনো ছাত্রাবস্থায়, তোমরা আবার বিজ্ঞানপ্রিয় ছাড়া — তোমরা কোনো যুক্তিবোধে বিশ্বাসে পারলে না কেন? তোমাদের স্বাভাবিকি অবস্থা তোমাদের দু'হাত তুলে আত্মবিশ্বাস করে বলেছেন, তোমরা যে গুরুজনের কথা মানি করে পৈতে ধরেছ—এটা নাকি 'আজকালকার ছেলেলিগেনের' কাছে আপাই করা যায় না। আজকালকার ছেলেলিগেনে বলতে অকণ্য তাঁর মাথার আমার মতো অকালকুহাওয়ার (যে কিনা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়) থেকে মাত্র আট বছরের বড়) মডেলটা ঘুরছিলো। আর আমার মাথায় ঘুরছিলো চীনের বিপ্লবী ছাত্র ছাত্রী অথবা ৬৯-র সরবর্নে বিদ্রোহী ছাত্র ছাত্রীদের কথা কিংবা আমাদের এখানকার ৭-এর দশকের ছাত্রছাত্রীদের কথা। কিন্তু হয়, 'ফুলগুলি সব কোথায় গেল' (এই 'ফুলগুলি সব কোথায় গেল' গানটা লীট সীপারের অনুপ্রেরণায় হোমস বিশ্বাস বলে- জনৈক গায়কের গাওয়া)

এই কথাটাই সেদিন বলে ফেললেন, আমি যে প্রতিষ্ঠানে (আই. এস. আই.) কাজ করি সেই প্রতিষ্ঠানের এক বয়স্ক বামপন্থী অধ্যাপক। আই. এস. আই.-এর ডিরেক্টর ও ডীন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রজ্ঞাপিতা ব্রহ্মকুমারীদের দিয়ে আধ্যাত্মিক মনোভ্রমেরেটের ক্লাস দেনে। হাতে গোনা দু'জন রিসর্চ ডলার বাসে সব ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারে নির্বিকার। আই. এস. আই.-এর পুরুষধারে আবার কিছু ছাত্র বাকি প্যাট পরে প্যারেড করে। তাদের দরুণ উৎসাহ — বোকাই যা যা তারা স্বতঃস্বেচ্ছ। কিন্তু যে দু'জন ছাত্র এদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা চাউন করে সেম, তাদের সৌলতেই আমরা নিয়ে ডিরেক্টর ও ডীনকে একই চাপ দিই। সেই চাপের ফলেই প্রজ্ঞাপিতাদের আগমন বন্ধ হয়। সেইসময় ওই অধ্যাপক বলেন, 'আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন তো এসব ব্যাপারে নিজেরাই এগিয়ে দিয়ে সমাধান করতাম। এই ব্যাপারটা আমাদের কাছেই বা এল কেন, ইউনিয়নেই বা গেল কেন — বুঝলাম না। আজকালকার ছেলেলিগেনেতো বী — তারা Science পড়ে না হয়েছে Modern, না হয়েছে Traditional! এরা বড় নির্বিকার।

আরে বাবা, যে তিনিসটা পালন করবে, তা নিয়ে তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকবে না? নির্বিকারে তাকে মেনে নেবে? আমি যেসব প্রশ্ন তুলছি, তা তো তোমাদের ভেতর থেকেই উঠে আসা জরুরী ছিল! আমার নিজের পুর আশ্চর্য লাগছে, তোমাদের এই প্রশ্ননি আনুগত্য সেবে —!

সেইসঙ্গে আরো আশ্চর্য লাগছে যে তোমরা তোমাদের পিসতুতো ভাই কক-এর পৈতের ব্যাপার একদম নিশ্চুপ। কক-এর মা, মানে তোমাদের পিসি বিয়ে করেন বসু-পরিবারে। বসু-পরিবারের সন্তান হওয়ায় (যেহেতু বাবার পরিচরেই ছেলোমেয়ের পরিচয় তৈরি হয় এখনকার হিন্দু পরিবারে—) কক-এর পৈতে হবার কথা নয়। সে তো 'অসবর্ণ' বিয়ের ফসল। তাই পনেরো বছরের কক-এর মনে খুব দুঃখ : তার সমবয়সী বন্ধুদের পৈতে হবে, আর তার হবে না? এটা কি ন্যায্য? তার অন্যান্য তুতো-ভাইরা উপহার পাবে, আর সে কি ভাতুল চুবে? অতএব সংস্কৃতের এম. এ. এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিতে মাসোহারা দেওয়া ছোট মামা ছুটলেন পুরুষের বিধান নিতে। তিনি বিধান দিলেন, 'না, এই অত্যাচারের পৈতে দেওয়া হবে না'। আমি তাকে মুখ ফসকে ভিগেস করে ফেলেছিলাম, 'ইতরা শূদ্রার গর্ভজাত মহীদাস কি করে ঐতরের (ইতর > ঐতরম) উপনিষদের প্রবক্তা হলেন?' পুরুষ শমাই তখন পালাতে পারলে বীতেন। কক-এর এই ব্যাপারে তোমাদের

কোনো বন্ধু-ভাব জাগলো না? স্বচ্ছ-এর সমবয়সী তোমরা হতে পারলে না? এই এক পৈতে-অনুষ্ঠানের দৌলতে, দেখে কেমন করে তোমরা আর স্বচ্ছ আলাদা হয়ে গেলে!

আসলে কি জানো, আমি-তুমি বা তোমাদের গুরুজনরা কেউই কিন্তু ঐতিহ্য কী তা জানি না:

আমরা সংস্কৃত মন্তর আওড়াই গ্রন্থটির পুরুতকে মেনে, তার মানে জানি না। ভারতীয় দর্শন জীবনে খুশেই দেখিনা পুরাণ কথাকে লোকমুখে ওনে মান্যতা দিই। কিন্তু স্মরণ হইল, এরকম কতকগুলো অনুষ্ঠানের পুনরাবর্তনেই কি ঐতিহ্য চিহ্ন থাকে? নাকি চোখ-কান খোলা রেখে ইতিহাসের পাতা উল্টে ঐতিহ্যের বহু ও বিরোধিতাকে বুকে নিয়ে সমকালের পথে পা-কেলাটি জরুরী? আমাদের ঐতিহ্যের এক কবি-গায়ক, নাম তার লালন, গেয়েছেন:

“সব লোক কম লালন কী জাত সংসারে।

লালন কম, ভেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥

ছত্রত দিলে হয় মুসলমান,
নারী গোড়ের কী হয় বিধান?
বামন যিনি পৈতাম্বর প্রমাণ,
বায়দী চিনি কী ধরে ॥

এমন ঐতিহ্য থাকতে, তোমাদের গুরুজনরা কোন ঐতিহ্যের পুনরাবর্তনে মেতেছেন?

তোমাদের কাছ থেকে উজ্জ্বল প্রত্যাপ্য রইলার।

তোমাদের

পুনঃ গুরুজনের সম্বন্ধে হয়তো এমন অনেক কথা বলে ফেলার, যা তোমাদের ও তাঁদের আঘাত করবে হয়তো। কিন্তু রণকীর সেনারা যখন দাপিরে বেড়ায়, আপনিসী কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরা যখন গলায় মার্শ-লেনিন ও

লেনিনাব্যবহার লকেট পরে ঘুরে বেড়িয়ে বলেন, “ভারতের ব্যাপারটা ঠিক ঐ মার্শ-লেনিন দিয়ে কোথা হবে না ...”, অথবা অল্প-কমব্রিজ ঘোরা প্রবীণ কম্যুনিষ্ট

হিন্দু যখন কঙ্গিপুজার উদ্বোধন করেন, নাতির পৈতে সেন (সে পৈতেতে মুসলিম প্রবীণ কম্যুনিষ্ট এসে বলেন, ‘তোমার নাতির কলাগণ হোক! আমি এ নিমন্ত্রণে বাবো না। আমি আমার নাতির ছত্রং করাই মি!’), তখন এই ব্যাপক ভতামি, এই নির্লজ্জ হিপোক্রিসিতে ব্যথিত হই। তোমাদের মতো ‘শিক্ষিত’ পরিবারের কাছে যে প্রত্যাপ্য নিয়ে মিশেছিলাম, তাতে এই হিপোক্রিসি আঘাত সেম বড়ো। তোমরা বা তোমাদের গুরুজনরা যাতে এখানে দেওয়া তাথার ‘অবেনটিসিটি’ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলতে না

স্বচ্ছ-এর মনে খুব দুঃখ: তার সমবয়সী মমুখের পৈতে হবে, আর তার হবে না? এটা কি ন্যায্য?

তার অন্যান্য তুতো-ভাইরা উপহার পাবে, আর সে

কি আত্মল চুষবে? অতএব সংস্কৃতের এম. এ.

এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিতে মাসোহারা দেওয়া ছোট-

মামা ছুটলেন পুরুতের বিধান নিতে। তিনি বিধান

দিলেন, ‘না, এই অরক্ষকের পৈতে দেওয়া যাবে

না’। আমি তাকে মুখ ফসকে জিগ্যেস করে

ফেলেছিলাম, ‘ইতরা শূদ্রার গর্ভজাত মহীদাস কি

করে ঐতরয় (ইতর > ঐতরয়)

উপনিষদের প্রবক্তা হলেন?’ পুরুত মশাই তখন

পালাতে পারলে বাঁচেন।

পারে/পারেন, সেজন্য —

সূত্র নির্দেশ:

১. সুকুমারী ভট্টাচার্য: ১৯৮৯। সুবীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: প. ব. বালো আকাশে। ৩৯ পাতা।
২. সুবীতিকুমারের জীবন-কথা: অমল কুমার ভট্টাচার্য-কৃত টীকা: ১১ পৃষ্ঠা। ২০-১৪ পাতা।
৩. মনুসংহিতা — পৃষ্ঠা: ১০/১২৫, ৮/২৭০-২। বিবৃত আলোচনাত জনা পৃষ্ঠা: বৈবীথ্যশাল চট্টোপাধ্যায় ও মুদ্রালয়টি বঙ্গোপাধ্যায় সম্পা। ভারত-বর্ষন সজ্জার। প্রথম বক্ত। বঙ্গবর প্রকাশন।
৪. পুরোহিত মর্শ। পণ্ডিত সুব্রহ্মচ্যেন ভট্টাচার্য সম্পাদিত। সত্যনাথরূপ লাইব্রেরি। ৪৪৮ পাতা। আরো বেশ — মনুসংহিতা। ২/৮০। গায়ত্রীর অপর নাম সবিদী স্বচ্ছ: মনু কলছেন, যথেষ্ট সময়ে উপনয়ন ও বেগদায়ন না হলে সে ‘ব্রাহ্ম’ হয়।
৫. টী ৪ ৪:
৬. Kakar, S. The Inner World. OUP. ১০০-০৯ পাতা ৪:১।
৭. যে কোন ‘নিভাক্ষরপদ্ধতি’ বা ‘পুরোহিত মর্শ’-এ গায়ত্রী জলের আগের ধান হয় ছটায়।
[এই নিবন্ধে ব্যবহৃত নাম-বা ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো পরিবারিক ধারার মিল থাকলে সেখান লক্ষ্য নহয়]

ঠিক-বেঠিক

সুজয় বসু

জী

কোনটা অংক হলে ঠিক-বেঠিকের গোলে পড়তে হত না। ঠিক না বেঠিক সহজেই ধরা যেত—অসুবিধা হত না কোনো। কিন্তু স্বার্থ-স্বার্থ-মায়ার-মহতায় মানুষের মন এক অশুভ বস্তু—এব মাপ করা কঠিন। মন বলছে এইটা কবো—করছি। ঠিক করছি না বেঠিক করছি তার যাচাই হচ্ছে না। আপাতত নিজের লাভটা হলেই হল। ইদানীং আবার তথ্য বিতরণের এমন প্রাবল্য শুরু হয়েছে যে ভাবনা-চিন্তা আর সরল রেখায় এগুচ্ছে না—সব রোজ জট পাকিয়ে যাচ্ছে। ফলে ঠিক-বেঠিক ঠাহর করাটা বেশ মুশকিল হয়ে পড়ছে। এটাই এ যুগের বড় বিপদ—সমাজ-বিজ্ঞানীরা বলছেন।

এদিকে, অংকের নিয়মে চলে না বলে ঠিক বেঠিক নিয়ে নানা সমস্যা। ফার ডান দিকে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে যদি বলি বামদিক ডানদিকে বেঠিক বলছি। তেমাধায় সাধু বসে আছেন নিজের মনে, এক পথিক ছুটেছে ছুটেছে এক রাস্তা দিয়ে এসে সোজা বেরিয়ে গেল। কেন ছুটছিল একটু পরেই বোকা গেল। ছুরি বাগিয়ে এক ডাকাত ঐ রাস্তা দিয়ে এসে তেমাধায় পড়ে একটু থমকে গেল। সামনের দুটো রাস্তা দু দিকে গেছে। তার শিকার গেল কোন দিকে? সাধুকে জিজ্ঞাসা করলো—ওঁর সামনে দিয়েই তো গেছে এপুনি। কথা না বলে সাধু আতুল দিয়ে অন্য রাস্তাটা দেখিয়ে গেলেন। সাধু কি ঠিক বলেছিলেন?

এখানেই ঠিক-বেঠিকের গুট বিচার। সত্য ক্রমই, কিন্তু সত্যও তো দেখা যাচ্ছে আপেক্ষিকতা রয়েছে। সে আপেক্ষিকতাই বা কিসের পরিপ্রেক্ষিতে? জীববর্ষ পালনে গ্রহণ বর্জনের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভুল হলে পরিণামে নান্ন বিপদ। কিন্তু কিসের নিরিখে, কোন প্রভাশায় ঠিক-বেঠিকের বিচারটাকে পুণ্য করে তুলবো? সাবেকী নায়ক-নীতির কাঠামোটাই সনাতন এবং সিদ্ধ বলে মেনে নেব, না আধুনিক প্রগতির সর্ববাণী প্রভাবে তার পুনর্বিচার করে সংস্কার করিয়ে নেব? উত্তরটা অনেকেরই জানা নেই। প্রজ্ঞাবান যারা হস্তি নিতে পারতেন তাঁরাও একে একে বিদায় নিয়েছেন। আমরা শিশুহীন হয়ে পড়ছি।

অবস্থাটা ক্রমেই সমীন হয়ে পড়ছে—দুশ্চিন্তা সবারই। দুই বিশেষের একটা অসহায়, নিরপরাধ শিশুকে খুন করলো বেশ

ডেবেটিভে। কোনো কিশোর তার বন্ধুকে দিয়ে তার বাবাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিচ্ছে বিচলিত না হয়ে। বড় অপরাধ যদি করে দু'একজন, ছোটখাট অপরাধ করছে বেশির ভাগই। আমেরিকায় হাইকুলের শতকরা পঁচাত্তরজন ছাত্রছাত্রী নকল করাটাকে অপরাধ বলে মনে করে না। এদেশে সমীক্ষা করা হয়নি তবে এক রাজ্য সরকারকে পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার জন্য এক বিশেষ আইনই করতে হয়েছিল এবং নির্বাচনে এখন অন্য দল জয়ী হয়ে সে আইন তুলে দিচ্ছে—হয়ত নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাই ছিল। অর্থাৎ কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক আগে কিছুটা অস্বস্তি ঠাহর করা যেত। এখন যাচ্ছে না। বেঠিক যা মনে হচ্ছে তাও আইনসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

পাপ-পুণ্যের ব্যাপারটা অতিশয় সেকেলে হয়ে গেছে। ধর্ম-সংক্রান্ত কোনো আলোচনাই এখন দল-জাতি নিরপেক্ষভাবে করা হচ্ছে না কারণ ধর্ম এখন প্রবলভাবে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে। সব কিছুর মতই ধর্মের নামে শোষণ হয়েছে, কটাকাটি-হানাহানিও। তবু ধর্ম টিকে থেকেছে। এখন শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করে পরিশীলিত কৃষ্টিবান মহলে, ধর্মের উল্লেখ করা একটা অনাকোঙ্কিত মানসিকতার লক্ষণ বলে ধরা হয়ে থাকে। আধুনিক, উদার এবং প্রগতিবাদী আমাদের কাছে ধর্ম একটি অপ্রাসঙ্গিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে অব্যাহিত বিষয়। শাস্ত্রীয় আচরণ কিছু বয়ে গেছে—প্রগতি পুরোটা বহিষ্কার করতে পারেনি। ঠাকুরঘর উঠে গেলেও বিবাহ-স্নাতক মন্ত্রপাঠের খুব খাতি হইয়েছে মনে হয় না। কিন্তু পাপ-পুণ্যের উল্লেখটা বাত গেছে। এটা কোর না, করলে পাপ হবে—এমন কথা এখন আর শিক্ষিত মহলে তেমন গোনা যায় না। পুত্রস্বর্গও বলেনি না—মহিলাস্বর্গও বোধহয় না। হযত সরকার নেই। এটা শুধু এদেশে নয়—বিশেষেও। আসলে ধর্মনীতি ও নীতিধর্ম এখন পালনীয় পর্যায় না থেকে বিশেষণের স্তরে এসেছে। ধর্মীয় নীতি-টিতি মেনে চলবে শুধু অন্ধারা যাদের কিম্বদন্তি একমাত্র সম্বল। যারা বিচার করতে পারেন (শিক্ষিত সকলেরই ধারণা ওঁরা পারেন) ওঁরা কেন এত ধর্মীয় পালনের ধার ধারবেন? সূত্রস্বর্গ পাপ-পুণ্যের প্রাচীন জগতটাকে অনেক পিছনে ফেলে আমরা এসেছি আধুনিক ঠিক-বেঠিকের কালে। এখন শুধি তাও নয়। সমগ্রতাই বিশেষী দর্শনের এক অধ্যাপিকা

তার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নীতিধর্মের আলোচনার পর বেশ হতাশভাবের লিখছেন যে এখনকার ছেলেমেয়েরা জীকেন বা সমাজে কোনটা ভাল কোনটা খারাপ এ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে আসে না—তাদের কাছে সম্পদে এবং বিপদের যুক্তির বিচারটাই প্রধান অর্থাৎ উপস্থিত যুক্তিগুলো ভাল না খারাপ এটাই প্রধান বিবেচ্য। ফলে সব ন্যায়নীতির বিচারই আপেক্ষিক থেকে যায়। কেন্দ্র বিশেষে যে কোনোটাই গ্রহণ করা যায়—সম্পদে যদি ভোরালো যুক্তি থাকে। সুনির্দিষ্ট নৈতিক চরিত্রের কোনো অবস্থান নেই।

এই অবস্থায় ঠিক-বেঠিকের বিচারে গোলাবোণ দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। জনসংখ্যা বাড়ছে—সম্পদ সেই হারে বাড়ছে না। সামাজিক আর্থিক বৈষম্য আরও প্রকট হচ্ছে।

প্রযুক্তির কল্যাণে প্রজাতনকে বাড়িয়ে তোলা শুধুমাত্র সামাজিক স্বীকৃতিই পায়নি, একটা পৃথক শিল্প হয়ে উঠিচ্ছে। 'যে কোনো সমস্যারই সমাধান করা যায় যদি উপযুক্ত প্রচেষ্টা বরাদ্দ করতে পারেন'—এই বিশ্বাস বাস্তবিক সর্বভাবে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে হাঙ্গির করার জন্য বিজ্ঞানপন্থাতারা যে অর্থ ব্যয় করেন তা সমানভাবে পৃথিবীর সব লোককে বেঁচে দিলে বছরে

হাজার সেকেন্ড টাকা করে পেতাম আমরা প্রত্যেকেই। তার কলমে অবিরত প্রজাতনের হাতছানি। সাতা না সেরাটা বলতে হবে ভীতুতাই। সুতরাং পাপ-পুণ্য ঠিক-বেঠিকের হাস্যম্য কেড়ে ফেলে যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নেওয়াই ভাল। যুক্তিটা বেশ ভোরালো হলেই হল, আর 'সকলেই যখন করছে তখন আমিই বা নয় কেন?' এর চেয়ে অকটা যুক্তি আর কী হতে পারে? নীতিধর্মের এমন সার্বজনীন আপেক্ষিকতায় প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্বে হয়েছে কি না ঐতিহাসিকেরাই বলতে পারবেন।

এ কথা মনেতেই হয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতিধর্মকে কোনো রকম ভোয়াল্লা না করেই আপন গতিতে সপৌরবে এগিয়েছে। বিজ্ঞানের ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং শুধুমাত্র ধর্ম কেন ধর্ম ও ধর্ম-নিরপেক্ষ অপ্রগতি অনেককেই মানবধর্ম অস্বীকার করতে

উৎসাহিত করেছে। ফলে যে নিরিখে ঠিক-বেঠিকের বিচার সকলের পক্ষে মঙ্গলকর হয়ে উঠতে পারত তা হয়নি। আসলে বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর—তার নিজস্ব ধারার যুক্তিকে বাদ দিয়ে বিশ্বাস-নির্ভর কোনো ধর্মকে স্বীকার করতে তার স্বাভাবিক বাধা। সুতরাং যে-কালে বিজ্ঞান প্রযুক্তির এত বিশাল বোলবোলাও, সেকালে ব্যক্তিগত আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের মূল কেন্দ্র থেকে বিশ্বাসকে পিছু হঠে আসতে হবেই।

ফলে সত্যতা-নিষ্ঠা-মদ্য-মায়া এগুলি 'আদর্শ' ব্যক্তিসের গুণাবলীর তালিকায় থেকে যাবে। আমাদের নিচ্ছেদেরও যে ঐ গুণগুলির প্রতি আনুগত্য থাকা উচিত, নিচ্ছেদের জীবনযাত্রায় এ সবের প্রকাশ থাকা উচিত, তা মনেই হয় না। সত্যতা বা মদ্য আদ্যের অবশ্যই থাকা উচিত—এই উপকারী সিদ্ধান্ত নিয়েই

আমরা ক্ষান্ত। আমি কী করছি তার জন্য অন্যের কাছে তো নয়ই, নিচের কাছেও জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। এক পিতা তাঁর সন্তানকে মানুষ হবার জন্য এক কাঠের মিস্ত্রীর উপহার দিয়েছিলেন। মিস্ত্রী তাঁর তৈরি ব্যঙ্গটার চমৎকার পালিশ করা বাইরের দিক দেখাবার পর ভিতরটা, এমন কি নীচটা, অবধি একই রকম পালিশ করা সেখানে ফ্রেতা বলেছিলেন ভিতরটা যদি বা কিন্তু নীচটা করবার

কোনো দরকারই ছিল না—কেউ তা জানবে না। মিস্ত্রী সবিনয়ে বলেছিলেন—'আমি জানব'। এই 'আমার জানাটা ইসলাম একটু বেশি মাত্রার এড়িয়ে চলার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের প্রতিদিনের নিঃশব্দ আত্মসাতী সিদ্ধান্তে বহু নির্দোষকে পীড়ন করছি, হরণ করছি, হতয় হত্যাও। কে আর জানছে যে দুর্দিনায় অনসহায় অনেকগুলো মানুষের প্রাণ গেল তাতে আমারও কোনো না কোনো অবদান ছিল। আমার ক্রিয়াকর্ম সুমীতি-বিরুদ্ধ হোক কৃতি নেই, শুধুমাত্র আইনগত হলেই হল।

এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি এক ইহুদী ধর্মযাজক বলছেন : 'আমরা পাপকে আর পাপ বলছি না, বলছি অনৈতিক। আর একটু তরল করে অনৈতিককে করে নিচ্ছি বিচ্যুতি অর্থাৎ একটু লাইন থেকে সরে আসা। তাকেও লম্বু করতে বলছি বিচ্যুতি ঠিক নয় ওটা মর্জি বা পছন্দ। পছন্দ আইনসিদ্ধও হয়ে যায়।'

সুতরাং পাপ এখন আর বেআইনি নয়।' তিনি বেশ উৎসাহ নিয়ে বলছেন যে আমাদের নৈতিক আদর্শকে এখন আমরা নতুন করে ইচ্ছামাফিক চেহারা দিচ্ছি এবং এই অবস্থার পরিবর্তন আসতে গেলে পারিবারিক শিক্ষার ধারা পাল্টাতে হবে—পরিবারকে কেন্দ্র করলে গোটা মানব সমাজই পাল্টাবে। পারিবারিক শিক্ষা, শিশু-কিশোরদের শিক্ষা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা হচ্ছে। বিশিষ্ট ভরলোকেরা তার সঙ্গে যুক্ত। অনেকে বলছেন এখনকার শিশুরা সকলেই যমাজি। মা-বাবার ইচ্ছাপূরণের মায়ে অকালেই কুফর ক্রান্তিতে কুগছে, লেশব-চাকসা-সারলা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। মা-বাবার ভাবনায় ক্রান্তি নেই—কারণ শিশুটিকে তাঁদের যন্ত্রের স্বর্ণকলসের নাগাল পেতেই হবে।

এর আগে কেমন ভাবনা ছিল সম্মানসের নিয়ে? আব্রাহাম লিঙ্কন তাঁর পুত্রের শিক্ষকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। চেরেছিলেন তাঁর ছেলেটি মানুষ হোক। তাই লিখেছিলেন—

‘তাকে শিখতে হবে। আমি জানি সব লোকই সঠিক নয়—সব লোকই সং নয়। কিন্তু তাকে এটাও শেখান প্রতিটি দুষ্ট লোক শিখ একজন শিষ্ট-সাহসী লোক আছেন। প্রতিটি স্বার্থপর রাজনীতিক শিখ একজন নিষ্ঠাবান নেতা আছেন। তাকে শেখান প্রতিটি শত্রু শিখ একজন মিত্র আছেন। আমি জানি সময় লাগবে, ভুল যদি পারেন তাকে শেখান কুড়িয়ে পাওয়া পাঁচ ডলার থেকে উপার্জন করা এক ডলার অনেক বেশি মূল্যবান। তাকে হারতে শেখান আবার জেতটিকেও উপভোগ করতে শেখান। তাকে ঈর্ষা থেকে পূরে রাখুন। যদি পারেন শান্ত হামির গভীরতাও তাকে শেখান।

তাকে বইয়ের আশ্চর্য জগৎটাকে জানান কিন্তু যদি পারেন তাকে খানিকটা সময়ও দিন যাতে সে আকাশের পাবিওলোর, সৌন্দর্যে মৌমাছিগুলোর আর সবুজ পাহাড়বারের ফুলগুলোর রহস্য নিয়েও চিন্তা করতে পারে।

ফুলে তাকে শেখান যে নকল করে পাল করা থেকে ফেল করা অনেক বেশি সম্মানজনক। তার নিজের ভাবনা-চিন্তাকে যদি প্রত্যেকে ভুলও বলে তাহলেও তার প্রতি আস্থা রাখতে শেখান। তাকে দরমের সঙ্গে নরম এবং শক্তের সঙ্গে শক্ত হতে শেখান। যখন সকলেই এক নৌকার গিয়ে উঠছে তখন সেই ভিড় থেকে সরে আসার সাহস দিন তাকে। সকলের কথাই তাকে ওনারে শেখান, তার সঙ্গে যা কিছু সে ওনারে তা একটা মজোর হাঁকনীতে ফেলে ওখুমার সঠিক যা বেরিয়ে আসছে সেটুকুই নিতে শেখান।’

ঠিক-বেঠিকের বিচার করতে গেলে লিঙ্কনের এই কথ-বটাই কি নিবিধ হিসাবে সেওয়া যায় না?

বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যর্থ ভারত

ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রায় ৮'৯ মানুষ পর পর দাঁড়িয়ে। একটা সম্মা লাইন। ওদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে ছিল ভীরা হোনা। প্রত্যাশা সকলের একটাই ছিল। মাত্র পনেরো দিনের জন্য একটা সুযোগ; যদিও সে সুযোগ মেলে নি ভীরা হোনার। অনেকেরই মেলে নি। চোপের সামনে অতুল সন্তান, শ্রী। সে চলে গিয়েছিল ওজরাতে। তবে অংশই পালিয়ে নয়। ছেলেমেয়ে, স্ত্রীকে বাঁচাতে কাজের বৌকে। হনো হয়ে ঘুরেছিল রাজ্যায়, রাজ্যায়। কিন্তু ভিকে করতে পারে নি। হোনার কাছে অনেক বেশি দামী ছিল আত্মমর্য। সে একজন আদিবাসী। বয়স মাত্র আঠাশ। এরমধ্যেও শুধু নিজের কথাই ভাবে নি, সমস্ত আদিবাসী মানুষদের কথাই ভেবেছিল। তাই তার মনে হয়েছিল, ভিকে করাটা খাটো করবে আদিবাসী মানুষদের সম্মানকে। হতাল হয়ে ফিরে এসেছিল। আসার সময় তার কাছে ভাতা পর্যন্ত ছিল না। সমস্ত কিশোরিদের রাজ্য পায়ে ছেঁটে এসেছিল নাকোলা গ্রামে। তখন তার বাড়ির সকলেই মৃতপ্রায়। মিনটা ছিল ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ। সেদিন আর সে নিজে অতুল থাকল না। ফিলে মেটাতে হাতের সামনে পেয়ে গিয়েছিল অনেক খাবার। এক শিশি ভর্তি ফেতের পোকা মারার ওষুধ। অবশ্য তারপর আর কোনদিন তার কিচু পায় নি। এখন তারই সমাধির উপর রাখা থাকে দুটি পাথর চা আর চাল। তা অবশ্য পারের জীবনের (!) জন্য। এই বকম হাজার হাজার ভীরা হোনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ভারতের চার, পাঁচটি রাজ্যে। তবে সবার পোকা মারার ওষুধের শিশিরও প্রয়োজন হচ্ছে না।

এটা কোনো গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। বিখ্যাত সাংবাদিক পি. সাইনাতের অভিজ্ঞতা। তিনি দেখেছেন রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় এই ছবি। তবে শুধু রাজস্থান নয়, ওজরাতে, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের অবস্থাও একই। রাজস্থানের ৩১টি জেলা, মহারাষ্ট্রের ১৯টি জেলার প্রায় ২০ হাজার ৫১৯টি গ্রাম, উড়িষ্যার ৩১৪টি ব্লকের মধ্যে ২০০টির, ওজরাতে ১৭টি জেলার ১২,২৪০টি গ্রাম, অন্ধ্রপ্রদেশের ১৭,৪৩১টি গ্রামের একই ছবি। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় রাজ্যের একটি বড় অংশও এর সঙ্গে আছে।

ওড়িশাতে কিছুদিন আগেই হয়ে গেছে ভয়াবহ ভূমিকম্প। উড়িষ্যা ১৯৯৯ সালের টার্নেডো বা সাইক্লোন বিধ্বস্ত করে ছিল ওড়িশাবাসীদের। তার পরের বছরের অনাবৃষ্টি। রাজস্থানের পশ্চিম অংশে ধরার অভিজ্ঞতা পর পর চার বছরের। এর সঙ্গে অল্পসময়ে কণের দ্বারা চট্টীসের প্রতিদিনই প্রায় একজন বা দু'জনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। চাষ-আবাদ বন্ধ হয়ে গেছে এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে।

ওষু মানুষ নয়, প্রচুর সংখ্যার পশুরাও মারা যাচ্ছে। অনাহারে মানুষেরা নানা রকম রোগে ভুগে চিকিৎসার অভাবে মারা যাচ্ছে। রাজস্থানের পশ্চিমে গ্রামগুলোতে ক্যাকটাস ছাড়া আর কোনো গাছপালা নেই। মাটির নীচে জলের স্তর নেমে গেছে। পানীয় জলও পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্যের অন্যান্য অংশে পরিণামী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ককন ভিক্ষে করছে। কোথাও কোথাও কিশোরীরা মেহ বেচার রাত্তাও বেছে নিয়েছে।

অনেক অঞ্চলে খরা যেমন এবছর নতুন নয়, তেমনি অনেকক্ষেত্রেই আগের থেকে বিশেষজ্ঞরা সাবধান করেছিলেন। কিন্তু ওষু এই পরিস্থিতি: সাধারণভাবেই যেকা যার প্রশাসনিক চরম উদাসীনতা এই ধরনের বিপর্যয়ের একটা বড় কারণ।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দু-প্রকৃতিগত অবস্থান বিভিন্ন রকম। তাই বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ফারাক আছে। এছাড়াও পরিবেশের নানা পরিবর্তনের ফলে আবহবহুলের পরিবর্তন ঘটছে। রাজস্থানে গতবছরে বৃষ্টি কম হয়েছে। এর পরিমাণ গড় বৃষ্টিপাতের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বৃষ্টিপাত কম। এবিষয়ে কোনো তাথোর অভাব ছিল না। ইদানিংকালে পরিবেশবিরূপা সবসময়েই আবহবহুলে পরিবেশের প্রভাব নিয়ে সচেতন করার চেষ্টা করছেন। এ সত্ত্বেও এই পরিস্থিতি একটা সভ্যসম্পে অত্যন্ত দুঃখজনক। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে।

গত দু'বছরে ওষু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মারা গেছে অনেক লক্ষ মানুষ। তার উপর রয়েছে আর্থিক কষ্টকন্ডিত। গতবছর বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতি হয়েছে ৫৬৬০ কোটি টাকা।

ভূমিকম্পে বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ ২৫,০০০ কোটি টাকা। আর খরায় ক্ষতি কত হতে পারে তা পরিস্থিতির বিচারে সহজেই ধারণা করা যায়।

ভারতবর্ষ অত্যন্ত গরিব একটা দেশ। এত ক্ষয়ক্ষতির পরে এখনও এই বিপর্যয়ের বিষয়ে কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা করা হয় নি। ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার বিপর্যয়ের বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এরমধ্যে বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ও সচেতনতা তৈরির বিষয়েই তোর নেওয়া হয়েছিল। তারপর ১৯৯৫ সালে তৈরি হয় ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর ডিসআসটার ম্যানেজমেন্ট। এই কেন্দ্রে বেশ কিছু উপর তলার সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। ১৯৯৭ সালের জবলপুর ভূমিকম্প, ১৯৯৯ সালের উড়িষ্যার সামুদ্রিক ভড়ের পরে নানা সমীক্ষার কাজ করা হয়েছিল এই কেন্দ্র থেকেই। কিন্তু কেন্দ্রটি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে সক্রিয়তা, বিশেষজ্ঞদের মতে এর কারণ হ'ল কেন্দ্রটির বিষয়ে

বন্যা, খরা বা ভূমিকম্প কারণ হলেও মানুষের অসহায়ত্ব বা সকেটের কারণটার উৎস লুকানো অন্য স্নায়গায়। তা হ'ল উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসম বিকাশ, নানা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিদেশী মদত পুষ্ট ফ্যাসিবাদী চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশ।

কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা নীতি তৈরি করা হয় নি। এর কাজকর্মের বিষয়ে সরকারের কোনো পরিচালার ধারণা নেই। অঞ্চ প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মোকাবিলা করার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল।

আবার বিপর্যয়গুলিকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গির অভাব লক্ষ্য করা

যায়। দু-প্রকৃতিগত অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয় না। এবছরের বাজেট অধিবেশনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে এখনো ৮০,০০০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। অঞ্চ মাথাপিছু শক্তির ব্যবহারকেই বিশেষজ্ঞরা উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে ধরে থাকেন। শক্তি ব্যবহারের একটা বড় অংশই হ'ল বিদ্যুতের ব্যবহার।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মানুষদের এই চরম পরিস্থিতির কারণ অবশ্যই খরা। কিন্তু এতটা বিপর্যত হওয়ার জন্য দায়ী সরকারি নীতি। কৃষির ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অভাব

রয়েছে। ভারতবর্ষে মোট চাষযোগ্য জমির ৫০ শতাংশই নির্ভর করে কৃষ্টির উপর। রাজস্থানে কৃষি জমির মাত্র ৩০ শতাংশ কানেল ও নলকূপের মাধ্যমে সেক্টর সুযোগ পায়। সেখা গেছে সেক্টর সুবিধা থাকলে প্রতি হেক্টরে গড় ফলন হয় প্রায় দু'টন। আর সেক্টর অভাবে, শুধু কৃষ্টির উপর নির্ভর করে এই ফলনের মাত্রা নেমে যায় ০.৭ থেকে ০.৮ টনে। অর্থাৎ একটি হিসাবে সেখা যায়, গড় তিন বছরের বাজেটে কৃষি মন্ত্রকের বরাদ্দ ছিল মোট ১৮,৭৩০ কোটি টাকা কিন্তু খরচ করা যায় নি ১,৫০২ কোটি টাকা। গ্রামোন্নয়নের মন্ত্রকের বরাদ্দ ছিল ৩১,৯৯৫ কোটি টাকা, খরচ করা যায় নি ১,৩৮০ কোটি টাকা। সেচ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি সম্পূর্ণ ভাবে অব্যবহৃত। গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মসূচির জন্য গত ৩ বছরে বরাদ্দ ছিল ৩৩৬ কোটি টাকা। খরচ হয় নি ৫১ কোটি টাকা। খরা প্রবণ এলাকার মানুষ অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে চিকিৎসার সুযোগের অভাবে। বেসরকারি খরচ সাপেক্ষে চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার মতো আর্থিক কমতাও তাদের নেই। যেখানে মানুষের কাছে বেঁচে থাকবার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পরিষেবার সুযোগ নেই, সেখানে বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে না। এতো সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনা, নৈতিকতার অভাবেরই প্রতিফলন।

এখনকার খরা কবলিত অঞ্চলের মানুষদের সাধারণভাবে আর্থিক অবস্থাও এর আগে বেশ খারাপ ছিল। তাও সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনার ফসল, ১৯৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী শিশু মৃত্যুর হার (হারার প্রতি) ওড়িশা — ৯৭, মধ্যপ্রদেশ — ৯১, রাজস্থান — ৮১, অন্ধ্রপ্রদেশ — ৬৬, গুজরাত — ৬৩। সেন্ট্রাল অ্যাগরিভ জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মত অনুযায়ী এই সমস্ত এলাকার মা ও শিশু মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট বেশি। কঠিন পরিস্রম ও অপুষ্টি এর কারণ।

আটটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাল শেষ হয়েছে। এখন চলছে নবম পরিকল্পনার সময়কাল। শুরু হয়েছে ১৯৯৭ সালে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছিল 'সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা সহ বিকাশ'। নবম পরিকল্পনায় ন'টি বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে —

১. কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ।
২. সমাজের দুর্বলতম মানুষের বাস্য ও পুষ্টির বিষয়ে সুরক্ষা।
৩. সমস্ত মানুষদের জন্য পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয় ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ।

কিন্তু ১৯৯৭-৯৮ সালে কৃষি উৎপাদন কৃষ্টির হার ছিল ক্ষণাত্মক, — ১.২ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ সালে এতটো খারাপ না হলেও আশানুরূপ ছিল না। এই অবস্থার জন্য কারো হিসাবে

সেখানে হয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে। অবশ্য তাদের উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আড়ালে মূল কারণগুলিকে প্রকাশ না করা। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ, সার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সংস্থাকে অবাধ ব্যবসার সুযোগ দেওয়া, সেচ, বিদ্যুৎ ইত্যাদির বিষয়ে কোনো সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ না করাটাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে সমস্ত দেশেই। তা প্রকৃতির নিয়মে ঘটে। কিন্তু বিপর্যয়ের কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেকটাই কমানে সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন — এক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক কৌশলের প্রয়োগ। দুই, বিপর্যয়ে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাময় অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করা। বিপর্যয়ে মোকাবিলা করার মত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এই দুটি বিষয়ের জন্য প্রয়োজন জীবাণুর মৌলিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গবেষণাকে আরো বিস্তৃত এবং উৎসাহিত করা। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিটা অন্যরকম। এবছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিজ্ঞানের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১২৮.৪ বিলিয়ন (১২৮৪ কোটি) টাকা। এর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পন্থের মৌলিক গবেষণার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১০০ বিলিয়ন (১০ কোটি) টাকা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির টাকার বড় অংশই চলে গেছে পরমাণু শক্তি, মহাকাশ ও সামরিক গবেষণার জন্য।

তাই বন্যা, খরা বা ভূমিকম্প কারণ হলেও মানুষের অসহায়তা বা সংকটের কারণটার উৎস লুকানো অন্য জায়গায়। জা হ'ল উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসম বিকাশ, ন'না ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বিদেশী মদত পুষ্টি ফ্যাসিবাদী ডিক্টিয়াতোরের অনুপ্রবেশ। তাই পাঁচটি রাক্ষুসের খরা, উড়িষ্যার সামুদ্রিক ক'ড, পশ্চিমবঙ্গের বন্যা কিংবা গুজরাতের ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ভাবে ভাবা মনে হয় ভুল হবে। সামগ্রিকতার ভিত্তিতেই বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

সাহায্য সূত্র :

১. An Introduction to Climate : Trewartha and Horn
২. মোক্ষনা : ঘর, ২০০১
৩. ব্রুটলইন : ৩০ মার্চ, ২০০১
৪. উৎস মানুষ : জন্ম, ফেব্রু. ২০০১ সংখ্যা
৫. গল্পভিত্তি বিশেষ প্রোগ্রাম — ২৯ মার্চ, ২০০১
৬. The Hindu : ১৮ মার্চ ২০০১

কিউবার ‘খালিপদ’ ডাক্তার

ডেভিড দেবদাস

পাঁচ

মাসের অক্টোবর ও ফেলিয়া মারোরে মার্টিন। হাসিমুখে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রোগী মেখে চলেছেন কিউবার এক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তাঁর কাজই হচ্ছে রোগীর চিকিৎসা যাতে সর্বোৎকৃষ্ট হয় সেমিকে নজর রাখা। কিউবারে অসংখ্য মার্টিনরা রয়েছেন। এরা মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। কিউবানরা এদের পরিবারিক চিকিৎসক (Family Doctor) বলে থাকেন। আসলে এরাই হলেন কিউবার খালিপদ ডাক্তার (Barefoot Doctor)। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যেই মার্টিন সপরিবারে বাস করেন। সব খালিপদ ডাক্তাররাই এভাবে জীবনযাপন করেন। ইংল্যান্ডের নরোয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র শেখও কিউবার স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও খালিপদ ডাক্তারদের গুরুত্ব নিয়ে থাকে। এইসব ডাক্তাররা এক একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঘরিতে থাকেন। এদের সঙ্গে থাকেন একজন নার্স ও একজন প্রকৌশলী (technician)। স্বাস্থ্যকেন্দ্র-পিছু ৫০০-৬০০ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। দু’ সপ্তাহই অতীত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও একজন সমাজকর্মী (social worker) স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে আসেন। এরা শুধু খালিপদ ডাক্তারদের অনুমোদিত রোগীদেরই দেখেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সৈনিক প্রশাসনিক কাজে স্থানীয় পৌরসভাগুলি সাহায্য করে, যদিও এগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন করে পরিসংখ্যানবিদ (statistician) থাকেন, যার কাজ হচ্ছে রোগের তথ্য ভোগাড় করা। কোন রোগ বেশি হচ্ছে তা অগ্রগম ভাবে থাকলে মহানগরীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর করা যায়।

অরাক হুইনা যখন গুনি ১৯৫৯ সালের বিপ্লবের পরে কিউবা তেরোটি ঘোঁরাতে রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে। শিশুদের আর পেলিও রোগের প্রতিবেদক পাওয়াতে হয় না। হাম, ম্যাস্পস, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি মারাত্মক রোগের হাত থেকে কিউবা মুক্ত। মেনেনজাইটিসের প্রতিবেদক টিকা দান করে খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে। কিউবার ৯০ শতাংশ মানুষ এই ভ্যাকসিন রোগের হাত থেকে বেঁচেছে। গত বছর মাত্র একজন ধনুটকার রোগে মারা গেছে।

বেজীর (Leucoderma) ফলগ্রন্থ চিকিৎসা একমাত্র কিউবাতেই হয়ে থাকে। যন্ত্রা গর্ভমূল (human Placenta)

থেকে অনেক ভটিল ও দুর্ব্যাবস্থা চর্মরোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। আর এসব ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিউবার এক অত্যন্ত সাধারণ মানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই হয়েছে। এখন টাক পড়ার চিকিৎসাও এখানে হয়ে থাকে। এইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বিভিন্ন রোগের ওষুধ উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৫৯ সালে বিপ্লবের সময় যেখানে চিকিৎসা-বিদ্যালয় ছিল একটা, ডাক্তার ত্রা বেড়ে হয়েছে ২২টা। ডাক্তারও বেড়েছে নানান তালে। শিশু মৃত্যুর হারও অনেক কমেছে। কিউবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী গর্ব ভরে জানাচ্ছেন যে তিন হাজারের বেশি কিউবার ডাক্তার আশেপাশের অনেক দেশেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়িয়ে সুদূর ককোডিয়াতেও চলে যাচ্ছেন অনেকে। রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে অন্যদেশে চলে গেছেন এরকম ডাক্তারের সংখ্যা নগণ্য। এছাড়াও চম্পিগ হাজার ডাক্তার কিউবা ছেড়ে অন্য দেশে গেছেন, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র চম্পিগসহ অন্য দেশের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

প্রচার মাধ্যম কিউবার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই সামগ্রিক সাফল্যকে বিকৃতভাবে মানুষের সামনে হাজির করে। কিউবার এই সুনিপুণ স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আমেরিকার অর্থনৈতিক অরোহণ। অর্থিক মূল্যে এই ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২১২.৩ কোটি ডলার। এই পরিস্থিতিতে সরকার একটা চিকিৎসা কেন্দ্রও বন্ধ করেনি। একজন চিকিৎসকও কর্মহীন হননি। বরঞ্চ এই সময়ে শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ১০.৭ ভাগ থেকে কমে ৭.২ ভাগে পৌঁছিয়েছে। এত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও গত শতাব্দীতে কিউবার শিশুদের স্বাস্থ্য আমেরিকার শিশুদের স্বাস্থ্যের সমপর্যায়ে চলে যায়। আসলে সঠিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিচালনাই কিউবাকে এত সাফল্য এনে দিয়েছে।

অনুবাদ : বরুণ ভট্টাচার্য

সূত্র : Business Standard, May 18, 2001 ; Cuba's Barefoot Doctors by DAVID DEVADAS

সহস্রাব্দের মূল্যায়ন

অমর্ত্য সেন

অনুবাদ : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

[দ্বিতীয় এবং শেষ পর্ব]

বিজ্ঞান, গণিত ও সংস্কৃতির প্রসার

এবারে দ্বিতীয় বিষয়। সেটা হল একটি ধারণা বা বিষয়ের সঠিক উৎসস্থল নির্ণয়ের অসুবিধা। কখনো কখনো হালে একটি বিষয় হয়তো পাশ্চাত্য দুনিয়া থেকে এসে পড়তে পারে, যদিও এর পূর্ববর্তী উৎস হয়তো পাশ্চাত্য-বহির্ভূত প্রভাবের আওতাধীন ছিল। বিজ্ঞান ও গণিতের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কারণ এই বিষয় দুটি বহু সমাচ্ছাদিত ও সংস্কৃতির অবদান আচ্ছাদিত করে গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক গৃহীততার কাছে আগত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস সন্দেহাতীতভাবে 'পাশ্চাত্যীয়' বলে মনে হবে, কারণ সেগুলি নিয়ে আসাম্ভে পাশ্চাত্যের মানুষ। অথচ এই ধারণা বা বিশ্বাসগুলি কোনো অর্থেই প্রকৃতি বা উৎসের দিক থেকে পাশ্চাত্যীয় নাও হতে পারে।

অন্য এক আলাপচনা (১৯৯৫ সালে কলকাতায় 'আমাদের সংস্কৃতি, তাদের সংস্কৃতি' শীর্ষক সম্মেলনে) রায় মারক বসুতায়) আমি যে উপাধরণ পেশ করেছিলাম, এখানেও তার উল্লেখ করে আমি সম্ভবত বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হব। বিষয়টি হল বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে আধুনিক গণিতশাস্ত্রের আগমন। ভারতীয় উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে বিষয়টি সুস্পষ্ট বৃটিশ রূপ ধরেই হাজির হয়েছিল। সে সময় ইংল্যান্ডের হাইকুলগুলিতে যে মান ছিল, পরিভাষা ও তা বিষয়বস্তু ছিল হুবহু ভারতীয় অনুসরণ। যদিও সময়কালীন বিখ্যে 'বৃটিশ' বা 'পাশ্চাত্যীয়' গণিতশাস্ত্র বলে কিছুই নেই, তা সত্ত্বেও ভারতে কিছু স্বকণ্ঠীয় ব্যক্তি-একে পাশ্চাত্যীয় চিন্তাধারার আগ্রাসন বলে মনে করেন। কিছু কিছু মৌলিক গাণিতিক ধারণা ভারতীয় বিদ্যালয়ে বৃটিশ কর্তৃক চালু করা হলেও আসতে সেগুলির বিকাশ ঘটেছিল এই ভারতেই। গ্রিকোগণিত এমন একটি বিষয়, যদিও পশ্চিমী পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমেই এই ধারণাগুলি ভারতে ফিরে আসে।

গ্রিকোগণিতের একটি মৌলিক ধারণা হল 'সাইন' (sine)। এই পরিভাষার উৎপত্তি পূর্বোন্মেষিত বিষয়টির অন্যতম সর্বাধিকৃষ্ট উদাহরণ। পঞ্চম শতকের শেষভাগে ও ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় ভারতীয় গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট 'সাইন'-এর ধারণা নিয়ে প্রয়োগ করা করেছিলেন। তিনি সংস্কৃতে এর নামকরণ

করেছিলেন জ্যা-অর্ধ, আর কখনো কখনো সংক্ষেপে উদ্দেশ্য করেছেন জ্যা বলে। আরবি গণিতজ্ঞরা এই ধারণা গ্রহণ করার সময় এর নাম রাখেন 'ইয়া' (iya)। এখান থেকেই শুক ইফ পরিভাষার আন্তর্জাতিক রূপান্তরের এক চমতপ্রস কাহিনী। গণিতের ইতিহাসে রচয়িতা হ্যাওয়ার্ড ইভ্‌স এর বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

আর্যভট্ট এর নাম মেনে অর্ধ-জ্যা ও জ্যা-অর্ধ। পরে তিনি একে সংক্ষেপে উদ্দেশ্য করেন জ্যা বলে। এই জ্যা থেকে আরবি গণিতজ্ঞরা উচ্চারণগতভাবে পৌছানেন জিব্বা (jiba) শব্দে। ব্রহ্মবর্ষ লোপ করার আরবি নীতি অনুসারে শব্দটিতে সেবা হল জিব্ব (jib)। গাণিতিক হাংলার ব্যতিরেকে এই জিব্বা শব্দটি কিন্তু আরবি ভাষায় কোনো অর্থই বহন করে না। পরবর্তীকালের লেখকেরা জিব্বা শব্দটির পরিবর্তে ব্যবহার করলেন জেইব্ব (jaib) শব্দটি। এটি লিখতে একই অক্ষরসমূহ ব্যবহার হলেও আরবি ভাষায় এর একটি অর্থ আছে — আর তা হল বাকী বা উপসাগর। আরো পরে আরবি ভাষা থেকে অনুবাদ করার সময় ক্রোমানোর পেরাণী আরবি জেইব্ব শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করলেন সমার্থক ল্যাটিন শব্দ সাইনুস (sinus) — যার অর্থও হল বাকী বা উপসাগর। আর এ থেকেই বর্তমান গাণিতিক প্রতীক সাইন-এর উৎপত্তি। একটি বিশেষ ধারণা বা বিষয়ের উৎপত্তি বিষয়ের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে হয়েছিল, গণিত এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধ্যানধারণার উপরোক্ত প্রকৃতির দেশান্তর থেকে প্রায় বোকা সত্যিই দুর্ভর।

প্রকৃতপক্ষে প্রথম সহস্রাব্দের অন্তিম লয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিভিন্ন সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচার থেকে পাশ্চাত্যের গণিতের ওপর গ্রিকের প্রভাবের ব্যাপকতা আমাদের নজরে পড়বেই। ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই ভারতে দশমিক পদ্ধতির যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল এবং তার অব্যবহিত পরেই আরবি গণিতজ্ঞরা এর বহুল প্রয়োগ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ইওরোপে এই গাণিতিক ধারণা এবং পদ্ধতি প্রথম দশম শতকের শেষার্ধ্বে পৌঁছেছিল। এছাড়া, ততদিনে ভারতীয় ও আরবি গণিতশাস্ত্রে শূন্যের ব্যবহার ভ্যাপোরকম চালু হলেও এই ধারণাটির অঙ্গো তাত্ত্বিক যুক্তিনিষ্ঠ সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের আগেরপাশে ভারতীয় গণিতবিদ ব্রীধর এ বিষয়ে নিশ্চিত তাত্ত্বিক সূত্র প্রদান করেন। বস্তুত, ৯৭৫ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দশমিক পদ্ধতি ও শূন্যের ব্যবহার — এই দুটিই ছিল একমাত্র

গাণিতিক আগ্রহের বিবরণ। কার্লস্ট গ্রন সম্পাদিত The Time-tables of History এবং ওরেনার স্টেইন সম্পাদিত Kulturfahrplan শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থেই এ বিষয়ে বিস্তৃত উল্লেখ আছে।^১ একইভাবে এই গ্রন্থদুটিতে একই সময়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ একমাত্র যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল ১০০০ খৃষ্টাব্দে চীনা বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক ব্যাক্সের ব্যবহারের আবিষ্কার।

বিজ্ঞান ও গণিতের কিছু কিছু সংযুক্তিকরণ ও সাম্প্রতিক বিকাশ পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ঘটেলেও ‘পাশ্চাত্যীয় বিজ্ঞান’ বা ‘পাশ্চাত্যীয় গণিত’ বলে যা কিছু কলা হয়ে থাকে, তা প্রকৃত অর্থে পাশ্চাত্য দুনিয়ার একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি নয়। বস্তুত, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রভাব বিস্তারক গতিতে সকল ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে যায়। আর তাই, সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যজাত বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য অথবা চারুকলার খোঁজ করা একেবারেই নিরর্থক। একইভাবে, অন্য দেশে উৎপত্তি হয়েছে এমন কোনো আবিষ্কার দেশীয় সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করবে, এই ভয়ে তার বিরোধিতা করারও কোনো অর্থ হয় না।

যুক্তিবাদিতা, অতীত্ববিবাদ ও বিচিত্রতা

যখন ধারণা ও যুক্তিবাদিতার ‘পাশ্চাত্যীয়’ ও ‘ভারতীয়’ ঐতিহ্যের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ সক্ষম হওয়ার সময়টি নিজে এবার আলোচনা করা যাক। একথা প্রায়ই খোঁজ দিয়ে কলা হয়ে থাকে যে, গভীরতার বিচারে ভারতীয় সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের তুলনায় অনেক বেশি ধর্মীয় ও অতীত্বিয়। একথা অকণ্ঠে ঠিক যে ভারতে ধর্মীয় সাহিত্যের অবস্থা এক ভাঙার রয়েছে, যা সত্যিই বিস্ময়কর। একই সাথে একথাও ঠিক যে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় নাস্তিক্যবাদী বা নিরীশ্বরবাদী যত রচনা রয়েছে, তা বিশ্বের অন্যান্য ধ্রুপদী ভাষায় (যেমন গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু বা আরবি) একই বিষয়ে লেখালেখির থেকে অনেক বেশি। এটা শুধু চারুকল্পী বা লোকায়ত দর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বের একমাত্র নিরীশ্বরবাদী ধর্মমত বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

এমনকি চতুর্দশ শতকেও মাধবাচার্য রচিত *সর্বকর্নসংগ্রহ* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের পুরোটাই নাস্তিক্যবাদী অবস্থানের সমর্থনসূচক যুক্তিতে ভরা। ভারতীয় ধর্মিকতার বিরুদ্ধে খাড়া করা ‘পাশ্চাত্যীয়’ চ্যালেঞ্জ রূপে যদি এই যুক্তিসমূহকে উপস্থিত করা হয়, তবে একজন ভারতীয় বিশেষত্ববাদী নিশ্চয়ই একে পাশ্চাত্যীয় ও ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্যের উজ্জ্বল এক উদাহরণ হিসাবেই দেখবেন। অথচ এক্ষেত্রে এই নাস্তিক্যবাদী যুক্তি স্থান পেয়েছে চতুর্দশ শতকের একজন বৈকল্প পণ্ডিতের লেখা গ্রন্থে। একইভাবে *রামায়ণের* কথাও ধরা যাক। এ হল সেই মহাকাব্য যাকে কেউ কেউ ভগবান রামচন্দ্রের জীবন

সম্বন্ধীয় পবিত্র গ্রন্থ বলে মনে করেন। এই মহাকাব্যের প্রাথমিক অংশে নিছক ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষার্থে রাম তাঁর রাজ্যাবিকার ত্যাগ করতে উদ্যত হলে যদি কেউ তাকে সেই কাজ না করতে পরামর্শ দেয়, তবে সেটা সাংঘাতিক ধরনের ‘পাশ্চাত্যামূলক’ মনোভাব বলে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিষয়টি মোটেই ‘পাশ্চাত্যীয় সমালোচনা’ ছিল না, কারণ জাগতিক জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত জাবালি রামকে এরকম কথাই বলেছিলেন, আর তা রামায়েণেই লেখা আছে : ‘হে রাম, বিচক্ষণ হও। নিশ্চিত জেনো, ইহজগৎ ছাড়া অন্য কোনো জগৎ নেই! যা বর্তমান, তাই উপভোগ করো, আর যা কিছু অশ্রুতিস্বর, তা পরিত্যাগ করো।’^২ প্রাচীন ভারতীয় রচনায় নাস্তিক্যবাদী চিন্তাভাবনা যথেষ্ট পরিমাণ ছড়িয়ে আছে। নিষিদ্ধ ‘পাশ্চাত্যীয়’ হলিপত্রের সন্ধানে যত কোনো শুষ্ক আধিকারিক এবংবিধ কথ জিনিস বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। পাশ্চাত্যীয় যুক্তিবাদিতা সম্বন্ধে সরলীকরণ এবং ভারতীয় ও অন্যান্য অ-পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের সাথে এর গভীর পার্থক্যের বেশিরভাগেরই কোনো মূল্য নেই। প্রতিটি প্রধান সংস্কৃতির মধ্যেই কলা পরিমাণ বৈচিত্র্য রয়েছে। একথা পাশ্চাত্যীয় ও ভারতীয় — উভয় ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পাশ্চাত্য দুনিয়া নিজেই অকণ্ঠ প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক শক্তির বিষয়ে গভীরভাবে বিতর্কিত। সহজবোধ্য দর্শনদের জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্বন্ধীয় কত শত কাহিনীই যে প্রচারিত হয়, সম্ভাব্যেণা আমেরিকায় টেলিভিশন চ্যানেলেই তা টের পাওয়া যায়। এই ভাবনের গোড়ার দিকে প্রথম সহস্রাব্দের সমাপ্তিকালীন যে কলার আমি করছি, তা এখানে পুনরায় স্বরণ কর্তা হরায়মান। ১০০০ খৃষ্টাব্দ যত এগিয়ে আসছিল, গোটা ইউরোপ জুড়ে একটা আতঙ্ক ততই বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছিল যে, পৃথিবীর অবলম্বিত আসর এবং ভরংকর ‘শেষ বিচার’ সেই সময়েই ঘটবে। একে কখনো কখনো ‘সহস্রাব্দের আতঙ্ক’ বলে অভিহিত করা হয়। তথাকথিত শেষ বিচারের এক হাজার বছর পূর্বেই যীশুখ্রীষ্টে আবির্ভাব ঘটবে — এমন একটি ধারণার সাথে এই আতঙ্কের যোগ ছিল। ‘মিলেনিয়রিকম’ নামে যাঁরা এই ধারণা খুঁটান ধর্মাবলম্বীদের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে (যেমন আডভেন্টিস্ট) এখনও কর্তমান। এই ইউরোপীয় আতঙ্কের সঙ্গে তুলনা করলে সেখা যাবে যে শক অথবা হিজিরা কালপঞ্জিকার ১০০০ অব্দের আগমন ভারতে এক শান্ত সুখির কাব্যবরণের মধ্যেই ঘটেছিল। একধারার অর্থ এই নয় যে, ভারতের থেকে ইউরোপ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে অধিকতার বিশ্বাসী। কিন্তু এটা মাঝারি সাধা দরকার যে, শক অথবা হিজিরা কালপঞ্জিকা অনুযায়ী সহস্রাব্দের অবসানে যদি ভারতে এমন কোনো আতঙ্কের সৃষ্টি হত এবং ১০০০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যদি সেরকম কোনো কিছু না ঘটত (অর্থাৎ যা ঘটেছিল, যদি ঠিক তার উল্টোটা ঘটত), তবে পাশ্চাত্য — অ-পাশ্চাত্য প্রভেদের

অভিভাবকতা তাকে পাক্কাভীর বৃত্তিবাধিতা এবং ভারতীয়দের অতি প্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসের মধ্যে বৈপরীতা সম্বন্ধীয় এক নিশ্চিত দৃষ্টান্ত রূপে অবশ্যই হাজির করত।

আমি একথা অস্বীকার করছি না যে বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঐতিহ্যের মধ্যে বিভিন্ন ভাবধারার ভারসাম্যের অবশ্যই ভারতমুখী হতে পারে। কিন্তু পাক্কাভা — অ-পাক্কাভার প্রভাব দর্শনে গিয়ে সে সব সমসীকরণ করা হয়, তার কিছু কিছু মেনে নেওয়া সত্যিই কঠিন। প্রতিটি সংস্কৃতির মধ্যেই রয়েছে বিপুল বৈচিত্র্য, আর তা সময়ে সময়ে সাথে পরিবর্তিতও হয়। প্রাচ্য ও পাক্কাভা - উভয়েই একান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একে অন্যের থেকে একেবারেই ভিন্ন — এমন কোনো অনড় সমসীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এদের বিপরীত আসনে বসানোটা হবে বিরাট এক ভুল। একটি অ-পাক্কাভা সমাজে প্রচলিত কোনো রীতিনীতির সমালোচনা করার সময় কিছু মানুষের পক্ষে ‘পাক্কাভাকরণের’ তত্বমা এটো নেওয়াটা খুবই সম্ভব। কিন্তু একটি অ-পাক্কাভা সমাজকে পাক্কাভাকৃত করার সহজ উপায়ের মতো শেখর নাট্যিকগণী রচনাতেও এরকম সমালোচনা খুব সহজেই বুঝে পাওয়া যাবে। বুদ্ধ, চার্বাক অথবা জীবালি ছিলেন রাম অথবা কৃষ্ণের মতোই ভারতীয়।

মানবাধিকার এবং এশীয় মূল্যবোধ

‘পাক্কাভাকরণ’ সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিতর্কের প্রতি এবার আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি মানবাধিকার সংক্রান্ত, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত। এশিয়া ও অফ্রিকার যে সব দেশে বৈরতাত্ত্বিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেইসব দেশের সরকার প্রায়শই পাক্কাভীয় মূল্যবোধের সাথে স্থানীয় মূল্যবোধের এক তথাকথিত বিনিময় পার্থক্যের কথা বলে থাকে। ‘পাক্কাভ মূল্যবোধের’ তুলনায় ‘এশীয় মূল্যবোধ’ মানবাধিকারের প্রতি কম দাব্যবোধ বলে ধরা হয়। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বসংমেলনে উজ্জ্বল মতবিরোধ কালে পাক্কাভাকরণের বিরুদ্ধে প্রবল চৌচায়েটি অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

মানবাধিকারের বিষয়ে পাক্কাভীয় ও অ-পাক্কাভীয় মূল্যবোধের মধ্যে সত্যিই কোনো পার্থক্য আছে কি? এটা সত্যি যে সাম্প্রতিক শতকগুলিতে, বিশেষ করে ইউরোপীয় ‘নব্যজাগরণের’ পরে গণতন্ত্রের প্রয়োগ এবং তৎসম্পর্কিত রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা পাক্কাভা দুনিয়ার প্রবলভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। অ-পাক্কাভীয় সমাজেও মানবাধিকারের মহান প্রবক্তারা আত্মপ্রকাশ করেছেন। মহাত্মা গান্ধী ও সান ইদ্রাং সেন-এর মতো ব্যক্তিরাজ্যীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরও পাক্কাভা দুনিয়ার গণতন্ত্রের বিকাশের প্রণালী করতে কখনো কুঠিত হননি।

এইসব রাজনৈতিক চিন্তাধারার সম্ভাব্য উৎসবুল পাক্কাভাত্মক কিনা, সেটা আলোচনার বিষয় নয়। যেটা জানা প্রয়োজন, তা হল পাক্কাভীয় ঐতিহ্যের সাথে অন্যত্রের ঐতিহ্যের এমন কোনো পার্থক্য সত্যিই আছে কিনা যা ওইসব মূল্যবোধকে সম্পূর্ণরূপে ‘পাক্কাভীয় মূল্যবোধ’ বলে চিহ্নিত করার সুযোগ করে দেয়। কিছু সোধক, বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ায় এই কাজটাই করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে আমি অন্যর বিচারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি (বিশেষ করে গত বছর নিউ ইয়র্কে কানেগী কাউন্সিলে মর্গেনথোট স্মারক বক্তৃতায়)। সেখানে আমি এটাই বলেছি যে পাক্কাভা ও অ-পাক্কাভা দুনিয়ার বৌদ্ধিক ইতিহাসের মধ্যে এরকম সাধারণ কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না।

পাক্কাভীয় এবং ভারতীয়, চীনা, আরবি ও অন্যান্য অ-পাক্কাভীয় ঐতিহ্যে মানবাধিকারের মৌলিক ভাবনা সম্বন্ধে অনুকূল ও প্রতিকূল — উভয় ধরনের রচনাই চোখে পড়তে বাধ্য। কোনো কোনো বিষয়ে কনফুসিয়াস বা কৌটিল্যকে বৈরতাত্ত্বী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্লেটো বা সেন্ট অগাস্টিনকেও তো তাই মনে হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার এক মহান প্রবক্তা ছিলেন আরিস্তোতল। কিন্তু তিনিও এই স্বাধীনতার দাবি মুক্ত মানুষদের জন্যই শুধু করেছিলেন (দাস বা মহিলাদের জন্য নয়)। সম্রাট অশোকের সংহিতা অথবা তিনি যে সহিষ্ণুতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তাও এর থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। যখন মূল্যবোধ সঙ্গতি আকারে বৈচিত্র্যের সহিষ্ণুতা এবং বিশেষ করে ধর্মিক ভেদাভেদ সম্বন্ধে তাঁর বলিষ্ঠ নীতিসমূহ কার্যকর করছিলেন, তখন ইউরোপে ধর্মবিশিষ্টতার অপরাধে বিচারের ব্যবস্থা খুবই ক্ষমতাসাহী ও সক্রিয় ছিল। এখানে একথা স্মরণ করা অগ্রাসঙ্গিক হবে না যে, দ্বাদশ শতকে ইউরোপে যখন নিষ্ঠুরভাবে ইউদিদের হত্যা করা হচ্ছিল, তখন মহান ইহুদি পণ্ডিত মাইমেনিডেন তাঁর অসহিষ্ণু জন্মস্থান থেকে পালাতে বাধ্য হন এবং সহিষ্ণু ও সত্য কায়রো শহরের আশ্রয়ে নিরাপত্তা খুঁজে পান এবং সুলতান সালাদিনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

এশীয় মূল্যবোধ বনাম মানবাধিকারের বিরোধ সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রবক্তারা তাঁদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য বারোবারেই কনফুসিয়াসের পোহাই পেড়ে থাকেন। অথচ তিনিও শাসকবর্গ তুল করলে তার প্রতিদান করার গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। চরম ব্যবস্কাধী মানুষ হিসাবে কনফুসিয়াস অকণ্যই কার্যকরী সাধননতা বা কৌশলের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, গ্রহাণযোগ্য নয় এমন কোনো সবকারের বিরোধিতা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস কম ছিল। ‘যখন রাষ্ট্রের অবস্থা অনুকূল, তখন দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কথা বলা, দুর্ভাগ্যের কাজ করা, আর কথা বলা শাস্ত্যাবে।’

শেখের মজ্জবা

একর শেখ করার পালা। যে সহস্রাব্দের সমাপ্তি আসায়, তা বিচ্ছিন্নকৃত করে দিয়ে পাশ্চাত্য নিয়েছে। কী কী ঘটেছে এবং সেগুলির সমাজ বা ধর্ম কী, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত। একতরু বিভিন্ন ঘটনাবলির পাশাপাশি সহস্রাব্দের সূচনা হচ্ছিল বিশেষ ইসলামী শক্তির অত্যাচারের মধ্য দিয়ে, আর এর শেষ হচ্ছে সমসাময়িক বিশ্বে পাকাতা শক্তির অসামান্য প্রাধান্য নিয়ে। প্রতিটি সংঘটিত ঘটনাই অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের পক্ষে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিষয়। ভারতের ক্ষেত্রেও একথা সমান প্রযোজ্য।

ভারতীয় সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে ইসলামী সংস্কৃতির আত্মীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সভ্যতা কল্যাণে বিকশিত হয়েছিল। এই সব পরিবর্তনকে মাধ্যম রেখে কখনো কখনো প্রাক-ইসলামী ভারতকে একটি সমসত্ত্ব ও মিশ্রণহীন জাতি রূপে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, যদিও ভারত প্রকৃতপক্ষে তা ছিল না। যে বৈচিত্র্য তখনই এসেছে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, ইসলামী প্রভাবে উপস্থিতি থাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল মাত্র। এর ফলে ঘটেছিল শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত সহ সামগ্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধি। এই সংযোজনর প্রসঙ্গই এটাই নির্বৃত্ত যে অনেক ভারতীয় ঐতিহ্য ও আচার-অচরণের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ব্যতীত চোখেই পড়ে না।

অপরপক্ষে, সহস্রাব্দের শেষভাগে বিশেষ পাকাতা দুনিয়ার বর্তমান প্রভাবে বিবর্তিত বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে। পাকাতা ও অ-পাকাতা দুনিয়ার মধ্যে অসামান্য সঠিক কারণেই একাধিক উল্লেখের ভঙ্গ দেয়। এখানে অবশ্য একটা বিষয়ে পরিষ্কার হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কিছু ধ্যান ধারণা এই ধরনের কয়েকটি উল্লেখকে যেমন অকণ্টা রূপ দেয়, তেমনি অন্যগুলি এর ধারেকাছে একেবারেই পৌছায় না। 'পাকাত্যকরণের' ধারণাটিই কল্পিত সমস্যার পরিপূর্ণ। আর তাই সাংস্কৃতিক সমাজতাত্ত্বিক প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে পাকাত্য দুনিয়া থেকে আগত সৃজনশীল প্রভাবে সমালোচনাকে প্রায়শই একই দৃষ্টিতে দেখা হয়।

কোনো চিন্তা, অথবা কোনো বিষয়, অথবা কোনো অনুশীলন সাংস্কৃতিক রকমের গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। সেই চিন্তা অথবা বিষয় অথবা অনুশীলনের কোনো অবদান আছে কিনা, নাকি এগুলি কোনো কিছু বদল করার কাজে নিয়োজিত – তা বাতাই করে দেବା দরকার। এর জন্য প্রয়োজন এক আদর্শ সতীকরণ। একই সাথে দেশ থেকে দেশান্তরে জ্ঞান, উপলব্ধি ও কৃৎসীশনের ঐতিহাসিক গণনাগমনের পরিবেশিত কোনো বিশেষ একটি চিন্তার উৎস চিহ্নিত করা অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কঠিন। ত্রিকোণমিত্তির 'সাইন' ধারণাটি ভারত থেকে বিদেশে গিয়ে পরে আবার ভারতে ফিরে

আসে (পূর্বেই একথা বলা হয়েছে)। দুনিয়া কোনো বিষয় থেকে কিংবা অন্য কিংবা একটি বিষয়কে গৃহক করে দেখাটা যে কতটা অসুবিধাজনক, উপরোক্ত দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ।

এই ভাবশেখের শেষপর্বে আমি প্রচলিত দুটি বিশেষ সরলীকরণের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি উপস্থাপিত করেছি। এর প্রথমটি হল ভারতীয় সংস্কৃতির অতীতের অথবা ধর্মীয় প্রকৃতি, আর দ্বিতীয়টি হল অ-পাকাত্যীয় ঐতিহ্যে, বিশেষ করে তথাকথিত 'এশীয় মূল্যবোধ' মানবাধিকার সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট অতিমত। কেন এই দুই সরলীকরণের কোনোটিই ঐতিহাসিক অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, আমি তাও যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি।

সর্বশেষ একটি মজবুত মাধ্যমে সমাপ্তি ঘোষণার অনুমতি চাইব। এই ভাষণে বিভিন্ন বিষয় আলোচনাকালে উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্যের কথা আমি বেশ কয়েকবার জোরের সঙ্গে বলেছি। নিরুপ পঠিত অথবা নিরুপ সম্পদ না হারিয়েই আমাদের সংস্কৃতি বহিরাগত প্রভাবে অক্ষত করতে সক্ষম এবং তা যথেষ্ট দৃঢ়প্রাণিত। পাকাত্যীয় প্রভাবে প্রতিরোধ সক্ষম অথবা সামাজিক বা ধর্মীয় গুরুত্ব রক্ষার জন্য আত্মসমর্পণ সাংস্কৃতিক কিছু কিছু সাংস্কৃতিক বিতর্ক বর্তমানে চলছে। এগুলি সংস্কৃতির শক্তি সম্বন্ধে আমাদের অতিমতের একেবারে বিরোধী। বিভিন্ন ধরনের আত্মসমর্পণ সৃষ্টিকারী ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সামাজিক রকমের ঘোষণা ও পলকা ধারণা পোষণ করে। আর এখানেই আশঙ্কিত জনের সঙ্গে আমার প্রধান পার্থক্য বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের কাছে যা কিছু মূল্যবান এবং যা কিছু আমরা সম্পদ বলে গণ্য করি, তা না হারিয়েই নতুন নতুন প্রত্যেককে স্বাগত জানানোর ক্ষমতা যে আমাদের আছে, তা আমি মানি। আমাদের সংস্কৃতির শক্তির মান্যতার পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমরা মোটেই কল্যাণী নই।

সূত্র নির্দেশ

‘এই বক্তৃতাটি প্রদান করেছিল কলকাতার নবন। ১ এপ্রিল, ১৯৯৬ এটি The New Republic পত্রিকাতো প্রকাশিত হয়।

Howard Eves, *An Introduction to the History of Mathematics* (New York: Saunders College Publishing House, 6th edition, 1990), p. 237.

‘সর্বদা প্রদান পঠিত The Timetables of History. কৃত্রিম সংস্করণিত সংস্করণ (New York: Simon and Schuster, 1991), পৃ. ১২০-৪ এবং ওয়েনার স্টোন সম্পাদিত Kulturfahrplan (Herbig Verlagshochhandlung 1963) প্রবৃত্তি।

The Ramayana of Valmiki (London, 1952), পৃ. ৩৩২ by H. P. Shastri

Amartya Sen, *Human Rights and Asian Values* (New York, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, 1997)

Simon Ley, *The Analects of Confucius* (New York, Norton ১৯৯৭) ১৪.৩, পৃ. ৩৬।

গ্যালিলিওর 'নির্যাতন' : কিছু তথ্য

সৌমিত্র লাহিড়ী

উ

ৎস মানুষের সেন্টেবর অক্টোবর (২০০১) সংখ্যায় প্রাচ্যে অমলেসু বংশোদ্ভূত-এর 'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?' বইটি নিয়ে আলোচনা উপলক্ষে লিখেছিলাম, গ্যালিলিও-কে যে শাস্তিঘরে আটক রেখে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল, এরকম কোনো তথ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে একটি বিস্তারিতভাবে আমার বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করছি। এই প্রসঙ্গে আমি যা কিছু জানি তা আর্থার কোয়েসলার-এর The Sleepwalkers (দ্য স্লিপওয়াকার্স) বইটি পড়ে।

১৬১০ সালে, গ্যালিলিওর যখন ছেচত্রিশ বছর বয়স, তখন প্রকাশিত হলো তাঁর The Starry Messenger গ্রন্থ। তৎকালীন রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পড়তেন জেসুইট (Jesuit) (পাদ্রী) তাঁরা সাদরে গ্রহণ করলেন এবং সাধুবাদ জানালেন এই গ্রন্থকে এবং লেখককে। তাঁরা কোপারনিকাস প্রস্তাবিত সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বকল্পনাটির প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও উপর্য উপর পক্ষপাত ছিল জ্যোতির্বিদ Tycho Brahe-র কল্পনাসমূহের প্রতি। টাইকো ব্রাহের কল্পনা ছিল দ্বি-র পৃথিবী, প্রাক্তনগত সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহসমূহ। বাইবেলের সঙ্গে বিরোধ ছিল না এ কল্পনার তবে বিরোধ ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে। এখানেই যেসনিট-রা আকৃষ্ট হয়েছিলেন কোপারনিকাসের তত্ত্বের প্রতি। অ্যারিস্টটল প্রস্তাবিত Spherical model-এর মহাবিশ্বকে পরিহার করার জন্য বিকল্প কোনো তত্ত্ব খুঁজছিলেন Jesuitরা। তবে অকটি প্রমাণ পাবার আগে কোনো কল্পনাকেই চূড়ান্তভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। এ পর্যায়ে গ্যালিলিও রোমে গেলো তাঁরা তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্থনাও জানিয়েছিলেন।

গ্যালিলিওর সঙ্গে প্রথম বিরোধ ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যারিস্টটলপন্থীদের। এ বিরোধের কেন্দ্রে ছিল গ্যালিলিওর এক প্রবন্ধ : 'Things that Float on Water' (বস্তুসমূহ, যেগুলি ভালে ডাসে)। গ্যালিলিওর সাথে জেসুইটদের সরাসরি সংঘাত ঘটে ১৬১২ সালে পবিত্রকিত সৌরকলঙ্কের (Sunspot) আবিষ্কারের অগ্রবিহার নিয়ে। বাভারিয়া দেশের Ingoldstat সহরের ফাদার শেইনার (Father Scheiner) দাবি করেন তিনিই সর্বপ্রথম সৌরকলঙ্ক দেখেন। গ্যালিলিও তা মানতে অস্বীকার করেন। প্রকৃত ঘটনা এই, যে এর পাঁচ বছর আগে, অর্থাৎ ১৬০৭ সালে কেপলারই প্রথম দেখতে পান সৌরকলঙ্ক, তবে সূর্যের ওপর বুধের ছায়া বলে তিনি এর ভুল ব্যাখ্যা দেন। পরবর্তীকালে বহু পেশাদারী জ্যোতির্বিদের

সৌরকলঙ্ক চোখে পড়ে এবং প্রত্যেকেই দেখেন গ্যালিলিওর আগেই।

বিজ্ঞানের প্রমাণ ইতিহাস থেকে -

টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে বোধহয় ঠিক বিজ্ঞানের অবদান বলা চলে না। হ্যুগোভের চন্দ্রা শিল্পের উপভাতক এই যন্ত্রটি যেন ঐশ্বরিকতা। অগোচরেই বিজ্ঞানের আভির্ভাব এসে পড়ে। কিংবদন্তী আছে, ১৬০০ সাল নাগাদ একটি ব্যক্তি মেলে নাকি লিপার্শির ফোফানে একটা সেলের মধ্যে দিয়ে জানলার রাখা আরেকটি সেলের দিকে ডাকায় এবং লক্ষ্য করে, কাঁচের জিনিসগুলো অনেক বড়ো দেখাচ্ছে। ... এর পরিণতিতে সেহাং ঘটনাচক্রে তৈরি হয়ে যায় দূরবীক্ষণ।

সে যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় এই দূরবীক্ষণ। পাদ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক এনজিনিয়ারিং ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক গ্যালিলিও গ্যালিলেই-এর (১৫৬৪-১৬৪২) কানে এই আবিষ্কারের খবর পৌছনো মাত্র তিনি ঠিক করেন তিনি নিয়ে ঐরকম এক যন্ত্র বানাবেন। সেই যন্ত্র দিয়ে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আকাশের দিকে।

(শ্রু. ২৭৪, জে. ডি. বার্নাল, ইতিহাসে বিজ্ঞান, প্রথম বও)

১৬১৩ সালে গ্যালিলিও বেশ কিছু চিত্রিত প্রকাশ করেন সৌরকলঙ্ক প্রসঙ্গে এবং এই সব চিত্রের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে প্রচার করেন কোপারনিকাস তত্ত্বের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যারিস্টটলবাদী বিশ্বংমহলের বড়ো একটা অংশ তাঁর বিরোধী লিখিত একত্র হয়েছেন। তবু, চার্চ থেকে কোনো ভয়সনা আসেনি। উণ্টে এসেছে Cardinal Boromero এবং Cardinal Barberinieri অকৃষ্ট প্রশংসাকাণী। দ্বিতীয় জান ছিলেন গ্যালিলিওর বিশেষ বন্ধু।

এই পরিস্থিতিতে গ্যালিলিওর এক শিষ্য গিয়েছিলেন ডিউক কেমিসমোর নিমন্ত্রণে তাঁর ভিলায়। সে নৈশভোজে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিউকের মা, ডিউকের স্ত্রী এবং এক লম্বনের অধ্যাপক। কথ্য প্রসঙ্গে, সে নৈশভোজে ডিউকের মা প্রশ্ন তুলেছিলেন 'Medicean Planets' সম্বন্ধে।

যেমন, তাদের গতিপথ স্বী, তাদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় কিনা। ইত্যাদি। শিষ্য তৎক্ষণাৎ গ্যালিলিও-সমর্পিত সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের অনুসারে তাঁর উত্তর দিলেন। অমনি দর্শনের অধ্যাপক বলে উঠলেন এর সবই বাস্তব কেবল পৃথিবীর কল্পনামাত্র। বাসে। কেননা বাইবেলে বারংবার আছে। পবিত্র শব্দের মুখে এ গল্প শুনে গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের বিষতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এক বিক্ষোভিত খোলা চিঠি প্রকাশ করলেন। এই চিঠি আজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। 'Letter to Grand Duchess Christina' (লটার টু গ্র্যান্ড ডাচিস ক্রিস্টিনা) নামে। এ চিঠিতে কোনো বৈজ্ঞানিক বিষয়কথা প্রমাণ না দেখিয়ে গ্যালিলিও এর সভ্যতা সম্বন্ধে নিজের নিঃসংশয় মতই শুধু দিলেন না, উৎপেত সংশয়ভেদ ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন এ তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করার দায়টা।

এই চিঠিকে কেন্দ্র করে উদ্ভাস বড় উঠলো জেসুইট বিশ্বমহলে। কেউ গ্যালিলিওকে সুখার-পথী বলে গাল দেন, কেউ আবার সমস্ত বছর আগে লোকান্তরিত কোপার্নিকাসকে ছেলে পুরতে চান। জেসুইটদের সম্মুখ মহলে নিজেকে সংগঠিতদের আচরণে লজ্জা পেলেন শীর্ষস্থানীয় প্রবীণরা। এদেরই একজন কার্ডিনাল রবার্ট বেলারমিন-কে মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। বেলারমিনকে (Cardinal Bellarmine) গ্যালিলিও চিঠিতে জানালেন তাঁর নিগ্রহের কথা। উত্তরে গ্যালিলিও গুডাকাক্তরী এবং বেলারমিনের মূখপাত্র শিয়েরো ডিনি (Cardinal Piero Dini) চার্টের তরফ থেকে জানালেন যে যতক্ষণ এই কোপার্নিকান তত্ত্বের সঙ্গে গ্রহ-মন্ডলের গতিবিধির কোনো গরমিল না ধরা পড়ছে, ততক্ষণ কোপার্নিকাসীয় বিশ্বতত্ত্বকে নিষিদ্ধ করার কোনো প্ররই উঠবে না। অনমনীয় গ্যালিলিও অমনি জানালেন যে কোপার্নিকাসের মতবাদ আপাত-গ্রহণীয় কোনো অনুমান ভিত্তিক ধারণা নয় — এটাই একমাত্র চূড়ান্ত সভ্য। Bellarmine-এর এক প্রবন্ধের প্রসঙ্গ টেনে গ্যালিলিও আত্মা জানালেন যে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অঙ্গগত ১৯৯০ খ্রোয়ে কথিত 'সবল ব্যক্তির ন্যায় সূর্যের আনন্দ বিচরণ' চলমান সূর্যের কথা বলছে না। 'বিচরণ' অর্থে আসলে সূর্য থেকে নির্গত আলো আর উত্তাপের গতি বোঝানো হয়েছে। Cardinal Dini এ চিঠির কথা Bellarmine-এর কাছে চলে গেলেন। তবে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মেখে বেলারমিন তাঁর খোলা মতামত জানাতে মনস্থ করলেন। এক চিঠিতে (গ্যালিলিওকে লেখা নয়) জানালেন :

- ১) অতি জটিল টেলিস্কোপ-বিশ্লেষণের হাত থেকে মুক্তি পেতে স্থির সূর্যের চার পাশে চলমান পৃথিবীর প্রকৃতির তত্ত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য নেই।
- ২) তবে, সঠিক প্রমাণের আগে এই তত্ত্বকে চূড়ান্ত সভ্য বলে

মেনে নিয়ে বাইবেলের নতুন ব্যাখ্যার প্রস্তাব ধৃষ্টতা-বিশেষ।

- ৩) কোনো এক আনুমানিক তত্ত্বপ্রকল্পের সাহায্যে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথের হিসেব প্রত্যক্ষের সঙ্গে মিলে গেলেই প্রমাণ হয়না ওই তত্ত্বই চূড়ান্ত কিংবা এর কোনো বিকল্প তত্ত্ব নেই।

১৬১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্যালিলিও রোম যাবার তোড়জোড় শুরু করলেন সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের সমর্থন জোগাড়ের আশায়। ওতানুগামীরা সন্তর্ক করে দিলেন তাঁকে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া ওই তত্ত্ব নিয়ে অত সোচ্চার না হতে। গিয়োর্নো ব্রুনোর মর্যাদিক শাস্তি ঘটে গেছে মাত্র তেরো বছর আগে। কিন্তু, গ্যালিলিও ততদিনে ঝাড়া করে ফেলছেন একটা প্রমাণ। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার পন্থা হিসেবে প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁর অভিনব জোয়ার-ভাটা তত্ত্বের। অভিকর্ষ-তত্ত্বের ক্ষমতা নিউটন যে যুগে ভূমিষ্ঠই হলনি, সে যুগে যে জোয়ার-ভাটার নির্ভুল কারণ উদ্ঘাটিত হতে পারে না, সে কথা বলাই বাধ্য। গ্যালিলিও জোয়ার-ভাটা তত্ত্ব এলে মিনাচ্ছে একটা জোয়ার এবং একটা ভাটা। বাস্তবিক যেকোনো হয় দুটি জোয়ার এবং দুটি ভাটা। গ্যালিলিওর মতো প্রাঞ্জলিভোমণির এই বাস্তব ঘটনা অজানা থাকার কথা নয়। সুতরাং এটা বেশ স্পষ্ট যে ধর্মবিশ্বাসের প্রতি কোনো অন্ধ গ্যালিলিও, চলমান পৃথিবীর প্রমাণ ঝাড়া করতে গিয়ে এই শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্যালিলিওর এই তত্ত্ব তাঁর যুগান্তকারী বস বস সফল কীর্তির তলয় আচ্ছাদিত; কিংবা বড় জোর ঐতিহাসিক গবেষকদের ফাইলে আবদ্ধ। কিন্তু এই প্রান্ত তত্ত্বই তখন মর্যাদা বিজ্ঞানীটির একমাত্র উত্তর, ধর্মতত্ত্বের আশ্রয়ন কথ্যে। পৃথিবীবেষ্টিত জল কখনো সরে যায়, কখনো ফেঁপে ওঠে — পৃথিবীর আনন্দিক এবং বাৎসরিক গতির প্রমাণ হিসেবে তিনি এ তত্ত্বই পেশ করলেন।

বোম্বে এ 'প্রমাণ' গ্রাহ্য হলো না। পোপ পঞ্চম পল-এর রোব নেড়ে পড়লেন গ্যালিলিও। ডাকা হলো ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের দল 'Qualifiers'দের, গ্যালিলিওকে দ্বিজনাসবাদ করতে। এর পরিণাম গ্যালিলিওর অনুকূলে গেল না। ১৬১৬ সালের ডেইশে ফেব্রুয়ারি নিষেধাজ্ঞা জারি হলো কোপার্নিকাসের তত্ত্ব এবং তার প্রচারের বিরুদ্ধে। নিষিদ্ধ হলো সৌরকেন্দ্রিক বিশ্বকল্পনার ওপর সমস্ত গ্রন্থের প্রকাশনার কাজ। পর্মতত্ত্ব মিনিটের এক মিটিং-এ পোপের মুখোমুখি এসে গ্যালিলিও অপদস্থ হলেন। তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হলো, যা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে, সীমা অধার না পেরোতে। তবে প্রকাশ্য অবমাননার হাত থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়া হলো। পরবর্তী দু-বছর ওমরে ওমরে রইলেন গ্যালিলিও। তারপর ১৬১৮ সালে Father Horatio Grassi-সঙ্গে তাঁর বেথে গেল ধুমকেতু নিয়ে। ফদার গ্রাসি-র ধুমকেতু তত্ত্ব

আধুনিক যুগের নিরিখেও নির্ভুলই ছিল। যাই হোক, সে বিতণ্ডার সার এই যে গ্রাসি বলেছিলেন, চাঁদ বা গ্রহের মতোই ধূমকেতুর কক্ষপথ নির্দিষ্ট আছে। গ্যালিলিওর মত, ধূমকেতু দুটি বিস্রম মাত্র — আগেরা করিওলিসের আলোর উৎস যেমন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলজনিত প্রতিফলন, অনেকটা তেমন। আবার বিভিন্ন দাবানল ছালে উঠলো। ধূমকেতু এসে ছাপিয়ে অবশ্যস্বার্থী যা ঘটায় তাই ঘটলো। গ্যালিলিও ছদ্মনামে বই ছাপালেন : 'Discourse on Comets', এবং সে বইয়ে তুলে ধরে ছাড়লেন গ্রাসি-কে। গ্রাসি-ও অর্থাৎ এক পাণ্ডা বইয়ের মাধ্যমে তাঁর আক্রমণ করলেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক গ্যালিলিও গ্যালিলির অগ্রাধিকারের পাবির বাতিকটাকে। গ্যালিলিও প্রকাশ করলেন *The Assayer* শীর্ষক এক পুস্তিকা এবং সেখানে শুধু Grassi নয়, Jesuit গোষ্ঠীর কং নামী ব্যক্তিরের বিদ্রোহ করলেন। বাস গেলেমনা সৌরকলঙ্ক অধ্যায়ের ফাদার স্কেইনার (Father Scheiner)। এ সব ঘটনায় যখন ইতালির বৈজ্ঞানিক মহল উদ্ভাল, তখন মারা গেলেম ডিউক এবং বৃদ্ধ কার্ডিনাল বেলারমিনি। ১৬২০ সালে পোপের আসনে অভিষিক্ত হলেন গ্যালিলিও সূত্রদ বারবেরিনি (Barberini), তৃতীয় আরবান নামে। উদ্ভাল পরিস্থিতিটাকে সামাল দিতে বন্ধপরিচর পোপ গ্যালিলিওর সঙ্গে নানা পরামর্শে নামলেন, কোপার্নিকাস ও চার্চ যাতে একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আসতে পারে। পোপের উদ্দেশ্য একেবারে বার্থ হলো না। স্বয়ং তাঁর মধ্যস্থতায়, চার্চের দলীয় মতটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না গ্যালিলিও। চার্চের দলীয় মতটা ছিল এইরকম : আনুমানিক কোনো তত্ত্ব-প্রকল্পের সাহায্যে প্রত্যেক বাস্তবটা হবৎ আবেশিক নিয়মে ধরা পড়লেও, প্রমাণ হয়না যে এটাই একমাত্র সত্য। হয়তো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ওই একই বাস্তবকে সৃষ্টি করেছেন এবং চালিয়ে যাচ্ছেন আরো কোনো অভিনব, অচিন্তনীয় কোনো উদ্ভাবনী কৌশলের দ্বারা। এই মত গ্যালিলিওর মতো অপসহীন সংগ্রামী বৈজ্ঞানিক যে মন থেকে মেনে নিতে পারেন না তা বলাই বাহুল্য। তবে এ সবের পর কিছুটা সংযত ও প্রণমিত করলেন নিজেকে গ্যালিলিও। গুরু করলেন নতুন ভাবনাজিন্দা তাঁর জোয়ার-ভাটা তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে। Dialogue on Flux and Reflux of Tides নামক গ্রন্থটি এ ভাবনায়ই ফসল। তবে বন্ধুবর তৃতীয় আরবানের নির্দেশে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় পরিবর্তিত নামে — Dialogue on the Great World Systems (বিপুল বিশ্বের নিয়ম-নীতি বিষয়ে আলোচনা)।

যখন প্রাণে রোম আক্রান্ত, কঠোর কোয়ারান্টিন ব্যবস্থায় রোম এবং ত্রোরেলেস যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তখন সেই সুযোগ নিয়ে, এ বইয়ের প্রকাশনার নির্বাচিত তৎসাবধায়ক-মওলীর জোখে ধুলো দিয়ে গ্যালিলিও এ বই প্রকাশ করলেন ১৬৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, তাঁর ডংকাসীন বাসস্থান ত্রোরেস

থেকে। অতিবর্ষি বছর বয়সে। যেসুইট (Jesuit) মহল, অন্যান্য ধর্মবিশ্ব সম্প্রদায় এবং স্বয়ং পোপকে হতবাক করে দিয়ে এ গ্রন্থে গ্যালিলিও সোচ্চারভাবে সমর্থন করে বসলেন কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বকে। পোপ যে দুই বিপরীত মন্ত্রের মতবাদের মধ্যে একটা কৌশলগত আপোাসের পরামর্শ দিয়েছিলেন তার প্রতি কোনো আক্ষেপ করলেন না গ্যালিলিও; উল্টে যে তিন ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তাঁর 'Dialogues ...' গ্রন্থ সাজালেন তাদের মধ্যে একজন — Simplicio-র গোবোলা, হাওয়ায় চলা, হাবতাবের মধ্যে স্বয়ং পোপের ছায়া ধরা পড়লো। ওদিকে আবার টাইকো ব্রাহের প্রস্তাবিত বিশ্বকল্পনাটাকে প্রত্যাখ্যান করে ইতিপূর্বেই ফ্রেনখারিত Jesuit-সের আরো রাগিয়ে দিলেন।

চার্টের ঘরক থেকে এবার সরাসরি অভিযোগ খাড়া করা হলো গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে — জোয়ার-ভাটার এক প্রান্ত তত্ত্বের সাহায্যে তিনি কোপার্নিকান বিশ্বকল্পনাটাকে একমাত্র সত্য বলে প্রমাণ করতে চাইছেন, এবং ১৬১৬ সালের নিষেধাজ্ঞা না মেনে তিনি কোপার্নিকান ব্যবস্থাকে প্রকাশ্যভাবে প্রচার করছেন। ১৬৩৩ সালের গ্যালিলিওকে তাঁর উনসত্তর বছর বয়সে মোট চারবার Inquisition (ইনকুইজিশন) নামধারী ধর্ম বিচারসভার সম্মুখীন হতে হয়। এই চারবারই তাঁকে জোরের পর জোরা করা হয় তাঁর বিশ্বাস সম্বন্ধে এবং তাঁর নানা অতীত আচরণের ঐক্যিগ্নে নিতে বলা হয়। যেমন কার্ডিনাল বেলারমিন-এর সঙ্গে তাঁর পরোক্ষ বিরোধিতার কথা, টলেমি এবং কোপার্নিকাসের তত্ত্বের ওপর তাঁর প্রকৃত অন্তরের বিশ্বাস কতটা, ১৬১৬ সালের কোপার্নিকান তত্ত্বের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি নানা কথা।

এই চারকারের উপপূর্ণির জেরায় গ্যালিলিও ক্রমশঃই যেন নমনীয় হতে থাকেন। যেমন প্রথমবার Father Firenzola-

গ্যালিলিও-কে আবার ডেকে পাঠানো হল রোমে, নির্বাচনের ভর নেপানো হল, কথা করা হল কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে যখন সব কথা কলডো। ... গ্যালিলিও সত্যি সত্যিই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে, তিনি তখন প্রায় সত্তর বছরের বৃদ্ধ, তার অত্যন্তার করে তাঁকে পুড়িয়ে মারতে পারত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অয়ের ওপর গিয়েই তিনি রেহাই পেতে পেরেছিলেন। উদ্ভব Arcetri-তে তাঁর ভিলার নির্মাণে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। পরে যখন তিনি অল্প হয়ে যান এবং তাঁর কন্ডার মৃত্যু হয়, তখন তাঁর দুই শিষ্য Vincenzo Viviani এবং Evangelista Torricelli-কে তাঁর সঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়।

(Chamber's Biographical Encyclopaedia of Scientists, 1983)

র মুখোমুখি এসে নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করেন। দ্বিতীয় দফায় একটা লিখিত বিবৃতি দেন যে কোপার্নিকান তত্ত্বের ওপর তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ অনবদ্যবলত এবং তিনি সেই বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। অধ্যাপকখন শৈলী অনুসরণ করে লেখার ফলেই তাঁর 'Dialogues ...' গ্রন্থে সৌরকেন্দ্রিকতার ওপর জোর বেশি পড়ে গেছে নিজের অজান্তে। তৃতীয় সম্মানতে, তাঁর এই উদ্ধাক্ষিত অনবদ্যবলতার কারণগুলিও ব্যক্ত করলেন খোলাখুলি : বার্ধক্য, শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক উষ্মণ এই সব আর কি। আরো জানালেন, বিচারকরা যে শাস্তি তাঁর জন্য ঠিক করবেন, তিনি তা মাথা পেতে নবেন। চতুর্থবারের বেলায় তাঁকে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করতে বলা হলো, তাঁর প্রকৃত বিশ্বাসটা কী। গ্যালিলিও বলেন যে ১৬১৩ সালের নিষেধাজ্ঞার পর থেকে তিনি সংশয়ভীতভাবেই টলেমির সমর্থক এবং পৃথিবীর স্থিতির ওপর বিশ্বাস রাখেন। মন্ত্রীরা হয়ে জানান যে, নিষেধাজ্ঞা জারি হবার পর থেকে কোনোদিনই তিনি কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিকতায় বিশ্বাস রাখেননি। কর্তৃমানে তিনি নিজেকে ইনকুইজিশনের-এর হাতে সোপে দিয়েছেন। অনুগ্রহ করে বিচারকরা তাঁকে নিয়ে যা করবার মনস্থ করেছেন তা করুন তিনি বাস্তব হবেন।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার পরীক্ষা ও বিচার আরম্ভ হয় ; সম্ভবত সৈনিক অভ্যাসের ইহতেও তিনি অস্বাভাবিক পান নাই। এই বিচার সম্বন্ধে স্থায়ী অলিভার লন্ড লিখিয়াছেন : ... বিশেষ জুন তাঁকে আবার ডেকে পাঠানো হল, বলা হল আগামীকাল সারাটা দিন ধরে ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে তাঁর বিচার হবে। ২১ তারিখ ভোরবেলা তিনি সেখানে গেলেন। ঘরের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এই ভয়ানক কক্ষ থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন একেবারে ২৪ তারিখে। ... আইনগত অর্থে তিনি যে অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাঁর কল্লি আর গোড়ালিতে বীধন দিয়ে rack-যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ... অনেক পণ্ডিত বলেন, হ্যাঁ, হয়েছিল। ... তার প্রমাণ হল, গ্যালিলিও-র হার্নিকা। এই বিচারের পরে তাঁর হার্নিকা হয়, যা এই ধরনের অত্যাচারের একটি সুপরিচিত ও পৌনঃপুনিক পরিণাম।' (পৃ. ১২৮-২৯, সার অলিভার লন্ড, *Pioneers of Science*)

এই বিচারে গ্যালিলিও সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। সৈনিক নির্বাক ও কঠোর স্বাধ্য ছিল। পরীক্ষার সময় তাঁর পক্ষে কোনো প্রমাণও ছিল না।

Inquisition-এর এই কার্যধারা চলাকালীন কখনোই তাঁকে ভুগাই অঙ্ককার কারাকক্ষে আবদ্ধ রাখা হয়নি। প্রথমে টাসকান রাষ্ট্রদূতের ভিলায় এবং পরে পোপের বাসগৃহ সলের একটি পাঁচ কামরার ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছিল, যেখান থেকে St. Peter's Church এবং ভ্যাটিকান-কাননের গোটা দৃশ্যটা দেখা যেত। সহচর হিসেবে ছিল তাঁর নিজস্ব ডৃত্তা এবং রাষ্ট্রদূতের বাস-ডৃত্তা। এখানে প্রায় মাসখানেক থাকার পরে তাঁকে বিচারের শেকড়গে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল টাসকান রাষ্ট্রদূতের গৃহে। গিয়োর্ডানো ব্রুনোর মর্মান্তিক পরিণতির ৩০-বছর পর, গ্যালিলিওর মতো ব্যক্তিরের প্রতি চার্চের এই বদন্যতার কারণ কিছুটা অক্ষয়ই অনুমেয়।

চার্টের তরফ থেকে গ্যালিলিও ওপর যে শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছিল তা এই রকম :-
এক) কয়েক মাস নজরবন্দী থাকা — প্রথমে গ্র্যান্ড ডিক্টরের ভিলায় এবং পরে আর্চবিষপের প্রাসাদে। বলা বাহুল্য, বিলাসকল্পতার কোনো ছাটটি সেখানে ছিল না।
দুই) তিন বছর ধরে, প্রতি সপ্তাহে একবার সাতটি করে প্রায়শ্চিত্তের বাইকেল-স্টোত্র পাঠ।

তিন) আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের ধর্মবিশ্বাসী-বিশ্বাস এবং মতবাদ প্রত্যাহান ঘোষণা।

চার) 'Dialogue on the Two World Systems' গ্রন্থের প্রকাশ এবং পাঠ নিষিদ্ধকরণ।

প্রথম দুটি শাস্তির বহরে মুহূর্তমান হয়ে যাবার লোক গ্যালিলিও ছিলেন না। তবে শেষ দুটি যে তাঁকে হত্যাশ্রম, ভয়হস্ত, হুঁবির করে দিয়েছিল তা সন্দেহাতীত। দুই মাসের মধ্যে চারবার জেল (১২.৪.৩০, ৩০.৪.৩০, ১০.৫.৩০ এবং ১৮.৬.৩০ তারিখে) এবং বেশ কয়েক মাস 'নির্বাসনের' পর তিনি ফিরে আসেন ফ্লোরেন্সে। আবিষ্কারের নেশা এবং তাঁর উগ্র অগ্রবর্তিতার দাবি তখন লুপ্ত। ব্যাডির শীর্ষে বধ আর্পণে পৌঁছে গেছেন। সে ব্যাডি-স্পৃহা তখন স্তিমিত। সংহত, শান্ত মনের অবকাশে তাঁর বিজ্ঞান-ভাবনার চূড়ান্ত ফসলটি ফগেছিল এই সময়ে, যখন এই 'বাহ্যজ্ঞ' বুড়ো মানুষটির 'Dialogue Concerning the Two New Sciences' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হলো ১৬৩৬ সালে। গ্যালিলিওর এক অনুগত শিষ্যের উদ্যমে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গোপনে পাচার করা হয়েছিল ইল্যান্ডের Lieden শহরে এবং সেখান থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল। পরীক্ষানির্ভর আধুনিক বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করার মূলে এই গ্রন্থের যা অবদান তার সঙ্গে তুলনীয় একমাত্র গ্রন্থ হল : একাদ বছর বয়ে প্রকাশিত উত্তরসূরী নিউটনের Principia Mathematica।

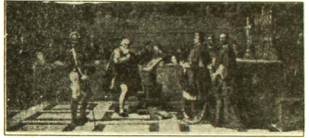
... বিচারের ফলাফল যে কী হবে তা জানাই ছিল। কৌতূহলের ব্যাপার এইটুকুই যে বিচারের সাক্ষ্য প্রমাণাদি প্রকাশ করা হল না। কারণ সম্ভবত এই যে সেগুলো প্রকাশ পেলে বিচারকদের কঠোরতার বদলে নরম মনোভাবের ব্যাপারটাই জানাজানি হয়ে যাওয়ার বিপদ ছিল! পোপ এবং তাঁর অধীন প্রশাসকদের আসল আশঙ্কা ছিল চার্চের কটর ধর্মোদ্ভাস্ত লোকদের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তাই নিয়ে ...।

গ্যালিলিও বিচারে সোধী সাব্যস্ত হন, এবং তাঁর সেই বিখ্যাত প্রত্যাহার-বাক্য উচ্চারণ করেন। তবে তাঁকে সাজা দেওয়া হয় নামমাত্র; এক বন্ধুর প্রাসাদে অন্তরীণ হয়ে থাকতে হয় তাঁকে। এই অবসরকালেই তিনি গতিবিজ্ঞান ও স্থিতিবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থটি শেষ করেন — যা তাঁর জীবনের শেষ পর্বে প্রকাশিত হয়।

(পৃ. ২৭৯, জে. ডি. বার্নাল, ইতিহাসে বিজ্ঞান, প্রথম খণ্ড)

১৬৩৭ সালের শুরুতেই এক ভয়াবহ বিবর্তন্যার ফলে নষ্ট হয়ে যায় গ্যালিলিওর ডান চোখ। ওই একই বছরের শেষে নষ্ট হয়ে যায় তাঁর বাঁ চোখও। অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দি গ্যালিলিওকে অন্ধ করে দেওয়ার ভুল ভ্রমের উৎস বোধহয় এখানেই। ১৬৪২ সালে, আটান্তর বছর বয়সে গ্যালিলিওর প্রয়াণ ঘটে। ওই একই বছরে তুর্কিষ্টান নিউটন।

গ্যালিলিওর উজ্জল জীবনের এই সংক্ষিপ্ত ঘটনা পরম্পরা লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যায় বায়ারনের একটা ছোট্ট উক্তি : 'History can only take things in the gross'। সুস্বভা বর্জিত 'সংক্ষিপ্ত-সংবাদ' বা Headline দিয়ে গ্যালিলিওর মাপের বিরাট ব্যক্তিত্বের মানুষকে বোকা যায় না। সে চেষ্টার সামান্যতম দায় থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখছি। যা সামান্য জেনেছি তাই লিখলাম। এর প্রামাণ্যতা নিয়ে সম্ভেদ যিনি করার তিনি করবেন; তবে ডাবালুতা ঝেড়ে ফেলে, তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েই যেন সে কাজে নামেন।



গ্যালিলিওর বিচার

গ্রাহক চাঁদা বাড়লো

ডাক মাণ্ডল (পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে) আবার বেড়েছে। যেহেতু ডাক খরচ আমাদেরই বহন করতে হয় তাই গ্রাহক চাঁদার স্বল্প বৃদ্ধি করতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। এখন থেকে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৬০ টাকা। বছরের মধ্যে কোনো বিশেষ সংখ্যা বেরোলে তার অতিরিক্ত মূল্য গ্রাহকদের দিতে হবে না। ডাকযোগে M. O. তে গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা :

উৎস মানুষ, বি ডি ৪২৪

স-স্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪

চেক বা ড্রাফটে চাঁদা পাঠালে UTSA MANUSH নামে দিতে হবে। কাঁইরের সহরের চেক-এ অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ লাগবে। M.O. কূপনের নীচে আগের গ্রাহক নম্বর অথবা নিজের নাম ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা থাকা চাই।

এই নভেম্বরেই
প্রকাশিত হচ্ছে

সমসাময়িক
সংকলন গ্রন্থ

প্রেসিডেন্ট

বুশ-এর

এই যুদ্ধ

উৎস মানুষ প্রকাশন

প্রকাশিত হল

উৎস মানুষ নব-সংস্করণ

বিজ্ঞান

অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান ১

৩৫.০০

জ্যোতিষ কি

আদৌ বিজ্ঞান?

[পরিবর্ধিত]

৩০.০০

বাঘ বনাম মানুষ

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

দৃশ্য : ১। হাত বাড়ালেই বাঘ। কিন্তু হাত বাড়ানোর পথে কাগা ঝাঁচার ভাগ। না, বাঘের ঝাঁচ নয়। বাঘ এখানে একেবারে উশুক। বরং মানুষই রয়েছে ঝাঁচার মধ্যে। ঝাঁচ কপটে বাসের চানলার ভাগ। স্থান : বানেরঘাটা জাতীয় উদ্যান, কর্ণাটক রাজ্যের বাঙ্গালোর শহর থেকে একশ কিলোমিটার দূরে।

দৃশ্য : ২। মানুষের হাতে বাঘ খুন। একবার নয়, আড়াই মাসের মধ্যে দু'-দু'বার। ৩০ জুলাই সজনেবাগি পশ্চিমবঙ্গের পর ২ অক্টোবর কুলদলিতে। বৃহত্তর সুন্দরবনে খটে যাওয়া এই ঘটনার তাক্সব সকলে। বিচলিতও বটে।

যাপারটা বেশ গোলামেলে। মানুষ আর বাঘ নিয়ে অনেক কথাই তো বলা হয়ে থাকে। বাঘ দেখতে আমরা খুবই উৎসাহী। সার্কাসে বাঘের খেলা দর্শক জনপ্রিয়। চিড়িয়াখানায় সবচেয়ে বেশি ভিড় বাঘের ঝাঁচার সামনে। বাঘকে আমরা একটা প্রশ্ন-সামগ্রী করে রাখতে চাই। আবার কখনও কখনও হানা মিহি তাদের ঘর-গেরস্থলিতে। এ লেখার গোড়ায় বানেরঘাটার বাঘ দেখতে যাওয়ার মতো 'সুর্কিত' হয়ে তো আর সুন্দরবনের মধু সংগ্রাহকরা বনের ভেতরে ঢোকে না। তাঁদের পথে পথে থাকে বিপদের আগ্রহ। 'ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস'-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিক কল্যাণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এপ্রিল মাসে বাঘের মুখে মানুষের মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। কারণ এ মাসেই সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ শুরু হয়। সিনরাতেব চবিশ ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টা, সকাল ছটা থেকে আটটা আর বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা সমস্ত মানুষ মৃত্যুর ৮৫ শতাংশ ঘটে থাকে। বাঘ কোথায় কোনে গেছে, এই দুই সময়েই কাঠুরে, মউলি, জেলেকা বনে প্রবেশ করে বা বন থেকে বের হয়। সরকারি হিসেব মত প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ জন মানুষ প্রতি বছর বাঘের মুখে পড়ে, এত বেশি মানুষের মৃত্যুর কারণ হ'ল বাঘের শিকারসের মধ্যে মানুষই সবচেয়ে সহজলভ্য; বুদো গুয়ারে বা চিত্রল হরিণের চেয়ে মানুষের আশ্রয়কার কমভা অনেক কম। অল্প কীটিকার প্রাণিগণ তাকে বনের মধ্যে চুপতেই হয়। বইপত্রের পাতা উটেটোলে সেবা যাবে, বাঘের মানুষ শিকারের অন্য কারণের মধ্যে রয়েছে শারীরিক দুর্বলতা, বৃদ্ধাবস্থা। এক বনে অন্য শিকার প্রাণীর অভাব।

বনের মধ্যে গিয়ে বাঘের হাতে মানুষের আক্রান্ত হওয়ার কথা না হোক মানা গেল, কিন্তু বাঘ যখন লোকালয়ে আসে ...? তবে কি সুন্দরবনের বাঘ সত্যিই নরশাখক? বন বিভাগের নথিপত্র কিন্তু সে কথা বলে না। বরং সেখান থেকে জানা যায়,

পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল (বন) আর শিকার (বন্য প্রাণী) না থাকার জন্যই বাঘ মানুষ খেতে বাধ্য হয়। আর বাঘ লোকালয়ে আসে আর-একটা খুব বড় কারণে — মিঠে জলের খোঁজে। নোনা জলের বদলে মিঠি জলের যোগান দেওয়া গেলে বাঘ আর মিঠি পানীয় জলের সন্ধানে লোকালয়ে হানা দেবে না।

লোকালয়ে এলেই যে ওরা মানুষ মাংসে এমনও তো নয়। বরং পরিসংখ্যান বলছে, গত দশ বছরে বাঘ বেশ কয়েকবার সুন্দরবনের গ্রামে ঢুকলেও মানুষ একবারও মारे নি। উটে মানুষই বাঘ মারেছে। তবে সব মানুষই তো আর বাঘ মারার যুক্ত হন না। একাঙ্ক সমর্থনও করেন না। ডবিঘাটে আর কেউ এরকম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করতে যাতে স্থানীয় মানুষজনই বাধা দেন সেজন্য প্রচারাভিযানে সামিল হয়েছেন সচেতন কিছু মানুষ। বাঘসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী ঝাঁচতে, ব্যাপক অর্থে বৃহত্তর সুন্দরবন রক্ষা করতে, তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন, আর এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বের হয়েছে এক প্রচার পত্র। সুন্দরবন ব্যাঙ্ক গ্রুপের উৎসাহ মানে উজ্জীবিত হয়ে 'ক্যানিং ইন্ডিবাণী সাংস্কৃতিক সংস্থা' এই প্রচারপত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে প্রতিটি ঘীপে এবং কলকাতাসহ অন্যান্য অঞ্চলে। এই প্রচারপত্রে বলা হয়েছে এরকম কথা —

৩০-৭-২০০১ তারিখে সোমবার পশ্চিমবঙ্গের একটি নিশ্চিত বিশ্রামরত বাঘকে বিনা প্ররোচনায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। কাচটি কিন্তু কখনোই কোনো মানুষকে আক্রমণ করতে যায়নি। এই ঘটনা সুন্দরবনের মানুষকে বন্যপ্রাণী সম্পর্কে সচেতন করার দাবি করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কিছু ক্রীত নিবেদন

'বাঘ বড় পাখী জানোয়ার। শরীরজোড়া জোরাকাটা চমৎকার চেহারা আর পৃথিবীজোড়া 'রয়েল বেঙ্গল' নামের খ্যাতি থাকলে কী হবে — ব্যাটা সাক্ষাৎ শয়তান। কত মানুষ যে খেয়েছে এই সুন্দরবনে, কত খটকে বিবাহ করেছে, কত ঘরে কোল কলি করেছে, কোনো হিসেব আছে তার? অবশ্য গরীবের জান গেলে কে-ই বা হিসেব রাখে। অগত্যা নিজেদেরই লাঠি-সড়কি-স্তম্ভ-টান্ডি ধরতে হয়। জঙ্গলের জানোয়ার গ্রামে ঢুকে মানুষের সর্বনাশ করবে আর আমরা এমনি ছেড়ে দেব? পোলেই কুপিয়ে মারবো। রেজারি বিট অফিসার বা বনকর্তাদের বরং করার অনেক হাশা।

একম ডাকনা-চিড়া আর রাগ-আক্রোশ এখন সুন্দরবন জঙ্গলের গ্রামগুলির অধিকাংশ মানুষজনের মনে ঢুকে গেছে।

ওই রাগটিই বড় গোপনমলে। বাথকে মেরে শেষ করার আগে দুবার ভাবতেই হয়। কেননা এতে যে মন্ত্র ক্ষতি হচ্ছে গ্রামবাসীদেরই। বাথ মারলে সুন্দরবনের সবার ক্ষতি।

ক্ষতি কেন বলুন তো? বাথকে যত পাঠী শরতান বলা হোক, বাথই কিন্তু এই বিশাল সুন্দরবনের একান্ত বিশ্বস্ত প্রহরী। বাথের ডয়েই দুই সোতী শিকারী, জলসমু, জল-জঙ্গলের ডাকাতরা গভীর বনে ঢুকতে পারতো না। এককো-সেউপো বছর ধরে বাথই বাঁচিয়ে রেখেছিলো সুন্দরবনের গভীর নিবিড় সুন্দর অকণ্য। সেখান না, সেইজন্যই বনসেবীর সঙ্গে তাঁর বাহন বাথও মানুষের পুজো পেয়ে এসেছে বকাল ধরে।

এখন অরণ্যরক্ষী বাথের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। সেই সঙ্গে জঙ্গলও হালিস হচ্ছে, মিঠে জলের বিধিতে নোনা জল ঢোকানো হচ্ছে। সাহেবদের হিসেব অনুযায়ী একল বছর আগে সারা ভারতে ৪০ হাজার বাথ ছিল, তার মধ্যে বড় অংশ ছিল সুন্দরবনে। তখনকার সাহেব, রাজা-রাজবা আব কিছু চোরশিকারীর নির্মম আনন্দ সুব মেটাতে শয়ে শয়ে হত্যা করা হয়েছে বাথ। ভারতের ওয়াইল্ড লাইফ (Wild Life) বিভাগের পরিসংখ্যান বলছে - ৪০ হাজার থেকে কমতে কমতে ১৯৬৪তে সারা দেশে বাথের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মাত্র ৪ হাজারে, ১৯৭২-এ সেটা ২ হাজারেরও নীচে নেমে আসে। সুন্দরবনে বাথের সংখ্যা তখন মাত্র কয়েকশ'। জঙ্গলের গাছ ক্ষমতাপালী গোষ্ঠীর কৃপায় হাজারে হাজারে সোপাট হয়ে যাওয়ায় বাথ আর লুকানোর ভালো জায়গা না। সংগঠিত চোরশিকারীরা সেই সুযোগে বেথুড়ক ব্যাঘ্রহত্যা চালার অত্যাধুনিক বন্দুক বা কিব মাঝানো মাংস দিয়ে (কিছু দুষ্ট প্রকৃতির গ্রামবাসী আর বনরক্ষীও পরসার সোতে ওদের সাহায্য করে)। ওরা কিন্তু বাথ মেরে কুপিয়ে খও-বিখও করেনা, কারণ বাথের গোটা ছাল আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেনী - বিশেষী রাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। প্রচুর টাকা।

এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে ১৯৭০ সালে ভারত সরকার বাথ-শিকার বে-আইনি ঘোষণা করেন, ১৯৭২-এ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হয়, ১৯৭৩-এ ব্যাঘ্র-প্রকল্প বা Project Tiger দপ্তর তৈরি হয়। এরপরে পরিস্থিতি কিছুটা আরওয়ে এসেছিলো। গ্রামবাসীদের সহায়তায় প্রকল্পের অফিসার ও কর্মীরা বাথের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে ছিলেন। ১৯৮৮-৮৯ তে সারা দেশে বাথের সংখ্যা উঠেছিলো ৪৩৪৪ পর্যন্ত, সুন্দরবনে ৫০০-র বেশি। কিন্তু ব্যাপক চোরশিকার, অরণ্য নিধন, আর জনবসতি বৃদ্ধি ঠেকানোর সাধ্য নেই 'ব্যাঘ্র প্রকল্প' দপ্তরের। ফলে আবার বাথের হত্যা বাড়তে থাকে। সুন্দরবনে গত দশকে সরকারি ব্যাঘ্র স্মারিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৩-এ বাথ রয়েছে ২৫১, ১৯৯৫-তে ২৪২টি, ১৯৯৭-এ ২৬৩ আর ১৯৯৯-এ ২৫৪টি। বেসরকারি বিশেষজ্ঞেরা বলছেন বাথের প্রকৃত সংখ্যা আরও কম। সে কথা থাক।

এখন এই দু' আড়াইশ' বাথের অবস্থাটা একটু ভাবুন।

ওরা সবসময় মুক্তার ভায়ে আতঙ্কিত। জঙ্গল সাফ হচ্ছে মানে ওদের শিকারে অসুবিধা হচ্ছে, নিরাপদে নিশ্চিতও থাকতে পারছে না। যিসের জ্বালায় উপায় না মেবে মৌলি, কাঠকুড়ানি, মৎস্যচাষী বা হীন-সংগ্রাহকদের খাড়ে লাফ দেয়, মেবে ফেলে এটা ঠিক। আবার কখনো নদী পার হয়ে ওরা গ্রামে ঢুক পড়ে গরু-ছাগলের সোতে এমনকি নিজেদের বিশাল বিচরণক্ষেত্রের অংশ ডেবে ব্যবেরা নদী সাতরে এখার ওখার ঘুরতে চায়। অথচ এখন জঙ্গল কেটে বহু জনবসতি হয়েছে। অকুর্ষ বাথ না জেনেই লোকালয়ে এসে যায়। কিন্তু মানুষকে ওরা গ্রামে ঢুক কখনো মারে না। সেবাং বিপদে না পড়লে সুন্দরবনের বাথ সাধারণভাবে মরখালক নয়। গবাদি পত পেলো, বিসে মিটলে, মানুষের গায়ে আঁচড়ও দেয় না। বরং মানুষকে বাথ খুবই ভয় পায়, তাই লুকিয়ে সব কাজ সারে। দেখুন না, সুন্দরবনের গ্রামগুলোতে গত ১০ বছরে বাথ ঢুকছে বেশ কয়েকবার, কিন্তু একটিও মানুষ মারেনি। এই যে সজ্ঞানখালি পাখিরালায়ে এত কাণ্ড হচ্ছে, এখানেও গত ১০ বছরে বাথ ঢুকছিলো মাত্র ২/৩ বার খাবারের বোঁকে, একটি মানুষকেও কিন্তু আক্রমণ করেনি। ... তবে ভয় পেলে, কোণঠাসা হয়ে গেলে, মোচাখুঁচি বেলে শুধু বাথ কেন যে কোনো বন্যজন্তুই তো খাবা ওঠাবে নিজে বাঁচার জন্য, তাই না?

তাই বনছিসাম বাথ যত মরবে, তত শয়তান দুষ্কৃতি চোরশিকারীর দাপট সুন্দরবনে বাড়বে, সাধারণ গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা অসুরা কমবে, জীবন অজিহত হবে। তাই বন কি বাথ গ্রামে এসে হামলা করলে তাকে আবার করে বেঁচে নিতে হবে? না, তা কখনোই হয় না, কেউই তা করতে বলবেন না। তবে ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে দ্রুত ববর সেওয়া এখন মোটেই কঠিন কিছু নয়। প্রকল্প থেকে 'টিম' এসে ব্যবস্থা নেবে। ঘুমপাড়ানি বন্দুক দিয়ে বন্ধি করবে। কিন্তু কোনমতেই সেটাকে হত্যা করা ঠিক হবে না, সুন্দরবনবাসীদেরই ক্ষতি বাড়বে তাতে।

বিশেষ করে বাথ যখন নিজেদের মনে নিজেই নিশ্চিতও বসে আছে, কিংবা লোকালয়ের বাইরে বসে বিগ্রাম নিচ্ছে, কোনো জ্বালাতন করছে না, তখন তাকে দলবদ্ধভাবে গিয়ে আক্রমণ করে কুপিয়ে মারাটা অন্যায় কাজ হবে, ভুল কাজ হবে। তাই না? আপনাবাই হেবে দেখুন। আর, সরকার পক্ষ থেকে সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের মানুষকে বাঁচানোর জন্য যে কোনো প্রকল্পই নেওয়া হোক না কেন, যেমন ব্যাঘ্র প্রকল্প বা অন্য কোনো ব্যবস্থা তা কোনো কাজই ঠিক মত করতে পারবে না গ্রামবাসীদের সহানুভূতি না পেলে। আমার আপনাব গভীরভাবে ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষের কাছে এই মানবিক আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন শতাধিক সমাজ সচেতন সংগঠক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী, এলোয়াড়, অভিনেতা, শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ এবং ছোট-বড় বিবিধ বিজ্ঞান দ্রাব, পরিবেশ সংস্থা, নাট্যদল ও গণসংস্কৃতি সংগঠন।

মনসামঙ্গলে কালনাগিনী ও বেহুলা

নারায়ণচন্দ্র রায়

দেখতে ভাবি সুন্দর। গোটা শরীরে হলুপ গোলাপী
কালো চিপের ছড়াছড়ি। দেখলে মনে হয় গোটা
গায়ে যেন অলঙ্কার পরে আছে। আর এই জন্যই
এর বোধহয় ইংরেজি নাম 'অর্নামেন্টাল স্নেক' (Crysopsalis
ornata)। খুব সুন্দর দেখতে বলে বিশেষে অনেকে আসর করে
একে ঘরে পোষে।

হ্যাঁ, কালনাগিনী সাপের কথা বলছি। তাকে নিয়ে অনেক
কল্পনা-কল্পনা, অনেক গল্প। সাপটা লম্বায় ২ থেকে ৩ ফুট।
প্রিয় খাদ্য টিকটিকি পিরিগিটি। পেটের পেশি চ্যাপ্টা-চওড়া
করে এই সাপ এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে যেতে পারে
অন্যদিকে — ঠিক যেন উড়ে যাওয়া। তাই একে অনেকে
'উড়ন্ত' সাপও বলে। নাম কালনাগিনী; 'কাল' কথার অর্থ
স্নিগ্ধ; বা ভয়ালকে বোঝানো হয়, আবার কালো রং-কেও
বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু যা থেকে আসিতে এর নামকরণ
'কালনাগিনী' করা হয়েছে বা এখনও প্রচলিত হয়ে আসছে,
সেটা কোন অর্থে নেব আমরা? নাকি কালো ছেলের নাম
পছন্দোচ্চনের মত নামের সঙ্গে ব্যবহার বা চরিত্রের মিল খুঁজতে
যাওয়া বুঝ। কেননা স্বভাবে সাপটি মোটেই ভয়ঙ্কর নয়, বরং
শান্ত স্ববর্ণন। মোটেই মৃত্যুর ঘোড়ক নয়, কারণ এ সাপ
নিবিঁষ। আর যদি সমাসগত অর্থে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ
কালো রঙের যে নাগিনী = কালনাগিনী (নিজা সমাস) তবে
সেটাও বিরাট ভুল হবে, কারণ এ সাপের রং মোটেই কালো
নয়। তাহলে; তবে কি এটিই সত্যি যে কালনাগিনী নামটি
কাল্পনিক? কবির কাব্যের প্রয়োজনে, ঘটনার হাস্যিকতার
সঙ্গে মিল রাখতে সাপটির নাম কালনাগিনী করা হয়েছে? আর
সেই কারণেই সুন্দর এই আপাত-নিষ্পাপ সাপটি মনসামঙ্গলের
বলনারক হয়ে গেল!

মনসা একটি লৌকিক দেবী এবং তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তনের
জন্যই লেখা হল মনসামঙ্গল কাব্য। আর পাঁচটা মঙ্গলকাব্যের
মত লেখ বা দেবীর পূজা মর্ত্যজগৎ প্রচার করাই এর লক্ষ্য। আর
এই লক্ষ্যপূরণ সাধনে একটা লক্ষ্যেব গণ্যের প্রয়োজন ছিলো
— যেখানে অসহায় মানুষের ওপর বর্ষিত হবে সেবসেবীর
অপার করুণা। আর সেই করুণা এমন ঘটনার মধ্যে দিয়ে
আসবে যেন আর সবকিছু ভুলে গিয়ে ওই করুণা-প্রাণটিই
মানুষের মনে উজ্জ্বলভাবে গাঁবে থাকে। এবং এর ফলে মানুষ
ডায়ে অথবা শত্রুকে আশ্রুত হয়ে তাঁর পূজায় ব্রতী হয়।

যদিও মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে করুণাময়ী মাতার
চেয়ে স্বার্থসর্বা, ক্রুদ্ধা, মর্ত্য জগতের একজন সাধারণ নারী
বলেই মনে হয়। পূজা প্রচারের জন্য চাঁদ মদাগরের সাত মাতটি
নিষ্পাপ শিশুকে খেঁচাবে মারল তাতে তাকে আর হাই বলা
হোক করুণাময়ী মা বলা যায় না।

১৫০০ শতকের মাঝামাঝি সময় বাংলার (বর্তমান
কালোঘাণ) কানা হরি দত্ত প্রথমে মনসার পাঁচালি রচনা করে
ভাসানের সুরে আসরে আসরে গেয়ে বেড়াতেন। পরবর্তী
সময়ে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব তাকে সার্থক কাব্যে রূপ দেন।
এ তথ্য অনেকেরই জানা। কিন্তু সেটা সেরকমভাবে জানা নেই
তা হ'ল এসব গল্প কতখানি বাস্তব সমর্থন-পুষ্ট, আর যদিবা
কিছু বাস্তবতা থাকেও তবে তার পেছনে যুক্তির জোর কতটা!

মানুষ দুটি বিশেষ গুণের অধিকারী — কল্পনাপ্রতিভা আর
বুদ্ধি ব্রহ্মি, যা অন্য কোনো জীবের নেই বললেই চলে। এই দুটি
কর্মতার ফলে মানুষ অসেবা বস্তু সম্পর্কে কল্পনা করতে পারে,
এবং সেই কল্পনাসৃষ্টি বস্তুটিকে বুদ্ধির প্রলেপ দিয়ে প্রতিষ্ঠাও
করতে পারে। এর ফলে চোখের সামনে যা দেখে তা হয়ে পড়ে
মিথ্যা, অলীক, 'মাদ্রা ইব পরম্পরা'। আর যাকে কোনোদিনই
সেখা যায় না সেটাই হয়ে দাঁড়ায় সত্য। তাই বোধহয়
মানবমনের অন্তরে ভূত-প্রেত-মতি-মায়ো-বর্ণ-ময়ক ইত্যাদি
আরও অনেক কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

এই পরিস্থিতিতেই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র
কল্পনার বস্ত্রে বাড়িয়ে লবিশ্বরের মৃত্যুর বলনারক করা হলো
কালনাগিনীকে। সাঁজালি পর্বতে নির্মিত লোহার বাসরঘর,
মনসার আসনে তাকে দুটি মাত্র ছিঁপ রাখা, দুখ কলা বাইয়ে
প্রথমে ডেকে এনে সপাকে বলি করা, এইরকম যেসব কাহিনীর
জাল বিস্তার করা হয়েছে, তাতে বাস্তবতার চেয়ে কল্পনাই প্রভুত
বিস্তার করেছে বেশি। আসলে একজন দক্ষ শিল্পী যেমন বিভিন্ন
রঙের মিশ্রণ খচিত করে এবং তাদের সফল প্রয়োগ করে এক
জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেন, ঠিক তেমনিভাবে আবেগ কল্পনার
উপাসনে আকর্ষণীয় শব্দ চায়ে, অলঙ্কার ও ছন্দেব নিপুণ
প্রয়োগে তৈরি হয় জীবন্ত কাব্য। কাহিনী তার পটভূমিকা ময়
— যেন চিত্রাঙ্কণের ক্যানভাস। তাই আসল কথা দাঁড়াচ্ছে,
মনসামঙ্গল একটি মিথক কাব্যকাহিনী এবং কালনাগিনী একটি
অতি চেনা বাস্তব প্রাণী। ফলে বাস্তব দুটিভঙ্গি ছেড়ে অলীক
কাব্যকাহিনীর রঙিন চশমা পরে কালনাগিনী সাপকে বিচার
করা মন্ত ভুল ছাড়া আর কিছু হবে না।

এটা বুঝি সত্যি কথা যে, একটি নিরীহ ছেলেকে বাসর ঘরে সাপে কটল, একটি নির্দোষ কিশোরী বাসর ঘরে বিধবা হল, যুত স্বামীর সেই নিড়ে গাঙ্গুর নদীতে একাকিনী লিপাহীনভাবে ডেলে পড়তে বাধ্য হল — এরকম ঘটনাগুলি আমাদের সহানুভূতিশীল মনকে সহজেই স্পর্শ করে। আবার যখন স্বামীকে এক-এক অল্প ভাসুরকে জীবিত করে তুলে, চাঁদের হারানো সব ডিসা এবং ঐশ্বর্য ফিরিয়ে নিয়ে সেই কিশোরী বাড়ি ফিরে আসে, তখন আমাদেরও মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। সুস্থই মধ্যে আমাদের অল্প মন বেহলাকে সতীশ্রেষ্ঠা এবং মনসাকে জাগ্রতা দেবার আসনে বসিয়ে দেয়। এ সবই অল্প ভাবাবেগের প্রতিফলন নয় কি?

বেহলা

মনসামঙ্গল লেখা হয়েছিল পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। শৌকি সেই মনসার পূজা প্রচারই ছিল এই মঙ্গল কাব্যের মূল লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য সাধনে যে কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে সেই কাহিনীর এক অবিস্মরণ্য নারী চরিত্র বেহলা। বয়সে কিশোরী, বাসর ঘরে স্বামীখাতিনী, বড়ই করুণ বিধিগিণি। এ হেন এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী এই কাব্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল চরিত্র। এমন কি মনসার চেয়েও এই নারী চরিত্রটি অধিকভাবে শ্রোতার মন জয় করেছে। তার একটি কারণ যদি তার ভাগ্যকিঙ্করনা জন্মিত করুণা হয়ে থাকে, তবে অপর কারণটি নিশ্চয়ই সেই বিড়ম্বিত ভাগ্যকে জয় করার সংগ্রাম।

বাঙালি হৃদয়ে সতী হিসাবে বেহলার স্থানটি বড়ই শ্রদ্ধার। কিন্তু সতী সম্পর্কে আমাদের বাঙালির গড়পড়তা যে ধারণা তা দিয়ে যদি বেহলাকে চিহ্নিত করা হয় তবে বেহলাকে খুব ছোট করা হবে। কারণ বেহলা শুধু পতিব্রতাই ছিল না, স্বামীকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে যে কঠোর যত্নশীল সে ভোগ করেছে তা অনেক গুণাকরিত সতীর মধ্যে দেখা যায় না।

বিয়ের আগের দিন মাসলিক স্ত্রী-আচার চলার সময় বেহলার গায়ের জল মনসার গায়ে লাগতেই পারে, জাতে এমন কিছু মহাভারতও অন্তর্ভুক্ত হয় না। কিন্তু তার জন্য তাকে ভয়ঙ্কর অভিশাপে পড়তে হয়। বাসর ঘরে স্বামীর সর্পদংশনে মৃত্যু। যার অর্থ তার পরদিন চিতায় তার জীবন্ত কষ্টমায়ক মরণ। বেহলা করজোড়ে মনসার কাছে আনয় স্বীকার করে নিলে তো এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রেহাই মিলত। কিন্তু বেহলা তা করেনি। বরং বলা যায় অভিশাপকে সে গ্রাস্তিই করেনি। প্রতি ঘটনার পিছনে আছে কার্যকারণ সম্বন্ধ। তবে কি বেহলার ভিন্নধর্মী মানসিকতা অভিশাপ ও তার ফলের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝে পায়নি? এটা যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ মেলে যখন অভিশাপকে বাস্তবায়িত করে বাসর ঘরে লুকিয়ে মনসাকে ছিন্ন রাখতে হয়। মায়াবিনী বেশে চাঁদের হেঁতাল দণ্ড চুরি করতে হয়। বেহলার এই ভিন্নধর্মী মানসিকতার

অপর নাম বিজ্ঞানমনস্কতা। যার মধ্যে আছে স্বচ্ছ চেতনাগ্রন্থত যুক্তিভিত্তিক ভাবনা এবং এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার এক অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু। আর এই গুণের জন্যই বেহলা হয়ত সতীত্ব সম্বন্ধে ভূতিকা।

এখন প্রশ্ন — বাসর ঘরে লম্বন্ধরের মৃত্যু কাহিনী কতখানি বাস্তব? যে কালনাগিনী দংশনে তার মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, সে সাপ তো সম্পূর্ণ নির্বিধ। এছাড়া কালনাগিনী রাত চরা সাপ নয়। রাতে বিছানায় গিয়ে কালনাগিনী কাউকে দংশন করেছে এমন নজির কখনও পাওয়া যায়নি। তাই প্রশ্ন জাগে লম্বন্ধর কি সত্যই মরেছিল? না দীর্ঘস্থায়ী চেতনাশক্তি ঘটেছিল তার। কল্পনায় ছলেমটি স্বীকার করলেও বাস্তব দৃষ্টিতে ষিঠীয়টিকে সত্য বলে মনে হয়। বেহলার সচেতন মন এ বিষয়ে সজাগ ছিল বলেই হয়ত লম্বন্ধরকে বাঁচানো গেছে।

বাসর ঘরটি তৈরি হয়েছিল সীতালি পর্বতে। সেখানে অগ্নিভেজনের পরিমাণ এমনিতেই কম। একটি ছিন্ন ছাড়া কোনো দরজা জানালা ছিল না। অতএব রুদ্ধ বাসর ঘরে অধিকন্তু অগ্নিভেজনেই ছিল দুটি প্রাণীর ভরসা। হিন্দু ধর্মনিযায়ী সেখানে সারা রাত প্রাণী জ্বলেছিল, যাতে যথেষ্ট অগ্নিভেজন নষ্ট হয়েছে। এরপর কুণ্ডার্ত স্বামীকে জাত রান্না করে খায়েছিল বেহলা। এতেও যথেষ্ট অগ্নিভেজন পড়েছিল। অগ্নিভেজন পড়ে তৈরি হয় কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। যা বেশি পরিমাণে একজন লোককে অচেতন করে দিতে যথেষ্ট।

একথা স্বীকার করলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠবে বেহলা তবে অচেতন হয়নি কেন? এর উত্তর বলা যায় সর্প দংশনে মৃত্যু ঘটবে লম্বন্ধরের। এই অভিশাপের কথা মাথায থাকায় লম্বন্ধরের মধ্যে ভয় কাজ করেছে, ফলে তার শরীর মন ছিল খুব দুর্বল। যেটা বেহলার ছিল না। ফলে আতঙ্ক বাতাসের বিধিক্রিয়া লম্বন্ধরকেই কাবু করে দেয় সহজে।

বেহলা হয়ত জানত দীর্ঘস্থায়ী অবসুপ চেতনা সুস্থতায় ফিরে আসতে পারে যদি দীর্ঘদিন তাকে নীতল জল ও হাওয়ার সংস্পর্শে রাখা যায়। এবং এর জন্য গাঙ্গুর নদী ও কলার মালা ছিল আদর্শ স্থান। বিজ্ঞানে যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ মেলে বেহলার স্বামীর সঙ্গে যাওয়া এবং তাকে সঙ্গের ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে। ... প্রাচীন লোক কাহিনীকে এভাবে বৈজ্ঞানিক চোখেও দেখা যায়।

নেতি ধোপানীর ঘাটে, স্বর্ণে বেহলার মৃত্যু, ছয় ভাসুরের জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা — এ সবই ঘটনোৎপত্তি কাব্যের কাঙ্ক্ষিত পরিণতির প্রয়োজন। তুলসে চলেবে কেন মনসার মায়ায় প্রচার ছিল এই কাব্যের উদ্দেশ্য। মনসার পূজা করতে নারাক কঠোর সম্বলগামী ব্যক্তিবান চাঁদকে তো মনসা কোনোভাবে পরাজিত করতে পারেনি, তাই তাকে প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে পরাজিত করে মনসার পূজা প্রচারের প্রয়োজন ছিল। তাই বোধ হয় স্বর্ণ পর্বত কাহিনীর ব্যাপ্তি।



হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্ন

কলকাতায় মুগাল সেন যখন বসেছেন, (বিদ্রোহের) স্বপ্ন আশ্রিত ব্যক্তি। ঠিক তখনই কিউবার ফিলস কাশ্রো সাক জনিয়ে মিছেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর বিপর্যয় আমাদের তেমন বিপদ করেনি।' কাশ্রোর মতে, 'রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয়োগ্য করে নিজেদের আত্মীয়জন বা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিলিয়ে দিইনি। অঞ্চ আমরা জানি, সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এক-কোনোদিন যারা সমাজতান্ত্রিক ছিল না সেখানে এ ঘটনা হামেশাই ঘটেছে।' কী মারাত্মক বীকারোক্তি! 'রবিশাস' পত্রিকার বইমেলা (২০০১) সংখ্যায়, বেশ কিছু গল্প-কবিতার সঙ্গে রয়েছে একটি 'বিশেষ ক্রোড়পত্র: মার্কসবাদের আলোয় সমকাল'। আর এই ক্রোড়পত্র-র একেবারে গোড়াতেই রয়েছে ফিলস কাশ্রো-র একটি সাক্ষাৎকারের অনুবাদ। সেখানেই ছড়িয়ে-ছিড়িয়ে রয়েছে কাশ্রোর বিদ্রোহের সব মন্তব্য। কাশ্রোর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে ইউনেস্কোর প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল ফেদেরিকো দেমের্স জারাগোভা একসময়ে একটি মোক্ষম প্রশ্ন করে বলেন — 'ফিলস, ১৯৯৭ এ হাভানায় আপনি আমাকে বলেছিলেন, 'ফেদেরিকো, আজ আর বিদ্রোহের কোনো প্রয়োজন নেই। এখন থেকে লড়াই হবে আরও ভালো অংশীদারিত্বের জন্য (যেমন অনেকটা 'বামফ্রন্টের বিপ্লব আরো উন্নত বামফ্রন্ট'। মন্তব্য: সমালোচক)। শ্রেণী সংগ্রাম আর আমাদের লক্ষ্য নয়, আমরা চাই ন্যায়সঙ্গত ও লাভিপূর্ণ সহাবস্থানের কঠোরতার মধ্যে শ্রেণীগুলির সমঝোতা।' সাবাস! তা হলে শ্রেণী সংগ্রাম নয়, শ্রেণী সমঝোতা! চকিৎসকদের বেশি সময় ধরে ক্ষমতার থাকার রসায়নটা হয়তো এমনই হয় — হাভানা থেকে কলকাতা, সর্বত্র। কাশ্রোর মুখেই শোনা যাক এ-প্রশ্নের উত্তর — 'আমি আসী এরকম কিছু বলেছিলাম বলে মনে হয় না। অনুবাদের সমস্যান্বিত ভুল বোঝাবুঝি হয়তো। কেন না বা বললেন তা আমার চিন্তাবাবনার থেকে অনেক দূরে।' ঠিক কতটা দূরে, তা কিন্তু বোঝা গেল না।

অবশ্য শ্রেণী সংগ্রাম চূড়োয় যাক বা না-যাক, সোভিয়েত রাশিয়ার আলো সেই প্রশাসনিক সৌঁহ যবনিকা কিন্তু কাশ্রো-র দেশেও রয়েছে। তাই সরকার বিরোধী অন্য কোনো দল ও মতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কাশ্রো-র স্বকথকে বীকারোক্তি, 'বুলে সেওয়ার কথা বলছেন তা করা হবে না।' এর পেছনে অবশ্য

অকটা মুক্তিও রয়েছে। অন্য কোনো দল ও মতকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের কাগ্য করা দিলে তা হবে 'মার্কিন স্ট্রীটসকে সাহায্য করা'। তবে হ্যাঁ, এরকম হাচের একটা বিষয়ে কাশ্রো-সের সঙ্গে স্বীয় কর্মের উদ্দেশ্যের মিল থাকলেও, ওঁর স্রেফ একটা কথাতেই গোটা 'আলিমুদ্দিন স্ট্রিট' জ্বলবে তলায় ভুবে যায়। জ্যোতিবাবুর উত্তরসূরি নির্বাচন নিয়ে এক উত্তর পদত্যাগ করা নিয়ে এখানে যখন দিনের-পর-দিন চিংড়ি লাড়মাড় খাওয়া চলছে, তখন কাশ্রো সাক জনিয়ে মিছেন, 'উত্তরাধিকারী তৈরি করার কোনও প্রয়োজন নেই।' এই ফিলস কাশ্রো এখন সত্তর পেরিয়ে রাতদিন জোণে থেকে কাজ করেন — 'সত্তর পেরিয়ে কি আর সময় নষ্ট করা যায়?'

ঠিক একই রকম কাগ্যদায়। সত্তর পেরিয়ে মুগাল সেন-ও বলে বলেন, 'বাই-বাই, ঘুমিয়ে কম, বইপত্র পড়ি, লিখিও বা যখন যেমন মনে হয় ...'। এই বিদগ্ধ (রাফটনৈতিক) চলচ্চিত্রকারের নামে কিউবার ফিল্ম ইনস্টিটিউট একটি আসন সংরক্ষিত রয়েছে। কী কাকতালীয় মিল — বাট-সত্তর দশকে কীকন্ত বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখা এই চলচ্চিত্রকারের আজ আর বিদ্রোহের স্বপ্ন দেখেন না। পাশাপাশি, সেই উত্থান সময়ের ফিলস কাশ্রোও কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। কিউবার প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার টমাস ওইতেবের্জ আলোরার ছবি 'মেমোরিজ অব আন্ডার-ডেভেলাপমেন্ট'-এর প্রায় শেষ দৃশ্যে, টেলিভিশনের পর্দায় যে-ফিলস কাশ্রোর মুখ থেকে সেই বক্তৃতা শোনা যায় — 'আমাদের জানতে হবে কীভাবে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়, সংগ্রামের সঙ্গে বাঁচতে হয়। দেশের আবাল-বৃদ্ধ বসিতা আমরা এখন সবাই একপ্রাণ। দেশপ্রেমিক এবং বিদ্রোহী যোদ্ধা সকলের কাছেই এই বিপদ সমান, এক জয়গাঁও হবে আমাদের সকলের। হয় সেল বাঁচবে, না হলে মৃত্যু! আমরা জিতবোই।' (অনুবাদ: নির্বল ধর; সিলে সেট্রাল প্রকাশনা)

সে তো মুক্ত হল, স্বাধীন হল। কিন্তু মানুষ? দেশের মানুষ মুক্ত হল কি? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের পরেও তো অনেক কথা ছিল, অনেক কাজ ছিল বাকি। চোখে ছিল সমাজতন্ত্রের রঙিন স্বপ্ন। সে সবার কী হল, কাশ্রো?

বয়েছে পল্ এম সুইজার-র 'পোস্ট রিভলুশনারি সোসাইটি' থেকে নির্বাচিত 'অংশ বিশেষ'। অনুবাদ করেছেন অসীম মজুমদার। 'মার্কসবাদের আলোর সমকাল' নামক বিশেষ ক্রোড়পত্রটি ছাড়াও এই সংখ্যায় রয়েছে এক ওজ গল্প ও কবিতা।

সবুজ মুখোপাধ্যায়

রবিশাস

বইমেলা সংখ্যা ২০০১, ৪র্থ বর্ষ

প্রাণ্ডিন : পতিব্রাহ্ম, বুক মার্চ, নিউ ইরহিজন, দিলীপ মজুমদার, পি. বি. এস ইত্যাদি। দাম : ৪০ টাকা



হয়েছে

□ এশতম প্রয়াস : সন্টসেকের প্রবীণদের এই সংগঠন বাকুড়া জেলার উদ্ভিদিকায় অনাবাদি জমিতে আধুনিক চাষ প্রকল্প শুরু করেছে। ৮ জুলাই এই উপলক্ষে শালতোড়া থানার কানুড়ি গ্রামের কৃষি নিকেতনে যুগ্মকারীর চারা রোপণ করা হয়। বাকুড়ার মাটি এ চাষের অনুকূল এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই চাষ লাভস্বরূপী বটে। সংগঠনের তরফে জেলার দরির চাষী ও আদিবাসীদের প্রত্যেকের পতিত জমিতে ডেহম চাষ কেন্দ্রীভূত করে জেলা সংযোগের মাধ্যমে তাদের আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

□ বিশ্ব প্রবীণ দিবস : সংসারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ক্রমশ অবহেলিত, অলক্ষিত, নিঃসহায় এমনকি নির্যাসিতও। রাষ্ট্র সত্ত্ব ১লা অক্টোবর দিনটিকে 'বিশ্ব প্রবীণ দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছে। আগরতলা, ধলাধর, রোড নং ১২-এর হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী এই দিনটিতে প্রবীণদের নিয়ে নানা আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের ডাক দেন। পলিতও হয়।

□ যুদ্ধমুগ নিয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতা। চারমিকে যুদ্ধ যুদ্ধ রবের মধ্যে প্রকৃতিতে যুদ্ধমুগ নিয়ে শিখীরা কী ভাবছেন — জানার জন্য কলকাতার বিজয়গড়ের 'নেচার মেটস' আয়োজন করেছে এক পোস্টার প্রতিযোগিতার। প্রকৃতিবন্ধ এই সংগঠনটি বছর পাঁচেক ধরে প্রকৃতিকে ভালবাসার জন্য নানান কাজ করে চলেছে। নিয়মিত বের হচ্ছে 'সবুলিয়া' পত্রিকা। আর পরিবেশ বিষয়ক বসে আঁকা, বসে লেখার আসরও বসে নিয়মিত। এবারের প্রতিযোগিতা ১২ নভেম্বর।

□ 'জ্যোতিষবিদ্যা কি বিজ্ঞান?' (Is astrology a science?) শীর্ষক বিষয়ে আলোচনাচক্র বসেছিলো রাজাবাজারের ফেডারেশন হল সোসাইটি সভাপণ্ডে, গভ ও অক্টোবর শনিবার। বৌদ্ধ উদ্যোক্তা সাইল ফর সোসাইটি এবং ফেডারেশন হল সোসাইটি। কমল বসু, চির দর, অমলেশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরজিৎ কর, বিমল রায়, মণীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্টজন আলোচনার অংশ নেন।

□ 'জ্যোতিষের জাগ্রাতি' শিরোনামে ১৪ অক্টোবর, রবিবার হালিসহর লোকসংস্কৃতি ভবনে ইইপ্রকাশ, গান ও রঙিন স্লাইড প্রদর্শনী হল। আয়োজক বিজ্ঞান দরবার কাঁচরাপাড়া।

□ চুঁচুরা কৌতুহলী বিজ্ঞান সংস্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গভ ভূন মাস থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের ধারাবাহিক উদ্যোগ নিয়েছে। ১২টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারের 'প্রতিযোগিতা' মূলক উদ্যোগ' নেয়। ১৬ সেপ্টেম্বর চুঁচুরা প্রতিযোগিতায় চন্দননগর কৃষ্ণভাষিনী নারী

শিক্ষা মন্ডির চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়। কুসংস্কার নিয়ে সহজবোধ্য আলোচনা হয়। সকল ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহবর্ধক সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

□ ৯ সেপ্টেম্বর রবিবার বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে, অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার অঙ্গণে বিভিন্ন সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বানে আলোচনাচক্র জ্যোতিষশাস্ত্রের অধৈর্যজনক ভিত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি ভুলে ধরেন। ডাঃ সাধন সেন — ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্যোতিষের বিকল্পে দীর্ঘস্থায়ী ও নিরলস প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সভায় কতগুলি সুনির্মিত প্রস্তাব দেওয়া হয়। জ্যোতিষবিজ্ঞান ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে সভার আয়োজন, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সংগীত রচনা ও পরিবেশনা, স্থানীয় কবিদের ছড়া রচনা ইত্যাদি প্রস্তাব সভায় পেশ করেন বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের সম্পাদক নির্মাল্য সিংহরায় যা সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। সংস্কৃতি সংঘ শিক্ষা নিকেতনে-হরিপুর এই আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়।

□ ২৯শে জুলাই হালিসহর বিজ্ঞান পরিষদের আয়োজনে হালিসহর লোক সংস্কৃতি ভবনে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা মূল্যায়ন ২০০০ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে মনোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল পরিষদের ছোট কর্মীদের দ্বারা পরিবেশিত নাটক 'মহাভারত' ও অতনু মন্তব্যকারী গান। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিষশিক্ষা প্রবর্তনের প্রতিবাদে উক্ত অনুষ্ঠানে একটি স্থিরচিত্র প্রদর্শনী হয়।

□ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক শাখা সানডে সিটিং ৭ অক্টোবর বীশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে তাদের ৭ম বর্ষ বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসা মূল্যায়ন অনুষ্ঠান করে। পুরস্কার বিতরণ ছাড়াও ছিল বিজ্ঞান কন্যা জ্যোতিষ বিষয়ে অমলেশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্লাইড-সহ আলোচনা। জ্যোতিষ কেন বিজ্ঞান নয় — সে নিয়ে বলেন বিভিন্ন দল। গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন সুদীপ গুপ্তার ও মৈত্রেয়ী নন্দী।

□ গঙ্গাতাণ্ডন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটির উদ্যোগে গণ কনভেনশন হল পঞ্চানন্দ পুরের নয়াবাজার হাই স্কুলে। ২ সেপ্টেম্বর। বেসরকারি ভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও দুর্বিপাক মোকাবিলায় কী করা যায়, তা নিয়ে সারাদিন ব্যাপী আলোচনা সভা চলে। কমানারাম মণ্ডল, ফিরি বক্স, তোরিকুল ইসলাম প্রমুখ ছিলেন উদ্যোক্তা।

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় নিরমিত বিভাগ 'চেনা' বিষয় অচেনা জগৎ এবং 'বনের খবর' দেওয়া গেল না। জানুয়ারি ২০০২ সংখ্যায় থাকবে।

পরিচালকমণ্ডলী

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচি — ২০০১

(অ) গল্প কথায় কেনে নেতাজ	১৪৬	বৌদ শিকার অ আ ক ব	পৃথীল বন্দোপাধ্যায়	১০৮	
অভিসৃষ্টির ধাঁধা	অশোক বন্দোপাধ্যায়	১৪৪	রবিশংকর বইলেখা সংস্থা	সতীশ মুখোপাধ্যায়	২০২
(আ) অজীবকাল পাথে নদী	সহীদকুমার খোদ	২৬	পুস্তকতরঙ্গের মারফাত বোর্ডিং-এন	সুজিতকুমার দাস	১৩৯
অমরতা কিছু করতে পারি	কল্যাণ কল	১৪৬	(ক) কল্যাণ দাস জেদার	সেখেন মুখার্জি	২১
আর্জ বক্তিতান ও ইতিহাস	হোসেনখিষ্ ট্রৌটরি	১৮১	(খ) কন্যা নিরঞ্জন ভাবনা	লিতাংগ পদোপাধ্যায়	০
আয়রণ — চেখনার সাহা		১৬২	ব্রাহ্মক্যান্টনের সূত্র	আশীষ লক্ষী	৪৪
আবেশ : কল্ল সৎবাব	ইজরাথ বন্দোপাধ্যায়	২০২	বিজ্ঞান আবেশন (পর্ব ৬)	সত্যসীতা চট্টোপাধ্যায়	৪৭
(উ) উঃ ২৪ পরগনা	হুগতোথ চক্রবর্তী	১৭	বিজ্ঞান বর্ণন (পর্ব ১৮)	যাসুদেব মুখোপাধ্যায়	৬১
(এ) এবারের কন্যা, কিছু পরামর্শ	তপোদ্রুত সন্দ্যাল	১০	বিজ্ঞান বর্ণন (পর্ব ১৯)		১০৪
(ঈ) ঈতা হাই	প্রভুদাসমুখোপাধ্যায়	২১০	মনের ঘর (ভক্ত)	বিক্রমল চক্রবর্তী ৮৪, ১০৮, ১৯২	
(ঊ) কলিঙ্গটোরে কুলুগ্রাম	ততানীগ্রামের সখ	৪৫	বিশ্ব স্বেচ্ছাসেবায়	(অনু) বল্লভ ভট্টাচার্য	৮৫
কোয়ালিন অশচর	জহর দাস	৬০	বিহরতা যখন অনুধ	সত্যজিৎ আল, মোজিত হুগলী ৮৯	
কলাপাহাড়ি তালিকান	অমিত্রভ ভট্টাচার্য	২৩	বাল্যসেখ বিজ্ঞান আবেশন	সত্যসীতা চট্টোপাধ্যায়	৯৮
কিটবার ডাক্তার	ডেভিড থেবকাল		কন্যা খোচে কিছু পরিহাস	তপসকুমার ট্রৌটরি	১৫০
(অনু:) বল্ল ভট্টাচার্য	২২০		বর্তমানে বিজ্ঞান আবেশন	সত্যসীতা চট্টোপাধ্যায়	১২০
(খ) ঘননা মহা	প্রতিবেশক	১৪২	বৈদ্যনাথের তৈল গাওরাই	সাজেন দত্ত	১১৮
(গ) গ্যামিলিওর নির্বাক	সৌমিত্র লক্ষী	২২৪	বন্যাকল্লিত মানুষের জ্ঞান	মনজোব সাহা	১৫৮
(ঙ) গেনা বিহর ভায়েনা অশ	সহীদকুমার খোদ		হৈমিক সমাজ ও মুলাবোহ	অপারুত সন্দ্যাল	১৭৭
গর বর বর ঈশিনে কুহর		৬৭	বিপর্ষয় মোলকিয়ার	ততানীগ্রাম মুখোপাধ্যায়	২১৭
মত বর ভায়েনা জ্বলাতে চাই		১০৬	বাধ কন্য মনুষ	সত্যসীতা চট্টোপাধ্যায়	২৩০
জ্বলনে কন্যে এক-রে বিল্ল		১৪০	(ক) গ্রেডি-জুতা - চার্লসকল		৬০
কেনে গুজুম তেমনি হায়ে		১৬৫	তুল্ল তুমিকল্ল	ততানীগ্রাম মুখোপাধ্যায়	৬১
(জ) জীবিকাবিহীন জীবন	জহা মিত্র	০১	তথিহাতের তথিবাং	সুনন্দ সন্দ্যাল	৭৪
জল সেরে খাওয়ার পর	অননুদা মুখোপাধ্যায়	১২৯	(ম) মানুষ কী না পারে	ভোলানাথ আইচ	১৮
জলাতুমি হস্তিরকল গ্রাম		১২৯	মালবা ও ফনজা হক	তপসকুমার ট্রৌটরি	২৪
জ্যোতিষ ভিগি	থোবালিন চক্রবর্তী	১৭০	মালবার ডাকন	তপসকুমার ট্রৌটরি	১১০
জ্যোতিষ ... মুতলী দোদী	ততানীগ্রামের সখ	১১২	(খ) বা আও কল্লি	ফল্যাণ কল	৮
(ঙ) ঙিক বৈঠক	সুজয় বসু	২১৫	বৌদ হেনহার আইন	সুজিতকুমার দাস	০৮
(ক) কোমারের পৈতেত ...	বেবকল্লার বন্দোপাধ্যায়	২১১	(ঈ) কোমরা সাধাওয়ার হোসেন	গোপা লক্ষ্যতামিক	৪৪
(খ) গাপর সবজি ও মাছ	তিব ধর	৮৬	রাজকিতির অবকর	পাণ্ডু রায়	৭৮
ধর স্বকল্ল	মুলাল বিবাস	১০০	(ল) লটি বনাম স্টেগো	শ্যামল চক্রবর্তী	৯০, ১১৫
(ন) নিরঞ্জন কি সত্যিই অসম্ভব	শঙ্কর খোদ	১৪৭	(শ) লাক্ষ নর জ্ঞান অনুষ্ঠান		১৯১
নীলসে চলে যান সুখরায়	অশোক বন্দোপাধ্যায়	১৪৪	(স) লক্কেলের মাল	সুভ্রত গ্যামেল	৮০
(প) পলিগ্রামে : পুথি সংগ্রহ	অজিত মারাতল বসু	১২৯	সহস্রাব্দের মুলায়ন	(অনু) সুভ্রত বন্দোপাধ্যায়	১৬০
পলিগ্রামে পরমাপু বিদ্যুৎ	(অনু) নান্দু মুলাক	১০৪	লক্ষী ব্রত	সুতপা বন্দোপাধ্যায়	১২২
পুস্তক পরিচিতি			সহস্রাব্দের মুলায়ন	অমর্তী সেন	
'গেম্‌স' নিশীথ ট্রৌটরি শরণ সংস্থা অ. ব		৬৯	(অনু:) সুভ্রত বন্দোপাধ্যায়		২২১
মানবজমিন	মিত্রা গায়	৬৯	(খ) হেমন্তবাসা : অনন্য নারী	অলকল্লার বসু ট্রৌটরি	৪৮



রেজিঃ অফিস — বিডি ৪৯৪, স-ট সেক, কোলকাতা ৭০০ ০৬৪
ফোনে যোগাযোগ : ৩৫৮-৬৩৯১/৩৪৩-৪১২৫/৩৩৪-০৯০৪/৪৬৬-৯৪৩৫

পুস্তক তালিকা

বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১ম খণ্ড)	৩৫.০০	ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচমিশের দাস	২৫.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)	৩০.০০	সাপ নিয়ে কিংবদন্তী	২০.০০
চলতে ফিরতে	১০.০০	বিবেকানন্দ অন্য চোখে	২৫.০০
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়	২০.০০	প্রমিথিউসের পাখে	১২.০০
অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে	৩০.০০	তিন অবহেলিত জ্যোতিষ	১৮.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ	১৫.০০	কি আর কেন	২০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	৩০.০০	লুপ্ত হয়ে যায় ব্রহ্মদেশভূমি	(নিঃশেষিত)
প্রতিরোধ : অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	২৫.০০	খাবার নিয়ে ভাবার আছে	২৫.০০
জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? [পরিবর্ধিত সংস্করণ]	৩০.০০	শেকলভাঙা সংস্কৃতি	২৫.০০

প্রাপ্তিস্থান : পরপুট, বুকমার্ক, পাতিরাম

কোনে যোগাযোগ : ৩৫৮ ৬৩৯১/ সন্ধ্যার পর ৩৪৩৪১২৫, ৩৩৪০৯০৪

'উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, স-ট সেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত
এবং পৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত

We are thankful to CSIR, Govt. of India, for partial financial support in publishing the journal.